শ্রীরামকৃষ্ণ
কিছু অজানা প্রসঙ্গ
সুনীত দে

শ্রীরামকৃষ্ণ
কিছু অজানা প্রসঙ্গ

সুনীত দে

দে পাবলিশিং
৬০/৬/১সি, শ্যামপুকুর স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০০৪
ফোন ঃ ৮২৯৬৬৭২৫৫৪

‘ভারতবর্ষকে জানতে হলে বিবেকানন্দকে জানো...... ।’

রবীন্দ্রনাথ রমাঁ রলাঁকে এমন কথা বলেছিলেন কী? স্বামী পূর্ণাত্মানন্দের গবেষণাপত্র কী বলে!
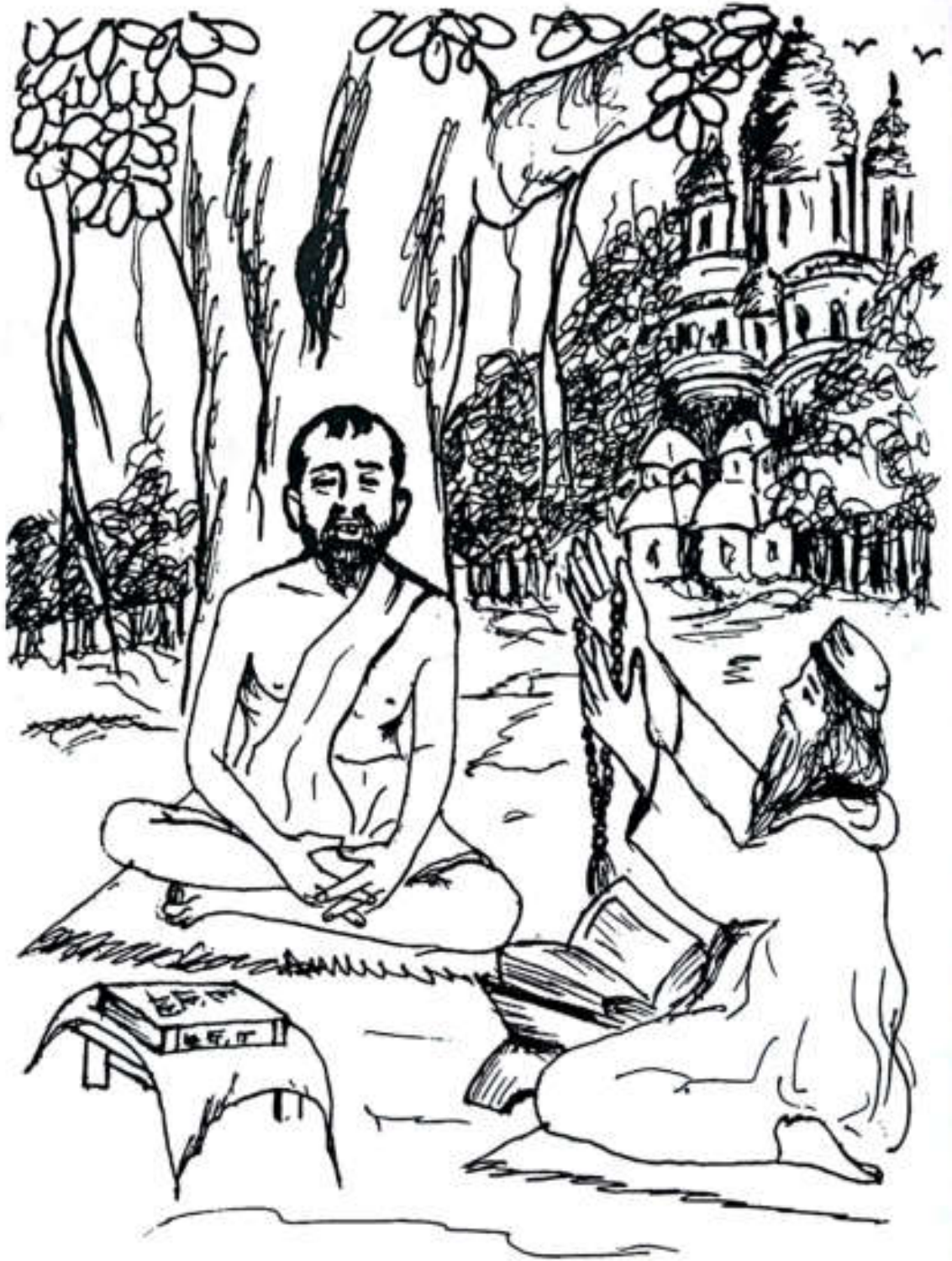
শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ইসলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ।

সূচীপত্র

মহীয়সী রাণী রাসমণি ৯
কিছু প্রাসঙ্গিক কথা ১৫
মন্দির নির্মাণ ও জাগ্রতকরণ ২০
জন্মরহস্য ৩৩
শ্রুতিধর শ্রীরামকৃষ্ণ ৩৯
ভাব সমাধি ৪১
শ্রী রামকৃষ্ণ এবং জাতপাত ৪৫
নারী সুলভ লক্ষণ ৬২
বিবাহ ও ষোড়শী পূজা ৭২
শ্রীরামকৃষ্ণ উত্থানের আর একটি কারণ ৮১
স্বয়ং ব্রহ্ম ৮৮
নারীর প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণ ১১১
লোক শিক্ষক শ্রীরামকৃষ্ণ ১২৬
যত মত তত পথ ১৬৯
টাকা মাটি মাটি টাকা ১৮৪
রামকৃষ্ণ এবং সেকালের মহাপুরুষেরা, মাইকেল মধুসূদন দত্ত ১৯০
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯২
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ২০০
বিদ্যাসাগর ২০৪
রবীন্দ্রনাথ ২১৪
স্বাধীনতা সংগ্রামে রামকৃষ্ণ মিশন ২১৮
যে সকল গ্রন্থ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে ২৫১

মহীয়সী রাণী রাসমণি

অনেকে বলেন রাণী রাসমণি মন্দির নির্মাণ করে ঠাকুর রামকৃষ্ণের উত্থানের পথ প্রশস্ত করেছিলেন। সত্যি কথাই তো, দক্ষিণেশ্বর মন্দির যদি নাই থাকে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবকে পেতাম কোথায়! এটা একটা মত বটে। আবার কাউকে বা বলতে শুনি, মন্দির ছিল বলে অবতার রামকৃষ্ণদেবের আগমন এটা আদপেই ঠিক কথা নয়। ঠাকুর আসবেন, তাই রাণী মন্দির সাজিয়ে বসেছিলেন, পূর্ব নির্দিষ্ট বিধির বিধান। এই খেলায় রাণী একটি মাধ্যম মাত্র। অবতার যখন আসেন তার সঙ্গীসাথী সঙ্গে নিয়েই আসেন। সপ্ত নায়িকার অন্যতমা রাণী রাসমণি নিজেও ওই দলের একজন। তাকে আসতে হত, মন্দির নির্মাণ করতে হত, গদাধরের অপেক্ষায় দিন গুনতে হত। এ তার নিজের ইচ্ছায় নয়, তার পয়সা আছে বলে নয়, এটাই বিধির বিধান। আয়োজন সম্পূর্ণ করে তাকে বসে থাকতে হত। আবার যখন একশো বছর পরে ঠাকুর আসবেন তাকে আসতে হবে। হয়তো সে আগমন অন্য কোন ভাবে হবে। কলেবর আলাদা, যুগ আলাদা, এক কথায় স্থান, কাল, পাত্র সবই পাল্টে যাবে। তবুও রাণীর রেহাই নেই। কলমীর দলের তিনিও এক শাখা। টান যখন পড়বে সবাইকে এসে হাজির হতে হবে।

আরও একটা মত আছে। যদিও সে মত খুব একটা পরিচিত নয়। অল্প কথায় তাকে প্রকাশ করাও যাবে না। এই বই জুড়ে সেই মতটি প্রকাশ করার অক্ষম চেষ্টা করা হয়েছে। যদি ঠিক ঠিক প্রকাশ করে উঠতে পারি, সে ঠাকুরের আশীর্বাদ। আর তা যদি না পারি সে আমারই দায়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে সর্বাগ্রে রাণী রাসমণির নামই মনে ওঠে। রাণী যে শুধুই একজন ধনাঢ্য মহিলা ছিলেন তা নয়। তার বহু কার্যাবলীর জন্য সমাজে তিনি এক প্রবাদপ্রতীম মহিলা। এহেন একজন সম্পর্কে কিছু বলতে যাওয়া কঠিন তো বটেই, আরও কঠিন হয়ে ওঠে যদি তা এমন কিছু তত্ত্ব হয় যা অনেকের কাছেই প্রায় অজানা। হ্যাঁ, এমনই বহু প্রামাণ্য এবং দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ থেকে অসংখ্য তথ্য সামনে রেখেই আমরা জীবনী পথে এগিয়ে চলব।

রাণী ছিলেন প্রজা হিতৈষী মহিলা। তার অনেক দান-ধ্যান আছে। প্রজার সুবিধার্থে তিনি বহু দৃষ্টান্তমূলক কাজ করে গেছেন। এসব আমাদের প্রায় সকলেরই কমবেশি জানা ঘটনা। কিন্তু এখানেই রাণী রাসমণি শেষ নন। আরো অনেক কিছুই আছে যা সেভাবে প্রচার পায়নি। আমরা সেই অজানা জীবনীটুকুই তুলে ধরার চেষ্টা করব। কোনও মহৎ জীবনীকে সম্যকভাবে জানতে যা জরুরিও বটে।

'ছোটবেলায় দোলনায় দোল খেতে খেতে রাণী ডুমুর গাছে ফুল দেখেছিলেন।' (দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ। দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা-২)। যদিও আমরা জানি ডুমুরের ভেতরেই তার ফুল থাকে। তাই বাইরে থেকে সেই ফুল দেখা যায় না। যাইহোক লোকে বলে ডুমুরের ফুল দেখলে ধন-মান্যে সে ফেঁপে-ফুলে ওঠে। রাণীর তো বিপুল ধন ছিলই, সেই সাথে রাণী ছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণ, উচ্চাকাঙ্ক্ষী মহিলা। কোন কাজে হাত দেবার আগে তার শেষ পরিণতি কি হতে পারে না ভেবে সে কাজে তিনি হাতই দিতেন না। আর সব কাজেই তার ডান হাত স্বরূপ ছিলেন সেজো বা ছোটো জামাই সুদর্শন, উচ্চশিক্ষিত, মথুরমোহন বিশ্বাস।

মথুরবাবুর কিন্তু রাণীর জামাই হবার কথা ছিল না। মথুরবাবুর দাদা প্রাণকান্তের সাথে রাণীর সেজো মেয়ে করুণাময়ীর বিয়ে হবার কথা হয়েছিল। কিন্তু রাণী কুলীন নন, এই অজুহাতে প্রাণকান্ত এবং তার পরিবার বিয়ে থেকে পিছিয়ে যায়। হঠাৎ-ই বাবা-মার অনুমতি না নিয়েই মথুরমোহন দাদার জায়গায় বিয়ে করতে রাজী হয়ে যান। এতে রাণীর অমতের কিছু ছিল না। কথা হচ্ছে মথুরমোহন কেন এই বিয়েতে রাজী হলেন। ঠিক আছে, কাহিনি এগিয়ে চলুক। রাজী হবার কারণটিও সেখান থেকেই উঠে আসবে। তিনি রাণীর বাড়িতেই ঘরজামাই হয়ে থেকে যান। করুণাময়ীর অকাল মৃত্যুর পর ছোট মেয়ে জগদম্বার সাথে রাণী তার বিয়ে দেন। রাণী চাইতেন না তার এই সুশিক্ষিত জামাইটি তাকে ছেড়ে চলে যাক। জমিদারি রক্ষার জটিল দায়-দায়িত্ব মথুরমোহন একাই অবলীলায় সামলে নিতেন।

জমিদারি সামলাতে গিয়েই মথুরবাবু ক্রমে অন্য জামাইদের সরিয়ে রাণীর সম্পত্তির একটা বড় অংশ নিজের নামে করে নিচ্ছিলেন। একসময় রাণী ব্যাপারটা বুঝতেও পারেন। পরিস্থিতি জটিল হওয়ায় কোর্টেই তা নিষ্পন্ন হবে ঠিক হয়। মামলা সুপ্রিম কোর্ট অবধি গড়ায়। কোর্টের রায়ও রাণীর পক্ষেই যায়। রাণী সংবাদ প্রভাকর পত্রিকায় ১৮৫২ সালের ১৪ই জুলাই একটি বিজ্ঞপ্তি দিয়ে সকলকে জানান 'সুপ্রিম কোর্টের অনুমতিক্রমে তাদের নামাঙ্কিত কোম্পানির শেয়ারের কাগজপত্র মথুরবাবুর কাছ থেকে কেউ কেনা-বেচা করতে পারবে না অথবা বন্ধক রাখতে পারবে না'। (রাণী রাসমণির জীবন বৃত্তান্ত—নির্মল কুমার রায়। প্রথম প্রকাশ, পৃষ্ঠা-১৫৮-৫৯)।

খুব সাধারণ ভাবে একটা কথা বলা যায়, যেখানে শাশুড়ি-জামাইয়ের মধ্যে সম্পত্তি নিয়ে মামলা কোর্ট-কাছারি অবধি গড়ায় সেখানে সম্পর্কের অবনতি ঘটতে বাধ্য। কিন্তু এখানে তেমনটি ঘটেনি। মথুরবাবু যেমন ছিলেন তেমনই বহাল তবিয়তে থেকে গেলেন। কেন এমন বিপরীত প্রতিক্রিয়া? সেখানেও রয়েছে রাণীর বিচক্ষণতা। অল্প বয়স, না হয় একটা ভুল করেই ফেলেছে। মানিয়ে নেওয়া যায় না তা! নিশ্চয়ই যায়।

আর একটি ঘটনা এই সূত্রে মনে আসছে। রাণী বেঁচে থাকতেই মথুরবাবু দক্ষিণেশ্বর দেবোত্তর এস্টেটের সম্পূর্ণ দখল নিজেই নেবার চেষ্টা করেছিলেন। মন্দির পরিচালনের সব দায়-দায়িত্ব স্ত্রী জগদম্বা ও তিন পুত্রসহ তিনিই নির্বাহ করতেন। রাণীর অন্যান্য কন্যা

বা নাতিদের এ ব্যাপারে ঘেঁষতেই দিতেন না। তারাও বসে না থেকে মথুরবাবুর বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা রুজু করে। এটি ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের বিখ্যাত ৩০৮ নং মোকদ্দমা। বিচারে মথুরবাবুর হার হয়। (ঐ, পৃষ্ঠা-১৫০)। এখন দেখা যাক রাণীর সেই সমস্ত কাজ, যার জন্য রাণীর খ্যাতি সমাজের সর্বত্র।

পাকা রাস্তা বানিয়ে দেওয়া, পুকুর ঘাট বাঁধিয়ে দেওয়া, গঙ্গাযাত্রীর থাকার ঘর করে দেওয়া, দরিদ্র ব্রাম্মণের মেয়ের বিয়ে দেওয়া, সময় সময় বিভিন্ন উৎসবে গরিব লোকদের অন্ন-বস্ত্র দান ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক জনহিতকর কাজ রাণী করেছেন। এসব নিয়ে কারো কিছু বলার নেই। বিপুল সম্পত্তির সাথে 'সেবা'র একটা সম্পর্ক থাকে। এই সেবা-ধর্মই সুখ্যাতি বয়ে আনে। রাণী তখন বাঙলার সেরা অভিজাত পরিবারগুলির মধ্যে গণ্য হচ্ছেন। সেবা-ধর্ম ত্যাগ করলে তিনি পিছিয়ে পড়বেন নিশ্চিৎ ।

রাণী ইংরেজদের সাথে বেশ কয়েকবার সম্মুখ সমরে জড়িয়ে পড়েছেন। এবং সব ক্ষেত্রেই জয় রাণীরই হয়েছে। এ নিয়ে আর বিস্তারিত আলোচনা নিস্প্রয়োজন। সকলেরই জানা বীর গাথা, নতুন কোন প্রশংসার অপেক্ষা রাখে না। আমাদের আলোচ্য বিষয় একটু অন্য রকম। প্রদীপের উপরটা যেমন আলোময় নিচটা তেমনি অন্ধকারই। শুধু আলোটুকু জানব অন্ধকারটা বাদ। তাহলে কিন্তু প্রদীপটাকে সম্পূর্ণ জানা হল না। জানতে হলে সবটাই জানতে হবে। তাহই সত্যজ্ঞান।

রাণীর বীরত্বের কাহিনী পড়ে মনে হয় যেন তিনি ইংরেজ শাসনের ঘোর বিরোধী। কিন্তু সত্যিই কি তাই ! দেখতে হবে রাণী কাদের সাথে বিরোধিতায় জড়িয়েছিলেন। কেউ বা খুনে লম্পট, ডাকাতি করতে রাণীর বাড়ি চড়াও হয়, কেউ বা নীলকর সাহেব, চাষীদের ওপর অত্যাচার করে বেড়ায়, ইত্যাদি ইত্যাদি। আসলে ইংল্যাণ্ড থেকে বখে যাওয়া কিছু লোকজনই মূলত এ পোড়া দেশে এসে ডেরা বেঁধেছিল। তারাই দেশটাকে নরক গুলজারে পরিণত করে। রাণীর সংগ্রাম মূলত এই লোকগুলির বিরুদ্ধেই। সব মিলিয়ে রাণীর বিরোধিতা ইংরেজ ব্যক্তি বিশেষের প্রতি, ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে নয়। দুটি ক্ষেত্রে তার লড়াই সরকারি স্তরে পৌঁছে গেছিল। একটি ক্ষেত্রে উপকৃত হয়েছিল দরিদ্র ধীবর সম্প্রদায়, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে জয়ী হয়েছিল রাণীর সাহস এবং জেদ। রাণীর সাহসিকতা সমাজে এখনও প্রবাদ স্বরূপ। তিনি ছিলেন দরিদ্র দেশবাসীর চোখে এক মহীয়সী নারী। 'ধন্যি রাণী রাসমণি, কৈবর্ত রমণী'। তারা রাণীর প্রশংসায় ছোট ছোট গান বাঁধত।

রাণী রাসমণি ইংরেজ সরকারের বিরোধী কখনও ছিলেন না। তেমন হওয়াও তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। রাণীর শ্বশুরমশায় প্রীতিরাম দাস ইংরেজের সাথে নানান ব্যবসায় যুক্ত ছিলেন। এই সব ব্যবসায় থেকে প্রচুর রোজগারও তিনি করেছিলেন। আস্তে আস্তে ছোটো খাটো জমিদার পর্যায়ে তার উত্তরণ ঘটে। প্রীতিরামের মৃত্যুর পর তার পুত্র রাজচন্দ্র দাসের চেষ্টায় এই জমিদারী আরও ফুলে ফেঁপে ওঠে। স্ত্রী রাণী রাসমণি দাসী ব্যবসায় সংক্রান্ত কাজেও স্বামীকে নানা ভাবে সাহায্য করতেন। আজ থেকে প্রায় দুশো বছর আগে রাজচন্দ্র দাস যে হারে রোজগার করেছিলেন ভাবলে অবাক হতে হয়। ত্রিশ

চল্লিশ হাজার না এলে ভাবতেন দিনটা বৃথাই গেল। কোন কোন দিন বা লাখখানেকও ছাড়িয়ে যেত। ভাবুন একবার যে যুগে পঞ্চাশ টাকা মাইনে পেলে একটা সংসার হেসে খেলে চলে যায়। সেই যুগে মাসে পনের বিশ লক্ষ টাকা, আজকের দিনে এটা নিশ্চয় বেশ কয়েক কোটিতে পৌছে যেত। (যদিও এই হিসাবটা সম্পূর্ণ ঠিক নাও হতে পারে) এহেন ধনাঢ্য ব্যক্তি কিছু জনহিতকর কাজ করবেন এতে আর আশ্চর্য কি।

জায়গা জমি বাড়ান আর প্রাসাদ নির্মাণেও লক্ষ লক্ষ টাকা তিনি ব্যয় করতেন। এসবের সঙ্গে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বড় বড় সাহেবদের সাথে ছিল দহরম-মহরম সম্পর্ক। কোম্পানী রাজচন্দ্রকে 'রায়' খেতাব দিয়েছিল। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানী সরকার 'রায় রাজচন্দ্র দাসকে' সম্মান সূচক 'অনারারী' ম্যাজিস্ট্রেট বা অবৈতনিক বিচারক পদে নিযুক্ত করে।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একজন প্রধান অভিজাত অংশীদার জন বেব সাহেব একবার ভারতে আসেন। কথিত আছে কোম্পানীর অভিজাত অংশীদারদের মধ্যে একমাত্র বেব সাহেবই ভারতে এসেছিলেন। ভারতে এসে তিনি রাজচন্দ্র দাসের অমায়িক ব্যবহারে অত্যন্ত প্রীত হন এবং তার সাথে বন্ধুতা স্থাপন করেন। বেব সাহেবের সহায়তায় রাজচন্দ্র ও তার বংশধরগণ পঞ্চাশ জন অশ্বারোহী বেষ্টিত চতুরশ্ব যানে ভ্রমণাদি সম্মানের সনদ প্রাপ্ত হন। ভারতীয়দের মধ্যে রাসমণি পরিবারই প্রথম চার ঘোড়াটানা গাড়িতে চড়ার সম্মান লাভ করেন। নেটিভ ভারতীয়দের এ অধিকার ছিল না। এরপর ইংলণ্ড ফেরত গিয়েও চিঠি চাপাটি, ঘড়ি উপহার ইত্যাদি আছে। আসলে সে যুগে কিছু দেশপ্রেমিক ধনী ছিলেন যারা ইংরাজের সহায়তায় বেশ কিছু সুযোগ সুবিধা আদায় করে নিতেন। বাবু রায় রাজচন্দ্র দাসও ব্যতিক্রম নন। তিনিও ঐ দলেই ছিলেন। ভারতবর্ষের বড়লাট লর্ড অকল্যাণ্ড বাঙালীদের মধ্যে রাজচন্দ্র দাসের বাগানেই প্রথম নিমন্ত্রণ রক্ষা করেন। (রাণী রাসমণি— প্রবোধ চন্দ্র সাঁতরা, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা-১৭। *তেলোভেলোর মাঠে সারদামণির বিখ্যাত 'ডাকাত বাবা' 'ডাকাত মা' সাগর সাঁতরা-মাতঙ্গিনী সাঁতরার বংশধর লেখক প্রবোধ চন্দ্র সাঁতরা*)।

এছাড়াও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত সাহেব-সুবোরা পদধূলি দিয়ে বাবুকে বাধিত করতেন। (রাণী রাসমণির জীবন বৃত্তান্ত, পৃ-৫২)। এহেন বাবুর অবর্তমানে পত্নী রাণী রাসমণি দাসীও সাহেব-মেমদের আপ্যায়ণ করে গৃহে নিয়ে আসতেন। নিমন্ত্রিত সম্ভ্রান্ত সাহেব-মেমরা তার বৈভব দেখে চোখ ছানাবড়া করে বাড়ি ফিরতেন। রাণী মাঝে মাঝে তাদের নানা উপঢৌকন পাঠিয়ে দিতেন। (ঐ, পৃ - ৬৮)।

এসবের পরেও কি মনে হয় রাণীর পক্ষে ইংরেজ সরকারের বিরোধিতা করা সম্ভব। সেরকম তো মনে হয় না। আর একটি উদাহরণ দিচ্ছি যার থেকে নিশ্চিত ভাবে বোঝা যাবে ইংরাজের সাথে সহযোগিতাপূর্ণ সহাবস্থানই রাণীর প্রথম পছন্দ ছিল।

সিপাহী-বিদ্রোহ শুরু হয়েছে। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ আন্দোলন। ভারতের দিকে দিকে বিপ্লবের আগুন জ্বলছে। কে এক নেপালের মন্ত্রী ইংরেজের তাঁবেদার জঙ্গ বাহাদুর সৈন্য সামন্ত নিয়ে ইংরেজের পক্ষ নিয়েছে। মনে আশা যুদ্ধ জিতে ইংরেজ তাকে মন্ত্রী থেকে রাজা বানাবে।

রাসমণির পরিবার তখন বাঙলার সবচেয়ে নামী পরিবার গুলির একটি। এত বড় বিদ্রোহ চলছে আর তাতে রাণীর কোন অবদান থাকবে না! এর পরবর্তী অংশ প্রবোধ চন্দ্র সাঁতরা ৬৫-৬৬ পাতা থেকে হুবহু তুলে দিলাম। "রাণী রাসমণির নিকট সংবাদ পৌছিলে তিনি কি করা কর্ত্তব্য স্থির করিতে লাগিলেন, যাহারা হিতৈষী তাহারা বলিলেন—'কোম্পানীর কাগজ পত্র বেচিয়া ফেলা হউক, কোম্পানীর রাজ্য তো গেল'। রাণী অনেক গবেষণার পর বলিলেন—'কিছুই হইবে না, মাত্র লোকক্ষয় হইবে, কোম্পানীর রাজত্ব থাকিবে। আমার ইচ্ছা আমরা যখন ইংরেজের প্রজা তখন কিছু উপঢৌকন দেওয়া যাউক।' তাহাই হইল—নিম্নলিখিত দ্রব্য সম্ভার ইংরেজগণের সাহায্যের নিমিত্ত প্রেরণ করা হইল।

হাতী—২টি	ঘোটক—৪০টি	ভেড়া—৬০টি
ছাগল—১০০টি	হাঁসের ডিম—১০০০টি	মুরগীর ডিম—৫,০০০টি
হাঁস, মুরগী—১০০টি	আটা—৫ মণ	ছোলা—৫ মণ
পাকা কলা—৫০ কাঁদী	চাল—১০ মণ	ভুট্টা—১০০০টি
বিস্কুট—১০ মণ	কম্বল—১০০ থান	লবণ—১০ মণ

এই সময় রাণী নিজ বাটীতে গোরা প্রহরীর বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। কানপুর বিজয়ের পর (অর্থাৎ সিপাহী বিদ্রোহে জয়লাভের পর) রাণীর উপর ইংরেজরা বিশেষ সন্তুষ্ট হন।" (রাণী রাসমণি — প্রবোধচন্দ্র সাঁতরা) একই ঘটনার উল্লেখ পাই 'ভক্তমালিকা'—স্বামী গম্ভীরানন্দ দ্বিতীয় ভাগ, পৃষ্ঠা ৪১৮। অথবা 'দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ'—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা ১৮।

এই হল প্রামাণ্য জীবনীকারের দেওয়া তথ্য। এর পরেও যদি রাণী সম্পর্কে সঠিক ধারণায় পৌছতে না পারেন নিন্দুকের আশীর্বাদ ভক্তের অদৃষ্টে সত্যজ্ঞান লাভ নাই।

এখানে আরও একটা সাধারণ বিচার শক্তি প্রয়োগ করা যায়, রাসমণি পরিবারের এই বিপুল সম্পত্তি এল কোথা থেকে! প্রায় সম্পূর্ণটাই ইংরেজের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে এবং ইংরেজের সাথে ব্যবসা বাণিজ্য করে। যে ইংরেজ থেকে তাদের এত বাড়-বাড়ান্ত, সেই ইংরেজের বিরুদ্ধেই বিপ্লব! এ কখনও হয়?

রাজচন্দ্রের মৃত্যুর পর প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর একদিন রাণীর কাছে এসে রাণীর জমিদারীতে ম্যানেজার হবার প্রস্তাব দেন। রাণি রাসমণি জানতেন তার স্বামীর কাছ থেকে

প্রিন্স দুলক্ষ টাকা ধার নিয়েছিলেন। রাণি রাসমণি প্রিন্সকে নানা কথায় আশ্বস্ত করে দুলক্ষ টাকা ফেরত চেয়ে বসেন। হ্যতে সেই সময় পর্যাপ্ত টাকা না থাকায় প্রিন্স তার জমিদারীর কিছু অংশ রাণীকে লিখে দিতে বাধ্য হন। যে জমির বাৎসরিক আয় ছিল প্রায় ছত্রিশ হাজার টাকা।

এরপরেও প্রিন্স রাণীর কাছে একই প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলেন এবং রাণী আবারও তাকে নিরস্ত্র করেন। প্রশ্ন হচ্ছে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের রাণী রাসমণির ম্যানেজার হবার এত আগ্রহ কেন! উত্তর জানা নেই।

অধ্যায়ের শেষে একটা কথা অকপটে স্বীকার করে নিতেই হবে রাণী ছিলেন অত্যন্ত প্রজা হিতৈষী মহিলা। যা ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যে এক বিরল গুণ। যদিও এ প্রসঙ্গে সবিস্তার আলোচনায় ঢুকতে পারলাম না। অজস্র গ্রন্থ আছে যা থেকে রাণী রাসমণি সম্বন্ধে বিশদভাবে জানা যেতে পারে। শুধু রাণীর সেই দিকটির প্রতি রেখাপাত করা হল যার অনেকটাই অজানা। তবে এ কথাও ঠিক রাণীর যা সামাজিক প্রতিপত্তি, যুগ অনুযায়ী, ইংরেজের সাথে একটু মেলামেশা না করে উপায়ও ছিল না। অতএব আলোচনা যা করা হল রাণীকে সম্যকভাবে জানার জন্যই, শুধুমাত্র বদনাম রটাতে নয়।

কিছু প্রাসঙ্গিক কথা

রাণী রাসমণি, রামকৃষ্ণদেব, স্বামী বিবেকানন্দ অথবা সারদামণি এদের কাউকে আমরা দেখিনি। এদের সম্বন্ধে জানবার একমাত্র উপায় সামন্য কিছু বই। একশ-দেড়শ বছর আগের কোন চরিত্রকে জানবার একমাত্র উপায় 'আকর' বা 'প্রামাণ্য' এই বই কটিই। কিন্তু এই বইগুলি কি সর্বৈব নিষ্কলুষ। সবক্ষেত্রে কিন্তু সেরকম মনে হয় না। দেখতে হবে এই বইগুলি লিখছে কারা। সবক্ষেত্রেই কোন ভক্তজন তার গুরুদেব সম্বন্ধে, নয় তার গুরুভাই সম্বন্ধে কলম ধরছে। যারা কিনা একে অপরের অত্যন্ত কাছের জন। একটু দূরের কেউ যদিও বা লেখনী ধরেছে তাকেও তথ্য সংগ্রহের জন্য সেই ভক্তদের উপরই নির্ভরশীল হতে হয়েছে। কারণ এছাড়া জীবনী লেখার উপাদান সংগ্রহের দ্বিতীয় কোন রাস্তাই নেই।

তাহলে দেখা যাচ্ছে আকর গ্রন্থ হিসাবে আমরা যা পাচ্ছি তার একশ ভাগই কোন না কোন ভক্ত পরমাত্মীয় দ্বারা লেখা। অতএব ধরেই নেওয়া যায় লেখবার সময় লেখক তার গুরুদেবের অথবা গুরুভ্রাতার প্রচার যোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলো একটু বেশি করেই তুলে ধরবেন। আবার যা তিনি অপ্রয়োজনীয় মনে করবেন তা বাদও দিয়ে দেবেন।

একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করছি। মাষ্টারমশায় মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের মহাগ্রন্থ 'কথামৃত'। মাষ্টারমশায় প্রায় পাঁচ বছর ধরে রামকৃষ্ণদেবকে অত্যন্ত কাছ থেকে দেখেছেন। খাওয়া-দাওয়া প্রসঙ্গে রামকৃষ্ণদেবের কি কি ছুতমার্গ ছিল সে সম্বন্ধেও তিনি নিশ্চয়ই ওয়াকিবহাল। তবুও কথামৃতে তিনি প্রসঙ্গটি অত্যন্ত সচেতন ভাবে প্রায় এড়িয়েই গেছেন। হয়ত তার মনে হয়েছিল এই নিয়ে লেখালেখি ঠিক হবে না। আবার স্বামী সারদানন্দ, অক্ষয় সেন অথবা বৈকুণ্ঠনাথ সান্যালদের মনে হয়েছে এ আর এমন কি ব্যাপার, তারা লিখে রেখেছেন।

পত্র সংকলন প্রথম সংস্করণের ৭৮ পৃষ্ঠায় স্বামী অভেদানন্দ তার এক গুরুভাইকে একটি চিঠিতে লিখছেন : "হ্যাঁ ভাই, মাষ্টারমশাই যে কথামৃতে এই এই কথাগুলি লিখেছেন আমিও তো ঠাকুরের কাছে সব সময় থেকেছি, কিন্তু এসব কথা তো তাকে বলতে শুনিনি। তুমি শুনেছ কি?" (অথবা, স্বামী অভেদানন্দের পত্রাবলী, বেদান্ত মঠ, প্রথম প্রকাশ, পৃ-১০৮)। তাহলে দেখা যাচ্ছে কথামৃতেই লেখক তার গুরুদেব সম্বন্ধে কিছু ঢাকা দিচ্ছেন, আবার না বলা কিছু ঢুকিয়েও দিচ্ছেন।

আর একটি উদাহরণ দিচ্ছি। নবদ্বীপ মহানির্ব্বাণ মঠ থেকে প্রকাশিত স্বামী ওঁকারানন্দ অবধূত মহাশয়ের 'শ্রীশ্রী নিত্যগোপাল চরিতামৃত' দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণ। নিত্যগোপাল ছিলেন একজন মস্ত বড় সাধক। রামকৃষ্ণদেব তাকে অনুরোধ করে ডেকে আনতেন তার কাছে ভগবৎ প্রসঙ্গ শুনতে। (পৃষ্ঠা-১০১, ২৫১)। রামকৃষ্ণ শিষ্য বলরাম বসু নিত্য-গোপালকে নারায়ণের সিংহাসনে বসিয়ে পূজো করেছেন। (পৃষ্ঠা-৮৬)। রামকৃষ্ণদেবের আদেশে বিবেকানন্দ পাঁঠা বলি দিয়ে তা প্রসাদ করে নিত্যগোপালকে খাইয়েছেন। (পৃষ্ঠা-৮৭)। স্বয়ং রামকৃষ্ণদেব তার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছেন। (পৃষ্ঠা-৯৬)। রামকৃষ্ণদেব কখনও বা বলতেন "নিত্য এখানকের নয়"। তিনি বুঝতেন এতবড় সাধক শুধু তার শিষ্য হয়ে পড়ে থাকবে না। আর সত্যিই পরবর্তী কালে নিত্যগোপাল 'জ্ঞানানন্দ অবধূত' নাম নিয়ে মহানির্ব্বাণ মঠ প্রতিষ্ঠা করেন।

রামকৃষ্ণদেবের আদেশে সারদামণি নিজের কোলে বসিয়ে নিজে হাতে নিত্যকে খাইয়েছেন। রামকৃষ্ণদেব আনন্দে সারদামণিকে বলেন 'আজ তোমার জন্ম সার্থক হল'। (পৃষ্ঠা-৯৮-৯৯, ১১৪)। রামকৃষ্ণদেবের মৃত্যুর পর গিরীশ ঘোষ একদিন নিত্যগোপালের পা ধরে বলেছিলেন "আপনি যতই গোপন থাকুন, আমার নাম গিরীশ ঘোষ, আমি জেনেছি আপনি কে"। আর সত্যিই তিনি নিজ পুত্র-কন্যাকে নিত্যগোপালের পাদপদ্মে নিবেদন করে কৃতার্থ হয়েছিলেন। (পৃষ্ঠা-১১৫)।

এমনকি রামকৃষ্ণদেবের মৃত্যুর পরের এমন একটি গোপন খবর এই বইটিতে আছে যা আগে কখন শুনিনি। ঘটনা এই রকম—'স্বামী ব্রম্মানন্দ, স্বামী বিবেকানন্দ, উপেনবাবু প্রভৃতি ভক্তগণ শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণদেবের আসন গ্রহণের নিমিত্ত শ্রী শ্রী নিত্যগোপালদেবকে পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ঠাকুর (নিত্যগোপাল) তদুত্তরে তাহাদিগকে বলিলেন, "তোমরা যাকে গুরু বলে বরণ করেছ, তার আসনে আর কাকেও বসিও না। তার উপরই ভক্তি শ্রদ্ধা রেখে যখন যাতে তার প্রচার হয় তখন তাই করো"। কিন্তু তাহাতেও তাহারা প্রবোধ না মানায় তিনি তাহাদের মঙ্গলার্থ অনতিবিলম্বে কাশীধামে প্রস্থান করাই স্থির করিলেন। যাহা হউক, লোক শিক্ষার্থ শ্রী শ্রী নিত্যগোপালদেব শ্রী শ্রী পরমহংসদেবের ভক্তগণের গুরুভক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিলেন। প্রকৃত ধর্মাচার্যগণ এইরূপই করিয়া থাকেন। ইহাই তাহাদের মাহাত্ম্য'। (পৃষ্ঠা-১১৩)।

এখানে একটা কথা উল্লেখ করতে পারি যা কিনা খুব একটা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। রামকৃষ্ণদেবের মৃত্যুর পর তার শিষ্যরা নানা জায়গায় তপস্যা করতে বেরিয়ে পড়েন। এই সময় স্বামী বিবেকানন্দ পওহারী বাবার কাছে দীক্ষা নেবার জন্য বেশ কয়েকবার পওহারী বাবার আশ্রমে যাতায়াত করেছিলেন। (নবযুগের মহাপুরুষ—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ, প্রথম প্রকাশ, ১৩৫৬ পৃষ্ঠা-৩৭৪)।

আগের বইটিতে এমন অনেক ঘটনার উল্লেখ আছে যা অনেকের কাছেই প্রায় অজানা। এতক্ষণ নিত্যগোপাল সম্বন্ধে এত কথা বলা হল এটা বোঝাতে যে নিত্যগোপাল রামকৃষ্ণ

মণ্ডলীতে অত্যন্ত পরিচিত একটি নাম এবং তিনি যথেষ্ট শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিও বটে। নিত্যগোপাল সম্বন্ধে বহু প্রশস্তি উদ্বোধন-এর নানা গ্রন্থে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। তিনি কিন্তু পরবর্তী কালে কথামৃত প্রসঙ্গে বলেছেন, "মহেন্দ্রবাবু তাঁর গুরুদেবকে বাড়াবার জন্য সত্যের অপলাপ করতেও কুণ্ঠিত হন নাই"। (পৃষ্ঠা-২৫০)।

তাহলে দেখা যাচ্ছে খোদ কথামৃতের মত মহাগ্রন্থও সন্দেহের উর্ধ্বে নয়। অন্য সব গ্রন্থের আর কা কথা। আর একটি মহাগ্রন্থ স্বামী সারদানন্দের 'লীলাপ্রসঙ্গ'। সেখানে দেখছি আশ্চর্য ভাবে সে যুগের বিভিন্ন মহাপুরুষ যেমন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মাইকেল মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগর প্রভৃতির সঙ্গে রামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎকার প্রায় অথবা সম্পূর্ণ ভাবে উপেক্ষিত। কিন্তু কেন? বঙ্কিমচন্দ্রের সাথে অথবা বিদ্যাসাগরের সাথে রামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎকার সেতো খুব সামান্য ব্যাপার নয় যে চোখ এড়িয়ে চলে গেল। তবে এই উপেক্ষা কেন?

আসল কথা স্বামী সারদানন্দ খুব ভালো ভাবেই বুঝেছিলেন এই সাক্ষাৎকার গুলির প্রতিটি 'অসফল'। রামকৃষ্ণদেবের গুণ গাইবার মত কিছু নেই এই সাক্ষাৎকার গুলিতে। সময় মতো এই প্রসঙ্গে আসব। তবে সারদানন্দজী যে বুঝে শুনেই এব্যাপারে মনোযোগী হননি তা বেশ হলফ করেই বলতে পারি।

আবার রামকৃষ্ণদেবের এক প্রধান শিষ্য স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন, "শিবানন্দ অবতার কি বস্তু তাই বোঝে নি। সারদানন্দ ঠাকুরকে কিছু কিছু জায়গায় বুঝতে পারেনি। শ্রী ম-ও অবতার বোঝে না। ঠাকুর শ্রী ম-কে একরকম বলতেন, আর আমাদের (ত্যাগী সন্তানদের) অন্য রকম বলতেন।" (স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের কথা—স্বামী চিৎস্বরূপানন্দ, দ্বিতীয় ভাগ, প্রথম সংস্করণ, ১৩৯৩, পৃষ্ঠা-২০)। বিখ্যাত আকর গ্রন্থগুলি কিন্তু এই শিষ্যদেরই লেখা।

শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনীকারদের কিছু কিছু ক্ষেত্রে পদস্খলন যে ঘটেছে তার অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায় স্বামী নির্লেপানন্দের বয়ানেও। 'রামকৃষ্ণ ও সারদামৃত' গ্রন্থের তৃতীয় পৃষ্ঠায় তিনি বলেছেন 'রামকৃষ্ণ জীবনীর কিছু কিছু জায়গায় অর্ধসত্য এবং অসত্য কথঞ্চিৎ রয়ে গেছে'।

স্বামী নির্লেপানন্দ মিশনের একজন প্রবীণ সন্ন্যাসী এবং গৌরী মা-র নাতি। রামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ শিষ্যদের সঙ্গ করার বহু অভিজ্ঞতা তার ছিল। তার কথা আমাদের মানতে হবে। তিনি যখন বলছেন কিছু কিছু অসত্য রয়ে গেছে তাহলে তাই ঠিক। আপনি বলতে পারেন বৃহৎ জীবনীর মধ্যে সামান্য কিছু ভুলভ্রান্তি, অসত্য থেকে যেতেই পারে। এ আর এমন কি ব্যাপার। কিন্তু স্থান মাহাত্ম্যে সামান্য ভুলচুকও ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে এ অস্বীকার করার জো নেই।

ধরুন আপনার পাড়ার রামবাবু একজন অতি সাধারণ লোক। আর পাঁচজন অতি সাধারণ লোকের মতই খাচ্ছেন, ঘুরছেন, অফিস করছেন, সংসার করছেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

আর দুদিন পরে মরবেন, চিত্রগুপ্ত তার পাপ-পুণ্যির খাতায় রামবাবুর নামের পাশে দাঁড়ি টেনে দেবেন। ব্যাস, রামবাবুর কাহিনি শেষ।

কিন্তু এই ভদ্রলোকের অতি সাধারণ রোজনামচার সাথে আপনি যদি একটি ছোট্ট কিন্তু মহৎ মিথ্যে যোগ করে দেন, যেমন ধরুন বললেন—'রামবাবু একবার এক অপরিচিত মৃতপ্রায় শিশুকে নিজের রক্ত দিয়ে জীবন রক্ষা করেছিলেন'। রামবাবুর পাঁচশ পাতার জীবনীর মধ্যে ওইদুটি লাইনের ভূমিকা কী জানেন, তাকে মানব থেকে অতিমানব বানিয়ে দেওয়া। অতএব ঐ ছোট ছোট ভুলভ্রান্তির গুরুত্ব উপেক্ষণীয় নয়।

ভুল সংযোজনের একটি নমুনা এখানে দেওয়া যাক। যা ধরিয়ে দিয়েছেন পন্ডিত ম্যাক্সমূলার। ঘটনা এই রকম—রামকৃষ্ণদেব তখন খুবই ছোট। পন্ডিতদের এক সমাবেশে গ্রামের অন্যান্যদের সাথে রামকৃষ্ণদেবও গিয়ে বসেছেন। পন্ডিত সমাবেশে যেমন হয়ে থাকে, তর্কাতর্কির হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে। বহু তর্কেরই মীমাংসা পন্ডিতদের চেষ্টায় হয়ে উঠছে না। উপস্থিত রামকৃষ্ণ সেই সকল তর্কের মীমাংসা সুষ্ঠু ভাবে সেরে দিচ্ছেন। পন্ডিতরা এমন ক্ষণজন্মা বালকের মীমাংসা শুনে সাধু-সাধু রব তুলছেন। রামকৃষ্ণ জীবনীকাররা বাল্য থেকেই রামকৃষ্ণদেবের অসাধারণ প্রতিভার সপক্ষে এই কাহিনিটির উল্লেখ করেছেন। আবার দেখা যাচ্ছে বাইবেলে অনুরূপ একটি কাহিনির উপস্থিতি। বার বছরের যিশু তার বাবা-মায়ের সাথে তীর্থ করতে বেরিয়েছেন। পথে হঠাৎ তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। অনেক খোঁজাখুঁজির পর দেখা গেল তিনি মন্দিরের মধ্যে শাস্ত্রজ্ঞ পন্ডিতদের সাথে শাস্ত্র আলোচনায় রত। জটিল প্রশ্ন সবের সহজ মীমাংসা করে চলেছেন।

কাহিনি দুটির গতিপথ একই রকম লক্ষ্য করে পন্ডিত ম্যাক্সমূলার মন্তব্য করেছেন "রামকৃষ্ণের ইংরাজী বিদ্যাভিজ্ঞ শিষ্যেরা গুরুর মান বাড়াইবার জন্য যিশুর বাল্য লীলার কথাটি রামকৃষ্ণের সহিত ইচ্ছা করিয়াই জুড়িয়া দিয়াছেন"। (লীলাপ্রসঙ্গ পৃষ্ঠা-৪৩০ রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন)। অথবা 'তার অর্থাৎ রামকৃষ্ণের জীবনের বিস্তৃত বিবরণ আমাদের কাছে আছে। কিন্তু তার মধ্যে কোথাও কোথাও এমন সব অদ্ভুত অতিশয়োক্তি ও স্ববিরোধী কথাবার্তা আছে যে তার চরিত্র ও জাগতিক ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে একটি সত্য ও নির্ভুল ধারণা গঠন করাও অসম্ভব বলে মনে হয়'। (রামকৃষ্ণ-জীবন ও বাণী— ফ্রেডারিখ ম্যাক্সমূলার, সলিল কুমার গঙ্গোপাধ্যায় অনূদিত, পৃষ্ঠা-৩৩-৩৪)। দেখা যাচ্ছে পন্ডিত ম্যাক্সমূলার রামকৃষ্ণ জীবনীর বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দিহান।

শুধু পন্ডিত ম্যাক্সমূলারই নন, আরও অনেকের মধ্যেই শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনীর অনেক ঘটনা নিয়েই সন্দেহ দেখা যাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৩১ তারিখে ত্রিষ্টুপ মুখোপাধ্যায়কে একটি চিঠি লিখেছিলেন যার অংশ বিশেষ—"পরমহংসদেবকে একদিন দশ মিনিটের জন্য দুর থেকে দেখেছি।......পরমহংসদেবের কথোপকথনের যে

বিবরণ আমি পড়েছি তার কোন কোন অংশ মনে হল বিদেশী সাধকদের কথা থেকে সংগৃহীত।"

ম্যাক্সমূলারের গ্রন্থের ৭০ পৃষ্ঠায় দেখছি বিখ্যাত ভৈরবী ব্রাহ্মণীর চরিত্রটাই তার বানানো বলে মনে হচ্ছে। কেন এমন একটি চরিত্র বানানো হল, তার ব্যাখ্যাও লেখক দিয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ভগবান হবেন, সকলকে বেদ উপনিষদ শোনাবেন, কিন্তু তাকে এসব শোনালো কে? আসলে তিনি গ্রাম্য মজলিশেই তার বিচিত্র মেধাকে কাজে লাগিয়ে বেদ-পুরাণ প্রচুর শিখেছিলেন। কিন্তু এইভাবে বোঝানোর মধ্যে অলৌকিক ব্যাপার কোথায়! তাই দরকার ঐ দেবী স্বরূপা ব্রাহ্মণী চরিত্র। যাকে দরকার অনেক দিক থেকেই। শ্রীরামকৃষ্ণের দীক্ষাগুরু রূপে, তার শিক্ষক রূপে, তার অবতারত্বের প্রচারক রূপে, সব মিলিয়ে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ কিছু কার্য সমাধার জন্য ব্রাহ্মণী চরিত্র অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তবে ম্যাক্সমূলার সন্দেহ প্রকাশ করছেন এই চরিত্রটি সম্পূর্ণ বানানো।

এছাড়াও আছে ভক্তদের অসুস্থ মনের অলীক দর্শন ও শ্রবণের বাড়াবাড়ি। স্বামী ব্রহ্মানন্দ বাগানে হেঁটে বেড়াচ্ছেন। শিষ্য নির্বাণানন্দ পিছনে। শিষ্য হঠাৎ দেখছেন গুরুদেব মাটির মায়া কাটিয়ে শূন্যে বিচরণ করছেন। (দেবলোকের কথা, প্রথম প্রকাশ, পৃষ্ঠা-১০০)। এই ধরনের ঘটনা আপনি বিশ্বাস করেন? আমি করি না। তবে লেখক কিন্তু মিথ্যা বলছেন না। আপনিও এরকম দেখতে পারেন। প্রয়োজন শুধু ভক্তিরসে আপ্লুত বিকারগ্রস্ত মন। এইসব আবর্জনা সরিয়ে আসল সত্যটি আপনিও বার করে নিতে পারেন, প্রয়োজন যুক্তিবাদী মন।

'সাধু নাগ মহাশয়ের কাতর প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে গঙ্গা তার বাড়ির বারান্দা ফুঁড়ে ঝরনার মত বইতে থাকে'। গ্যাঁজায় দম দিয়ে লেখা কিনা বলতে পারব না, তবে প্রামাণ্য এবং আকর গ্রন্থের বিবরণ এইরকমই। অতএব প্রামাণ্যই হোক, আর যাইহোক, বিচার করেই পড়া উচিৎ।

সে যুগে ম্যালেরিয়া হলে 'পেট দাগানো' বলে এক অদ্ভুত চিকিৎসা চালু ছিল। জ্বলন্ত কুল কাঠ দিয়ে পেটের একটি অংশ ঘষে ঘষে পুড়িয়ে দেওয়া হোত। রামকৃষ্ণদেব একবার এইরকম পেট দাগিয়েছিলেন। (সারদাদেবী একাধিক বার)। পোড়ার দাগও ছিল। ভক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল রামকৃষ্ণদেবকে প্রথম দর্শনেই দাগটি লক্ষ্য করেন। পরে জীবনী লিখতে গিয়ে রামকৃষ্ণদেবের শরীরের বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন—'উদরে প্লীহা চিকিৎসার দাগটি যেন কবচের মত অঙ্গ শোভার উৎকর্ষ করিয়াছে'। আপনি কারো শরীরে এমন কোন পোড়ার দাগ দেখেছেন যা তার সৌন্দর্য বাড়িয়ে দিয়েছে? আমি দেখিনি। তবে অনেকে দেখে, এখানে যেমন লেখক দেখছেন। ধর্ম পুস্তক পড়ার সময় মনের দরজা জানালা খুলে রাখা খুব জরুরি।

মন্দির নির্মাণ ও জাগ্রতকরণ

এতক্ষণ আলোচনায় যা নিয়ে একটি কথাও বলা হয়নি তা হল রাণীর 'জাত'। এই ব্যাপারটিকে খুব গভীর ভাবে বুঝতে হবে, কারণ এই জাতপাত ব্যবস্থার মধ্যেই লুকিয়ে আছে রামকৃষ্ণায়ণের মূল গোপন সূত্রটি।

অনেকে ভ্রমবশতঃ রাণী রাসমণিকে মৎস্যজীবী কৈবর্ত বলে উল্লেখ করলেও তারা প্রকৃতপক্ষে ছিলেন কৃষিজীবী মাহিষ্য। একদা উৎপীড়িত ধীবর সম্প্রদায়ের পক্ষ নিয়ে শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার কারণে অনেকে তাকে কৈবর্ত বলেন। কিন্তু তা ঠিক নয়। মোদ্দা কথা রাণী জাতিতে শূদ্র। এবং উচ্চবর্ণের হিন্দুর তুলনায় শূদ্ররা অনুন্নত, এবং বরাবরই ঘৃণার পাত্র। কিন্তু আর পাঁচটা শূদ্রের সাথে রাণীর তুলনা করলে চলবে কেন। রাণী কি যে-সে লোক! বিশাল সম্পত্তির মালিক তিনি। আমার পকেটে কয়েক লাখ টাকার সম্পত্তি ঢুকে গেলে কাল থেকেই দেখব দুনিয়া বদলাতে শুরু করেছে। আর রাণীতো লাখ টাকের আওতায় পড়েন না, তিনি নিজেও হয়ত সবটা জানেন না কোথায় কত সম্পত্তি আছে। ছোটবেলা থেকেই রাণী ভীষণ উচ্চাভিলাষীও বটে। এহেন রাণীর পক্ষে দু'পয়সার ঘন্টা নাড়া বামুনের থেকে নিম্নস্তরের প্রাণী বলে নিজেকে ভেবে নেওয়াটা একটু কষ্টকরও বটে। কিন্তু নিরুপায়। সমাজের এই নিয়ম।

রাণীর পিতা হরেকৃষ্ণ দাস চাষবাস ছাড়াও ঘরামির কাজ করতেন। 'হারু ঘরামি' নামে তিনি গ্রামে পরিচিত ছিলেন। রাসমণির শ্বশুরমশাই প্রীতিরাম দাসের ছিল বাঁশের ব্যবসায়। এর থেকে তিনি এবং তার বংশধরগণ 'মাড়' উপাধি লাভ করেন। রাণীর এক জামাইয়ের পারিবারিক উপাধি ছিল 'আটা'। যাদের নামে সিঁথিতে 'আটা পাড়া' বলে একটি অঞ্চল আজও আছে।

দেখা যাচ্ছে রাণীর পিতা বা শ্বশুরকুল এমন কিছু উপাধি লাভ করেছিল যার একটিও বংশের সম্মান একটুও বাড়ায় না। বরং এই ধরনের উপাধি কি করে চাপা দেওয়া যায় লোকে তারই চেষ্টা করে। কিন্তু চাপা দেব বললেই তো আর চাপা দেওয়া যায় না। যতই ধন দৌলত বিলাও না, আর ব্রাহ্মণ প্রণামি দাও না, তোমার নামের পিছে যে নিচু জাত লেগে রয়েছে সেই হতভাগা মোরগকে তাড়াবে কি করে! তোমার জমিদারীর খেয়েই বেঁচে আছি, তোমার দাসানুদাস প্রজা ভিন্ন কিছুই নই, তুমি ঘাড় ধাক্কা মেরে আজ তাড়ালে কাল থেকেই অন্নচিন্তা চমৎকারা, তথাপি আমি 'ভটচাজ বামুন',

তুমি শূদ্রানি। তোমার ছোঁয়া লাগলেও আমার মুখের গ্রাস আস্তাকুঁড়ে ঠাঁই পায়। এই ভয়ংকর সত্য রাণী খুব ভালভাবে বুঝতেন। কিন্তু কিচ্ছুটি করার নেই। সমাজের এ বিধান ভেঙে ফেলা রাণীর কম্মো নয়। এই অভিশাপ থেকে উচ্চাকাঙ্ক্ষী রাণীর মুক্তি লাভের উপায় একটিই—'জাতে ওঠা'। শূদ্রের জাতে ওঠার উপায়ও একটিই—ঈশ্বর আনুকূল্য লাভ। ঈশ্বর আনুকূল্য লাভ হয় কিভাবে, না, মন্দির-মসজিদ নির্মাণ করে।

স্বামী রাজচন্দ্র দাস মন্দির নির্মাণের কথা ভেবেছিলেন কিন্তু হয়ে ওঠেনি। রাণীও অনেক কিছু করেছেন কিন্তু মন্দির নির্মাণ এখনও হয়নি। কয়েক লক্ষ টাকা খরচ করে মন্দির নির্মাণ করা যেতেই পারে। কিন্তু সমস্যা রয়েছে সেখানে। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে যে মন্দিরের সিঁড়ি বেয়ে জাতে উঠতে হবে, জাত-পাতের অজুহাতে সেই মন্দিরই যদি ব্রাত্য থেকে যায়, লোক না ঢোকে, তখন কি হবে! পণ্ডশ্রম হবে না কি? অতএব উপায়! এরও উপায় একটা আছে। মন্দির নির্মাণের আগেই দেবতাকে জাগ্রত করে তুলতে হবে।

মন্দিরই নেই তায় দেবতা জাগ্রত হন কিভাবে? উপায় আছে, তারও উপায় আছে। ব্রাহ্মণকে মূল্য ধরে দিলে তিনি সব সমস্যার উপায় বাতলে দেন, আর এক্ষেত্রে একটি রাস্তা বেরবে না! তবে এর জন্য কোন ব্রাহ্মণকে মূল্য ধরে দিতে হবে না। নিজে নিজেই মুশকিল আসান করা যায়। শুধু একটি স্বপ্নাদেশ।

এদেশে যুগ যুগ ধরে লোকে স্বপ্নাদেশ পেয়ে আসছে। হতদরিদ্র স্বপ্নাদেশ পায়, ভর, তুকতাক এসব হয়ে একটা যাহোক উপার্জনের রাস্তা তৈরি হয়। মধ্যবিত্ত খুব একটা স্বপ্ন-টপ্ন দেখে না। দেখলেও বড়জোর একটা নাকছাবি মা কালির নাক আলো করে। আসল স্বপ্ন দেখে রাজা-উজীর লোকেরা। ঘোড়ার ল্যাজে আতর মাখানো বা বিড়ালের বিয়ে দেওয়া যাদের ছেলেখেলা, স্বপ্ন দেখেও তারা। এইসব আমীরী স্বপ্ন থেকেই বড় বড় মন্দির গজিয়ে ওঠে, আরও বড় মন্দিরের জীর্ণ সংস্কার হয়ে যায়, বস্তি উচ্ছেদ হয়ে ফ্ল্যাট বাড়ি। আরও কত কি যে হয় স্বপ্নদ্রষ্টারাই তা বলতে পারেন। আমি ভগবানের স্নেহের পাত্রও নই, দৈব স্বপ্নের দর্শকও নই।

তা প্রয়োজন যখন আছেই রাণী একটি স্বপ্নাদেশ পেতেই পারেন। বিড়ালের বিয়ে দেবার মত খামখেয়ালী তিনি ছিলেন না ঠিকই কিন্তু স্বপ্নাদেশ পাবার মত আর্থিক সঙ্গতি তার যথেষ্টই ছিল। গঙ্গার বুকে বজরায় শুয়ে স্বপ্নাদেশ পেয়েও গেলেন, 'গঙ্গার পাড়েই মায়ের মন্দির নির্মাণ করতে হবে'। স্থগিত হয়ে গেল কাশী-বিশ্বনাথ দর্শনের মানস। রাণী বাড়ি ফিরে গেলেন।

দাস-দাসীর সংখ্যা কম নয়, তারা যখন রাণীর স্বপ্নাদেশের কথা জেনেছে রাষ্ট্র হতে খুব বেশি সময় লাগবে না। প্রশ্ন হতে পারে রাণী দাস-দাসীদের দিয়ে তার স্বপ্নের কথা

প্রচার করেছিলেন একথা বলল কে? ঠিক কথা। আসলে হয় কি এই ধরনের প্রচার শিখিয়ে পড়িয়ে হয় না। মনিব দৈব স্বপ্ন পেয়েছে। পরিচারকরা তার পাশে সব সময় থাকছে, মনিবের দরকার নেই পরিচারককে প্রচারের জন্য প্রভাবিত করা। তারা বাড়ি-ঘরে যাবে, একে ওকে তাকে বলবে, হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে কথা পাঁচ কান হবে। প্রচারের চেষ্টা না করেই যথেষ্ট প্রচার হয়ে যাবে। কাশীর উদ্দেশ্যে দশ নৌকা দ্রব্য সামগ্রী দরিদ্রদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া হল। কারণ কি—না, রাণী মন্দির নির্মাণের দৈব আদেশ পেয়েছেন। দশ নৌকা দ্রব্যসামগ্রী সামান্য ব্যাপার নয়। লোকের মনে প্রশ্ন জাগবেই এত দান-খয়রাত চলছে কেন?

সময় সময় দৈব স্বপ্ন যে কত গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে দেয় তার একটা উদাহরণ এখানে দিচ্ছি—মুসলমানদের আক্রমণে বৃন্দাবনের মূর্তি ভেঙে গেছে। কিন্তু মূর্তি ভাঙলে চলে কি করে! গাদা গাদা পাণ্ডা পুরোহিতের রুজিরোজগারের প্রশ্ন জড়িয়ে আছে ঐ মূর্তির সাথে। অন্য একটা মূর্তি বসালে ভক্তরা যদি মেনে না নেয়। অতএব ভরসা দৈব স্বপ্ন। মন্দিরের প্রধান পুরোহিত একটি স্বপ্ন দেখে ফেললেন নতুন বিগ্রহেই ঈশ্বর অধিষ্ঠান করবেন। ব্যস, সমস্যার সমাধান। পাণ্ডা পুরোহিতও খুশী, ভক্তরাও খুশী।

স্বামী অভেদানন্দের পিতা প্রথম স্ত্রী মারা যাবার পর অনেক দিন কেটে গেছে, হঠাৎ দৈব আদেশ পেলেন 'আবার বিয়ে কর', করে ফেললেন আবার বিয়ে। কিন্তু কেন দৈব আদেশ এলো বোঝা খুব মুশকিল নয়।

এবার রাণী লোক মারফৎ খবর নিতে লাগলেন গঙ্গার পাড়ে তেমন একটা জায়গার জন্য। দক্ষিণেশ্বরে হেষ্টি সাহেবের বাগানবাড়ি পাওয়া গেল। চুয়ান্ন বিঘা জমি প্রায় তেতাল্লিশ হাজার টাকায় খরিদ করা হল।

মন্দির নির্মাণের কাজ প্রথম দফায় কারা নিয়েছিল জানা যায় না। হয়ত কোন দেশী কোম্পানী। কিন্তু তাদের কাজ বেশি দূর এগোয় নি। গঙ্গার প্রবল বানে সব নষ্ট হবার পর ম্যাকিন্‌টস এণ্ড ব্যরন কোম্পানীকে দায়িত্ব দেওয়া হয়।

মন্দির শেষ পর্যন্ত নির্মাণ হলো। এর জন্য আরও প্রায় দশ লক্ষ টাকা ব্যয় হল। মন্দির প্রতিষ্ঠা হওয়া পর্যন্ত রাণী ব্রত ধারণ করেছেন। ত্রিসন্ধ্যা স্নান, হবিষ্যান্ন ভোজন, মাটিতে শয়ন, জপ পূজাপাঠ ইত্যাদি।

দেখতে দেখতে প্রতিষ্ঠার দিন এসে গেল। এক লক্ষের উপর ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নিমন্ত্রিত হয়েছেন। যাদের সরাসরি নিমন্ত্রণ করা যায় নি তাদের উদ্দেশ্যেও রাণী নিমন্ত্রণ জানিয়ে রেখেছেন 'এসে হাজির হলেই পাওনা গণ্ডা সমান সমান'। পাওনা গণ্ডা যখন আছে ব্রাহ্মণ পেতে অসুবিধা নেই। কিন্তু প্রতিষ্ঠা দিবসে ঠাকুরের অন্নভোগ দিতে কেউ রাজী নয়। শূদ্রের ঠাকুরকে অন্নভোগ দিয়ে জাতমান খোয়াতে কে-ই বা রাজী হবে।

'লীলাপ্রসঙ্গ'কার সারদানন্দজী বলছেন 'শূদ্র প্রতিষ্ঠিত দেবদেবীর পূজা করা দূরে যাউক সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণগণ ঐ কালে প্রণাম পর্যন্ত করিয়া ঐ সকল মূর্তির মর্যাদা রক্ষা করিতেন না। এবং রাণীর গুরুবংশীয়গণের ন্যায় ব্রহ্ম বন্ধুদিগকে তাহারা শূদ্র মধ্যেই পরিগণিত করিতেন। সুতরাং যজন যাজন ক্ষম সদাচারী কোন ব্রাহ্মণই রাণীর দেবালয়ে পূজক পদে ব্রতী হইতে সহসা স্বীকৃত হইলেন না'। (পৃষ্ঠা-১৮৬)।

দান-দক্ষিণা নেব, পেট পুরে খাব, ব্যস, চলে যাব। এই মোদ্দা কথা। শেষ সময়ে রাণী পড়ে গেলেন মহা ফাঁপরে। দিকে দিকে খবর পাঠালেন যদি কেউ এমন কোন বিধান দেন যাতে তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। কিন্তু সব দিক থেকেই নেতিবাচক উত্তর আসতে লাগল। রাণী পূজকের জন্য বেতন ও পারিতোষিকের হার বাড়িয়ে দিয়ে ফল পেলেন। হঠাৎই এলো ঝামাপুকুর নিবাসী টোল পণ্ডিত রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক বিধান। যার দ্বারা রাণীর অন্নভোগ দেবার মনোরথ পূর্ণ হল।

উদার রাণী লক্ষাধিক ব্রাহ্মণের জন্য যা দান-দক্ষিণার ব্যবস্থা রেখেছিলেন (রেশমি বস্ত্র, উত্তরীয়, স্বর্ণ মুদ্রা) আজকের হিসাবে তা দশ বারো কোটির নিচে কিছুতেই হবে না। রাণী আর একটা খুব দামী জিনিস রেখেছিলেন যা আজ থাকলে মহা মহা রোগের ওষুধ নিয়ে বিজ্ঞানীদের এত গবেষণার প্রয়োজনই পড়ত না। অতি সামান্য জিনিস, কৌটো ভরে লক্ষাধিক ব্রাহ্মণের 'পদধূলি'। এক কণা খেলেই যে কোন রোগ থেকে মুক্তি। রোগ সারাতে সারাতে কৌটোটি খালিও হয়ে যায়।

রামকুমার রাণী রাসমণির পূজকের আসনও গ্রহণ করেন। কামারপুকুর গ্রামে তার সামান্য আয়ে সংসার প্রতিপালনে অসমর্থ হয়ে ঝামাপুকুরে একটি টোল খুলেছিলেন রামকুমার। টোলে দু-চার জন ছাত্র আর যজমানী থেকে সামান্য আয়। রামকুমার যে দুরবস্থায় ছিলেন কলকাতায় এসেও সেই দুরবস্থাই রয়ে গেছে। এমত অবস্থায় যদি কোন ধনী ব্যক্তির মনোমত ব্যবস্থা দিয়ে তার আনুগত্য লাভ করা যায় তাতে মন্দ কি! আর সত্যিই এর ফলে রামকুমার যথেষ্টই লাভবান হয়েছিলেন। পুঁথিকার অক্ষয় কুমার সেন বলছেন—

অন্নভোগ হেতু ব্রতী হবে যে ব্রাহ্মণ।
করিতে বলিল রাণী তার অন্বেষণ।।
যত লবে মাহিয়ানা তত দিব তায়।
তদুপরি মনোমত পাইবে বিদায়।।
রাণীর বিদায় বড় ছোটখাট নয়।
ক্ষুদ্র যেটি তবু পাঁচশত টাকা ব্যয়।। (পৃষ্ঠা-৪৩)

* * *

গরদ বসন অর্থ শ্রীরামকুমারে।
দান করিলেন রাণী অতি উচ্চ দরে।।
আর বড় ভট্টাচার্য আখ্যা দিয়া তায়।
সমাদরে রাখে রাণী শ্যামার সেবায়।। (পৃষ্ঠা ৪৫)

বেশ বোঝা যাচ্ছে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতেই রামকুমার সমগ্র ব্রাহ্মণ সমাজের বিরুদ্ধে গিয়ে রাণীর সাথে হাত মিলিয়েছিলেন। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ব্রাহ্মণদের ক্ষমতার তুলনায় এক রাণীর ক্ষমতাই যে অনেক বেশী একথা রামকুমার বিলক্ষণ বুঝেছিলেন। তাকে শারীরিক ভাবে নিগ্রহ করা অথবা সমাজে এক ঘরে করা অত সহজ হবে না। যদিও, তাদের পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় শূদ্রযাজী ব্রাহ্মণের নিমন্ত্রণ পর্যন্ত গ্রহণ করতেন না। এ নিয়ে রামকুমারের গর্বও কম ছিল না। তবুও পেটের দায় বড় দায়। রামকুমার ভাই গদাধরকে নিয়েই মন্দিরে বহাল রইলেন। ছোট জাতের মন্দিরে থাকতে গদাধরের তীব্র আপত্তি ছিল। কিন্তু সেই পেটের দায় বড় দায়। শেষ পর্যন্ত থাকতেই হল।

শুধু ভাই গদাধর কেন, কলকাতায় তাদের গ্রামের যত জ্ঞাতিগুষ্টি ছিল সকলকেই তিনি মন্দিরের কাজে লাগিয়ে দিলেন।

মন্দির প্রতিষ্ঠা হল। রামকুমারের সু-বন্দোবস্ত হল। কিন্তু রাণী রাসমণির মনোবাঞ্ছা কি সত্যিই পূর্ণ হল? দেখা যাক এর পর কি ঘটছে।

স্বামী সারদানন্দ বলছেন—'ঠাকুর কখনো কখনো নিজ মুখে আমাদের ঐ সময়কার কথা এইরূপে বলিয়াছেন, "কৈবর্তের অন্ন খাইতে হইবে ভাবিয়া মনে তখন দারুণ কষ্ট উপস্থিত হইত। গরীব কাঙ্গালেরাও অনেকে তখন রাসমণির ঠাকুরবাড়িতে ঐজন্য খাইতে আসিত না। খাইবার লোক জুটিত না বলিয়া কতদিন প্রসাদী অন্ন গরুকে খাওয়াইতে এবং অবশিষ্ট গঙ্গায় ফেলিয়া দিতে হইয়াছে"।' (লীলাপ্রসঙ্গ, পৃষ্ঠা-১৯৬)। রাসমণির অভিলাষ পূর্ণ হল না।

আজকের দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের দিকে তাকিয়ে কিন্তু সেই সময়টাকে ঠিক বোঝা যাবে না। হাজার হাজার মানুষের কোলাহলে পরিপূর্ণ আজকের মন্দির আর দেড়শ বছর আগের সেই ফাঁকা জনমানবহীন মন্দির এক জিনিস নয়। এ যেন রাম চেয়ে বাঁদর লাভ। অনশনে থাকা কাঙ্গালদের ভাতের লোভ দেখিয়েও যেখানে আনা যায় না উচ্চবর্ণের হিন্দুরা যে সেদিকে ফিরেও তাকাবে না এ বলাই বাহুল্য।

কিন্তু রাণী রাসমণি তো এমন চাননি। তিনি চেয়েছিলেন আজকের দক্ষিণেশ্বর। যেখানে কাতারে কাতারে দর্শনার্থীর ভীড় লেগে থাকবে। সবাই রাণীর নামে জয়ধ্বনি দিয়ে বলবে 'অতুল কীর্তি রাখল ভবে....।' এখানে বলতে পারেন রাণীর মত নিরভিমানী মহিলার নামে আত্মপ্রচারের অভিযোগ কেন? দেখুন, এ প্রসঙ্গে আমি বলি কি, ভক্তি

শ্রদ্ধা আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার। আপনার মনে প্রবল ঈশ্বরানুরাগ জেগেছে তা আপনি সারাদিন রাত পূজো-আচ্চা, জপ-ধ্যান নিয়ে থাকুন না। তাতেও যদি কম মনে হয় তো নির্জন পাহাড়ে বনে চলে গেলেই হল। 'আপনার' ভক্তি শ্রদ্ধার সেটাই শ্রেষ্ঠ পরাকাষ্ঠা হয় না কি! তা না করে পাঁচজনের উদ্দেশ্যে মন্দির বানাবার আপনার দরকারটা কি। মন্দির বানানোর জন্য ঈশ্বর কি আপনার জন্য একটু বেশি পুণ্যি বরাদ্দ করবেন। মোদ্দা কথাটা এই মন্দির-মসজিদ বড়লোকেরা নির্মাণ করে নিজের নামে জয়ধ্বনি শোনবার জন্যই। রমাঁ রলাঁ তার 'রামকৃষ্ণের জীবন' গ্রন্থে লিখেছেন—"সেখানে (ভারতবর্ষে) দেশের ধনী-মহাজনরা বিধাতার দরবারে সুযোগ-সুবিধা পাইবার প্রত্যাশায় দেবতার মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।" (প্রথম সংস্করণ, পৃষ্ঠা-১১, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃষ্ঠা-২০)।

যাক, ভগবান নিজে দাঁড়িয়ে রাণীকে স্বপ্নাদেশ দিলেন, আবার শূদ্রের ঘরে জন্ম দিয়ে তার অভিলাষ অপূর্ণ থাকার ব্যবস্থাও তিনিই করে রাখলেন। কি বিচিত্র লীলা মহামায়ার। তবে দু একটি নিন্দুক না থাকলে লীলা-পোষ্টাই কিন্তু জমত না।

আচ্ছা, একটা কথা কি মনে হয় না, যেখানে লোকে জেনেছে রাণী এই মন্দির তৈরি করেছেন স্বয়ং ভগবানের আদেশেই। সেখানে তো লোকের মনে এই প্রশ্ন আসাই উচিত নয় এই মন্দির কোন্ জাতের তৈরি। ভগবানের আদেশে তৈরি মন্দির এটাই শেষ কথা। ভগবানের আদেশ উপেক্ষা করে, মন্দির দর্শন না করে, ভগবানের নেকনজরে পড়তে চায় কোন্ ভারতবাসী আমার জানা নেই। কিন্তু এখানে তাই ঘটছে।

আসলে সমাজের ধর্মীয় দিক পরিচালনা করে যে মাতব্বরেরা তারা যতক্ষণ না সবুজ সংকেত দিচ্ছে ততক্ষণ তো মন্দির উপেক্ষিত থাকবেই। কিন্তু কথা হচ্ছে ভগবানের স্বপ্নাদেশ অগ্রাহ্য তারা করছেন কি ভাবে? আসলে কি জানেন, এইসব মাতব্বরেরা নানা প্রয়োজনে নিজেরাও নানান দৈব স্বপ্ন দেখে থাকেন। তারা ভালই জানেন কে, কখন, কেন, দৈব স্বপ্ন দেখে। রাণী রাসমণিও কেন স্বপ্ন দেখছেন তারা ভালো ভাবেই জানেন। সেই জন্যই ও নিয়ে তাদের অত মাথাব্যথা নেই। আজ রাণীর মা কালী ঘেমেছেন, কাল মা কালী পা ভেঙেছেন, পরশু মা কালীর কিছু একটা হয়েছে এইসব নানা অজুহাতে একটা করে অনুষ্ঠান লাগাও, চব্য-চোষ্যের ব্যবস্থা করো, দান-দক্ষিণা হোক, আমরা আছি। নীচ জাতের সাথে এর থেকে বেশি মাখামাখি ভালো নয়।

এই তো গেল অবস্থা। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে রাণীর এত সাধের মন্দির শেষ পর্যন্ত কোন কাজেই এল না। নীচ কুলে জন্মানোর জন্য রাণী অনেক দুঃখ করলেন। কিন্তু তাতে আর হবে কি! রাণীর স্বপ্ন সার্থক হল না।

বিষম মরম খেদে রাসমণি বলে।
হে মা শ্যামা দিলে জন্ম হেন নীচ কুলে।। —রামকৃষ্ণ পুঁথি, পৃ-৪৩

কিন্তু সব আশা ছেড়ে দেবার পাত্র ছিলেন না মথুরমোহন বিশ্বাস। এবার তিনি আসরে নামলেন। তিনি দেখেছেন স্বপ্ন দেখে, টাকা ছড়িয়ে মন্দির সার্বজনীন করা গেল না। এমন একটা কিছু চাই যার টানে লোকে মন্দিরে আসবে। কিন্তু কি সেই জিনিস যার টানে লোকে মন্দিরে ভীড় করবে! মথুরবাবু অপেক্ষায় রইলেন। হয়ত কোন দিক থেকে সুযোগ আসবে।

'ছোট ভটচায' গদাধর চট্টোপাধ্যায়। বয়সে নবীন। চেহারার মধ্যে একটা বেশ শান্ত সৌম্য আকর্ষণ আছে। মথুরবাবুর চোখে পড়ে গেল ছেলেটি। কিন্তু ছোট ভটচায নজরে এসেছে আরও অন্য একটি কারণে। তার ভক্তিশ্রদ্ধা দেখে মথুরবাবু অবাক হয়েছেন। পূজো করতে বসলে সময়ের হিসেব থাকে না। পূজো পদ্ধতিও রীতি বহির্ভূত, কিন্তু ভক্তিতে পরিপূর্ণ। এসবের মধ্যে একটা আকর্ষণীয় ব্যাপার গদাধরের মধ্যে ছিলই। কিন্তু নজরে আসার আসল রহস্য অন্য জায়গায়।

লীলাপ্রসঙ্গকার (রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, পৃষ্ঠা-১৯৯) বলছেন, 'ভগবৎ প্রেমে ঠাকুরকে ইতিপূর্বে মধ্যে মধ্যে ভাবাবিষ্ট হইতে দর্শন এবং কোন কোন বিষয় আদেশ প্রাপ্ত হইতে শ্রবণ করিয়াই মথুরবাবু.....'। অর্থাৎ মথুরবাবু লক্ষ্য করেছেন ছেলেটি হঠাৎ হঠাৎ সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে। কিছু পরেই আবার স্বাভাবিক।

রামচন্দ্র দত্ত (রামকৃষ্ণের জীবন বৃত্তান্ত, পৃষ্ঠা-৭৫) বলছেন, মথুরবাবু লক্ষ্য করেছেন 'ছেলেটি ক্ষণে ক্ষণে মৃতপ্রায় পরক্ষণেই স্বাভাবিক'। এমন পড়ে পাওয়া সুযোগ হাতছাড়া হতে দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

নবীন বয়েস, বেশ ব্রহ্মচারী প্রায়।
দরশনে মন-প্রাণ মুগ্ধ হয়ে যায়।।
মনে লয় তায় যদি কালীর সেবনে।
পুরীমধ্যে রাখা যায় অতি অল্প দিনে।।
জাগরিত করিতে পারেন শ্যামা মায়ে।
এমন প্রতীত হয় তাহারে দেখিয়ে।। —পুঁথি, পৃ-৪৮

যেমন করে হোক এই ছেলেটিকে দিয়েই বাজি জিততে হবে। ছেলেটির বৈশিষ্ট্যগুলো কাজে লাগিয়ে একে ভগবান যদি বানানো যায়! আর একবার যদি সাক্ষাৎ ভগবান মন্দিরে বাঁধা পড়েন তাকে দেখার জন্য অন্তত কাতারে কাতারে লোক আসবেই আসবে। মথুরবাবু রাণী রাসমণিকে বলছেন, "অদ্ভুত পূজক পাইয়াছি, দেবী বোধ হয় শীঘ্রই জাগ্রতা হইয়া উঠিবেন"। (ঠাকুর রামকৃষ্ণ— ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা-৬৩)।

মন্দিরের অন্যান্য কর্মচারীরা গদাধরের নামে অভিযোগ আনছে 'একে দিয়ে পূজোর কাজ হবে না, একে সরিয়ে দেওয়া হোক।' মথুরবাবু কিন্তু এসব শোনার মধ্যে নেই।

তিনি ফরমান জারি করছেন কেউ যদি গদাধরকে তাড়ানোর জন্য ব্যস্ত হয় তো তার মাথা কেটে উড়িয়ে দেওয়া হবে। স্বামী সারদানন্দ বলছেন, — 'কাজেই মথুর ঠাকুরের আচরণে বাধা না দিয়া কতদূর কী দাঁড়ায় তাহাই দেখিয়া যাইতে সংকল্প করিলেন এবং দেখিয়া শুনিয়া পরে যাহা যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হইবে তাহাই করিবেন, ইহাই স্থির করিলেন। বিষয়ী প্রভুর অধীনস্ত সামান্য কর্মচারীর উপর এইরূপ ব্যবহার কম ধৈর্য্যের পরিচায়ক নহে।' (লীলাপ্রসঙ্গ, পৃ - ৪৫২)।

আসলে তিনি ছোট ভটচাযকে বাড়তে দিচ্ছেন। যাকে ভগবান বানানো হবে তাকে তো দমিয়ে রাখলে চলবে না। ডানা মেলে উড়তে দিতে হবে। তাকে নিজেকেই বুঝতে হবে আমি সত্যিই মানুষ নই, ভগবান।

এরপরের ঘটনাবলী মোটামুটি ভাবে মথুর কেন্দ্রিক। মানে গদাধর পর্বের যা কিছু আলোচনা লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এইসময় সবেতেই মথুরবাবু উপস্থিত। আসলে তিনি এই সময় চেষ্টা করছিলেন গদাধর যাতে মনে প্রাণে বিশ্বাস করে সে মানুষ নয়। মানুষের থেকে অনেক বেশি একটা কিছু।

একবার গদাধর মন্দিরের বারান্দায় পায়চারি করছেন। মথুরবাবু ততদিনে গদাধরকে 'বাবা' বানিয়ে ফেলেছেন। তিনি বললেন বাবা তুমি যখন পায়চারি করছিলে সামনে যাচ্ছ তো দেখছি তুমি শিব, পেছনে যাচ্ছ তো দেখছি মা কালী।

এখানে আমার জিজ্ঞাস্য মথুরবাবুর মত একজন লোককে ভগবান কেন দেখা দেবেন? বেদ-পুরাণাদি বলছেন একমাত্র শুদ্ধ চিত্তেই ঈশ্বর দর্শন সম্ভব। সেখানে মথুরবাবুর মত একজন অর্থলোভী ব্যক্তি, যে প্রভূত সম্পত্তির মালিক হয়েও পরের সম্পত্তি হাতিয়ে নেবার চেষ্টা করে। জমি-জমা রক্ষার্থে মানুষ খুন করতেও যার দ্বিধা নেই। (লীলাপ্রসঙ্গ পৃ - ৪৫৭)। 'আর একবার সেজো-গিন্নী (জগদম্বা) বাবাকে বলেন, "বাবা, আমার সন্দেহ হয়, সেজোবাবু বোধহয় খারাপ জায়গায় যান। বাবা, আমি যেদিন বলবো, আপনি কি সেদিন সেজোবাবুর সঙ্গে যাবেন?" ঠাকুর বললেন, "বেশ, তা যাবো।" শেষে সেজো-গিন্নীর ইঙ্গিতে একদিন তিনি সেজোবাবুর সঙ্গে গাড়িতে করিয়া বাহির হইলেন। ফিরিয়া আসিলে সেজো-গিন্নী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, আপনারা কোথায় গেলেন, কি হোলো বলুন তো।" ঠাকুর বলিলেন, "দেখ গো—আমরা এক জায়গায় গেলুম। সেখানে সেজোবাবু আমাকে নীচে বসিয়ে রেখে ওপরে কোথায় চলে গেল। প্রায় আধঘণ্টা পরে এসে আমায় বল্লে, চলো বাবা।" সেজো-গিন্নী ঠিক অবস্থাটা বুঝিয়া লইলেন। মথুর কিন্তু এতো সাহসী যে, শ্রী ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া এমন স্থানে যাইতেও দ্বিধা বোধ করেন নাই।' (শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গ—মাসিক বসুমতি ১৩২৯-১৩৭৮, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার থেকে প্রকাশিত, প্রথম সং-২০১২, পৃষ্ঠা-৪২৩)। ঠাকুরকে নীচে বসিয়ে রেখে উপরে বারবণিতার ঘরে ঢুকেছিলেন। এহেন মথুরবাবুকে যদি ভগবান দেখা দিয়েই থাকেন তাহলে মানতে হবে বেদ-পুরাণ মিথ্যে।

আসলে ওসব কিছু নয়, মথুরবাবু চাইছেন গদাধর যেন ভাবতে থাকে 'তাহলে সত্যিই কি আমি ভগবান?' এই ভাবনাটাই মথুরবাবুর কাজে আসবে। কারণ, যে ভগবান হবে তার নিজের মধ্যেই যদি তার ভগবানত্ব নিয়ে সংশয় থাকে তাহলেই মুশকিল। তাকে মনেপ্রাণে এই বোধ আনতে হবে সে মানুষ নয়।

একবার কথা প্রসঙ্গে মথুরবাবু গদাধরকে বলেন ভগবান যা নিয়ম করে দিয়েছেন সেই নিয়মে ভগবানকেও চলতে হয়। করুক দেখি সাদা ফুলের গাছে লাল ফুল। গদাধর বলেন যার নিয়ম ইচ্ছে হলে সে ভাঙতেও পারে অন্য একটা নিয়ম বসিয়ে দিতেও পারে।

পরের দিন গদাধর যখন শৌচের জন্য ঝাউতলার দিকে যাচ্ছেন একটি জবা গাছে দুটি ফেকড়িতে লাল সাদা দুটি জবাফুল ফুটে থাকতে দেখেন। আবার কোন জায়গায় কাহিনিটি একটু অন্য ভাবেও পাওয়া যায়। গদাধর মথুরবাবুর সাথে বাগানে ঘুরতে ঘুরতে একটি জবা গাছের কাছে এসে দেখেন গাছে লাল সাদা ফুল ফুটে রয়েছে। কাহিনি যে ভাবেই থাকুক আসল ঘটনা গদাধরকে বোঝানো 'দেখো তুমি বলেছ বলে ভগবান এক গাছে দুরকম ফুল ফুটিয়ে দিলেন। তুমি সাধারণ লোক নও'।

ধারণা করা যায় মথুরবাবুই লাল জবার গাছে একটি সাদা জবা অত্যন্ত সূক্ষ্ম ভাবে লাগিয়ে রাখেন। হতে পারে গাছটা গদাধরের শৌচে যাবার পথের ধারে। যাতে শৌচে যেতে গেলেই ফুল দুটি চোখে পড়ে। না হয় বাগানের কোন এক জায়গায়, ঘুরতে ঘুরতে মথুরবাবু যেখানে গদাধরকে নিয়ে পৌঁছে যান।

ঠিক এমনই একটি ঘটনা কিছু দিন আগে আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রায় সকলেই পড়েছি। ঐ এক গাছে দুই ফুলের গল্প। কিছু এঁচোড়ে পক্ক কলেজ পড়ুয়ার জ্বালায় ঘুঁটি সেবার চিকে পৌঁছতে পারেনি। করিৎকর্মা গৃহস্বামী গনধোলাইয়ের হাত থেকে বাঁচতে দরজায় তালা ঝুলিয়ে পালান।

অনেকে বলতে পারেন, কেন, ভগবানের লীলায় সব হয়। আর এই সামান্য ঘটনাটুকু ঘটতে পারে না? হয়ত পারে। কিন্তু যে ভগবানের জগৎ জোড়া এত দায়-দায়িত্ব তার সময় কোথায় এ ধরনের ছেলেখেলায় মেতে থাকার। কোথায় প্লেন দুর্ঘটনায় দুশ লোকের মৃত্যু, কোথাও ভগবানের অসীম দয়ায় ট্রেনের তলা থেকে জ্যান্ত বেরিয়ে আসা। ট্রেড সেন্টারে হাজার পাঁচেক লোক এক ধাক্কায় শেষ, লটারীতে ছেলের চাকরিটা লেগে যাওয়া, সব কাজের যন্ত্রী তিনি। এমন লক্ষ লক্ষ মরণ-বাঁচন সমস্যা ফাঁকি দিয়ে লাল ফুল সাদা ফুল নিয়ে মাতার সময় তার কোথায়। আর যদি এমনটিই তিনি করেন বিদ্যাসাগরের কথায় 'সে ভগবান থাকলেও কোন কাজে আসবে না, না থাকলেও কোন ক্ষতি হবে না।'

ব্যক্তিগত ভাবে একটা কথা আমার খুব মনে হয় মানুষের সাথে ভগবানের যে লীলা খেলা সেই খেলায় বিচারক হিসাবে ভগবান সত্যিই খুব উপযুক্ত কিনা। মনে করুন সেই

করে এ বিশ্ব সংসার সৃষ্টি হয়েছে। নয় নয় করেও হাজার কোটি বছর তো হবেই। আর ভগবান, সেতো আরও মান্ধাতার আমলের। একেবারে অনাদি অনন্ত। যদিও এই সময়টা ভগবানের কয়েকদিনের মামলা মাত্র। আর মানুষের ইতিহাস, সেতো ভগবানের সবে কয়েক পল কেটেছে মাত্র। এইটুকু সময়ের মধ্যে সব দায়-দায়িত্ব ঠিক ঠিক বুঝে ওঠা সম্ভব কখনো! সেই কারণেই ভগবানের বিচারে এত গরমিল। কেউ বা বেবি ফুডে ময়দা মিশিয়ে, রাজার হালে, সাত্ত্বিক ভাবে ধর্ম-কর্ম নিয়ে জীবন কাটিয়ে দিচ্ছে। শাস্তি পাচ্ছে বন্যায় ঘর-বাড়ি ডুবে হাজার হাজার হত দরিদ্র, সরল সাদা গ্রামবাসী। কোথাও বা কামান কিনতে কোটি কোটি টাকা নয়-ছয়। অবশ্যই তার কিছু অংশ ভগবানের সেবায়। 'কনিষ্ক' ভেঙে তিনশ প্রাণ সলিল সমাধি। একি গরমিল, মেলেনা কিছুই। ভগবানের লাঠির শব্দ কেউ শুনতে পায় না, পড়ে কিন্তু শতকরা আটানব্বইটা গরীবের পিঠে। যোগ্য বিচারক হিসাবে ভগবানকে মানতে পারেন কিনা নতুন করে ভেবে দেখুন। তার এখনো অনেক সময় দরকার।

ঈশ্বর প্রসঙ্গে আরো একটি ব্যক্তিগত প্রশ্ন আছে যার উত্তর আজ পর্যন্ত পাইনি। খুব ছোট্ট প্রশ্ন, 'ঈশ্বর এলেন কীভাবে'। আমরা শুনি এ জগৎ প্রপঞ্চ তারই মায়া। তার ইচ্ছা বিনে গাছের পাতাটিও নড়ে না। সকল কাজের যন্ত্রী তিনি। ইত্যাদি ইত্যাদি ঈশ্বর সম্পর্কে যা কিছু শুনি সবই মেনে নিতে কোনো অসুবিধাই নেই। শুধু ঐ জিজ্ঞাসা— সেই মহাশক্তি এলো কীভাবে! এর উত্তরটুকু পেলেই সন্দেহমুক্ত হই। কারো সাথে তর্ক-বিতর্ক নয়, শুধু নিজে সন্দেহমুক্ত হবার জন্যই জানতে চাই।

বলা হয় ঈশ্বর অনাদি অনন্ত। তার জন্ম নেই, মৃত্যুও নেই। তিনি সব সময় ছিলেন, সব সময় আছেন। এই কথাগুলো অনেকটা কাঁঠালের আমসত্ত্বের মতো শুনতে লাগে। ঈশ্বর কীভাবে বা কখন এলেন সেটা আমরা কিছুতেই বলতে পারছিনা, অথচ, তিনি কি কি করেছেন, তাকে পেতে গেলে কি কি করতে হবে, মোটামুটি সব জানা। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাই বলেছেন, ' যেন এইমাত্র দেখে এলেন।' মাঝখানে একটা ফাঁক রয়ে গেছে। যে ফাঁকটা পূরণ হবে ঐ ছোট্ট প্রশ্নের উত্তরটুকু পেলেই। তিনি এলেন কি ভাবে?

আমি অনেক জ্ঞানীগুনি লোকের কাছে জিজ্ঞাসা করেছি। রামকৃষ্ণমিশনের অনেক সন্ন্যাসীর কাছে জানতে চেয়েছি, জগৎ সংসারে যাকিছু আছে সবই কোন না কোন ভাবে কোন এক সময় তৈরি হয়েছে। ঈশ্বর বা সেই ব্রহ্মশক্তি যখন আছেনই তিনিও নিশ্চয়ই কোনো এক সময় তৈরি হয়ে থাকবেন। কিন্তু সেটা কীভাবে ও কখন। মহারাজ পাতার পর পাতা কথার জাল বুনে গেছেন। আমি জানতে চেয়েছি তাহলে ঠিক কোন্ উত্তরটা লিখব মহারাজ? মহারাজ আবার এক প্রস্ত বুঝিয়েছেন। আমি আবারও বলেছি তাহলে কি এই কথাটুকু লিখব মহারাজ? এবার মহারাজ বিরক্ত হয়ে আমাকে বিদেয় করে

দিয়েছেন। একবার নয়, অনেকের কাছে অনেকবার একই প্রশ্নের উত্তর জানতে চেয়েছি, কিন্তু আমার সেই অজানা প্রশ্নটির উত্তর আজও অজানাই থেকে গেছে।

এক বন্ধু বলেছিল, হয়তো দুটো ধূমকেতুর সংঘর্ষের ফলে এক মহাশক্তির উদ্ভব ঘটেছিল, যাকে আমরা ঈশ্বর রূপে মেনে নিয়েছি। প্রশ্নের সোজাসুজি উত্তর ওই একবারই পেয়েছি। যদিও তা মানার যোগ্য নয়। এক্ষেত্রে স্রষ্টার আগেই সৃষ্টি এসে পড়েছে। মনে হয় এ প্রশ্নের উত্তর অজানাই থেকে যাবে। সকলের কাছেই অনুরোধ, সেই মহাশক্তি, যা এই বিশ্বচরাচর নিয়ন্ত্রণ করছে, তা কীভাবে ও কখন তৈরী হল, তা যদি কারো জানা থাকে, দয়া করে আমার মতো অজ্ঞজনের জন্য তা প্রকাশ করুন। নিশ্চয়ই সকলে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকবো। প্রশ্নটি ছুঁড়ে ফেলে না দিয়ে এ নিয়ে একটু ভাবুন। এ মহাশক্তির উৎস সন্ধানে আমরা যত দূর এগিয়ে যাবো ধর্মপ্রসঙ্গও আমাদের কাছে তত সহজভাবে ধরা দেবে।

মূল প্রসঙ্গ থেকে অনেক দূরে সরে এসেছি। আগের সূত্র ধরে আর একটি গল্প বলছি। মথুরবাবু ফিটন গাড়ীতে চড়িয়ে রামকৃষ্ণদেবকে তার জানবাজারের বাড়িতে নিয়ে আসছেন। পথে এক সংকীর্তন দলের সাথে সাক্ষাৎ। গাড়ি কীর্তন দলের সাথেই চলতে লাগল। রামকৃষ্ণদেবের খুব ইচ্ছা ঐ দলে যোগ দেন। পরের অংশ বই থেকে তুলে দিচ্ছি—

'রামকৃষ্ণদেব ভাবাবিষ্ট হইলেন, অমনি তাহার হৃদয় হইতে রজ্জুবৎ ঘনীভূত জ্যোতিঃ বাহির হইয়া সংকীর্তনের মধ্যে পড়িয়া তাহার অনুরূপ একটি মূর্তি ধারণ পূর্বক সেই দলের সঙ্গে নৃত্য করিতে লাগিল, আর কীর্তনও খুব জমে গেল। এইরূপে সেই মূর্তি সেই কীর্তনে কিছুক্ষণ নৃত্য করিয়া পুনরায় তাহার দেহে আসিয়া প্রবেশ করিলে তৎপরে তাহার সহজাবস্থা আসিল।' (রামকৃষ্ণ চরিত—গুরুদাস বর্মণ, প্রথম ভাগ, প্রথম সংস্করণ, ১৩১৬ পৃষ্ঠা-৮৬)।

কি সুন্দর গল্পই না ফেঁদেছিলেন মথুরবাবু। গাড়িতে রামকৃষ্ণদেব ভাবাবিষ্ট হয়ে বসে রইলেন, তার দেহ থেকে জ্যোতি বেরিয়ে আর একটা রামকৃষ্ণ শরীর ধারণ করে নেচে গেয়ে আবার তার শরীরে মিলিয়ে গেল। যুক্তি তর্ক বর্জিত মানুষ আমরা। জমিদার বাবু গল্প শোনাচ্ছেন অতএব গোগ্রাসে গেলো। হাঁসের ডিম খাচ্ছি না ঘোড়ার ডিম খাচ্ছি কে তার বিচার করে।

আর একবারের ঘটনা। একইভাবে ফিটন গাড়ি দক্ষিণেশ্বর থেকে জানবাজারের দিকে চলেছে। পথে হঠাৎ ঠাকুরের ভাব। যেন তিনি সীতা, রাবণ তাকে হরণ করে নিয়ে চলেছে। পথে গাড়ির রাশ ছিড়ে ছিটকে পড়ে। সমাধি ভাঙলে রামকৃষ্ণদেব বলেন, জটায়ু আক্রমণ করেছিল, তাই সব লণ্ডভণ্ড হয়ে যাচ্ছিল। (জীবন্মুক্তি সুখপ্রাপ্তি, পৃ - ১৬৫)। এ বিবরণও শুধুমাত্র মথুরবাবুরই দেওয়া। এর আর অন্য কোন সাক্ষী নেই। এমন কি রামকৃষ্ণদেব ভক্তদের কাছে পুরানো দিনের এত গল্প করলেও এ গল্প তার কাছে কোনদিন শোনা যায়নি।

যাক, গদাধর কিন্তু ভাবছে ছিলুম এক গণ্ডগ্রাম কামারপুকুরের 'গদাই'। আর কলকাতায় এসে স্বয়ং জমিদারবাবুকে এক গাছে দুই ফুল দেখিয়ে ছাড়লাম। রাণীমাকে থাবড়ে দিলুম, কিচ্ছুটি বললে না। সামনে হাঁটছি তো কালী, পেছনে গেলেই শিব। নিজে তো কিছু বুঝতে পারছি না। তবে স্বয়ং জমিদারবাবু যখন বলে বেড়াচ্ছেন কিছু একটা পরিবর্তন নিশ্চয়ই হয়েছে।

মথুরবাবুর আদর যত্ন দিনকে দিন বেড়েই চলেছে। তিনি গদাধরকে সঙ্গে নিয়ে তীর্থ ভ্রমণে বেরোচ্ছেন। তার আবদার রাখতে নিরন্ন গ্রামবাসীকে পেট ভরে খাওয়াচ্ছেন। তাদের কাপড় বিতরণ করছেন। এখানে একটা কথা বলার আছে, গদাধরের নয় রাসমণির মন্দিরে অন্ন বস্ত্রের সংস্থান হয়ে গেছে। কিন্তু যে অনাহার ক্লিষ্ট লোকগুলিকে তিনি আজ খাবার ব্যবস্থা করে দিলেন কাল থেকে তারা খাবে কি? এদেরকে কুকুরের মত বাঁচিয়ে রাখা যদি বিধির বিধান হয় তো সে বিধি আমাদের কি উপকার করতে পারে।

সে সময় দক্ষিণেশ্বর মন্দির ছিল তীর্থ পর্যটনশীল সাধু সন্ন্যাসীদের দু-চার দিনের বিশ্রামস্থল। তারা দু'চার দিন থাকে, মন্দিরের অদ্ভুত পূজারীকে দেখে তার নামে নানা কথা শুনে অন্য সাধুদের কাছে তার কথা বলে। বিনে পয়সায় থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা তো আছেই সেই সঙ্গে উপরি পাওনা সাক্ষাৎ ভগবান দর্শন। আস্তে আস্তে ভীড় বাড়তে লাগল। মথুরবাবু ঢালাও লঙ্গরখানার ব্যবস্থা করলেন। সেই সঙ্গে অতিথি ব্রাহ্মণদের বাড়তি উপঢৌকন। পুঁথিকার মন্দিরের অতিথি সেবা নিয়ে লিখছেন—

যেমন অতিথিশালা ভাণ্ডার তেমন।
ছত্রে খায় দিনে রেতে লোক অগণন।।
যেমন তেমন নয় যাহা ইচ্ছা যার।
ভক্তাভক্ত ছোটবড় নাহিক বিচার।।
আবাসে দ্বাদশ মাসে পর্ব ত্রয়োদশ।
অন্ন দান বস্ত্র দান দেশ জুড়ে যশ।।
স্বর্ণ রৌপ্য পাত্র দেয় বিদায় ব্রাহ্মণে।
সম্বৎসর বারে বারে হিসাব বিহীনে।।
মূল্যবান পরিচ্ছদ গরদ বসন।
অকাতরে যারে তারে করে বিতরণ।। (পৃষ্ঠা-১৪৩)

বোঝাই যাচ্ছে যেখানে গেলে অঢেল ভুরিভোজ আর দামী দামী ভেট পাওয়া যায়, এক-আধ দিন নয় বারো মাসে তেরো পার্বণ লাগিয়ে যখন তখন গিয়ে হাজির হলেই হলো। এমন কল্পতরুর নাচে কে না যেতে চাইবে! রাণীর মনের সাধ পূর্ণ হচ্ছে। এরই মধ্যে মথুরবাবু মাঝে মাঝে সভা সমিতি ডেকে প্রমাণ করার চেষ্টা করতেন তাদের পূজক ঠাকুরটি নেহাত সাধারণ ব্যক্তি নন। (রামকৃষ্ণ পুঁথি, পৃষ্ঠা-১২৬, লীলাপ্রসঙ্গ, পৃষ্ঠা-৫০৬)।

এই ভাবেই রাণী রাসমণির প্রয়োজনে, মথুরমোহন বিশ্বাসের বুদ্ধিমত্তায় গণ্ডগ্রাম কামারপুকুরের গদাধর চট্টোপাধ্যায় 'ভগবান রামকৃষ্ণদেব'-এ পরিণত হলেন। অবশ্য মথুরবাবুর উদ্দেশ্য সফল হবার পেছনে আরও অনেকগুলো 'ফ্যাক্টর' কাজ করেছিল। যথা সময়ে সেগুলি নিয়ে আলোচনা করা যাবেখন।

মন্দির এখন লোকে লোকারণ্য। কেউ আর বলছে না 'শূদ্রের' মন্দির। রাতারাতি মন্দির হয়ে উঠেছে মহা জাগ্রত। সাক্ষাৎ ভগবান অবতার বেশে মন্দিরে পুজো করছেন। রাবণ কুম্ভকর্ণের মতো দশ হাজার বছর তপস্যা করার দরকার নেই, হাতের কাছেই দক্ষিণেশ্বর মন্দির, গিয়ে পৌঁছলেই ভগবৎ দর্শন। এমন সোনার সুযোগ হাতছাড়া হতে দেওয়া যায় না। হাজার বছরে ভগবান অবতার বেশে এক-আধবার আসেন কি আসেন না। এ সুযোগ কেউ হেলা-ফেলা করে?

তবু ভারতবাসী ভাগ্যবান। এ পোড়া দেশে ভগবান নানা রূপ ধরে মাঝে মধ্যে অবতীর্ণ হন বটে। উন্নত দেশগুলো সে অমৃতে বঞ্চিত। সেই কবে কোন্ এক ভগবানপুত্র এসে শরীর ধারণ করেছিলেন। ব্যস্, সেই শুরু, সেই শেষ। আবার এলে তার গদি নিয়ে টানাটানি শুরু হতে পারে। অতএব আর ওমুখো না হয়ে যারা অবতারের অপেক্ষায় দিন গোনে তাদের কাছে যাওয়াই ভাল।

সনাতন ধর্ম রক্ষার তাগিদেই অবতারদের এত ভিড় এ অভাগা দেশে। সনাতন ধর্ম রক্ষা পেলেই অন্য সব ধর্ম ঠিক থাকে। না হলে সব কি যে হত! ওদের ভাষাটা জানা থাকলে কোন ইওরোপীয়কে জিজ্ঞাসা করার ইচ্ছা ছিল, ভায়া, সনাতন ধর্ম ঠিক আছে বলেই তোমরা আছ, না হলে সব রসাতলে যেতে। সে কি উত্তর দেয় শোনার ইচ্ছা ছিল।

এই আলোচনা থেকে রাণী রাসমণি তারণ অবতার বরিষ্ঠ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উত্থানের একটি অতি সরল কিন্তু লুকোনো কারণ আমরা খুঁজে পেলাম। পরবর্তী পর্বে আমরা দেখব ভক্তদের ভক্তি আর নিজের অসাধারণ মেধা ও বাগ্মিতা বলে রামকৃষ্ণদেব তার অবতারকে কি ভাবে এক মহীরুহে পরিণত করছেন। ভক্তের চোখে এ কাহিনি আপনি অনেক দেখেছেন। নিন্দুকের চোখে একবার দেখাই যাক না। ভালো না লাগে, ফেলে দিলেই হল।

জন্মরহস্য

সকলের জানা একটি গল্প দিয়ে এই পর্ব শুরু করা যাক। রামকৃষ্ণদেবের দাদা রামকুমার চট্টোপাধ্যায় গেছেন পাশের গ্রামে পূজো করতে। রামকৃষ্ণদেব তখনও জন্মাননি। বাড়িতে চিন্তিতা মা চন্দ্রমণি দেবী উৎকণ্ঠার সঙ্গে অপেক্ষা করছেন, ছেলে আজ বড্ড দেরী করছে। পথের দিকে তাকিয়ে বসে আছেন। নিঝুম অন্ধকার চারিদিক। ঐ দূরে কে যেন আসে। নিশ্চয় ছেলে রামকুমার হবে। কিন্তু একি, এ যে এক সুন্দরী রমণী। এক গা সোনা দানা পরে এই অসময়ে—'কোত্থেকে আসছ মা'? 'ভূরসুবো থেকে'। আরে, সেখানেই তো রামকুমার গেছে কোজাগরী লক্ষ্মীপূজো করতে। 'তা আমার ছেলেকে দেখেছ নাকি? সে কি ফিরছে?' রমণী বললে 'তোমার ছেলে যেখানে পূজো করছিল আমি সেখান থেকেই আসছি। ছেলে এখনি ফিরবে।' রাতটুকু থেকে যাবার অনুরোধ না শুনে ধানের মরাইয়ের মধ্যে দিয়ে মেয়েটি কোথায় যেন হারিয়ে গেল।

সব শুনে স্বামী ক্ষুদিরাম বললেন 'মা লক্ষ্মী তোমাকে দেখা দিয়ে গেলেন'। তা মা লক্ষ্মী একবার কেন বারে বারে দেখা দিন গে। অন্য নানা ব্যাপারে মনে হাজারো ছলছুতো থাকলেও এই দৈব-দর্শনাদির ব্যাপারে মন এক্কেবারে জলের মত পরিষ্কার। আপনি রোজ পাঁচবার করে ভগবান দেখে হিংসা ধরাবার চেষ্টা করুন, একটুও হিংসে তৈরি হবে না। তৈরি হবে অন্য একটা জিনিস, 'সন্দেহ'। কেন লোকটা ভগবান দেখে বেড়াচ্ছে। নিশ্চয়ই পেছনে একটা কারণ আছে। এই কারণটাই খুঁজে বার করুন, দেখবেন সম্পূর্ণ ঘটনাটাই জলের মত স্বচ্ছ। আপনিই তখন নিন্দুক।

এই যে এক্ষুনি একটা ভগবান দেখার ঘটনা ঘটে গেল, কেন জানেন? যে ঘরে যুগাবতার ঠাকুর রামকৃষ্ণ জন্মাবেন সে ঘরের লোকজন কি অতি সামান্য হতে পারে! ভগবানের সাথে একটা 'ডাইরেক্ট' সম্পর্ক তাদের থাকতেই হবে। তবে না ভগবান সেখানে জন্ম নেবেন।

মা লক্ষ্মীও সেজেগুজে ঘোরেননি, চন্দ্রমণিও কিছুই দেখেননি। এগুলো নিছক গল্পই। যেদিন রামকৃষ্ণ 'অবতার রামকৃষ্ণদেবে' পরিণত হয়েছেন তখনই এই সব গল্প রটেছে। অবতারের পিতামাতার নামে এমন ভারী ভারী 'সার্টিফিকেট' না থাকলে সন্তানের অবতারত্ব ফিকে হয়ে যায়। এখনও কিন্তু রামকৃষ্ণদেব জন্মাননি। গল্পটা অনেক পরের হলেও এমন ভাবে তৈরি যেন জন্মের আগের কাহিনীতে ঠিক ঠিক, মাপে মাপে লেগে যায়।

আর একটা গল্প বলছি শুনুন। গল্পটার সাথে মহাভারতের একটি কাহিনীর বেশ মিল আছে। বাড়ির সকলের খাওয়া হয়ে গেছে। হাঁড়িতে সামান্য খাদ্যই পড়ে আছে। চন্দ্রাদেবী খাবেন। এমন সময় কয়েকজন হাভাতে এসে জুটেছে। আবার তীর্থযাত্রী ফকির। কি খেতে দেন তাদের? হাঁড়ি যে বাড়ন্ত। হঠাৎ একি কাণ্ড। নয়-দশ বছরের একটি মেয়ের উদয় হয়েছে। চন্দ্রাদেবীর পিছনে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছে আর ফাঁকা হাঁড়ি অন্ন-ব্যঞ্জনে ভরে উঠছে। (রামকৃষ্ণ পুঁথি, পৃষ্ঠা-১৩-১৪)।

আপনি বিশ্বাস করেন এই সব গল্প? না করাই উচিত। তবে অবতারের মা বলে কথা। এরকম কিছু আশ্চর্য ঘটনা তার থাকবেই। বিশ্বাস করে নিলেন তো বেঁচে গেলেন। বিশ্বাসী না হলে বিপদ অবশ্যম্ভাবী।

শ্রীরামকৃষ্ণের পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের সাথেও ভগবানের সম্পর্ক খুব ভালো ছিল। তিনি যখন সকালে পূজোর ফুল তুলতে বাগানে যেতেন মা শীতলা নিজে বালিকা সেজে তার সাথে সাথে ঘুরতেন। গাছের ডাল নুইয়ে ধরে ফুল তুলতে সাহায্য করতেন। গল্পবাজরা এইসব বলে বটে তবে মা শীতলা নিজে জানিয়েছেন এই মিথ্যের বিরুদ্ধে তিনি হাইকোর্টে যাবেন।

এবার শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মাবেন। অন্তরীক্ষে ভগবান নিশ্চয়ই খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। অবতার রূপে তারই খণ্ড প্রকাশ হবে কিনা। ভগবানের সব দপ্তরে কর্ম ব্যস্ততা তুঙ্গে। শুধু একটি দপ্তর একটু কলম চোষার অবসর পেয়েছে। বিধাতা পুরুষের দপ্তর।

এমনিতে এই দপ্তরের দায়-দায়িত্বের কথা ভাবলে মাথা ঘুরে যায়। ভগবানের সৃষ্ট প্রতিটি জীবের ভূত-ভবিষ্যৎ নির্ধারণ হয় এখান থেকেই। তা ভগবানের সৃষ্ট জীবের সংখ্যা তো নেহাত কম নয়। মানুষ আর কটি, বড় জোর ছ-সাতশ কোটি হবে। এক গ্লাস জলেই ওইকটি জীবাণু পাওয়া যাবে। তাহলে ভেবে দেখুন এই বিশাল পৃথিবীতে জীবাণুর সংখ্যা কত হতে পারে। পূর্ব জন্মের কর্মফল যখন সব প্রাণীর জন্যই নির্দিষ্ট তাহলে এদেরও ঐ একই নিয়মে ভাগ্য বিধান হয়ে থাকবে। একদম আদি জীবাণুটির ভাগ্য কোন ফলের উপর দাঁড়িয়ে ছিল জানি না। (স্বামীজী একবার ঠিক এই প্রশ্নের মুখে পড়ে ডারউইনের পৌরাণিক ব্যাখ্যা শুনিয়েছিলেন)। যাইহোক, ভেবে দেখুন একবার, হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ কোটি জীবাণুর প্রতিটির পূর্ব জন্মের কর্ম বিধাতাকে বিচার করতে হয়। কে কতটা পাপ করেছিল কে কতটা পুণ্যি করেছে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করে তবেই এই জন্মের ভাগ্য নির্দিষ্ট হবে। এক্ষেত্রে কোন গড়পড়তা নিয়মও চলবে না। আমার মনে হয় রাঁচির পাগলা গারদে খোঁজ করলে ছদ্মবেশধারী বিধাতাকে পাওয়া যেতে পারে। যাকে এইভাবে অসম্ভবের পেছনে ছুটতে হয় তার কপাল লিখন পাগলা গারদ ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না।

গড়পড়তা নিয়ম বলতে ধরুন যেখানে যত হরিণ জন্মাচ্ছে বিধাতা সকলের জন্য একটিই রাবার স্টাম্প করিয়ে রেখেছেন 'বাঘ-সিংহের পুষ্টি সাধন'। দু-একটি যে ফসকে যায়না তা নয় তবে তাদের পরীক্ষা করলেই দেখা যাবে কোন জ্যোতিষীর দেওয়া আংটি পরে ফাঁড়া কাটিয়ে ফেলেছে।

আবার আর এক দিক থেকে দেখতে গেলে আংটি পরে ফাঁড়া কাটানো মানে বিধাতাকে মিথ্যে প্রমাণ করাও। ধরুন বিধাতা কপালে লিখে দিয়েছেন লরির নীচে পঞ্চত্ব প্রাপ্তি। আপনি এমন এক আংটি ধারণ করলেন যে লরি বেমালুম পাশ কাটিয়ে চলে গেল। হয়তো সামান্য ধাক্কা লেগে দুচারটি হাড়গোড় ভাঙার উপর দিয়েই রক্ষে পেয়ে গেলেন। তাহলে হলটা কি? বিধাতা লিখেছেন মৃত্যু, জ্যোতিষী পাল্টে দিল হাত ভাঙাতে। বিধাতার আর কপালে ভূত ভবিষ্যত লিখে লাভ কি!

সেদিক থেকে দেখতে গেলে আংটি পরে ভাগ্য ফেরানো নাস্তিকতারই সামিল। বিধাতা আপনার জন্য যা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন তাই তো আপনার ভবিতব্য। ধরুন ব্যবসায় আপনার মন্দা'ই চলবে। এই বিধাতার বিধান। আপনি একটা 'প্রোটেকশন' দরকার বলে একটা আংটি ধারণ করে আপনার ডুবন্ত ব্যবসাকে কূলে টেনে আনার চেষ্টা করছেন। সে তো উপরওয়ালার নির্দেশকে উপেক্ষা করাই হল। তিনি চান একরকম, আপনি করতে চান অন্য রকম। আমার এক বন্ধু বলল, 'কেন, দরজা, জানালা ভেঙে পড়তে দেখলে আমরা কি একটা প্রোটেকশন নেবার চেষ্টা করিনা।' ঠিক কথা, করি । কিন্তু সে সব তো জাগতিক ব্যাপার। জাগতিক কোনো ব্যাপারকে পাল্টানোর অধিকার আমার নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু ভাগ্য ! সে তো ঈশ্বর নির্দিষ্ট। তাকে পাল্টাতে যাওয়া মানে ঈশ্বরের বিরোধিতা করা হল না কি?

রামকৃষ্ণদেব জন্মাচ্ছেন, স্বয়ং ভগবান, তার আবার কপাল লিখন লিখবে কে। তাই একটু অবসর। একটু হাত-পা ছড়িয়ে ঘুম। ঘুমোও বিধাতা, ঘুমোও।

ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখছেন ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়। এক অলৌকিক পুরুষ তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। ক্ষুদিরাম তার পদতলে পতিত। দৈব পুরুষ ক্ষুদিরামকে বলছেন 'তোর ঘরে আমি জন্ম নেব'। ক্ষুদিরাম দ্বিধাগ্রস্ত। বলছেন আমার অভাবের সংসার। নিজেদের পেটই চলে না, আবার কেউ জন্ম নিলে সে হ্যাপা সামলাই কি করে। সে দৈব পুরুষও নাছোড়বান্দা। তিনি জন্ম নেবেনই নেবেন।

গয়াধামে কন্যা কাত্যায়নীর ঘাড়ে চাপা ভূতের উদ্দেশ্যে পিণ্ডি দিতে এসে এই দৈব-দুর্বিপাকে পড়েছেন ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়। দৈব-দুর্বিপাক বললাম এই কারণে, অভাবের সংসারে তিন-চারটি ছেলেমেয়ের মুখে অন্ন তুলে দিতেই হিমশিম অবস্থা। আবার একটি সন্তান, দুর্বিপাকই বটে।

একই সময় কামারপুকুর গ্রামেও ক্ষুদিরামের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী (লীলাপ্রসঙ্গ, পৃষ্ঠা-৯৬) চন্দ্রাদেবীও প্রায় একই রকম পরিস্থিতির মুখে পড়েছেন। দু-একজন প্রতিবেশিনী সহ চন্দ্রাদেবী গেছেন শিব মন্দিরে। হঠাৎ শিবের শরীর থেকে একটা জ্যোতি বেরিয়ে ঘুরপাক খেয়ে চন্দ্রাদেবীর শরীরে প্রবেশ করল। তিনি প্রায় সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন। এই কাহিনী নানা বইতে নানা ভাবে থাকলেও মূল ঘটনা একই, শিবের মন্দির বা শরীর থেকে কিছু একটা চন্দ্রাদেবীর শরীরে প্রবেশ করছে।

ক্ষুদিরাম গয়া থেকে ফিরে এলে চন্দ্রাদেবী তাকে আনুপূর্বিক সব ঘটনা বললেন। শুনে তিনি স্ত্রীকে এই সব দৈব দর্শন নিয়ে কারও সাথে আলোচনা করতে বারণ করলেন, এবং বলে রাখলেন এখন থেকে এইরকম দর্শন চলতেই থাকবে।

ক্রমে ক্রমে চন্দ্রাদেবীর শরীরে গর্ভ লক্ষণ ফুটে উঠতে লাগল। তিনি তার প্রতিবেশিনীদের বললেন এ তার স্বামী সঙ্গ ছাড়াই সন্তান। সাক্ষাৎ ভগবান ঘরে আসছেন। প্রতিবেশিনীরা তাকে এরূপ প্রলাপ বকতে নিষেধ করে বলেন 'অন্য কাউকে আর এসব কথা বল না'। (পুঁথি, পৃষ্ঠা-৩, জীবনবৃত্তান্ত, পৃষ্ঠা-২) 'ভক্ত মনমোহন' গ্রন্থে দেখি 'এই সকল কথা রাষ্ট্র হইলে প্রতিবেশিনীগণ তাহাকে 'পাগলী' বলিয়া উপহাস করিতে লাগিলেন।' (উদ্বোধন—পৃ-১৯৪)।

দিনে দিনে দিন কাটতে লাগল। যথা সময়ে চন্দ্রাদেবী একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দিলেন। এই সেই সন্তান যে পরবর্তীকালে অবতার বরিষ্ঠ শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণদেব নামে জগৎ পূজ্য হবে। অনেক গল্প রটিয়ে তবেই তার আগমন।

এত সহজেই এতগুলো স্বপ্ন, দৈব-দর্শন গল্প বলে উড়িয়ে দিচ্ছি কিভাবে জানেন। একটা ছোট ঘটনা থেকে। রামকৃষ্ণদেবের বয়স তখন সাত-আট মাস হবে। স্তন্য পান করে মশারীর মধ্যে ঘুমোচ্ছেন, শ্রীমতী চন্দ্রাদেবী ঘরের কাজ কর্ম করছেন। হঠাৎ তার লক্ষ্য গেল ছোট্ট ছেলের বদলে কে এক দীর্ঘাকায় পুরুষ মশারী জুড়ে শুয়ে আছে। ভয় পেয়ে স্বামীকে সব জানালেন। তার ধারণা কোন উপদেবতা তার ছেলের অনিষ্ট করতে চাইছে। অতএব এক্ষুনি ওঝা ডেকে এর প্রতিবিধান করা হোক। ক্ষুদিরাম অনেক বুঝিয়ে সে যাত্রা তাকে আশ্বস্ত করেন।

পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণদেবের বয়স যখন তেইশ তখনও প্রায় একই রকম একটি ঘটনা দেখতে পাই। শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্ভুত আচরণে গ্রামবাসীরা বলাবলি শুরু করেছে একে নিশ্চয়ই ভূতে পেয়েছে। এই রকম কানাকানি শুনে চন্দ্রাদেবী শঙ্কিত হয়ে ওঠেন ও ওঝা দিয়ে ঝাড়-ফুকের ব্যবস্থা করেন। (লীলাপ্রসঙ্গ, পৃষ্ঠা-২৩৮)। আর এখানেই আমার সন্দেহ। অপদেবতা, ভূত-প্রেতের ভয় তো আর যারই হোক চন্দ্রাদেবীর হওয়া উচিত নয়। যে যেমনই ভাবুক আর যাই হোক না কেন, তিনি তো নিশ্চিত ভাবেই জানেন এ তার স্বামীর সন্তান নয়। দৈব স্বপ্নে পাওয়া সন্তান। সাক্ষাৎ ভগবান। আর যে সাক্ষাৎ ভগবান তাকে

আবার ভূতে ধরা কি। তাহলে কি ভগবানকেও ভূতে ধরে? ভূত-ভগবান এরা প্রায় অঙ্গাঙ্গি দুটি শব্দ হলেও শুধুমাত্র ছাপার অক্ষরেই দুজনে পাশাপাশি থাকতে পারে। যেমন আর কি বাঘ-সিংহ। ট্রেনারের চাবুক ছাড়া এরা এক জায়গায় থাকে কখনো।

ওসব গল্প ভুলে আসল সত্যটা কি সেটাই বলি। গল্প যখন রটানো হচ্ছে তখন পেছনে একটা কারণ থাকবেই। কারণ খোঁজার আগে রামকৃষ্ণ মিশনের কাছে একটা আবেদন রেখে নিই। রামকৃষ্ণদেবের গর্ভধারিণী মাতা চন্দ্রাদেবী হলেও তার পিতা কিন্তু কেউ নয়। স্বপ্নে পাওয়া সন্তান এই মাত্র সত্য। ক্ষুদিরামের ঔরসজাত সন্তান তিনি নন। বড় জোর পালক পিতার মর্যাদা তিনি পেতে পারেন। তার বেশি নয়। দৈবগুণে প্রাপ্ত সন্তান মাতার গর্ভজাত হলেও পিতার ঔরসজাত মোটেই নয়। একটি স্বপ্ন দেখা ছাড়া পুত্রের জন্মের পিছনে তার আর কোন ভূমিকা নেই। রামকৃষ্ণদেবের পিতার নাম উহ্য রাখা হোক। এটা মিশনের কর্তব্য।

রামকৃষ্ণ জীবনী সবিস্তারে জানতে গিয়ে ফ্রেডারিখ ম্যাক্সমূলার লক্ষ করেছেন রামকৃষ্ণ জীবনীতে অসত্য, অর্ধসত্য যেমন মিশে আছে, তেমনই ভক্তদের বিশেষত ইংরেজী জানা ভক্তদের দাক্ষিণ্যে যীশুখ্রীষ্টের জীবনীর কিছু ঘটনাও ঢুকে গেছে। কুমারী মাতার গর্ভে যিশুর জন্ম। রামকৃষ্ণ জন্মের ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে পিতার কোন ভূমিকা নেই। গল্পগুলো অনেকটা একই রকম, তাই না?

আবার সারদামণির জন্মের গল্পও রামকৃষ্ণদেবের সাথে তাল মিলিয়ে প্রায় একই ভাবে সাজানো হয়েছে। শ্যামা সুন্দরীর পেটে সেই শিবের জ্যোতি প্রবেশ, গর্ভসঞ্চার এবং সারদার জন্ম। ভেল্কি বলতে সামান্যই, শিবের প্রবেশ, পার্বতীর নিষ্ক্রমণ। যেন লিফটে ঢুকল অষ্টাদশী সুন্দরী, বেরিয়ে এল সত্তুরে বুড়ী। চাষা অবাক।

রামকৃষ্ণদেবের পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় ছিলেন অত্যন্ত আচারী ব্রাহ্মণ। শূদ্রের গৃহে যজমানী করে এমন ব্রাহ্মণের নিমন্ত্রণ পর্যন্ত তিনি গ্রহণ করতেন না। অশিক্ষা-কুশিক্ষায় ভরা গ্রামাঞ্চলে এইরকম সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণদের সম্মান প্রতিপত্তি সাংঘাতিক। সকলেই এদের একটু অন্য চোখে দেখে। 'ওরে, চাটুজ্যেমশাই আসছেন, রাস্তা ছেড়ে দাঁড়া', এইরকম একটা ভাবমূর্তি গ্রামাঞ্চলে এদের থাকে। ক্ষুদিরামেরও ছিল। তিনি পুকুরে স্নান করতে গেলে স্নানরত অন্য ব্যক্তিরা জল থেকে উঠে পড়ত। ক্ষুদিরামের স্নান শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করত। এহেন ক্ষুদিরাম পিতা হবেন। বয়সটা কিন্তু পিতা হবার পক্ষে অনেক বেশিই হয়ে গেছে। প্রায় একষট্টি। এক কথায় বৃদ্ধ। স্ত্রী চন্দ্রাদেবীর বয়সটাও নেহাত কম নয়। পঁয়তাল্লিশ পেরিয়ে গেছে। বাঙালী মেয়েরা যেখানে 'কুড়িতেই বুড়ী' প্রবাদ আছে। সেখানে পঁয়তাল্লিশ! বুড়ী দুগুণে কত হয়? তার চেয়েও বেশী। সোজা কথায় বুড়ো-বুড়ির সন্তান।

লোকে সামনে দাঁড়িয়ে সম্মান দেখালেও আস্তিনের নীচে হাসবেই। 'বুড়ো দিবারাত্র ঠাকুর ঠাকুর তো খুব করে, আবার রস দেখনা। এই বয়সেও....।'

চন্দ্রাদেবীও রেহাই পাবেন না, গ্রামের মহিলারা বলবে 'মাগী বুড়ি বয়সে বাচ্চা বিয়োবে। বাঁচে না মরে কে জানে'। এই ধরণের কুৎসা গ্রামে রটবেই রটবে। লোকের কাছে মুখ দেখানো দায় হয়ে দাঁড়াবে।

মেয়ের ঘরে নাতিনাতনি তো আছেই, বড় ছেলে রামকুমারেরই বিয়ে হয়ে গেছে সেই কবে। ছেলে মেয়ে তখনো পর্যন্ত হয়নি তাই। হলে সেও এত দিনে বড় হয়ে যেত। এই কানাঘুষোর হাত থেকে রেহাই পেতেই ক্ষুদিরাম চন্দ্রাদেবীর এত অভিনয়। ভাবখানা এমন যেন এর জন্য আমরা মোটেও দায়ী নই। যা হয়েছে সব ওপরওয়ালার ইচ্ছায়। বুড়োবুড়ি হয়ে গেছি এখন আর ওসব একদম নয়।

আমরা জানি সন্তান জন্মের জন্য একটি নারী ও একটি পুরুষ আবশ্যক। ধর্ম বিজ্ঞান দিয়ে যতই সত্যকে ঘুলিয়ে দেবার চেষ্টা হোক না কেন, আমরা বস্তু বিজ্ঞানেই বিশ্বাসী। এর অন্যথায় যা কিছু ঘটছে খোঁজ নিয়ে দেখুন পেছনে রহস্য পাবেন।

প্রশ্ন হতে পারে রামকৃষ্ণদেবের পরেও ক্ষুদিরাম চন্দ্রাদেবীর একটি কন্যা সন্তান জন্মেছিল। তখন তো তাদের বয়স আরও বেশী। ভগবানের গল্প রটাবার জন্য সেটাতো আরও ভাল সময়। কই তখন তো তারা ভগবানের দোহাই দেননি। তাহলে এমন অভিযোগ কেন?

হ্যাঁ, এই প্রশ্নটা ওঠাই উচিত। রামকৃষ্ণদেবের বেলায় লোকলজ্জার হাত থেকে বাঁচতে ভগবানের গল্প রটলো। অথচ পরের বার চুপচাপ কেন। উত্তর দিতে হবে। প্রসঙ্গটা টেনে আনা হয়েছে যেমন, যবনিকাও টানতে হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ যখন জন্মাচ্ছেন তখন তো আর ক্ষুদিরাম চন্দ্রাদেবী জানেন না যে আবার তিন চার বছর পরে তাদের সন্তানের মুখ দেখতে হবে। তারা জানেন একষট্টি-পঁয়তাল্লিশেই লোকের কাছে হাসির খোরাক হতে হবে। অতএব যাহোক করে চাপা দেবার চেষ্টা। তিন চার বছর পরে মানে প্রায় পঞ্চাশ বছরের কাছে গিয়ে আবার যখন তিনি মা হচ্ছেন তখন আবার একটা গল্প ফাঁদলে লোক কি আর খাবে! সাত্ত্বিক, আচারী, পূজারী এবং সম্মানীয় ভদ্রলোক। তার প্রতি ভগবানের করুণা গ্রামের লোক বিনা প্রতিবাদে একবার মেনে নিতে পারে। কিন্তু বার বার সন্তান হবে আর একবার ভগবানের গল্প, একবার ভূতের গল্প, একবার প্রেতের গল্প বলে চালিয়ে দেব ভাবলেই তো হবে না, লোকের বদহজম হয়ে যাবে।

শ্রুতিধর শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীরামকৃষ্ণ বড় হতে লাগলেন। খুব ছোট বয়স থেকেই শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে কয়েকটি গুণ প্রকাশ পেতে লাগল। তিনি দিব্যি আঁকতে মাটির পুতুল বানাতে শিখেছেন। গানের গলাও ছিল খুব সুন্দর। সবার চেয়ে বড় যে গুণটি তার মধ্যে ফুটে উঠতে লাগল তা হল একবার তিনি যা শোনেন কখনও তা ভোলেন না। এ কিন্তু এক অসাধারণ গুণ।

কোথায় হরি কথা শুনে এলেন, কোথাও রামায়ণ পাঠ শুনে এলেন, বাড়িতে এসেও দেখা যেত সেসব তিনি ভুলতেন না। প্রায় হুবহু সব বলে দিতে পারতেন। তিনি ছিলেন শ্রুতিধর। স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যেও এই গুণ যথেষ্ট পরিমাণে ছিল।

এখন আর তেমন প্রচলন নেই কিন্তু সে যুগে গ্রামে গঞ্জে ধর্ম চর্চার একটা বিরাট রেওয়াজ ছিল। আজ গীতা পাঠ, কাল বেদ পাঠ, পরশু পুরাণ এসব লেগেই থাকত। রামকৃষ্ণদেব নাওয়া-খাওয়া ভুলে এইসব আসরে বসে থাকতেন। এমনও দিন গেছে বাড়ির লোকেরা তাকে পাগলের মত খুঁজে বেড়াচ্ছে আর তিনি পাশের গ্রামে ধর্ম কথা শুনছেন। বাড়িতে ফিরতে হবে একথা তার খেয়ালই নেই। এইভাবেই তিনি ধর্ম আলোচনা বহু শুনেছেন। বলা যায় সেই ছোট্ট বেলা থেকেই ধর্মের প্রতি তিনি নিবেদিত প্রাণ। বলতেন—"নিজে পড়ি নাই, কিন্তু ঢের সব যে শুনেছি গো, সে সব মনে আছে। অপরের কাছ থেকে, ভালো ভালো পন্ডিতের কাছ থেকে, বেদ-বেদান্ত, দর্শন-পুরাণ সব শুনেছি।"

পরবর্তীকালে তিনি যখন ভক্তদের নিয়ে ধর্ম প্রসঙ্গ করতেন দেখতে পাই সেই সময়কার সঞ্চিত জ্ঞানই তার কথায় প্রতিফলিত হচ্ছে। বেদে ব্রহ্মজ্ঞানীর অবস্থা সম্বন্ধে কি বলা আছে, সপ্তভূমি কি, গীতায় পরলোকতত্ত্ব নিয়ে কি বলা হয়েছে, ভরতরাজা হরিণ হরিণ করে মরে কি হয়েছিল এসব নিয়ে তিনি দিব্যি ঘন্টার পর ঘন্টা আলোচনা চালিয়ে যেতে পারতেন।

বেদে ব্রহ্মজ্ঞানীর অবস্থা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে আপনাকে বিষয়টি সম্বন্ধে জানতে তো হবেই সেই সঙ্গে দরকার গভীর ভাবে এসব নিয়ে চিন্তা ভাবনা। তা নয় আপনি বললেন 'আমার ভেতর থেকে কে যেন কথা ঠেলে ঠেলে দিচ্ছে, আর মুখ দিয়ে তা ভসভসিয়ে সোডার মত বেরিয়ে আসছে'। এসব কথা বললে তো হবে না। রামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে এরকম একটা কথা চালু আছে। তিনি অশিক্ষিত অথচ তার কথা

যেন বেদ-বেদান্ত ছাড়িয়ে যাচ্ছে। রামকৃষ্ণদেব নিজেও বলতেন "এখানকার ভাব বেদ-বেদান্তকেও ছাড়িয়ে গেছে"। তা যে যা বলে বলুক আসল কথা হল গিয়ে, যে বিষয়ে আপনি কিছু জানেন সেই বিষয়েই আপনি কিছু বলতে পারেন, নচেৎ নয়। ভরত রাজার হরিণ হরিণ ভেবে কি হয়েছিল সে কাহিনীই যদি আপনি না জানেন তো কি করে তার অন্তর্নিহিত অর্থ ব্যাখ্যা করবেন। কি করেই বা কোন কথার মধ্যে উপমা হিসেবে তাকে ব্যবহার করবেন।

আসলে শ্রীরামকৃষ্ণের অসাধারণ মেধা সব সময় তার সঙ্গেই ছিল। আর এমন মেধাবী ছাত্রের স্কুল-কলেজে রুচি থাক আর না থাক সে তার মননশীলতার খোরাক পরিবেশ থেকে সংগ্রহ করে নেবেই। শুধু পুরাণ কথা শোনাই নয় প্রকৃতির প্রতিটি বিষয় থেকেই তিনি সৌন্দর্য আহরণ করে নিতেন। এ এক অনন্য গুণ। যে গুণের অধিকারী ছিলেন রামকৃষ্ণদেব। রমাঁ রলাঁ তাই বলেছেন "রামকৃষ্ণ ছিলেন আজন্ম শিল্পী"। শ্রীরামকৃষ্ণের এক প্রিয় সন্তান স্বামী নির্মলানন্দ বলেছেন—প্রকৃতিই ছিল তাহার পক্ষে মহাগ্রন্থ, মহাবেদ। অন্য কেহ তাহার মত প্রকৃতি-পুস্তককে এত গভীর ও ঘনিষ্ঠভাবে অধ্যয়ন করেছেন কিনা সন্দেহ!

'অশিক্ষিত' এ ভাবেই সর্বত্র উল্লেখ থাকলেও ধর্মীয় ব্যাপারে তিনি মোটেও অশিক্ষিত ছিলেন না। ধর্ম তত্ত্বের যথেষ্ট প্রগাঢ়তা তার ছিল। তার ভেতর থেকে যখন 'ঠেলা' আসত তিনি তো তখন শুধু ধর্ম প্রসঙ্গই করতেন, এমন তো নয় যে ঠেলা খেয়ে তিনি নিউটনের তৃতীয় সূত্র বলে ফেলেছেন! সেটা তিনি বলতে পারবেন না। তার মন যাতে টানত, যে পরিবেশে তিনি বড় হয়েছেন তাতে নিউটন-আইনস্টাইন নয়, ছিল শুধু ধর্ম। তিনি শিখেছেনও শুধু তাই। সুতরাং ধর্মীয় ব্যাপারে তিনি অশিক্ষিত কখনোই ছিলেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণ আলোচনায় এই কথাটা খুব আসে 'দেখেছ, লোকটা লেখাপড়া কিচ্ছু জানে না অথচ কি কথাই না বলে'। একটু তলিয়ে দেখলেই দেখা যায় এই কথাটাই 'ভেক কথা'। তিনি ধর্মতত্ত্বে অতটা অজ্ঞান ছিলেন না যতটা আমরা ভেবে থাকি। এমন মেধা সম্পন্ন ব্যক্তি হবার পরও আমাদের জন্য রাখলেন কি? ধর্মের পথ। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কথায় এই পথ ধরেই যত বড় বড় ভুল-ভ্রান্তিগুলি সমাজে প্রবেশ করে। রবীন্দ্রনাথ বলেন, "যে দেশে প্রধানত ধর্মের মিলেই মানুষকে মেলায়, অন্য কোনো বাঁধন তাকে বাঁধতে পারে না, সে দেশ হতভাগ্য।"

ভাব সমাধি

গ্রামের মেঠো পথের আল ধরে চলেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। হাতে এক আঁজলা মুড়ি। সেই খেতে খেতে চলেছেন। আকাশে কালো মেঘের ঘনঘটা। কালো মেঘের গায়ে এক সারি বক উড়ে চলেছে। দূরে রাখাল বালকের দল খেলে বেড়াচ্ছে। প্রকৃতি যেন তার কাব্যগ্রন্থের একটি পাতা মেলে ধরেছেন। মন যদি কবি হয় পড়ে নাও, বিভোর ভাব আসলেও আসতে পারে। অতি সংবেদনশীল যদি হয় শুধু ভাব নয় মহাভাবও দেখা দিতে পারে।

আর শ্রীরামকৃষ্ণের হলও ঠিক তাই। বাহ্য জ্ঞান নেই, হাত-পা আড়ষ্ঠ, মুঠো ভরা মুড়ি কোথায় ছড়িয়ে পড়েছে, পড়ে আছেন তিনি মাঠের মধ্যে। রাখাল ছেলের দল দৌড়ে কাছে এসেছে। তারা হতবুদ্ধি। ছোট ছোট ছেলের দল এই অদ্ভুত পরিস্থিতিতে কি করবে নিজেরাও জানে না। তারা ব্যস্ত হয়ে ছোটাছুটি করছে। কেউ বা একটু জল এনে চোখে মুখে ছিটিয়ে দিচ্ছে। ভয় পেয়ে তারা ঠিক করে ফেলেছে একে নিয়ে আর খেলা নয়। এখন যাহোক করে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি।

বাড়িতে মা চন্দ্রাদেবী কিংকর্তব্যবিমূঢ়। আবার তার ভগবান ছেলেকে ভূতে ধরেছে। অতএব মারণ-উচাটন, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন, ওঝা-ঝাড়ফুকের ব্যবস্থা। কিন্তু এত কিছুর পরও রেহাই নেই। আবার কিছুদিন পরে পাড়ার মহিলাদের সাথে বিশালাক্ষী মন্দিরে পূজো দেখতে যাবার পথে একই অবস্থা। হাত-পা খিঁচিয়ে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়া।

এইভাবে দিন কাটতে লাগল। তার এই অদ্ভুত ব্যাধির উপশম হল না। তবে এর ফলে শ্রীরামকৃষ্ণের স্বাস্থ্যের তেমন কোন ক্ষতি হয় নি। যার জন্য গ্রাম্য, দরিদ্র, পিতামাতার পক্ষে সুচিকিৎসার প্রয়োজনবোধ তেমন একটা হয়ে ওঠেনি। যদি সে সময় সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত হত তাহলে হয়তো আমরা অবতার রামকৃষ্ণদেবকে পেতামই না। অবতার রূপী শ্রীরামকৃষ্ণ উত্থানে সবচেয়ে বড় সহায়ক হয়ে উঠেছে তার এই ব্যাধি। যা কিনা জনমানসে রামকৃষ্ণদেবের 'ভাব সমাধি' নামে খ্যাত। রমাঁ রলাঁ বলেছেন 'ইউরোপ হইলে তাহার নিস্তার ছিল না। অবিলম্বে ওই শিশুকে মানসিক চিকিৎসার কড়া কানুনের কবলে কোন উন্মাদ আশ্রমে পাঠানো হইত।' (রামকৃষ্ণের জীবন, প্রথম সংস্করণ, পৃষ্ঠা-৯, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃষ্ঠা-১৮)। এও বলেছেন, এর ফলে এক অসাধারণ শিল্পী সত্তার ইতিও ঘটে যেত।

আমরা আগে দেখেছি শ্রীরামকৃষ্ণের এই ব্যাধি কাজে লাগিয়ে রাণী রাসমণির জামাই মথুরমোহন বিশ্বাস তাদের মন্দির সার্বজনীন করতে কত বড় বাজি খেলে গেছেন। এবার

আমরা আলোচনা করব তার এই ভাব সমাধি বা ভাবাবেশ আসলে কি। ধর্মবিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত আমরা আগেই পেয়ে গেছি। বস্তুবিজ্ঞান কি বলে দেখাই যাক না।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পিসী রামশীলাদেবীর উপর মাঝে মাঝে মা শীতলার ভাবাবেশ দেখা দিত। একবার ভাই ক্ষুদিরামের বাড়ি বেড়াতে এসে সেখানেই তিনি ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়েন। রামকৃষ্ণদেব সে বার তাকে খুব কাছ থেকে লক্ষ্য করেন এবং পরে বলেছিলেন, "পিসীর ঘাড়ে যে আছে সে যদি আমার ঘাড়ে চাপে তো বেশ হয়।" (লীলাপ্রসঙ্গ, পৃষ্ঠা-১২৫)। রামকৃষ্ণদেবের দিদি কাত্যায়নীর হত ভূতের আবেশ। (লীলাপ্রসঙ্গ, পৃষ্ঠা-১০৬)। এই ভূতটিকে মুক্ত করতেই ক্ষুদিরামের গয়া গমন, স্বপ্ন দর্শন এবং শ্রীরামকৃষ্ণ লাভ। পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণদেবের মধ্যেও দেখা যাচ্ছে সেই একই ভাবাবেশ।

এমন কি রামকৃষ্ণদেবের ভাইয়ের মেয়ে লক্ষ্মীমণিদেবীর মধ্যেও দেখতে পাচ্ছি একই রোগের লক্ষণ। তিনিও গুরুমা হয়েছিলেন। তার এক ভক্ত শিষ্য রাস্তা থেকে একটি গান শুনে আসে। লক্ষ্মীদেবী সেই গানটি জানেন কিনা জিজ্ঞাসা করায় তিনি গানটি গাইতে থাকেন। গাইতে গাইতে এতই ভাব বিভোর হয়ে পড়েন যে হাত পা আড়ষ্ট হয়ে বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। অন্যান্য ভক্তরা মিলে তাকে বিছানায় শুইয়ে কানে কৃষ্ণ নাম শোনাতে থাকেন। প্রায় দু-তিনদিন এই অবস্থায় পড়েছিলেন। (শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীশ্রী লক্ষ্মীমণিদেবী—শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র সেনগুপ্ত, পৃষ্ঠা-২৫৬-৫৭)। এর পরবর্তী অংশ গুরুমার ভাব সমাধি নিয়ে ভক্তদের ঈশ্বরীয় ব্যাখ্যা। সে সব আমাদের দরকার নেই। সারদামণির মন্ত্র শিষ্য স্বামী ভূমানন্দের বয়ানেও দেখছি—'সাধন-ভজনকালে লক্ষ্মীদিদির দেবদেবী দর্শন এবং ভাবসমাধি হোত।' (শ্রী শ্রী মায়ের জীবন-কথা, পৃষ্ঠা ২৩৪)। আমরা সিদ্ধান্তে আসতে পারি পিতার বংশের দিক থেকেই এদের এই আবিষ্ট হবার রোগটা আসছে।

এই ভাবাবিষ্ট হবার পিছনে দুটো কারণ থাকতে পারে। এক, বদমায়েশী। ভাবাবেশ হয়েছে প্রচার করে ভর-টর হয়ে বেশ দুপয়সা কামিয়ে নেওয়া। যেমনটি হয় স্বপ্নাদেশের ক্ষেত্রেও। দ্বিতীয়, হিষ্টিরিয়া, স্নায়বিক বিকার জনিত এক ভয়ংকর রোগ। সময় মতো চিকিৎসা হলে সেরে যেতে পারে অথবা নিয়ন্ত্রণে থাকতে পারে। কিন্তু ঠিকমতো চিকিৎসা না হলে অন্য সব রোগের মতো বেড়েই যাবে। রামকৃষ্ণদেবেরও ঠিক তাই হয়েছিল। ছয় সাত বছর বয়সে শম্ভু কুমোরকে গান শোনাতে গিয়ে যখন তার মধ্যে প্রথম হিষ্টিরিয়ার লক্ষণ দেখা দেয় তখন থেকেই চিকিৎসা তেমন হয় নি। পরবর্তীকালে দক্ষিণেশ্বরে এসে দীর্ঘ বারো বছর ধরে সাধনার নামে শরীরের উপর তিনি যে অত্যাচার করেন তার ক্ষত তাকে সারা জীবন বইতে হয়। শরীর এতই দুর্বল হয়ে পড়েছিল যে তিনি আর কোনদিন নিজের পায়ে ভর দিয়ে দু পা হাঁটতে পারতেন না। যেখানেই যেতেন ভক্তদের কাঁধে ভর দিয়েই যেতে হত।

সুদীর্ঘ বারো বছর সময়টা তো নেহাত কম নয়। এই বারো বছর তিনি পৃথিবীবাসীকে উদ্ধার করার জন্য তীব্র সাধনা কাকে বলে দেখিয়ে দিয়েছেন। 'এখনও দেখা দিলিনি' বলে কাঁদতে কাঁদতে মনের আবেগে রাস্তায় মুখ ঘষটাতেন। খাওয়া দাওয়ার কোন ঠিক নেই। কেউ জোর করে মুখে দুমুঠো ঢুকিয়ে দেয় তো কিছু পেটে গেল। বেশির ভাগ সময় তাও সম্ভব হত না। ঘুম তো একদমই হত না। নিজে মুখে বলেছেন 'বারো বছর চোখের পাতা এক হয়নি'। রোদ বৃষ্টি উপেক্ষা করে পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছেন "মা আমায় দেখা দে, মা আমায় দেখা দে" করে। এরপরে কোনো সুস্থ লোকও যদি সুস্থ থেকে যায় তো সপ্ত আশ্চর্যের মধ্যে ঠাঁই পাবে। আর রামকৃষ্ণদেব তো ছোট্টবেলা থেকেই হিষ্টিরিয়া রোগের শিকার। এই অত্যাচারের পর তার রোগ সাংঘাতিক রকম বেড়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। আমার জ্ঞান অনুযায়ী রোগটিকে হিস্টিরিয়া বলে উল্লেখ করলাম। বিশেষজ্ঞ কেউ অন্য কোন নামও বলতে পারেন।

পরবর্তীকালে আমরা দেখতে পাই তিনি বারে বারে ভাবসমাধি নামক হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত হয়ে পড়ছেন। 'যখন কম্প হইত, তখন পাঁচ জনে ধরিয়া রাখিতে পারিত না।' (জীবনবৃত্তান্ত—রামচন্দ্র দত্ত, চতুর্থ সংস্করণ, পৃ-২৬)। আবার এই রোগ একজনের দেখাদেখি আর একজনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ারও একটা প্রবণতা আছে। একে বলা যায় গণহিষ্টিরিয়া। এমনও দেখা গেছে কোন এক গ্রামে একটি মেয়ে হঠাৎ করেই নিজেকে মা কালী বলে ভাবতে শুরু করেছে। সেটা হজম হতে না হতেই দেখা গেল আর একটি মেয়ে একই রকম আচরণ করছে। তারপরে আবার আর একজন, আবারও আর একজন। হঠাৎ হলটা কি এদের। সবাই মিলে একসঙ্গে একই রকম ভাবছে কেন?

সমীক্ষক সমীক্ষা চালিয়ে দেখেছেন আসলে এরা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের বন্ধু। হয়তো সবাই মিলে ঠাকুর দেবতা নিয়ে গল্পগুজব করতে গিয়ে, অথবা মন্দিরে ঠাকুর দেখতে গিয়ে মা কালীর উদ্দীপনা লাভ করেছে। পরে এই নিয়ে সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে কল্পনার রাজ্যে প্রত্যেকেই এক একজন মা কালী হয়ে উঠেছে।

আর একটা উপমা দিচ্ছি। রামকৃষ্ণদেব ভক্ত সঙ্গে কীর্ত্তনে মেতে উঠেছেন। স্বয়ং রামকৃষ্ণ ভাবে ডগমগ, সমবেত প্রলয় নৃত্য চাপে মেদিনী কম্পমান। শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবের ঘোরে নেচে চলেছেন। ভাব দেখে নাচতে নাচতেই এক ভক্ত আর এক ভক্তের গায়ে ঢলে পড়ল। তার দেখাদেখি আর একজন। একজন হো হো করে হাসছে। কেউ বা ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে কাঁদছে। (রামকৃষ্ণ পুঁথি, পৃষ্ঠা-৩৪৯, জীবন বৃত্তান্ত পৃষ্ঠা-১৭৭-৭৮)। এই হল গণহিষ্টিরিয়া। তবে এই ভাব দীর্ঘস্থায়ী হয় না। সাময়িক উদ্দীপনা কেটে গেলে রোগের বিকারও কেটে যায়। কিন্তু রামকৃষ্ণদেব তো সাময়িক রোগী নন। তার রোগ এসেছে বংশগতির হাত ধরে। অর্থাৎ 'জীন' বাহিত। সে তো অত সহজে যাবার নয়। আর সেই কারণেই শ্রীরামকৃষ্ণ মহা ভাবসমাধির সাধক।

একমাত্র শিবনাথ শাস্ত্রী শ্রীরামকৃষ্ণের অসুখ ঠিকমতো চিনতে পেরেছিলেন। তিনি বলতেন "রামকৃষ্ণের ভাবসমাধি স্নায়ুবিকার প্রসূত রোগ বিশেষ"। (লীলাপ্রসঙ্গ, পৃষ্ঠা-৫৪৬)। ভক্ত মারফৎ এই কথা শ্রীরামকৃষ্ণের কানে এসে পৌঁছলে কথাটা তিনি মোটেই সহজ ভাবে নেননি। পরে শিবনাথ শাস্ত্রীর সাথে দেখা হলে তাকে বেশ দুকথা শুনিয়ে ছাড়েন।

দক্ষিণেশ্বরে যে ঘরে রামকৃষ্ণদেব থাকতেন ঘরটি ছিল স্যাঁতস্যাঁতে, অস্বাস্থ্যকর, হাওয়া বাতাস চলাচলের অনুপযুক্ত। সুস্থ লোকই বেশিদিন সেখানে থাকলে সমাধিগ্রস্ত হয়ে পড়বে। আর তিনি তো হাজারো রোগের রুগী। ভাবসমাধি তো তার হবেই।

শুনি সাধকেরা সমাধির মাধ্যমে ভগবানের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেন। কিন্তু যিনি নিজেই সাক্ষাৎ ভগবান, তিনি সমাধির মধ্যে কোন ভগবানের সাথে যুক্ত হতেন?

বিখ্যাত ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার রামকৃষ্ণদেবের ভাবাবেশ দেখে অবাক হয়েছিলেন। ডাক্তারবাবু রামকৃষ্ণদেবের সরলতায় মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং তার কাছে সুযোগ পেলেই আসা যাওয়া করতেন। এটা ধারণা করাই যায় তিনি রামকৃষ্ণদেবের ভাবাবেশই দেখেছিলেন, তার পারিবারিক ইতিহাস সেভাবে জানতেন না। যদি জানতেন এর পিসীর হয় শীতলার আবেশ, এনার হয় ভবতারিণীর আবেশ, বোনের হয় ভূতের আবেশ, ভাইঝির হয় কালীর আবেশ, বংশের পূর্বতন লোকেদের মধ্যে আরও কত আবেশ হত আমার জানা নেই, এত আবেশ দেখলে রামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধেও ডাক্তারবাবুর প্রেসক্রিপসন কিন্তু পাল্টে যেতে পারত। হয়তো সুচিকিৎসার পরামর্শই তিনি দিতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ এবং জাতপাত

শ্রীরামকৃষ্ণের বয়স এখন প্রায় নয় বছর। এই বয়সে ব্রাহ্মণ ছেলেদের উপনয়ন হয়ে থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণেরও হবে। কিন্তু বাধ সেধেছে রামকৃষ্ণদেবের একগুয়েমি। গ্রামে এত ব্রাহ্মণ পরিবার থাকতে তিনি তার ভিক্ষা মা করতে চান ধনী কামারনী নামে এক নীচ জাতের কামার মহিলাকে।

এই ধনী কামারনীকে একটু জানতে হবে। কামারপুকুরে ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিবেশি ছিল এই ধনী কামারনীর পরিবার। পরিবার বলতে শুধু স্বামী-স্ত্রী। তাদের কোন সন্তান ছিল না। পাশাপাশি বাস করার সুবাদে তাদের সম্পর্কটাও ভালই ছিল। চন্দ্রমণি দেবীর বন্ধুস্থানীয়াই তিনি ছিলেন। এমনকি রামকৃষ্ণের জন্মের সময় গ্রামের অন্যান্য বয়স্থা মহিলাদের সাথে ধনীও ধাইমার কাজ করেছিলেন। কোন সন্তান না থাকায় নিজে হাতে জন্ম দেওয়া ছোট্ট গদাধরকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করতেন। একটি ছোট্ট ছেলেকে যে-ই আন্তরিক ভাবে ভালবাসবে তার প্রতি ছেলেটির একটা দুর্বলতা আসবেই। ধনীর প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণেরও তাই ছিল। সে উঁচু জাত কি নীচু জাত এ প্রশ্ন ওই বয়সে আসার কথা নয়। তিনি ধরে বসলেন ধনী কামারনী ভিক্ষা মা না হলে পৈতে নেওয়াই হবে না।

তার দাদারা তাকে অনেক বোঝাল। তাদের পিতা শূদ্রের দান পর্যন্ত গ্রহণ করেন না এসব শুনিয়ে কোন লাভ হল না। তার যা বয়স তাতে কি শূদ্র আর কি বৈশ্য এসব বোঝার কথা তার নয়। তিনি শুধু জানেন ঐ মহিলা তাকে ভালবাসে। অতএব কি এক সবাই ভিক্ষা মার কথা বলছে ঐ মাতৃস্থানীয়া ভালবাসার মহিলাকেই তাই হতে হবে। এবং শেষ পর্যন্ত করলেনও তাই। কামার বৌ ব্রাহ্মণের ছেলের ভিক্ষা মা হবার গৌরব লাভ করলেন।

ব্যাস্, এ পর্যন্ত সকলেরই জানা ঘটনা। কিন্তু এর পরও কিছু আছে, যা হয়তো তেমনভাবে সকলের জন্য নয়। যে কারণে ধনী সম্পর্কে জ্ঞান আমাদের এখানেই শেষ। এটাই নিয়ম। কিছুটা জানো, কিছুটা জেনো না। এ ভাবেই অনেককিছু যুগ যুগ ধরে এগিয়ে চলেছে। আসুন সেই না-জানা পরবর্তী অংশটুকু জানার চেষ্টা করি। তবে কথামৃতেরই অংশ যখন অজানাই বা বলি কেন। অনেকেরই জানা, তবু অজানা।

প্রচারের একটা নমুনা শুনবেন? যত্রতত্র একটা কথা শুনতে পাই, 'ভারতবর্ষকে জানতে হলে বিবেকানন্দকে জান,........'। তলায় লেখা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কোন

নোট বইতে অথবা যাকে বলা হয়েছিল সেই রমাঁ রলাঁর কোন লেখায় এর কোন উল্লেখ নেই। 'এক প্রবীণ সন্ন্যাসী স্বামী অশোকানন্দ রলাঁর কাছে এই কথা শুনেছেন' এর উপর নির্ভর করেই রামকৃষ্ণ মিশন রবীন্দ্রনাথকে ব্যবহার করে চলেছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ একথা বলতে পারেন না। কারণ 'বিবেকানন্দ ও তার চেলাদের' সম্বন্ধে তার অভিমত সম্পূর্ণ অন্য রকম। তার প্রমাণও অন্যত্র দেব।

'শোনা কথা' মানেই যে উড়িয়ে দিতে হবে তা মোটেই বলছি না। তবে তার একটা সম্ভাব্যতা থাকতে হবে তো! ধরুন আমি বললাম 'শচীন তেণ্ডুলকর আমাকে বলেছে ক্রিকেট একটি অতি বোগাস খেলা।' শচীন আমার পরিচিত হলেও এ কথা আপনি মানবেন? মানাটা উচিত নয়।

ভুল বোঝানোর জন্য আমিও একই ছল করতে পারি। তাই বলে রাখছি যে অংশটুকু লেখার স্বার্থে ব্যবহার করব মূল গ্রন্থে আপনি শুধু সেই অংশটুকুই দেখবেন না। তার দু-দশ পাতা আগে পরে অবধি যাচাই করে নেবেন। বলা তো যায় না, ঠগ ধার্মিকের দেশ, যে যাকে পারে ঠকায়।

ছোট্ট ছেলে গদাধর, সে আর জাতপাতের বদমায়েসী কি বোঝে। না বুঝেই কামার বউকে ভিক্ষা মা বানিয়ে ফেলেছে। কিন্তু পরবর্তী কালে যখন রামকৃষ্ণদেবের জ্ঞানগম্যি হয়েছে তখন তিনি কি বলছেন সেটাই শুনতে হবে।

একদিন ভক্ত সঙ্গে খাওয়া দাওয়া প্রসঙ্গ চলছে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন—"আমার কামার বাড়ির দাল খেতে ইচ্ছে ছিল ; ছেলেবেলা থেকে কামাররা বল্‌তো বামুনেরা কি রাঁধতে জানে? তাই (ধনীর বাড়ি) খেলুম, কিন্তু, কামারে কামারে গন্ধ"। (সকলের হাস্য)। (কথামৃত—শ্রীম, দ্বিতীয় ভাগ, একাদশ সংস্করণ - ১৩৮৮, পৃ - ১৩২)।

ধনীর প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তির ঘাটতি তার ছিল না। মাঝখানে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে ঐ জাতপাতের আচার। ছোট্টবেলা থেকে যার কোলে পিঠে বড় হয়েছেন, প্রাপ্ত বয়সে ব্রাহ্মণত্বের অভিমানে তার খাবারেই 'কামারে কামারে গন্ধ' পাচ্ছেন। আসলে তিনি ছোট জাতের হাতে খাওয়া ব্যাপারটাকেই মেনে নিতে পারেননি। তার ভক্তমণ্ডলীও একথা শুনে হেসে ফুটিফাটা। (নিশ্চয়ই শুধু ব্রাহ্মণরাই হবে)। পাঠকের কাছে জিজ্ঞাসা আমরা তাহলে কোন্ সময়টাকে ধরব, শৈশবের 'ভিক্ষা মা', নাকি প্রাপ্ত বয়সের 'কামারে কামারে গন্ধ'।

জমিদার মণি মল্লিকের বাড়ি খেতে গিয়েও তার অভিমত একই রকম—'মণি মল্লিকের (বরানগর) বাগানে ব্যঞ্জন রান্না খেলুম, কিন্তু কেমন একটা ঘেন্না হল।" (ঐ, পৃ-১৩২।

দক্ষিণেশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠা হবে। কাতারে কাতারে ব্রাহ্মণের মধ্যে রামকৃষ্ণদেবও আছেন। সকলে খাওয়া দাওয়া করছেন। এমনকি দাদা রামকুমার পর্যন্ত। কিন্তু রামকৃষ্ণদেব সে খাবার স্পর্শ করলেন না। বাইরে থেকে চিড়ে মুড়কি কিনে তাই খেয়ে ঝামাপুকুর নিবাসে চলে এলেন। রাণী রাসমণি নীচজাতীয়া মহিলা। তার মন্দিরের অন্ন গ্রহণ করে জাত খোয়াতে রাজী নন ভগবান রামকৃষ্ণদেব।

তিনি ঝামাপুকুরেই রয়ে গেলেন দাদার অপেক্ষায়। কিন্তু দাদা যে ফেরেই না। রামকুমার বুঝে গেছেন তার যা আর্থিক অবস্থা এই মন্দির ছেড়ে চলে আসা নেহাত মূর্খামো ছাড়া কিছুই নয়। তিনি ফিরলেন না। এইভাবে পুরো সপ্তাহ কেটে গেল। রামকৃষ্ণদেব আর অপেক্ষা করতে পারলেন না। দক্ষিণেশ্বরে এসে হাজির হলেন। এবং অবশ্যম্ভাবী দাদার সাথে বাতবিতণ্ডা শুরু হল। পৈতে নেবার সময় ধনীকে ভিক্ষা মা হতে বলায় রামকুমার যুক্তি দেখিয়েছিলেন 'তাদের পিতা কখনও নীচ জাতের সাথে গা মাখামাখি করেন নি। রামকৃষ্ণও যেন ওপথে পা না দেয়।' আজ শ্রীরামকৃষ্ণও দাদার কাছে একই যুক্তি তুলে ধরলেন।

যুক্তি যেমনই হোক না কেন, এ যে রামকুমারের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই। যুক্তি তক্কো কি পেট ভরাবে! শেষ পর্যন্ত 'ধর্ম পত্রানুষ্ঠান' রূপ সরল উপায় অবলম্বন করা হল। এ এক অনেকটা হেড-টেল করার মত ব্যাপার। টসে রামকুমারের জিত হল। জানিনা কয়েনটা 'শোলে'র কয়েন ছিল কিনা। কারণ রামকুমারের জেতাটা ছিল ভাইয়ের জেদ বজায় রাখার থেকে অনেক বেশি জরুরি।

রামকৃষ্ণদেব বুঝে গেছেন রামকুমার আর ফিরছেন না। ঝামাপুকুরের টোলটিও গেল। এবার তিনি যাবেন কোথায়। সে রাত দক্ষিণেশ্বরেই থেকে গেলেন। রামকুমারও তাকে পথে আনার একটু সময় পেয়ে গেলেন। "দেবালয়, গঙ্গা জলে রান্না, তাহার উপরে শ্রী শ্রী জগদম্বাকে নিবেদন করা হইয়াছে, এ ভোজনে কোন দোষ হইবে না"। কিন্তু রামকৃষ্ণদেব মানছেন না। এসবের মধ্যে ব্রাহ্মণত্বের সমূহ ক্ষতি, এ তিনি দিব্য চক্ষে দেখতে পাচ্ছেন।

এবার রামকুমার তার শেষ অস্ত্রটি নিক্ষেপ করছেন। এ অস্ত্র যদি ব্যর্থ হয় শ্রীরামকৃষ্ণকে নিশ্চিত কামারপুকুরে ফিরে যেতে হবে। কোথায় পড়ে থাকবে দক্ষিণেশ্বর মন্দির আর কোথায়ই বা অবতার রামকৃষ্ণদেব। রামকুমার বললেন "তবে সিধা লইয়া পঞ্চবটী তলে গঙ্গা গর্ভে স্বহস্তে রন্ধন করিয়া ভোজন কর ; গঙ্গা গর্ভে অবস্থিত সকল বস্তুই পবিত্র, একথা মান তো?"

উপরের সমস্ত বিবরণই লীলাপ্রসঙ্গ ১৯০-৯১-৯২ পাতা থেকে নেওয়া। পড়ে মিলিয়ে নিতে পারেন।

যাক, শেষ পর্যন্ত রামকৃষ্ণদেব নিমরাজী হলেন। এছাড়া যে তার অন্য কোন উপায় নেই এটুকু বোঝার মত বুদ্ধি তার ছিল। নিজের হাতে, গঙ্গা জলে পাক করা রান্না খেয়েই তিনি রয়ে গেলেন। এই আলোচনা থেকে এটা পরিষ্কার ভগবানের অংশে স্বরূপ অবতার রামকৃষ্ণদেব নীচ জাতের অন্ন গ্রহণ করেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যান্য জীবনী গ্রন্থেও একই কাহিনী নানা ভাষায় পাওয়া যাবে। তবে কোন কোন জীবনীকার এর সাথে কিছু অদ্ভুত আত্মসমীক্ষা যোগ করে দিয়েছেন। সেগুলো একটু জানা দরকার। রামচন্দ্র দত্ত তার 'পরমহংসদেবের জীবন বৃত্তান্ত' গ্রন্থে যোগ করেছেন "তিনি যে কি জন্য মন্দিরের সামগ্রী স্পর্শ করেন নাই, আমরা তাহার কোন কারণ প্রদর্শন করিতে পারিলাম না।" (পৃষ্ঠা-৬)। রামচন্দ্র দত্ত একজন ডাক্তার, রসায়নবিদ্, এমনকি 'কুর্চিসিন' নামক একটি ওষুধের আবিষ্কারক। তিনিও বুঝে উঠতে পারছেন না কেন রামকৃষ্ণদেব মন্দিরের প্রসাদ গ্রহণ করছেন না। আসলে 'গুরুদেব নীচ জাতের অন্ন স্পর্শ করেন না' এই বোমাটি বুকের উপর ফেটে যায় এই ভয়। এমন কি রাম দত্তের বাড়িতে একবার অন্ন গ্রহণের প্রস্তাব রামকৃষ্ণদেব স্বযত্নে প্রত্যাখ্যান করেন। বলেন 'তুমি তো ব্রাহ্মণ নও'। রামচন্দ্র দত্ত ছিলেন সম্পর্কে স্বামীজীর দাদু। যদিও বয়সের তফাৎ সামান্য হওয়ায় রামদাদা নামেই তিনি খ্যাত ছিলেন। সম্ভবতঃ তিনিই ছিলেন রামকৃষ্ণদেবের প্রথম শিষ্য এবং প্রচারক।

'শ্রীরামকৃষ্ণ লীলামৃত' গ্রন্থে বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল বলেছেন 'মন্দিরের প্রসাদ গ্রহণ না করে তিনি আমাদের লোভ সংবরণ শিক্ষা দিয়ে গেছেন।' 'নীচু জাতের অন্ন ছুঁই না' এর মধ্যে লোভ সংবরণের কি শিক্ষা আছে তা ঠিক বুঝতে পারলাম না।

আবার আমরা লীলাপ্রসঙ্গে ফিরে যাই। রামকৃষ্ণদেব এখন দক্ষিণেশ্বরে রয়ে গেছেন। নিজে হাতে গঙ্গা জলে রান্না করে খাচ্ছেন। রাতে কিন্তু তিনি আর সকলের সাথে মন্দিরের প্রসাদী লুচিই খান। ভাগ্নে হৃদয়রাম বলছেন, "কত দিন দেখিয়াছি ঐরূপে লুচি খাইতে খাইতে তাহার চক্ষে জল আসিয়াছে এবং আক্ষেপ করিয়া শ্রী শ্রী জগন্মাতাকে বলিয়াছেন, 'মা, আমাকে কৈবর্তের অন্ন খাওয়ালি'!" (পৃষ্ঠা-১৯৫)।

এখানে ব্রাহ্মণদের খাওয়া দাওয়ার সংস্কার নিয়ে একটু আলোচনা করা যায়। অন্ন ছাড়া অন্য খাদ্য সামগ্রী তারা বোস-মিত্তিরের বাড়িতে খেতে পারেন। কিন্তু অন্ন চলে না। চা-বিস্কুটটাও খুব উদার মনে যে খান না তার প্রমাণ রামকৃষ্ণদেব লুচি খেয়ে কেঁদে দেখিয়েছেন। তবে যুগ পাল্টাচ্ছে এখন কিছু কিছু তাদের মেনে নিতেই হচ্ছে। এখনও ভাত খাবার নিমন্ত্রণ করলে অনেক ব্রাহ্মণই যারা আমার আপনার বাড়িতে মুড়ি তেলেভাজাটা খায় দেখবেন কোন একটা অজুহাত দিয়ে কেটে পড়েছে। হয়তো সেদিন সারাদিন বাড়ি ছাড়া হয়ে আপনাকে বুঝিয়ে দেবে সত্যিই সে কোন অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিল।

আমার পরিচিত এক ব্রাহ্মণ পরিবার আছে যাদের ঘরে চার পাঁচ জন বয়স্ক পুরুষ থাকলেও কোন মহিলা নেই। রান্নাবান্নার জন্য একজন রাঁধুনি আছে যে ব্রাহ্মণ নয়। সব কিছুই সে রেঁধে দেয়, ভাতটি ছাড়া। ভাত তারা হাত পুড়িয়ে কেউ একজন ফুটিয়ে নেয়। ব্রাহ্মণ তো, নীচু জাতের ছোঁয়া ভাতটি চলবে না। এখানেই ব্রাহ্মণ সংস্কার।

শ্রীরামকৃষ্ণকেও দেখি বহু ভক্তের বাড়িতেই প্রসাদ গ্রহণ করছেন। কিন্তু কারও বাড়িতেই অন্ন গ্রহণ করেন না। তবে দু-একটি ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রমও আছে। যেমন স্বামীজীর ছোঁয়া তিনি খেতেন। স্বামীজী আপত্তি করায় তিনি বলেন 'তুই শুধ সত্ত্ব আধার, তোর ছোঁয়ায় দোষ নেই।' আসলে বিবেকানন্দকে তিনি একটু অন্য চোখে দেখতেন কিনা তাই তার ছোঁয়াটা মেনে নিতে পেরেছিলেন।

বলরাম বসু, যার বাড়িতে রামকৃষ্ণদেব শতাধিকবার অন্ন গ্রহণ করেছেন। 'বাস্তবিক ঠাকুরের এত ভক্তের ভিতর বলরাম বাবুর অন্নই তাহাকে বিশেষ প্রীতির সহিত ভোজন করিতে দেখিয়াছি। কলকাতায় যেদিন ঠাকুর প্রাতে আসিতেন, সেদিন মধ্যাহ্ন ভোজন বলরামের বাটীতেই হইত। ব্রাহ্মণ ভক্তদিগের বাটী ব্যতীত অপর কাহারও বাটিতে কোনদিন অন্ন গ্রহণ করিয়াছেন কিনা সন্দেহ—তবে অবশ্য নারায়ণ বা বিগ্রহাদির প্রসাদ হইলে অন্য কথা।' (লীলাপ্রসঙ্গ, পৃষ্ঠা-৬৩৯)। বলতেন 'বলরামের ঠাকুরের নিত্য ভোগ আছে। ওর অন্ন পবিত্র।' যদিও ভামিনী নাম্নী এক ব্রাহ্মণ মহিলা অন্ন প্রস্তুত করতেন, তবুও শূদ্রের অন্নই গ্রহণ করা হল। এ রকম দু-একটি ক্ষেত্র তিনি মেনে নিয়েছিলেন।

একদিন কথা প্রসঙ্গে বলছেন, "সে অবস্থা এখন নাই। এখন ব্রাহ্মণ হবে, আচারী হবে, ঠাকুরের ভোগ হবে, তবে ভাত খাব।" (কথামৃত, দ্বিতীয় ভাগ, পৃ-১১৩)। এখানে এই যে রামকৃষ্ণদেব বলছেন "সে অবস্থা এখন নাই" এই কথাটা একটু খুলে আলোচনার দরকার আছে। রামকৃষ্ণদেব যখন তীব্র সাধনায় মত্ত হয়ে পড়েছিলেন সেই সময় সাধনার খাতিরে অনেক বিকৃত ক্রিয়া কলাপ তিনি করে ফেলেছেন। যেমন নীচু জাতের ছোঁয়া তিনি খেয়ে ফেলেছেন, এর ওর হুঁকোয় মুখ দিয়ে ফেলেছেন, পাঁচজনের খাওয়া এঁটো খাবার খেয়ে ফেলেছেন, অন্যের খাওয়া পাতা মাথায় নিয়ে ফেলে এসেছেন, তিন হাত লম্বা চুল দিয়ে মেথরের পায়খানা পরিষ্কার করেছেন, এরকম অনেক কিছু।

এসব দেখে মনে হতে পারে তিনি বুঝি জাতপাত প্রসঙ্গে একেবারেই উদাসীন। ঘটনা কিন্তু আদৌ তা নয়। একটু খ্যাপাটে প্রকৃতির তো তিনি বরাবরই। আর সাধু সন্ন্যাসীরা জানে এই সব বিকৃত ক্রিয়াকলাপ সাধনারই অঙ্গ। সিদ্ধ হতে গেলে এসবের মধ্যে দিয়েই যেতে হবে। এসব ক্রিয়া কাণ্ড সাধু সন্তের কাছে সিদ্ধ হবার মাধ্যমিক পরীক্ষা। পাশ করলে আরও উঁচু ক্লাসে পড়া যাবে। নচেৎ ফেল। রামকৃষ্ণদেব সেই পরীক্ষাতেই বসেছিলেন।

সেই সঙ্গে না খেয়ে সাঙঘাতিক শারীরিক কৃচ্ছ্র সাধনের ফলে তিনি প্রায় সব সময়ই অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় থাকতেন। যেন মদ না খেয়েই সারাদিন মাতাল হয়ে রয়েছেন। এখন কিন্তু আর সে অবস্থা নেই। এখন তার সাধনার তোড় কমেছে, খাওয়া পরা ঠিকঠাক চলছে, সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় ফিরে এসেছেন। অতএব এখন তিনি খাঁটি ব্রাহ্মণ। এখন ব্রাহ্মণ হবে, আচারী হবে, ঠাকুরের ভোগ হবে, তবে তিনি অন্ন গ্রহণ করবেন। এখন আর নীচু জাতের ছোঁয়াছুঁয়ির মধ্যে তিনি নেই।

শিশু কেমন সরল হয় বলতে গিয়ে বলছেন, 'মা বলে দিয়েছেন "ও তোর দাদা হয়" সে ছুতোর হলেও এক পাতে বসে ভাত খাবে। বালকের ঘৃণা নাই, শুচি-অশুচি বোধ নাই। ইত্যাদি'। (কথামৃত, শ্রী ম, প্রথম ভাগ, সপ্তম পরিচ্ছেদ, পৃ - ৯৭)। ছুতোর এখানে একজন অচ্ছুৎ প্রতিনিধি। তার সাথে একাসনে ভাত খাওয়া, সে এক গুরুতর অপরাধ।

মন্দিরে তিনি প্রথম দিকে নিজেই নিজের অন্ন প্রস্তুত করে নিতেন। কিন্তু যখন সাধন ভজনের তোড় বাড়তে লাগল ভক্তদের ভীড়ও বাড়তে লাগল, তখন থেকে আর নিজে রান্না করা সম্ভব হত না। মন্দিরের প্রসাদী অন্নই খেতে হত। যা তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মেনে নিতে পারেননি। আজীবন আক্ষেপ করে গেছেন। (শ্রীরামকৃষ্ণ সারদামৃত—স্বামী নির্লেপানন্দ, পৃষ্ঠা-৩৬)। ঘুমের মধ্যে কোনদিন বা বলে উঠতেন, "আর খাব না, আর খাব না।" (শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ লীলা তত্ত্ব—শ্রী শশীভূষণ সামন্ত, পৃষ্ঠা-২০)। তিনি ঘুমের মধ্যে কৈবর্তের অন্ন গ্রহণের দুঃস্বপ্ন দেখতেন।

মাঝে মাঝে আবার এমনও করতেন, 'ঠাকুরের খাবার তৈরি। হঠাৎ বাহিরে গিয়ে দক্ষিণেশ্বরে নবকুমার চাটুজ্যের বাড়িতে খেয়ে পান চিবুতে চিবুতে এলেন। হৃদে এদিকে তাকে না দেখে ডাকাডাকি করছে। উনি এসে বল্লেন নবকুমার চাটুজ্যের বাড়িতে খেয়ে এলুম। হৃদে দুঃখ করে বল্লে—কি দুর্ভাগ্য আমার। এমন চর্ব-চূষ্য প্রসাদ তৈরি, কোথা খেতে গেলে মামা? ঠাকুর বল্লেন—যখন পরমহংস অবস্থা হয় তখন এমনি হয়ে থাকে, কোথায় খাবে তার কিছু ঠিক ঠিকানা থাকে না।' (ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ—ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা-৫০৭)।

এখানে ঠাকুর বলছেন উচ্চ অবস্থায় কোন কিছুর ঠিক থাকে না। আমার কিন্তু সে রকম মনে হচ্ছে না। শূদ্রের অন্ন এড়িয়ে যদি একদিনের জন্যেও ব্রাহ্মণের ঘরে খাওয়া যায়, তাতেও সে দিনটার 'অন্ন দোষ' কাটানো গেল, এই আর কি।

বৃন্দাবনে ভ্রমণ প্রসঙ্গে রামকৃষ্ণদেব বলছেন, "বৃন্দাবনে গিয়ে আর আমার ফিরে আসতে ইচ্ছা হল না। গঙ্গা মার কাছে থাকবার কথা হল। সব ঠিকঠাক। এদিকে আমার বিছানা হবে, ওদিকে গঙ্গা মার বিছানা হবে, আর কলকাতায় যাব না, কৈবর্তের ভাত

কতদিন খাব?" (কথামৃত, দ্বিতীয় ভাগ, পৃ - ১৪৫)। এরপরে আছে মাতৃভক্তি, মায়ের টানে কলকাতায় ফিরে আসা।

কিন্তু ফিরলেই তো হবে না, আমরা তার মনের কথাটা শুনে নিয়েছি। কে এক 'গঙ্গা মা', যাকে তিনি চিনেছেন দুদিন আগে, মথুরবাবুর এতদিনের আতিথেয়তা জাতপাতের জোয়ারে মুহূর্তে ভেসে যাচ্ছে। তিনি বৃন্দাবনেই থেকে যাবেন। দক্ষিণেশ্বরের নিরুৎবেগ জীবন, খাওয়া পরার নিশ্চিন্তি, যখন যা বলছেন পালন করার জন্য মথুরবাবু এক পায়ে খাড়া, সে সব ফেলে দিয়ে এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যেতেও তিনি রাজী। নীচু জাত তার চোখে এমনই ছিল। পুঁথিকার অক্ষয় সেনের একটি বর্ণনা—

সকলে রাখিয়া অগ্রে করিতে ভোজন।
শ্রীপ্রভু দেবের নহে কোন কালে মন।।
সেই হেতু কাছে দূরে লয়ে ভক্তগণে।
প্রভুদেব রামকৃষ্ণ বসিলা ভোজনে।।
একত্তরে সবে কিন্তু স্বতন্তর স্থান।
বর্ণভেদ রক্ষা করা প্রভুর বিধান।। (পৃষ্ঠা-৫২২)

ভক্ত শিষ্যদের নিয়ে খেতে বসেছেন। কিন্তু ভক্ত হও আর শিষ্য হও জাতপাতের কথাটা তার ঠিক খেয়াল আছে। তাই 'একত্তরে সবে কিন্তু স্বতন্তর স্থান', একসাথেই বসেছেন, তবু একসাথে নয়। ব্রাহ্মণ একদিকে, অন্যান্য জাত তার থেকে একটু তফাতে, নিজে আর একটু তফাতে, এইভাবে আর কি। 'বর্ণভেদ রক্ষা করা প্রভুর বিধান'। বর্ণভেদ রক্ষায় তিনি সর্বদা আপোষহীন।

পবিত্র ব্রাহ্মণ বিনা রন্ধন না হয়।
অন্যে পরশিলে অন্ন ঘৃণা অতিশয়।।
ভক্ত যদি অন্য জাতি তথাপি না চলে।
বিনা যজ্ঞ সূত্রধারী ব্রাহ্মণের ছেলে।।
ভক্তদের মধ্যে মাত্র কায়স্থ-নন্দন।
নরেন্দ্র ও বাবুরাম এই দুই-জন।।
ছুঁইতে ভোজন থাল ছিলা অধিকারী।
কারণ ইঁহার কথা বলিতে না পারি।। (পৃষ্ঠা-৪৮৮)

পবিত্র ব্রাহ্মণকে রাঁধতে হবে। পৈতেহীন কোন ব্যক্তির সে খাদ্য স্পর্শ করা চলবে না, তা সে ভক্ত শিষ্য যেই হও। ব্যতিক্রম শুধু নরেন্দ্র। নরেন্দ্রের কথা আগে বলেছি। বাবুরাম, মানে স্বামী প্রেমানন্দেরও একটু ছোঁয়াছুঁয়ির অধিকার ছিল। কারণ রামকৃষ্ণদেব বলতেন 'বাবুরামের হাড় পর্যন্ত শুদ্ধ'। তা সেই শুদ্ধ হাড়ের ছোঁয়া তিনি মেনে নিয়েছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব সমাধি হয়েছে। সারাদিন ভাবের ঘোরে পড়ে আছেন। সন্ধ্যার দিকে একটু স্বাভাবিক হয়ে এলে অপেক্ষমান ভক্তদের মৃদুস্বরে বলছেন "দেবগণ-সমাগমে সারাদিন তাদের নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম, তাই তোদের সাথে কথা বলার সময় পাই নাই। আজ ভাতের পায়স খাব।"

ভক্তরা আনন্দিত। গুরুদেব কিছু খেতে পারছেন না। গলায় ভীষণ ব্যাথা, ক্যান্সার ধরা পড়েছে। বিছানায় উঠে বসতেও পারছেন না। কয়েকদিন ধরেই এই অবস্থা চলছে। পায়স নিয়ে আসা হয়েছে। ভক্তরা কোনক্রমে তাকে তুলে বসিয়েছেন। এরপরের অংশ শ্রীরামকৃষ্ণ লীলামৃত গ্রন্থে বৈকুন্ঠনাথ সান্যাল ২২৫ পাতায় যে বর্ণনা দিয়েছেন হুবহু তা তুলে দিচ্ছি—

শূদ্রকে শয্যা ত্যাগে অনুজ্ঞা

'পায়স গ্রহণোদ্যত, এমতকালে দেখেন লাটু ও গোপাল দাদা (অব্রাম্মণ) শয্যা ধারণ করিয়া আছেন। কহেন "ওদের বিছানা ছেড়ে দিতে বল।" "কেন করিবে!" নরেন্দ্রের প্রশ্নে বলেন—"ওরে! ভাত যে রে।" "আপনি তো বিধি-নিষেধের পার, তথাপি এ আদেশ কেন?" নরেন্দ্রনাথ নিবেদন করিলে ঠাকুর বলেন—"ওরে ব্রাম্মণ-শরীর যে রে? তাই ব্রাম্মণ সংস্কার যাবার নয়।" অগত্যা লাটু ও গোপাল দাদাকে শয্যা ছাড়িতে বলা হইল।'

অন্ন-বিচার

'যদিও বিশেষ কৃপা প্রাপ্ত অনেক ভক্ত ছিলেন, তথাপি ঠাকুর সকলের আলয় অন্ন গ্রহণ করেন নাই। বলিতেন "লুচি-তরকারী খেতে পারা যায়, কিন্তু অন্ন নহে। কলিতে অন্নগত পাপই মহাপাপ।" কিন্তু দেখিয়াছি, পরমভক্ত বলরাম বসুর ভবনে জগন্নাথ দেবের অন্ন-ভোগ গ্রহণ করিতেন, বলিতেন, 'বৈষ্ণব বলে কুল প্রথায় উহারা জগন্নাথ স্বামীকে অন্ন ভোগ দেয়, তাই উহা শুধান্ন।"

বলরাম মন্দিরে অন্ন গ্রহণ করেন জানিয়া, কোন ভক্ত তাদের শালগ্রাম শিলার অন্ন ভোগ দিয়া তাহাকে সেবা করিবার প্রস্তাব করিলে ঠাকুর কহেন—"তোমার তো কুল প্রথা নয়, কেবল আমাকে ভাত খাওয়াবার অভিলাষ, আবার তোমার দেখাদেখি অন্য ভক্তরাও এইরূপ করবে। তাহলে আমি সকল শূদ্র ভক্ত বাড়িতেই ভাত খেয়ে বেড়াই"।' এই হল লীলামৃতের বর্ণনা। এই বর্ণনাটি 'প্রেমানন্দ—ওঁকারেশ্বরানন্দ, দ্বিতীয় ভাগ, প্রথম সংস্করণ ১৩৫৩ পৃ. ৯৯-১০১' থেকেও পাওয়া যাবে। সেখানে আরও দেখা যাবে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর বীর ভক্ত গিরীশ ঘোষের বাড়িতে অন্ন গ্রহণেও অস্বীকার করেন। তাকে

পরিষ্কার বলে দেন, তুমি তো ব্রাহ্মণ নও, আর তোমার বাড়িতে কোন ঠাকুরের অন্নভোগও নেই। অতএব তোমার ভাতের থালায় আমিও নেই।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ বলেন, 'শ্রী রামকৃষ্ণ সকল অহং ভাব ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি "আমি ব্রাহ্মণ" এই বোধ তাহার ছিল।'

রামকৃষ্ণদেব বলতেন, "ভগবানকে দেখার পর আর জাতির অভিমান থাকে না, তখন শিশুর মতো অবস্থা হয়। শিশুর যেমন জাতের অভিমান নাই, তত্ত্ব দ্রষ্টারও তেমনি জাতির অভিমান লোপ পায়।" (ভক্ত মনোমোহন—উদ্বোধন, পৃ - ৪৫)। আমরা দেখছি মৃত্যুর পূর্বেও ঠাকুরের জাতের অভিমান অতি প্রবল। তাহলে ঠাকুর ঠিক কোন্ সময় তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেছিলেন, মৃত্যুর আগে না পরে।

ব্রাহ্মণদের নীচু জাতের ছোঁয়া না খাওয়া প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ 'মদীয় আচার্যদেব' প্রবন্ধে তার মত ব্যক্ত করেছেন এই ভাবে, যদিও সব কুসংস্কারের মত এক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা তিনি দেন নি, এটি খাঁটি পৌরাণিক ব্যাখ্যা —'তাহারা বরং উপবাস করিয়া থাকিবে, তথাপি তাহাদের স্বজাতির ক্ষুদ্র গণ্ডীর বহির্ভূত কোন ব্যক্তির হাতে খাইবে না। এইরূপ স্বাতন্ত্র্য-প্রিয় হইলেও তাহাদের ঐকান্তিকতা ও অসাধারণ নিষ্ঠা আছে। নিষ্ঠাবান হিন্দুদের ভিতর অনেক সময় এইরূপ প্রবল বিশ্বাস ও ধর্মভাব দেখা যায়, কারণ সত্যের প্রতি গভীর বিশ্বাস হইতেই তাহাদের নিষ্ঠা আসিয়াছে।' (স্বামীজীর বাণী ও রচনা, অষ্টম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৮৪)। নিজে শূদ্র হয়েও বীর কেশরী স্বামী বিবেকানন্দ দেখছি প্রথাটিকে দিব্যি হজম করে নিয়েছেন।

'শ্রী শ্রী ঠাকুর ব্রাহ্মণেতর বর্ণের হাতে ভাতটা মাত্র সচরাচর খাইতেন না। কিন্তু কখনও কখনও এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়াছেন। যেমন পূজ্যপাদ স্বামীজী রন্ধন করিলেও সেই অন্ন খাইয়াছেন এবং 'সর্ব্বং ব্রহ্ম' এই কথা প্রত্যক্ষ করিয়া কাঙ্গালীদের উচ্ছিষ্ট খাইয়া পবিত্র জ্ঞানে মস্তকে হস্ত স্পর্শ করিয়াছেন।' (স্বামী সারদানন্দের 'পত্রমালা', দ্বিতীয় সংস্করণ, পত্র সংখ্যা 'তিন', পৃষ্ঠা-১৪৩)।

স্বামী সারদানন্দের এই পত্রাংশটুকু থেকে বেশ বোঝা যাচ্ছে ব্রাহ্মণ না হলে অন্ন তিনি গ্রহণ করবেন না। পত্রের শেষের অংশে দেখছি কাঙ্গালীদের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করে তিনি মাথায় স্পর্শ করছেন। এই পরের অংশটুকু সকলের জানা, প্রথম অংশটা নয়। ভক্ত লোক, তীব্র সাধনা নিয়ে পড়ে আছেন, আর এই সব বিকৃত অনুষ্ঠান সাধনারই অঙ্গ বিশেষ। তিনি সেই অনুষ্ঠান পালন করেছেন মাত্র। এর মধ্যে জাতপাতের লড়াই একটুও নেই। যেমন নেই ধনী কামারনীকে ভিক্ষা মা রূপে গ্রহণ করায়।

আর একটি ঘটনার উল্লেখ করছি। 'রামকৃষ্ণের মনে এমন প্রবল ভাব আসিল যে, তিনি তৎক্ষণাৎ গঙ্গাতীরে যে স্থানে সকলে মল মূত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া থাকে, সেই

স্থানে উপস্থিত হইয়া তথা হইতে সদ্য তপ্ত মল মৃত্তিকাবৎ ব্যবহার করিলেন। এমন কি, জিহ্বা দ্বারা উহা স্পর্শ করিতেও তাহার ঘৃণার উদ্রেক হয় নাই। তাহার মুখে শুনিয়াছি, যখন তিনি বিষ্ঠায় জিহ্বা সংলগ্ন করিয়াছিলেন, তখন কোন প্রকার দুর্গন্ধ অনুভব করেন নাই।' (জীবন বৃত্তান্ত—শ্রীরামচন্দ্র দত্ত, পৃষ্ঠা-১৯)। এ সবই সাধনা নামক পরীক্ষার অঙ্গ। তিনি নানা সময় সেইসব পরীক্ষায় বসেছেন মাত্র। কুসংস্কার বশে ভক্ত লোকেরা যে কোন বিকৃত কাজ করতে পারে। (নর বলি পর্যন্ত)। প্রতিদিন খবর কাগজের দিকে তাকালে এমন ঘটনা চোখেও পড়ে।

শাস্ত্র বলছেন 'শূদ্র যদি বেদ শোনে তার কানে তপ্ত সীসা ঢেলে দিতে হবে। যদি তখনও কিছু মনে থাকে তাকে কেটে ফেলতে হবে। শূদ্র যদি ব্রাহ্মণকে 'ওহে ব্রাহ্মণ' বলে ডাকে, তার জিব কেটে দিতে হবে।' (মনু সংহিতা)। স্মৃতি শাস্ত্র বলছেন 'শূদ্রের প্রতি নিষ্ঠুর হবার দরকার নেই কিন্তু তাকে বেদাদি শিক্ষা দেবে না।'

শাস্ত্রকাররা প্রায় সকলেই 'দ্বিজাতি' অর্থাৎ উচ্চবর্ণ। সমাজে তাদের আধিপত্য বজায় রাখতে বেদকে তারা তাদের কুক্ষিগত করে রাখতে চান। সেই কারণেই 'কানে গরম সীসে', 'জিব কেটে' দেবার বিধান। আজ যুগ বদলেছে। তবুও বদলায়নি অনেক কিছু। অনেকেই চান না ব্রাহ্মণ্যবাদ কোনো ভাবে পরিবর্তিত হোক। 'শ্রীরামকৃষ্ণ লীলামৃত' গ্রন্থের ১৩৭ পাতার কিছু অংশ এই সূত্রে তুলে দিচ্ছি—

নাম-নামী অভেদ

'ভক্ত ভগবানের জাতি হইলেও, কি জানি, কি কারণে, অথবা বৈদিক বর্ণাশ্রম রক্ষণে রামকৃষ্ণদেব বলিতেন, "জন্মগত দ্বিজাতি নহে, এমন ভক্ত মুখে পরব্রহ্ম বাচক প্রণব উচ্চারণ শুনিলেই কে যেন কানে ছুঁচ ফুটিয়ে দেয়।" তাই কোন কায়স্থ ভক্তকে কহেন, "নামী কিনা ভগবান সঙ্গে অভেদ এমন যে, তার নাম জপ করলে সর্ব্বার্থ সিদ্ধ হয়, তখন প্রণবটা না বল্লে আর তোমার ধর্ম হবে না"?'

বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল ঐ গ্রন্থের অন্যত্র বলছেন, 'আর একদিন কহেন, "শূদ্র মুখে প্রণব উচ্চারণ শুনলে, কানে যেন ছুঁচ ফুটিয়ে দ্যায় ; ভগবানের অসংখ্য নামের একটিতে রতি হলে সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হয়। তখন প্রণব উচ্চারণের কি আবশ্যক"?' (পৃষ্ঠা-৩৩৪)। এখানে দেখুন শ্রীরামকৃষ্ণ কি বলছেন, জন্ম সূত্রে যে উচ্চবর্ণ নয় তার মুখে প্রণব মন্ত্র তিনি শুনতে চান না। উচ্চবর্ণের কথা বললেও তার প্রকৃত উদ্দেশ্য কিন্তু শুধুই ব্রাহ্মণদের পক্ষে।

স্বামী বিবেকানন্দ কিন্তু এই মতের পক্ষে ছিলেন না। তিনি শূদ্রের দর্শন চর্চায় কোন আপত্তি তোলেন নি। 'শূদ্র যদি জ্ঞানী হয় সে ব্রাহ্মণের কাছেও শাস্ত্র ব্যাখ্যা

করতে পারে' এই তার অভিমত। আসলে স্বামী বিবেকানন্দ নিজেই জাতে শূদ্র। তিনি উদার হতেই পারেন।

একটা লোক খেতে বসেছে, তাকে অন্য একজন ছুঁয়ে ফেললে তার খাওয়া নষ্ট হয়, এ যে মনুষ্যত্বের কত বড় অপমান আমরা আজও বুঝে উঠতে পারলাম না। দাদু ঠাকুমা মেনেছে, বাপ কাকা মেনেছে আর আমরা মানব না! এই আমাদের অজুহাত। আজকের উন্নত দেশ গুলোতেও এক সময় এই ধরনের নীচ সামাজিক আচার চালু ছিল। কিন্তু যেদিন থেকে তারা উন্নতি করতে শিখেছে, নিজেকে মানুষ বলে চিনতে শিখেছে সেদিন থেকেই এই সব কদাচার লাথি মেরে দেশ থেকে বিদেয় করেছে। অবশ্য লাথি খাওয়া কুসংস্কার গুলো সাগর পেরিয়ে আমাদের মহান দেশে প্রবেশ করে আমাদের কুসংস্কারগুলোর সাথে হাতে হাত মিলিয়ে সহাবস্থান করছে। এখানে ওদের তাড়ানোর কেউ নেই।

যাও বা বিদ্যাসাগরের মত কয়েকজন এসেছিলেন, কিন্তু অধিকাংশের চাপে তারাও বেশি দূর এগোতে পারেন নি। আমরা সেই বিদ্যাসাগরের বাতি বাহক। আমরা 'মৃত' বিদ্যাসাগরকে ফিরিয়ে আনব। 'জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে' শুনতে বেশ ভালো লাগে। বাসের পেছনে লেখা 'মেরা দেশ মহান হ্যায়' মূর্খের প্রলাপ। তবু সব কল্পনাই সম্ভব যদি পাশে থাকেন আদর্শ স্বরূপ বিদ্যাসাগর। অ, আ, ক, খ-এর মধ্যে শুধুই নাম সর্বস্ব হয়ে তিনি টিকে আছেন। তাকে চাই জীবনের প্রতি পদক্ষেপে জীবন্ত অস্তিত্ব নিয়ে। তবেই যদি আমরা মানুষ হয়ে উঠতে পারি। নতুবা, পরীক্ষা নিরীক্ষা করব আমি, ধমক দেবে আমেরিকা। ধমক খেয়ে বলব 'এই বেশ ভালো আছি'। কপালের লিখন পাল্টাই কি করে!

কিছু দিন আগে আমার এক স্কুলবেলার বন্ধু তার ছেলের পৈতে অনুষ্ঠানে আমাকে নিমন্ত্রণ করতে আসে। কার্ডে আমার নাম লিখতে গেলে তাকে বলি কার্ড নষ্ট করিস না, আমি ঐ নিমন্ত্রণ স্বীকার করতে পারব না। সে তো আকাশ থেকে পড়ে। সে কি, আমি তোর বাড়িতে এলাম নিমন্ত্রণ করতে, আর তুই সে নিমন্ত্রণ নিবিই না। ব্যাপারটা বুঝলাম না তো। বন্ধুকে নানা কথায় আশ্বস্ত করে বলি, দেখ, উপনয়ন মানে একগাছা সুতো গলায় পরার অনুষ্ঠান। যার মাধ্যমে সে-দিন থেকে ছেলেটি কোটি কোটি অব্রাহ্মণের থেকে উচ্চস্তরের প্রাণীতে পরিণত হবে। এর জন্য তাকে খেলোয়াড় হতে হবে না, গায়ক হতে হবে না, বৈজ্ঞানিক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার কিছু হবার দরকার নেই। শুধু একগাছা সুতোর গুণেই সে কোটি কোটি অব্রাহ্মণের থেকে আলাদা। এই অনুষ্ঠানের নিমন্ত্রণ স্বীকার করাটাও মনুষ্যত্বের অপমান।

বন্ধু তো রাগারাগি করে চলে গেল। ভাবলাম বন্ধু বিচ্ছেদ হয়েই গেল বুঝি। অতি উচ্চ পরিবার, দক্ষ ড্রাফ্টসম্যান, কর্মসূত্রে বেশ কয়েকবার ইউরোপ ভ্রমণও করেছে, আমার

সাথে সম্পর্কচ্ছেদ হলে তার কিছু এসে যাবে না। যদিও বন্ধু তেমনটি করেনি। কিছুদিন পরে দেখাও করে, আমার পিঠ চাপড়ে বলে, তুই তোর বিশ্বাস অনুযায়ী ঠিকই আছিস। রাগ ভুলে গেছি।

জাতিভেদ প্রথা লোপ কল্পে রামকৃষ্ণদেব আমাদের সামনে একটি পথ খুলে দিয়েছেন। পথটা কি, না, ভক্তির পথ। তিনি বলতেন ভক্তের কোন জাত নাই। ভক্তি না থাকলে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ নয়, ভক্তি থাকলে চণ্ডাল চণ্ডাল নয়। (যদিও অন্যত্র আমরা দেখেছি জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণ না হলে সেই ভক্তকে তিনি মন্ত্র উচ্চারণে নিষেধ করতেন। অর্থাৎ কিনা ভক্ত হও আর যাই হয়, শূদ্র শূদ্রই।) এ এক অদ্ভুত উপায় বাতলেছেন। আপনি কোন্ মাপকাঠি দিয়ে মাপবেন এই লোকটা কতটা ভক্তিমান আর ওই লোকটা কতটা ভক্তিহীন। আপনার পরিচিত লোকের সংখ্যা অনেক আছে নিশ্চয়ই। আপনি কি তাদের মধ্যে অব্রাহ্মণ এমন পাঁচজনকে বেছে নিতে পারেন যারা অতি ভক্তিমান। যাদের আপনি ভাবতে পারেন এরাই প্রকৃত ব্রাহ্মণ। আবার এমন পাঁচজন ব্রাহ্মণকে বেছে নিতে পারেন যারা নেহাতই ভক্তিহীন। যাদেরকে আপনি বলতে পারেন 'তোরা ব্রাহ্মণ নয় শূদ্র'। আসলে এসবই হচ্ছে ধর্ম নেতাদের কথার গোলক ধাঁধা। ভক্তি অভক্তির পথ ধরে জাতিভেদ প্রথা লোপ কল্পে দশ পা এগিয়ে দেখবেন যেখানে আছেন পাঁচ পা পিছিয়েও সেখানেই পড়ে থাকবেন। সবই কথার মারপ্যাঁচ, গোলক ধাঁধা। আসলে এই ধরনের কথার কোন পরিণতি নেই। শুনতে ভালো লাগে, মনে হয় যেন কি না কি গূঢ় অর্থ বহন করছে কথাটা, আসলে অন্তঃসারশূন্য।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'চরিত্রহীন'-এ বেদের স্ববিরোধিতার কথা উল্লেখ করে বলেছেন—'যা বুদ্ধির বাইরে, তা বুদ্ধির বাইরে বলেই ত্যাগ করব। মুখে বলব অব্যক্ত, অবন্ধ, অজ্ঞেয়, আর কাজে কথায় তাকেই ক্রমাগত বলবার চেষ্টা, জানবার চেষ্টা কিছুতেই করব না। যে মুখে বলছেন জানা যায় না, সেই মুখেই আবার এত কথা বলছেন, যেন এই মাত্র স্বচক্ষে দেখে এলেন। যাকে কোন মতেই উপলব্ধি করা যায় না, তাকেই উপলব্ধি করার জন্য পাতার পর পাতা, বইয়ের পর বই লিখে যাচ্ছেন। কেবল বড় বড় কথার মারপ্যাঁচ। নির্গুণ, নিরাকার, নির্লিপ্ত, নির্বিকার, এসব কেবল কথার কথা। এর কোন মানে নেই।'

আমারও এই কথাটা বারে বারে মনে হয়েছে, এই মাত্র যাকে বলছি কেউ তোমায় বুঝতে পারে না, তুমি বোধের অতীত, আবার পরক্ষণেই তাকে বোঝার জন্য কত জপ করতে হবে, কতক্ষণ ধ্যান করতে হবে, কি ভাবে করুণ সুরে কাঁদতে হবে, ভক্তকে এই সব বুঝিয়ে দিচ্ছি।

ভাগবতে কুন্তিদেবী কৃষ্ণের স্তব করছেন—'হে কৃষ্ণ, তুমি আদি পুরুষ, তুমি পূর্ণ রূপে সর্বভূতের অন্তরে ও বাহিরে বিরাজ করিতেছ। কিন্তু মায়া-যবনিকার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন

ভাবে তোমার এই অবস্থান। তাই কেহ তোমায় বুঝিতে পারে না।' এই যে বলছেন তাকে কেউ বুঝতে পারে না তাহলে এই 'আদি পুরুষ', 'পূর্ণ রূপ', 'সর্বভূত', 'অন্তর-বাহির', 'পর্দার আড়াল', এত সব বুঝে ফেললেন কি ভাবে? যা বোঝা যায় না, তা তো বোঝা যাবেই না, এই তো সোজা কথা। কলা গাছে তেল মাখিয়ে উঠতে গেলে পিছলে পড়ব, এই তো সোজা কথা। কেন নির্বোধের মত বারে বারে ওঠার চেষ্টা চালিয়ে যাব?

আর আছে কিছু বিপরীতধর্মী গল্প। দুম্ করে একটা চমক লাগিয়ে দেওয়া। স্নো, পাউডার, দাঁতের মাজনের বিজ্ঞাপনে যেমন হঠাৎ করে একটা চমক লাগিয়ে দেবার ব্যাপার থাকে অনেকটা সেই রকম আর কি। ধরুন একজন মারা গেছে, তার একটা শেষকৃত্য দরকার। কিন্তু এ মরা যে সে মরা নয়। একমাত্র নিষ্পাপ ব্যক্তি ছাড়া এ মরাকে কেউ ছুঁতে পারবে না। ছুঁলেই সমূহ ক্ষতি। যারা সৎকারের জন্য এসেছে সবাই থমকে গেছে। কেউ আর এগোতে ভরসা পাচ্ছে না। কি হয় এখন? কেউ যে এগোয় না। হঠাৎ সেখান দিয়ে এক ডাকাবুকো লম্পট মাতাল যাচ্ছিল। সব শুনে গঙ্গায় এক ডুব মেরে মরা কাঁধে নিয়ে চলে গেল। সবাই অবাক, শুধু আমরা ছাড়া। জানি এই ধরনের উল্টো পুরাণ লোকে খায় ভালো।

স্বামী বিবেকানন্দ নিজে শূদ্র হয়েও বলে গেছেন "বামুনের ছেলের নীচ জাতের ছোঁয়া না খাওয়াই ভালো।" (স্বামীজির বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড, পৃ - ১৫৩)।

রামকৃষ্ণদেবের অনান্য শিষ্যরাও জাতিভেদ প্রথা রক্ষার্থে সবিশেষ যত্নবান ছিলেন। মুচি আমার ভাই, চামার আমার ভাই, ব্রাহ্মণ আমার ভাই, এতসব ভাই ভাই শুনে ভেবে বসবেন না যেন স্বামীজী জাতপাত উৎখাত করতে এত ভাইয়ের ডাক দিয়েছেন। একেবারেই না। জাতপাত যেমন আছে তেমনই থাকুক, ওসব নিয়ে নাড়াচাড়া করার পক্ষপাতী কখনই তিনি ছিলেন না। সিস্টার নিবেদিতার বক্তব্য অনুযায়ী জাতিভেদ প্রথার বিরোধিতা করে তিনি জীবনে একটি বাক্যও খরচ করেন নি। বরং এই কু-প্রথার প্রয়োজনীয়তা এবং গুণাবলী নিয়ে গণ্ডা গণ্ডা মন্তব্য করে গেছেন। (স্বামীজিকে যেরূপ দেখিয়াছি—নিবেদিতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৫৩, অনুবাদক-স্বামী মাধবানন্দ, পৃ - ২৯১)। আসলে স্বামীজী 'ভবঘুরে' থেকে সাফল্যের মঞ্চে পৌঁছে সব সময় স্বপ্ন রাজ্যে বিচরণ করতেন। মুচি মুচিই থাকবে, চামার চামারই থাকবে, ব্রাহ্মণও ব্রাহ্মণই থাকবে, অথচ সব ভাই ভাই। ধনী তার ধন বিলিয়ে দিয়ে দরিদ্রকে উঠিয়ে আনবে; কি সব অভূতপূর্ব স্বপ্নরে বাবা।

মাস্টারমশাই, মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মর্টন স্কুল বাড়ির নিজের কক্ষে ভক্ত বেষ্টিত হয়ে 'মনুর বিধান' পাঠ করছেন। পাঠ শুনতে শুনতে এক ভক্ত বলে উঠলেন—"মনুর অস্পৃশ্যদের উপর ব্যবহার আর অপরাধীর উপর দণ্ড বিধান পাঠ করলে মনে হয়, এ মানুষের রচিত নয়, নির্দয়তার চূড়ান্ত ব্যবহার। কয়েকজনের স্বার্থের জন্য অপরের পশুবৎ আচরণ।" শ্রী ম—"মনু ঐ রকম বলেছেন। এখন এরা বুঝি অন্যরকম করতে চেষ্টা করছে—দেশের

লোকেরা। এরাও করুক আর এও আছে। দেখা যাক কোনটা দাঁড়ায় তার ইচ্ছায়।" (শ্রী ম-দর্শন—স্বামী নিত্যাত্মানন্দ, একাদশ ভাগ, প্রথম সংস্করণ, পৃষ্ঠা-৯)। 'তার' ইচ্ছাতেই এই অস্পৃশ্যতা। তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভক্ত শিষ্য যাবেন কি ভাবে!

সব মিলিয়ে আমরা এই সিধান্তে নিশ্চিত ভাবেই আসতে পারি ভগবান রামকৃষ্ণদেব ছিলেন একজন গোঁড়া ব্রাম্মণ এবং ব্রাম্মণ্যবাদের প্রতীক। রাণীর অন্ন গ্রহণ করে সারাজীবন তিনি কেঁদেছেন। শূদ্রের সাথে দূরত্ব বজায় রেখে তার পিতা কত বড় ব্রাম্মণত্বের নমুনা খাঁড়া করেছেন, বলে তিনি গর্ব অনুভব করতেন। আদর্শস্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আরো একটু উদারতা কাম্য ছিল নাকি!

একটা প্রশ্ন — ব্রাম্মণের ঘরে জন্মালেও রামকৃষ্ণদেব কি সত্যিই ব্রাম্মণ ছিলেন? হেঁয়ালি নয় কিন্তু।

শ্রীরামকৃষ্ণ তখন তীব্র সাধনায় মত্ত। শুধু যে হিন্দু ধর্মেই সাধনা করে চলেছেন তা নয়, একে একে বেশ কয়েকটি ধর্মেই সাধনা করে ফেলেছেন এবং সব ধর্মেই তার ঈশ্বর দর্শন হয়েছে। রামকৃষ্ণদেবের এই যে চতুর্দিকে ঈশ্বর দর্শন অথবা যে ধর্ম নিয়েই সাধনা করছেন তাতেই ঈশ্বর দর্শন হয়ে যাচ্ছে এই ব্যাপারটাকে রমাঁ রলাঁ যে ভাবে দেখেছেন সেটুকু তুলে দিচ্ছি—'এ-গুলি ছিল সমস্ত দেবতাকে আত্মসাৎ করিবার অতৃপ্ত একটি লালসা—আবেগের তাড়নায় উন্মত্ত, ভয়াল তরঙ্গাঘাতে দোলায়মান আত্মার প্রলাপ।' (রামকৃষ্ণের জীবন, প্রথম সংস্করণ, পৃষ্ঠা-২১, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃষ্ঠা-২৮)। শ্রীরামকৃষ্ণের ভগবান দেখা সম্বন্ধে অন্য এক জায়গায় রমাঁ রলাঁ মন্তব্য করেছেন—'যদি ঔদ্ধত্য মার্জনা করেন, তবে এ বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত মত হইল, তিনি এরূপ কিছুই দেখেন নাই। কেবল দেবীর সর্বব্যাপী অস্তিত্ব সম্পর্কে তিনি 'সচেতন' ছিলেন এবং ঐ মহাসমুদ্রকেই তিনি মায়ের নামে আহ্বান করেন। ছোট-খাট দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়, তাহার অভিজ্ঞতা ছিল স্বপ্ন দর্শনের অনুরূপ।' (ঐ, পৃ - ১৭, ২৫)।

ভগবান তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন ঠিকই। আসলে ভগবান ভগবান করে এমন ভগবানময় হয়ে উঠেছেন যে ইট কাঠ, বেড়াল কুকুরের মধ্যেও ঈশ্বর দর্শন করে ফেলছেন। আমি যেমন কালো চশমা পরে সব কিছু কালো দেখছি, তিনিও তেমনি ভগবানের চশমা পরে সব ভগবানময় দেখতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তরা তার বিভিন্ন ধর্মের সাধনা দেখে বলে থাকেন 'দুনিয়ায় যত ধর্ম আছে ঠাকুর সব ধর্মে সাধনা করে সিদ্ধ হয়েছেন।' কথাটা কিন্তু সর্বৈব সত্য নয়। দুনিয়ায় কত ধর্ম আছে সব কি আমরা জানি। শয়ে শয়ে ধর্ম আছে। তার কটা সাধনা করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ? চার পাঁচটির বেশি হবে না। বৌদ্ধ ধর্ম, জৈনধর্ম্ম, পারসিক ধর্ম, শিখ, সিন্টো, তাও, কনফুচিয়াস, আরো কত কি আছে আমার জানা নেই। এসব নিয়ে তিনি কবে সাধনা

করলেন! অবশ্য, সনাতন ধর্ম সব ধর্মের জনক। হিন্দু ধর্মে সাধনা মানেই সব ধর্মে সাধনা। আইনের এই ফাঁকটা এখানে রয়েই যাচ্ছে।

যাক্, আমরা আমাদের মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসি। সে সময় দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে নানা জায়গা থেকে সাধু, সন্ন্যাসী, ফকিরের দল এসে ডেরা বাঁধত। খাওয়া পরার চিন্তা নেই, এমন শান্ত নির্জন পরিবেশ তাদের সাধন ভজনের জন্যও বেশ প্রশস্ত। ভ্রাম্যমান সন্ন্যাসী ফকিরেরা দক্ষিণেশ্বরে এসে নিশ্চিন্ত মনে কয়েকটা দিন কাটিয়ে যেত। রামকৃষ্ণদেবেরও চলছিল তখন বিভিন্ন ধর্মে সাধন শিক্ষা। কয়েকদিন গীর্জায় গেলেন, খ্রীষ্টধর্ম সাধনা করলেন। (যদিও এর জন্য তিনি খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হন নি)। কিছুদিন ভৈরবীর কাছে তন্ত্র সাধনা হল। তোতাপুরীর কাছে নিরাকারের সাধন, সেও সাঙ্গ হল।

সে সময় দক্ষিণেশ্বরে এসে ডেরা বেঁধেছেন গোবিন্দ রায় নামে এক সুফীপন্থী ইসলাম দরবেশ। রামকৃষ্ণের ইচ্ছে গোবিন্দ রায়ের কাছে দীক্ষা নিয়ে ইসলাম ধর্ম সাধনা করবেন। 'যে চিন্তা, সেই কাজ। ঠাকুর গোবিন্দকে নিজ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন এবং **যথাবিধি** দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ইসলাম ধর্ম সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন।' (লীলাপ্রসঙ্গ, পৃষ্ঠা-৩১০, লীলামৃত, পৃষ্ঠা-৭১, শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ চরিত — গুরুদাস বর্মণ, পৃষ্ঠা-৮০, জীবন বৃত্তান্ত—রামচন্দ্র দত্ত, পৃষ্ঠা-৫৪, রামকৃষ্ণ পুঁথি, পৃষ্ঠা-১১৯)। লীলাপ্রসঙ্গ এখানে ব্যবহার করা হল। রামকৃষ্ণদেবের সব জীবনী গ্রন্থেই এই ঘটনার উল্লেখ পাবেন।

তবে 'কথামৃতে' এই ধরনের অনেক ঘটনারই উল্লেখ নেই। আসলে কথামৃত ঠিক জীবনী গ্রন্থ নয়। মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত ১৮৮২ থেকে ১৮৮৬ পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্গ করেছেন। এই পাঁচ বছর সময়ের মধ্যে তিনি যা দেখেছেন এবং শুনেছেন তার নোট বইতে ঠিক সেইটুকুই লিপিবদ্ধ করে গেছেন। পরে সেই নোট বই থেকেই মহাগ্রন্থ 'কথামৃত' রচনা করেছেন। এই ধরনের রচনাকে বলে 'অ্যানাল্স'। রামকৃষ্ণদেবের মৃত্যুর পরেও যেহেতু শ্রী ম তার গুরুভাইদের সাথে অনেক দিন কাটিয়েছেন, তাই ১৮৮৬ সালের পরের বহু ঘটনাও কথামৃতে ঠাঁই পেয়েছে। কিন্তু এ বইতে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম, বেড়ে ওঠা, ইত্যাদি নানা ঘটনার তেমন কোন উল্লেখ নেই। উল্লেখ নেই তার সাধনকালীন সময়ের ঘটনাবলীও। সে সব জানতে গেলে অন্যান্য প্রামাণ্য জীবনী গ্রন্থ থেকেই জানতে হবে। এবং সব জীবনীকারই একটা কথা খুব নিশ্চিত ভাবে প্রয়োগ করেছেন, তা হল 'যথাবিধি দীক্ষা গ্রহণ'।

যথাবিধি দীক্ষা গ্রহণ বললে আমরা নিশ্চয়ই বুঝবো হিন্দু থেকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হতে গেলে যে সব প্রথা পালন করতে হয়, এক্ষেত্রে সে সব সুচারু রূপেই পালন করা হয়েছিল। সব মিলিয়ে রামকৃষ্ণদেব হিন্দু ধর্ম থেকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। ছোটবেলায় ব্রাহ্মণ ছিলেন ঠিকই, দীক্ষা গ্রহণের পর তা কিন্তু তিনি নন।

এরপরে তিন চার দিনের সাধন ঘোর কেটে যাবার পর তিনি অবশ্য তার পুরানো কালী মন্দিরেই ফিরে এসেছেন। কিন্তু তাতে তো তিনি হিন্দু হলেন না। আমরা তো কত মুসলমানকেই দেখেছি বাঙালী হিন্দু পাড়ায় থাকে, বাংলা স্কুলে পড়াশুনো করে, আদব কায়দায়ও হিন্দুর মত হয়ে গেছে, তা বলে কি তারা হিন্দু হয়ে গেল। সে মুসলমান মুসলমানই থাকবে। একটি মুসলমান ছেলেকে চিনি, যার সব ভাইরা বাঙলা স্কুলে পড়াশুনো করেছে, ওঠাবসা হিন্দুদের সাথে। সরস্বতী পূজায় প্রসাদী ফল কাটে, অঞ্জলি দেয়, সব কিছুই হিন্দুদের মত । তা বলে সে কখনই বলে না আমি হিন্দু। সব সময়ই বলে 'আমি খাঁটি মুসলমান'।

মুসলমান থেকে হিন্দু হতে গেলে সেই 'যথাবিধি' নিয়মকানুন অনুষ্ঠান করেই আসতে হবে। সেই সঙ্গে আছে 'প্রায়শ্চিত্ত'। কাউকে যদি বলপূর্বক বিধর্মী বানানো হয় তবে তার হিন্দু ধর্মে ফিরে আসতে প্রায়শ্চিত্ত না করলেও চলে। কিন্তু যে স্বেচ্ছায় ধর্মান্তরিত হয়েছে তার ক্ষেত্রে এই নিয়ম অবশ্য পালনীয়। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন—''যাহারা ইচ্ছাপূর্বক ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু এখন হিন্দু সমাজে ফিরিয়া আসিতে চায়, তাহাদের পক্ষে প্রায়শ্চিত্ত ক্রিয়া আবশ্যক, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।'' (বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৮৪)। শ্রীরামকৃষ্ণ তো সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছাতেই ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। তাকে এখন হিন্দু হতে গেলে নিশ্চিত ভাবেই প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে না কি! কিন্তু তা তো তিনি করেন নি। তাহলে উপায়? তিনি যতই অন্যের জাত বিচার করুন না কেন, তিনি নিজে কিন্তু ব্রাহ্মণও নন, হিন্দুও নন, খাঁটি বাঙালি মুসলমান।

কেউ বা বলতে পারেন রামকৃষ্ণদেব একজন সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসীর আবার জাত কি? খুব ভালো কথা, তাহলে কি আমরা মেনে নেব গীর্জায় যে পাদ্রী সাহেবরা রয়েছেন তারা খ্রীষ্টান নন! মসজিদে যে ইমাম সাহেব বসে আছেন তিনি মুসলমান নন! মঠ-মন্দিরে যে সন্ন্যাসীরা রয়েছেন তারা হিন্দু নন!

'শ্রীমা সারদাদেবী' গ্রন্থে স্বামী গম্ভীরানন্দ কি লিখছেন একবার দেখা যাক— 'কোঠারের পোষ্ট মাস্টার দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ঘটনাচক্রে যৌবনে খ্রীষ্টধর্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। অধুনা তিনি বিশেষ অনুতপ্ত ও স্বধর্মে ফিরিয়া আসিতে বিশেষ ব্যগ্র হইয়া সকলের নিকট পরামর্শ চাহিতে লাগিলেন। ক্রমে ভক্তদের মুখে শ্রীমা ঐ কথা শুনিয়া বিধান দিলেন যে, ''সরস্বতী পূজার পূর্বদিন দেবেন্দ্রবাবু রামবাবুদের গৃহদেবতা রাধাশ্যাম চাঁদজীর সম্মুখে যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত সমাপণান্তে গায়ত্রী ও যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিলেই পুনঃ ব্রাহ্মণত্বে প্রতিষ্ঠিত হইবেন''।' (সপ্তম সংস্করণ, পৃষ্ঠা-২৬১)। স্বামী ভুমানন্দের 'শ্রীশ্রী মায়ের জীবন কথা' গ্রন্থে প্রায়শ্চিত্তের কথা নেই। শুধু শুদ্ধিক্রিয়ার উল্লেখই আছে। (২য় সংস্করণ, পৃষ্ঠা ২০৪)।

এরপর দেবেন্দ্রনাথের শুদ্ধিক্রিয়া, গায়ত্রী মন্ত্র, যজ্ঞোপবীত ধারণ ইত্যাদি আছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি সারদাদেবীও স্বেচ্ছায় ধর্মত্যাগীকে প্রায়শ্চিত্ত অথবা শুদ্ধিক্রিয়া করিয়েই হিন্দুধর্মে দীক্ষিত করছেন। তবে রামকৃষ্ণদেবের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে না কেন? নিশ্চয়ই হওয়া উচিত। তা যদি তিনি না করে থাকেন, ইসলাম ধর্মে দীক্ষা যখন নিয়েই ফেলেছেন, নিশ্চিত ভাবেই তিনি ধর্মান্তরিত। ওপাড়ার রহিম চাচা বেদ পাঠ করলেই যেমন হিন্দু হচ্ছেন না, শ্রীরামকৃষ্ণও তেমনই কালী কালী করে হিন্দু হবেন না। অবশ্য স্বীকার করে নেবার প্রশ্নটা থেকেই যাচ্ছে।

এখানে আমাদের মত নাস্তিকদের সম্বন্ধে একটা কথা বলে রাখি। আমাদের নিজেদের কোন জাত বা ধর্ম নেই। সুতরাং রামকৃষ্ণদেব মুসলমান কি খ্রীষ্টান সে নিয়ে আমাদের কোন মাথাব্যাথাও নেই। এ হিন্দু ও খ্রীষ্টান এই ধারণাটাই হাস্যকর বলে মনে করি। যারা এসব মানে তাদের জন্যই এতগুলো কথা লেখা হল। ধর্মে অবিশ্বাসীদের জন্য নয়।

নারীসুলভ লক্ষণ

রামকৃষ্ণদেব যখন একটু বড় হয়েছেন তখন থেকেই তার মধ্যে নারী সুলভ কিছু লক্ষণ ফুটে উঠতে থাকে। গ্রামের অন্যান্য বাচ্চাদের মত তিনিও যাত্রাপালা দেখতে ভালবাসতেন। সঙ্গীসাথীদের নিয়ে একটি যাত্রাদলও তৈরি করেছিলেন। যাত্রা দেখে তিনি যাত্রার নারী চরিত্রগুলি অদ্ভুত অভিনয় করে দেখাতে পারতেন। গ্রামের মেয়েরাও তাকে চেপে ধরে (অনুরোধ করে) শ্রীমতী রাধারাণী তার সখীবৃন্দ ইত্যাদি সাজিয়ে অভিনয় করাত। অভিনয় দেখে তারা মুগ্ধ হয়ে বলত 'এ ছেলে না মেয়ে তাই বোঝা যায় না'। কখনও বা নিজের ইচ্ছাতেই মেয়েদের মত সেজে কাঁখে কলসি নিয়ে জল আনতে পুকুরে চলে যেতেন। তার বেশভূষা ও হাবভাবে তাকে পুরুষ বলে কেউ চিনতেই পারত না। (লীলাপ্রসঙ্গ, পৃষ্ঠা-১৪১)।

যত বয়স বাড়তে লাগল রামকৃষ্ণদেবের এই ভাব ততই বাড়তে লাগল। পুঁথিকার বলছেন—

বহুরঙ্গ বিশেষত নারীদের সনে।
প্রভুর রমনী ভাব ষোল আনা মনে।।
ফুটে মুখে মিঠা বাণী রমনীর প্রায়।
প্রকৃতি সুলভ ভাব কান্তি মাখা গায়।। (পৃষ্ঠা-৩০)

চান করে উঠে রোদে দাঁড়িয়ে তিনি মেয়েদের মত চুল শুকোতেন। (শ্রী রামকৃষ্ণ অন্ত্যলীলা, স্বামী প্রভানন্দ, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৯-১০)। মনে মনে কল্পনা করতেন আবার যদি জন্ম গ্রহণ করেন তবে যেন ব্রাম্ভণের ঘরে সুন্দরী, সুকেশী, বালবিধবা কন্যা হয়ে জন্মান। বাকী জীবনটা একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে ভজনা করে কাটিয়ে দিবেন। (লীলাপ্রসঙ্গ, পৃষ্ঠা-২৯৩)। বলতেন, 'প্রকৃতিভাবে পুরুষকে (ঈশ্বরকে) আলিঙ্গন চুম্বন করতে ইচ্ছে হয়।' (অন্ত্যলীলা, প্রথম খণ্ড, পৃ-৬৫)।

একবার যুবক স্বামী অভেদানন্দকে শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন—"তোর ভ্রূ-দুটি, চোখ ও কপাল দেখে শ্রীকৃষ্ণের মুখের উদ্দীপনা হয় ও আমার ভিতর রাধার ভাব জেগে ওঠে কেন বল দেখি?" (স্বামী অভেদানন্দ, প্রকাশক স্বামী আদ্যানন্দ, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা-২১)। লক্ষ্য করে দেখবেন রামকৃষ্ণের মধ্যে সব সময় মা কালী, শ্রী রাধিকা এই রকম

কোন নারী চরিত্রের ভাবই ফুটে উঠছে। শিব ঠাকুর, নারায়ণ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু এরা যেন তার বিপরীত চরিত্র। 'ঠাকুর অন্তরের ভাব প্রেরণায় অনেক সময় আপনাকে ললনাজনোচিত দেহ-মন সম্পন্ন বলিয়া ধারণাপূর্বক তদনুরূপ কার্যসকলের অনুষ্ঠান করিতেন।' (লীলা-প্রসঙ্গ, পৃ - ২৭১)।

একবার আরতি হচ্ছে। শ্রীরামকৃষ্ণ কাপড় পরে মথুরবাবুর পাশে দাঁড়িয়ে চামর করছেন। মথুরবাবু তাঁকে চিনতে পারেননি। স্ত্রী জগদম্বা বলেন— ' তা হইতেই পারে। মেয়েদের মতো কাপড়চোপড় পরিলে বাবাকে পুরুষ বলিয়া মনেই হয় না।' (লীলা-প্রসঙ্গ, পৃ - ৪৬৭)। স্ত্রী ভক্তরা বলেন—"ঠাকুরকে আমাদের পুরুষ বলিয়াই অনেক সময় মনে হইত না ; মনে হইত যেন আমাদেরই একজন। সেজন্য পুরুষের নিকট আমাদের যেমন লজ্জা সংকোচ আসে ঠাকুরের নিকটে তাহার কিছুই আসিত না।" (ঠাকুর রামকৃষ্ণ—ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা-৫১৫)। বেশ বোঝা যাচ্ছে রামকৃষ্ণদেবের স্বভাবে একটা মেয়েলি লক্ষণ ফুটে উঠেছিল। কিছু হরমোন ক্ষরণের অসাম্য থেকে এই ধরনের বিপরীত লক্ষণ ফুটে উঠতে পারে। এজন্য তার কিছু করারও থাকে না।

পুংদেহে পুরুষোচিত বৃত্তি আর নাই।
ললনাসুলভ ভাবে ভাবিত গোঁসাঞি।।
চলন বলন চেষ্টা কটাক্ষ ইঙ্গিত।
অঙ্গ রঙ্গ হাসি আদি স্বভাব চরিত।।
ঠমক ঠমক ঠিক ললনার প্রায়।
স্ত্রী কি পুরুষ প্রভু চেনা নাহি যায়।।

—রামকৃষ্ণ পুঁথি, (পৃ-১০৭)

*   *   *

প্রভুরে সরম লাজ নাহি আসে কার।
স্ত্রীলোক দেখিত তায় স্বজাতি তাহার।।
প্রভুরে পুরুষ জ্ঞান কভু না হইত।
বর্ণে বর্ণে স্ত্রীলোকের স্বভাবে মিলিত।। (পুঁথি)

*   *   *

অদ্ভুত এ লীলা খেলা বুঝে ওঠা ভার।
প্রকৃত রমণী প্রভু পুরুষ আকার।। (পুঁথি)

বৃন্দাবনে গঙ্গা মাইয়া রামকৃষ্ণদেবকে দেখে কি ভেবেছিলেন লক্ষ্য করুন— "ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি ইনি দর্শন মাত্রেই ধরিতে পারিয়াছিলেন ঠাকুরের শরীরে শ্রীমতী রাধিকার ন্যায় মহাভাবের প্রকাশ, এবং সেজন্য ইনি ঠাকুরকে শ্রীমতী রাধিকাই

স্বয়ং অবতীর্ণ ভাবিয়া 'দুলালী' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন।" (লীলাপ্রসঙ্গ, পৃষ্ঠা-৫৬৮)। রামকৃষ্ণদেবকে দেখে শিব, কৃষ্ণ, নারায়ণ ইত্যাদি কোন পুরুষ চরিত্র তার মনে না এসে রাধিকার ছবি ফুটে উঠল কেন?

রমাঁ রলাঁও বলেছেন "আর সেই সঙ্গে ছিল নারী সুলভ একটি মাধুর্য, যাহা তাহার মধ্যে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল।" (রামকৃষ্ণের জীবন, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃষ্ঠা-১৬, প্রথম সংস্করণ, পৃষ্ঠা-৬)। অথবা—"সম্ভবত মেয়েরা তাহার মধ্যে নারী সুলভ কোন বস্তু প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তিনি কৃষ্ণ ও গোপীদের কাহিনী কিংবদন্তীর মধ্যে আবাল্য লালিত হওয়ায় একটি নারী সুলভ প্রকৃতিও তাহার অধিগত হইয়া গিয়াছিল।" (ঐ, পৃষ্ঠা-১০, ১৯)।

শ্রীরামকৃষ্ণের এই নারী সুলভ আচরণের প্রমাণ জীবনী গ্রন্থগুলির যত্রতত্র খুঁজে পাওয়া যাবে। নিজেকে নারী ভাবার মধ্যেই তিনি সীমাবদ্ধ ছিলেন না। আরও অন্য দিক থেকেও তাকে লক্ষ্য করার আছে। যখন তখন উলঙ্গ হয়ে পড়ার একটা প্রবণতা তার ছিল। শুধু নিজে একা নয়, অল্প বয়সী কোন ভক্তকে নির্জনে পেলে তাকেও তিনি উলঙ্গ করিয়ে দিতেন। যুক্তি দেখাতেন সাধন কালে শরীরে মনে কোন বন্ধন রাখতে নেই।

স্বামী তুরীয়ানন্দ তখন সবে রামকৃষ্ণদেবের কাছে এসেছেন। একদিন রামকৃষ্ণদেব তাকে জিজ্ঞাসা করছেন "কিরে, ন্যাংটা হয়ে ধ্যান করিস তো?" "আজ্ঞা হ্যাঁ"। "কেমন বোধ হয়?" ইত্যাদি। (রামকৃষ্ণকে যেরূপ দেখিয়াছি—স্বামী চেতনানন্দ, প্রথম সংস্করণ, পৃষ্ঠা-১৭২)। তবে বহু সাধু সন্তকেই উলঙ্গ হয়ে সাধন ভজন করতে দেখা যায়। জন্মদিনের পোষাকে সাধন-ভজনে সম্ভবতঃ পুণ্যি একটু বেশি পাওয়া যায়।

স্বামী অখণ্ডানন্দ তার 'স্মৃতি-কথা'য় বলছেন 'সন্ধ্যার পর আরতি হয়ে গেলে তিনি একেবারে উলঙ্গ হয়ে পশ্চিম দিকের বারান্দায় আমাকে একখানা মাদুর দিয়ে বললেন "পাত"। তারপর একটি বালিশ এনে শুলেন। এর আগেই আমার কোমরের কাপড়ের বাঁধ খুলে দিতে বললেন। বললেন "মার কাছে যেন ছেলে" (পৃষ্ঠা-৪-৫)।

ভক্ত জিজ্ঞাসা করছে স্বামী বিজ্ঞানানন্দকে "ঠাকুর আপনাকে কিরকম করে পরীক্ষা করেছিলেন?" স্বামীজী "ঠাকুর সকলকে পরীক্ষা করতেন একেবারে উলঙ্গ করে। আমাকেও তাই করেছিলেন।" (সৎ প্রসঙ্গে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ—স্বামী অপূর্বানন্দ, তৃতীয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা-৯৭)। মুত্র ত্যাগের ধারা কার কোন দিকে বয়, কড়া নজর থাকত সেদিকেও। ধারা ডান দিকে বইলে ডান-পন্থী সাধু। বাঁ দিকে বইলে বাম-পন্থী সাধু।

সাধু সন্ন্যাসীদের দেখি 'আমি খুব আপন ভোলা' এই ভাবটা প্রকাশ করার ইচ্ছা অতি প্রবল। তারা তাদের জামা কাপড় বিশেষ একটা পরিষ্কার করেন না। বিছানাপত্র যেমনকার তেমনই ফেলে রাখেন। ভাবটা এমনই যেন ধ্যান-জপ করব না ঐ সব নিয়ে থাকব।

তা তুমি ধ্যান জপ নিয়েই থাক, অন্য কেউ যদি তোমার বিছানাটা পরিষ্কার করে দেয় তোমার আপত্তিটা কি? কিন্তু তাতে যে পরিষ্কার পোষাক, পরিষ্কার বিছানা, আত্মভোলা ভাবের অর্ধেকটাই মাটি। এমনই একটি ঘটনা—

এলাহাবাদে থাকতে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের অগোছাল বিছানা সেবক পরিষ্কার করে রাখে। স্বামীজী তা দেখে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে শত অনুরোধ সত্ত্বেও পত্রপাঠ তাকে কলকাতায় ফেরত পাঠিয়ে দেন। (পূণ্য স্মৃতি—স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ, পৃষ্ঠা-৭৬)। ফিটফাট বাবুটি কেউ যেন বলতে না পারে। উলঙ্গ হয়ে থাকার ব্যাপারে ইনি মনে হয় সবার উপরে যাবেন। রামকৃষ্ণদেবের আদেশে জীবনের এক তৃতীয়াংশ সময় ইনি উলঙ্গ হয়েই কাটিয়েছেন। লোকলজ্জা, ওসবের ধার তিনি ধারতেন না (পূণ্য স্মৃতি, পৃষ্ঠা-৯০-৯১)। 'বিজ্ঞান মহারাজকে শ্রীশ্রীঠাকুর দুইটি অমূল্য উপদেশ দিয়াছিলেন—উহার প্রথমটি ছিল এইরূপ ঃ "যখন ধ্যান করবে তখন সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে সর্ববন্ধনমুক্ত হয়ে তা করবে।"... সে সময় কখনও হঠাৎ ঘুম ভাঙিলে দেখিতাম তিনি সম্পূর্ণ উলঙ্গ হইয়া আমাদের পাশ দিয়া ছাদের দিকে হাত মুখ ধুইতে যাইতেছেন। পরে জেনেছিলাম তার প্রতি ঠাকুরের এই ছিল আদেশ।' (প্রত্যক্ষদর্শীর স্মৃতিপটে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ, পৃষ্ঠা - ২৪৮)। এই সব ঘটনা কতটা সুস্থ স্বাভাবিক পাঠক বিচার করে দেখবেন।

কিছু কিছু ঘটনা ঘটে যা সহজে মেনে নিতে মন কিছুতেই সায় দেয় না। এমনই একটি ঘটনার উল্লেখ এখানে করছি—

> তিনি কেন শিশু সম মলভূমে বসে।
> কি বা বুদ্ধি-বলে বল বুঝিবে মানুষে।। (পুঁথি, পৃষ্ঠা-১৪১)

একটা লোকের মল বেগ এসেছে। সে তো তা করবেই। পৃথিবীর প্রতিটি প্রাণীই তাই করে। অতি ভক্তি এমনই বস্তু যে ভক্ত এর মধ্যেও এক পরমাশ্চর্য রহস্য খুঁজে পাচ্ছে। এও এমন এক অত্যাশ্চর্য ঐশ্বরিক ব্যাপার যে সাধারণ মানুষ তা বুঝতেই পারবে না। (এর সাথে ট্রেন আসা যাওয়ার সময় বিভ্রাট নিয়ে রামকৃষ্ণদেবের অবতারত্ব প্রমাণিত হয়েছে)।

মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের একটি কথা মনে পড়ছে। তিনি ভক্তদের বলছেন—"আহা, কি বলব! আপনারা অবতারকে দেখেন নাই। দেখলে মুগ্ধ হয়ে যেতেন। তার সবই সুন্দর। তার ওঠা, বসা, চলন-বলন, স্নানাহার, শয়ন স্বপন, ভালোবাসা, তিরস্কার, মৌন ও কথন, সবই সুন্দর। সুন্দর সরস ও মধুর। তার সবই মধুর। 'ছাতাটা আন' এও সে অমৃতের ঝরনা। মানুষে কি এ সম্ভব!" তবে, গুরুদেব স্বপ্ন দেখবেন তাও সুন্দর। মলত্যাগ আর কি দোষ করল।

ঠাকুর বলেন—"রাখালের কি সুন্দর বালক ভাব, খেলতে খেলতে দৌড়ে এসে আমার কোলে বসে মাই খায়। দাঁড়িয়ে থাকলে জাপটে ধরে আহ্লাদে হো-হো করে। আলাদা

শুলে ভয় পাবে বলে আমার বিছানাতে রাখি, ঘুমের ঘোরে একদিন আমার গায়ে মুতে ফেলেছিল"।' (লীলামৃত, পৃষ্ঠা-৩০৩, লীলাপ্রসঙ্গ, পৃষ্ঠা-৬৯৩)।

রাখাল, মানে স্বামী ব্রম্মানন্দ, বিবাহিত এক জোয়ান যুবক। তাকে রামকৃষ্ণদেব কোলে বসিয়ে দুধ খাওয়াচ্ছেন। একে যতই বালক ভাব, মাতৃ ভাব বলে বোঝান হোক না কেন, আধুনিক মানুষের বোঝা উচিত শুধুই বিজ্ঞানবাদ। বিজ্ঞান এ সব ঘটনা মোটেও স্বাভাবিক চোখে দেখে না।

শ্রীরামকৃষ্ণের শারীরিক গঠন লক্ষ্য করে দেখুন। পুরুষ সুলভ মাংসপেশীর লক্ষণ খুঁজে পাওয়া যাবে না। বসা ছবিটিতে বুকের গড়নে মেয়েলি ভাব স্পষ্ট। যখনই কোন ভক্ত তার অঙ্গ মর্দন করেছেন, অথবা তেল মাখিয়ে দিয়েছেন লক্ষ্য করেছেন জোরে চাপ রামকৃষ্ণদেব একদমই সহ্য করতে পারেন না। তার শরীরটিও যেন মাখনের মত কোমল। ভক্তরা একেই দেব শরীর মেনে নিয়েছেন। দেবতার শরীর টিপে-টাপে দেখার সৌভাগ্য কখনও হয়নি। কিন্তু নারী শরীরের সাথে যে বিলকুল মিলে যাচ্ছে একথা নিশ্চিৎ।

শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী সন্ন্যাসী শিষ্যদের প্রায় প্রত্যেকের মধ্যেই অস্বাভাবিকতার লক্ষণ স্পষ্ট। স্বামী ব্রম্মানন্দের কথা আগেই বলেছি। ঘরে স্ত্রীকে ফেলে রেখে একটি পুরুষ মানুষের কোলে চড়ে তার দুগ্ধ পান সুস্থতার লক্ষণ নয়। স্বামী অখণ্ডানন্দেরও অস্বাভাবিকতার লক্ষণ স্পষ্ট। তিনি আবার স্বামী সারদানন্দের ঝুলে পড়া দুধ পান করে আনন্দ পেতেন। (স্বামী অখণ্ডানন্দ—স্বামী অন্নদানন্দ, প্রথম সংস্করণ, পৃষ্ঠা-২৪৭)। স্বামী অভেদানন্দ এক ভক্তকে বলছেন, "এমন অনেক ঘটনা আছে, যাকে যা বলি তা সত্যিই ফলে যায়; যাবেও। সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় হলে তোমাদেরও হতে পারে, এ বিচিত্র কিছু নয়।" (কথা প্রসঙ্গে স্বামী অভেদানন্দ—স্বামী সোমেশ্বরানন্দ, ১৯৮২, পৃ - ১৯)। রামকৃষ্ণদেবের শিষ্যরা সকলেই ছিলেন সিদ্ধ, বাকসিদ্ধ, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়। এক প্রধান শিষ্য স্বামী অখণ্ডানন্দ বাগানে চেয়ারে বসে আছেন। এক ভক্ত এসে জিজ্ঞাসা করেন, মহারাজ কেমন আছেন! মহারাজ হাসতে হাসতে বলেন, 'শরীরের ওপর দিকটা বেশ ভালই আছে, যত গণ্ডগোল এই নিচটা নিয়ে। কেউ যদি এটাকে কেটেকুটে সাফ করে দিতে পারত বেশ হত।' মহারাজের বয়স কিন্তু ষাট পেরিয়ে গেছে। জিতেন্দ্রিয় বলা যাবে কি?

এবার স্বামী সারদানন্দের বয়ানে একটি ঘটনার উল্লেখ করছি। সারদানন্দ ও নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটীতে ধ্যানে বসেছেন। হঠাৎ সারদানন্দ চোখ খুলে দেখেন নরেন রাগে চোখ মুখ লাল করে অন্ধকারে কার উদ্দেশ্যে যেন 'তবে রে শালা' বলে সিংহ বিক্রমে হুঙ্কার দিয়ে চলেছেন। ধুনি থেকে এক খণ্ড জ্বলন্ত কাঠের টুকরো তুলে অন্ধকারে সেই অজানা আগন্তুকের সাথে ক্রুদ্ধ শার্দুলসম এক প্রস্থ ছায়া যুদ্ধ সাঙ্গ করে আবার এসে ধ্যানাসনে বসলেন। সারদানন্দ জিজ্ঞাসা করায় বললেন 'শালা এসেছিল উৎপাত করতে। উনি যার কথা বলেন। শালাকে তাড়িয়ে দিয়েছি। আর আসবে না।' এরপর আবার

জমিয়ে ধ্যান। (শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী—শ্রী মহেন্দ্রনাথ দত্ত, পৃষ্ঠা-২৯)।

এখানে নরেন্দ্রনাথ কাকে তাড়িয়ে এলেন, না এক অপদেবতাকে। যার কথা 'উনি' মানে রামকৃষ্ণদেব বলেন। রামকৃষ্ণদেব অন্ধকার পঞ্চবটীতে একটি ভৌতিক উপস্থিতি আগেই অনুভব করেছেন। সেটা ঢুকে গেছে নরেন্দ্রনাথের মাথায়, যার জন্য তিনিও অন্ধকার রাতে ছায়া যুদ্ধ করছেন। তারপর জ্বলন্ত চেলা কাঠের ভয় দেখিয়ে তাকে তাড়িয়ে তবে নিশ্চিন্তি।

'নাচের সময় বিবেকানন্দ গোড়ালি পর্যন্ত নেমে আসা লম্বা আলখাল্লা পরে দাঁড়াতেন। পায়ে থাকত মল, আর কানে দুল। নড়াচড়া খুব বেশি করতেন না। বিশেষ কোন ভঙ্গিমা ছাড়াই ধীরে ধীরে হাত দুটি আন্দোলিত করতেন। ভাবগম্ভীর দেহটি ধীরে ধীরে সামান্য একটু দুলত আর কানে আসত নুপুর ধ্বনি।' (জোসেফিন ম্যাকলাউড — প্রব্রাজিকা প্রবুদ্ধপ্রাণা, পৃ-৩২৩)। এসব করেই আমরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতে পরিণত হয়েছি।

রামকৃষ্ণদেবের অসুখ তখন খুব বাড়াবাড়ি। 'একদিন নরেন্দ্রনাথ প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে করিয়াই হউক পরমহংসদেবের যন্ত্রণা নিবারণে সমর্থ একজনকে খুঁজিয়া বাহির করিবেন এবং সন্ধ্যার পর হইতেই 'রাম', 'রাম' শব্দ করিতে করিতে উন্মত্তের ন্যায়, বাগানের চতুর্দিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন।' (বিবেকানন্দ জীবনচরিত —প্রমথনাথ বসু, প্রথম খণ্ড, ১৩২৬, উদ্বোধন, পৃষ্ঠা ১৩৭)। সে যাত্রা রামকৃষ্ণদেব লোকজন পাঠিয়ে নরেন্দ্রকে ধরে এনে, ধমক টমক দিয়ে তার বেগ সামলান।

বেলুড় মঠে উৎসব চলছে। বহুলোক একসাথে খেতে বসেছে। আরও অজস্র বাকি আছে। বাকিদের তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করে দিতে শরৎ মহারাজ মানে স্বামী সারদানন্দ, স্বামী বিরজানন্দ এবং স্বামী বিবেকানন্দের ভাই লেখক মহেন্দ্রনাথ দত্ত ঝাড়ু হাতে মাঠ পরিষ্কার করতে নেমে পড়েছেন। যেখানে সব আবর্জনা ফেলা হচ্ছে সে জায়গাটা ডাল, ঝোল, ভাত, বোঁদে আরও কি সব মিলেমিশে কদাকার চেহারা নিয়েছে। হঠাৎ শরৎ মহারাজ ঐ আবর্জনা স্তূপ থেকে একটু কদাকার খাবার তুলে মুখে দিয়ে দিলেন। (শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী—শ্রী মহেন্দ্রনাথ দত্ত, পৃষ্ঠা-৭২)।

এসব করে সাধু সন্তরা যে কি প্রমাণ করেন তা এরাই জানেন। এ কোন সুস্থ লোকের কাজ নয়। 'উনসাত্ত্বিক জাতের প্রসাদ মহা-প্রসাদ' এই তাদের ধারণা। বিয়ে বাড়িতে ভুরিভোজ সেরে বেরিয়ে দেখবেন পাশের ডাস্টবিনে কুকুর আর মানুষের লড়াই চলছে, মহাপ্রসাদের টানে। এরা এই মহাপ্রসাদ বহু খেয়েছে। তবু ভগবানের সুনজরে আসতে পারেনি। এদের নয় পকেটের অবস্থাই বিকৃত। মহাপ্রসাদ ছাড়া গতি নেই। কিন্তু যাদের পেছনে অনেক গৌরি সেন লেগে থাকে তাদের এরকম করা কেন? 'ভগবান খুশী হয়ে কিছু বাড়তি নম্বর দেবেন' এই আশায়! সাধে কি আর দেশের এই হাল। উন্নত দেশ

হলে এদের মানসিক রোগ শোধনাগারে পাঠান হত। আমাদের দেশে এরাই জনগণের পথপ্রদর্শক। লাথি ঝাঁটা ছাড়া আর আমাদের জুটবে কি।

স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বভ্রমণ সেরে বলেছেন 'কোথাও এমন জাত দ্বিতীয়টি দেখলুম না, এ মহামানবের জাত।' কি আনন্দ, কি আনন্দ, স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন আমরাই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাত, মহামানবের জাত। কি মুখরোচক কথা। জয় স্বামী বিবেকানন্দ, জয় গুরু, জয় গুরু।

স্বামী প্রেমানন্দ 'বাবুরাম মহারাজের মনে পুরুষোচিত কোন ভাব ছিল না', 'বাবুরামের বয়স তখন কিঞ্চিদধিক বিশ বৎসর, যদিও বালিকা সুলভ দেহ কান্তির জন্য তাহার বয়স অনেক কম দেখাইত'। (ঠাকুর রামকৃষ্ণ—ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য, পৃষ্ঠা-৩২৭-২৮)। দেখা যাচ্ছে স্বামী প্রেমানন্দ মন ও শরীর দুই দিক থেকেই বালিকা সুলভ। ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য 'প্রেমানন্দ প্রেমকথা'য় (চতুর্থ সংস্করণ পৃষ্ঠা-৩৭) বাবুরামের ব্যায়াম করা প্রসঙ্গে বলেছেন 'তাহার ললনা সুলভ দেহলতিকা অতিরিক্ত কঠোরতার চাপ সহ্য করিতে পারিত না।......তার কোন কোন অঙ্গে নারীজনোচিত লক্ষণও ছিল।......চাদরের কিছু অংশ মাথায় দিয়ে হাঁটলে তাকে পুরুষ বলে চেনাই যেত না।' অক্ষয়চৈতন্য যখন তাকে প্রথম দেখেছিলেন তার মনে হয়েছিল 'এক দেবী মূর্তি।'

বৃন্দাবন ভ্রমণের গল্প বলতে গিয়ে বাবুরাম মহারাজ বলেছিলেন 'একদিন ধ্যানের সময় একটি মেয়ে এসে তাকে ফলমূল দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। স্থানীয় লোকেরা বলে এ নিশ্চয় রাধারাণী কৃপা করে তাকে দেখা দিলেন।' ধৃষ্টতা মাপ করলে আমার কি মনে হয় বলব, বাবুরামের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন অবস্থায় যে মেয়েটি রয়েছে সে'ই তাকে দেখা দিয়ে গেছিল।

গুরুজীর হাতে একটু মুখশুদ্ধি দিতে গিয়ে ভক্ত অবাক, 'এ কি মানুষের হাত? এত কোমল, এত রক্তিম!' ভক্ত নিশ্চয়ই খেটে খাওয়া মানুষের সাথে গুলিয়ে ফেলেছিলেন। রামকৃষ্ণদেব বলে গেছেন—"বাবুরামের মহালক্ষ্মীর অংশে জন্ম—রাধারানীর অংশে।" এত পুরুষ দেবতা থাকতে রাধারাণী কেন? গণেশের অংশে জন্মালে কি ক্ষতি হত।

রামকৃষ্ণ মণ্ডলীতে 'সাধু' উপাধি একজনেরই ছিল। তিনি সাধু নাগ মহাশয়। এই সাধুটির জীবন শুধুই মানসিক বিকার দিয়ে মোড়া।

ইনি দুবার বিয়ে করেছিলেন। আবার বউয়ের সাথে এক বিছানায় শোবার ভয়ে রাত হলেই গাছে চড়ে বসে থাকতেন। (সাধু নাগ মহাশয়—শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী, পৃষ্ঠা-২০)। আর এক ভক্ত জীবনীকার বিনোদিনী মিত্র একেই 'অলৌকিকভাব' বলে উল্লেখ করেছেন। ভালোমন্দ খাওয়া ছেড়ে চালের কুঁড়ো গঙ্গা জলে মেখে তাই খেয়ে জীবন কাটাবেন ঠিক করেছিলেন। রান্নাবান্নার হ্যাপা নেই, স্মরণ-মনন-এর সময় তা হলে একটু বাড়ানো যাবে। (ঐ, পৃষ্ঠা-৮০)। রিপু জয় করার জন্য মাঝে মাঝে পাঁচ-ছয় দিন নিরম্বু উপবাসে কাটিয়ে

দিতেন। (ঐ, পৃষ্ঠা-৮৫)। প্রসাদ বলে দিলে যাতে করে দেওয়া হত সেটিকেও ছেড়ে কথা বলতেন না। সব উদরস্ত করে ফেলতেন। ভক্তরা তার ভাব দেখে বিভোর হয়ে পড়তেন। (ঐ, পৃষ্ঠা-৯৩)। পাশের বাড়ি আগুন লেগেছে, নাগ মহাশয়ের ঘরেও আগুন ছড়িয়ে পড়তে পারে। অগ্নিদেবকে এত কাছ থেকে দেখে তিনি আনন্দে নাচতে লাগলেন। স্ত্রী ঘরের মালপত্র বাইরে নিয়ে আসায় তাকে বোঝাচ্ছেন, 'এত কাছে অগ্নিদেবকে পেয়ে কোথায় তার স্তব করবে, না তো কি লেপ কম্বল নিয়ে পড়ে আছ।' (ঐ, পৃষ্ঠা-১৬৬-৬৭)। ইনি শিরঃপীড়ার জন্য বিশ বৎসর স্নান করেন নাই।

গুরুকুলের এক সাধক একবার তাদের বাড়িতে ঘুরতে আসেন। পিতার অনুরোধে সাধক তাকে সংসারী হয়ে সন্তান উৎপাদনে মনোযোগী হতে অনুরোধ করেন। নাগমশায় বলেন আপনি সাধক হয়েও এমন অন্যায় অনুরোধ করছেন। বলেই একখণ্ড ইট নিয়ে নিজের মাথায় আঘাত করে রক্তারক্তি কাণ্ড বাঁধিয়ে বসেন। সাধক মশায় ঘাবড়ে গিয়ে তার অনুরোধ প্রত্যাহার করে নেন। (ঐ, পৃষ্ঠা-১৪৮-৪৯)।

ঘুমন্ত নাগ মহাশয়ের মুখের উপর বিড়াল লাফিয়ে পড়ে মুখের দফা রফা করে দিয়েছে। তার মতে এও রামকৃষ্ণের দয়া। ঠাকুর বিড়াল রূপে এসে তার কোন পাপের শাস্তি দিয়ে গেলেন। (ঐ, পৃষ্ঠা-১৬৯-৭০)। অতি ভক্তিও এক প্রকার মানসিক রোগ। বাবা রেগে গিয়ে বলেছেন 'তুই ব্যাঙ খা', তো নাগ মশাই পিতৃ আজ্ঞা পালনে সত্যিসত্যিই একটা মরা ব্যাঙ যোগাড় করে খেয়ে ফেললেন।

নাগমশায় অত্যন্ত দয়ালু প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। উদাহরণ অনেক আছে। একবার এক সাহেব পাখি শিকার করতে নাগ মশায়ের গ্রামে আসে। নাগ মশায় রাগারাগি করে তার হাত থেকে বন্দুক কেড়ে নেন। আমরা এখনও শিকার শিকার খেলি। ভাল শিক্ষা গ্রহণ করাই কঠিন।

এহেন শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত সাধু নাগ মহাশয়ের মুখে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে এমন একটি ঘটনার বর্ণনা পাই যা বিশ্বাস করতে বেশ কষ্ট হয়। এমনকি আদৌ বিশ্বাসযোগ্য কিনা তা নিয়েও সন্দেহ হয়। দেওভোগ গ্রামস্থ নরেন্দ্র নামের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। সকলকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে লেখিকা পরমভক্ত বিনোদিনী মিত্রের দিকে তাকিয়ে নাগ মহাশয় বলছেন, —'ভগবান ইহকালের সুখ দেখেন না, পরকাল দেখেন। পরমহংসদেবের বাটীতে রঘুবীরের পূজা হইত। তাহার এক ভাইয়ের মেয়ে রঘুবীরের সেবা করিতেন। মেয়ের বিবাহ হইল। পরমহংসদেব দেখিলেন, মেয়ে স্বামীর বাড়ি গেলে ভালভাবে রঘুবীরের সেবা হইবে না। তিনি মা কালীকে বলিলেন, মা, উহাকে বিধবা করিয়া দে, সে বাড়িতে থাকিয়া রঘুবীরের সেবা করিবে। জামাই উলাউঠা হইয়া মারা গেল। পরমহংসদেব তাহাকে রঘুবীরের পূজার জন্য রাখিয়াছিলেন' নাগ মহাশয়ের কথা শুনিয়া সারদা পিসি (নাগ মহাশয়ের বোন) শান্তি পাইলেন। (শ্রী শ্রী নাগ মহাশয়, পৃষ্ঠা-৪২৭)।

স্বামী নিরঞ্জনানন্দ ছিলেন প্যারীচাঁদ মিত্রের ভূতুড়ে দলের মিডিয়াম। কোথায় ভূত নামানো, কোথায় প্ল্যানচেট এই সব নিয়েই তার দিন কাটত। পাগল প্রহারে এনার হাতযশ বেশ ভালো। এক পাগলী প্রায়ই মঠে আসত। ইচ্ছে, রামকৃষ্ণদেবকে গান শোনায়। নিরঞ্জনানন্দ তাকে বেদম প্রহার করে, মাথার চুল মুড়িয়ে মঠে ঢোকা বন্ধ করেন। স্বামী অভেদানন্দের সাথে এনার একদিক দিয়ে বেশ মিল। অভেদানন্দজী তো ভূত, প্রেত, আত্মা, প্রেতাত্মার নাড়ী নক্ষত্রের খবর পর্যন্ত তার 'মরণের পারে' বইতে লিখে রেখেছেন। সত্যিকারের ভূত-প্রেত, আত্মা-প্রেতাত্মা নিয়ে এমন সরস হাসির গল্প বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ ১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯০৩ বেলুড় মঠ থেকে একটি চিঠি লিখেছেন হরি মহারাজ স্বামী তুরিয়ানন্দকে। চিঠির শুরুতেই লিখছেন—'শরতের পত্রে জানিলাম যে, আপনার মাথার অসুখ আবার বাড়িয়াছে।' এই 'আবার বাড়িয়াছে' মানে কি? পুরানো মাথার ব্যামো। (উদ্বোধন, একাদশ সংখ্যা, ১১৫তম বর্ষ)।

'শশী মহারাজ (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে দুপুরবেলা একখানা লেপ মুড়িদিয়া শুইয়া থাকিতেন। একে দারুণ গরম, তাহাতে আবার লেপমুড়ি, গা দিয়ে দরদর করিয়া ঘাম বাহির হইত। তাহা না হইলে শশী মহারাজের আরামবোধ হইত না।' (স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী—মহেন্দ্রনাথ দত্ত, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, পৃষ্ঠা-৯১-৯২)। ঘোর গরমে লেপমুড়ি দিয়ে একদিন শুয়ে দেখুন না, সুকুমার রায়ের সেই রাজা আর শশী মহারাজা দুজনেই চোখের সামনে ভেসে উঠবেন। দেখবেন মাদ্রাজের গরমে গায়ে লেপকম্বল চাপিয়ে মহারাজ মন্দির তৈরি করছেন। এখানে আর একজনের কথাও উল্লেখ করা যায়, স্বামী বিজ্ঞানানন্দ। এক ভক্তকে চিঠি লিখেছেন, 'যদিও শীত চলে যাচ্ছে, তবুও সোয়েটারের কথা লিখছি, কারণ আমি সারা বছর সোয়েটার গায়ে দিয়ে থাকি। অতএব, তাড়াতাড়ি কাজ আরম্ভ করে দেওয়া হোক, শেষ করতেও যেন দেরি না হয়।' (প্রতক্ষ্যদর্শীর স্মৃতিপটে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ, পৃ - ১১৫)। স্বামীজী ছিলেন অত্যন্ত স্থূলকায়। এই রকম মানুষেরা গরমে কষ্ট পানও বেশি। তবুও গরমকালে সোয়েটার।

স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ বা সারদা মহারাজ—'কিন্তু তাহার মাথার একটু ব্যারাম হইল। মাথায় রৌদ্র লাগিলেই কখনো তিনি কাঁদিয়া উঠিতেন কখনো চিৎকার করিয়া উঠিতেন,.......সারদা মহারাজের 'কাক চরিত' অর্থাৎ কাকেরা কত প্রকার ডাকে ও তাহার কি অর্থ ও ফল তাহা জানিবার ইচ্ছা হইল।.....তিনি এক মনে সেই অন্ধকার ঘরটিতে বসিয়া সারাদিন কাকের নানারকম ডাক এবং কোন্ দিনে কোন্ মুখে বসিয়া ডাকিলে তাহার কিরূপ অর্থ হয়, কোন্ গাছের ডালে বসিয়া কিরূপ ডাকিলে তাহারই বা কি অর্থ হয় এই সব অতি মনোযোগ সহকারে শিখিতে লাগিলেন।' (স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী—মহেন্দ্রনাথ দত্ত, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম

সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, পৃষ্ঠা-৯৩-৯৪)। খবরদার কাক প্যাঁচার ভাষা শিখতে যাবেন না, রাঁচির পাগলা গারদে ভরে দেবে লোকে। ইনি বড় খাদ্য রসিকও ছিলেন। স্বামীজী ঠাট্টা করে বলতেন 'শালা, তোর স্টমাকটা আমায় দে দেখি'। ভীষণ জ্বরের মধ্যেও একসের রাবড়ি, আধ সের কচুরি ও তদুপযুক্ত তরকারি, ছিল তার কাছে নস্যি মাত্র।

১৯১১ গ্রীষ্মকাল, মা দেশে। জ্ঞান মহারাজ বলেন, তখন উদ্বোধনে আমি ঠাকুর পূজক। অমাবস্যা, রাত বারটা, কিছুতেই ঘরে ঘুম আসে না। উলঙ্গ হয়ে ছাদে নির্জনে একটু হাওয়া খাওয়ার আশায় গিয়ে দেখি, মোটা মানুষ তফাতে গঙ্গামুখো হয়ে দাঁড়িয়ে—সেই লজ্জায় নেমে আসতে উদ্যত হলাম, আমার তো দারুণ চোখের দোষ, মিষ্টি সুরে শরৎ মহারাজ বলছেন, ও জ্ঞান, কাকে লজ্জা করে পালাচ্ছো? আমিও ন্যাংটো, খুব হাসাহাসি তখন দুইজনে।' (রামকৃষ্ণ পার্ষদ পরশে—স্বামী নির্লেপানন্দ, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭১, পৃ - ৭৪-৭৫)।

এক ভক্তের অদ্ভুত স্বভাব দিয়ে এই অধ্যায় শেষ করব। পাথুরিয়াঘাটার বিত্তবান ভক্ত দুর্গাপদ ঘোষ। সারদামণির সেবায় রাশ রাশ টাকা খরচ করতেন। শেষ বয়সে বাগবাজারে মায়ের বাড়ির পাশে মস্ত এক বাড়িতে তিনি থাকতেন। একদিন অখণ্ডানন্দজী ও নরেন তাকে দেখতে যান। তারপর—'কথা কইতে কইতে হঠাৎ ভাঁড়টি নিয়ে আমাদের সামনেই পেচ্ছাব করলেন। তিনি উলঙ্গ। আবার খানিক পরে ওই ভাঁড়টি নিয়ে চকচক করে খেয়ে ফেললেন। আমরা বললাম, "করেন কি মশাই।" তিনি বললেন, "এ আর কি মশাই? ওলাউঠা হয়েছিল, তা যত বেরিয়েছে সব আবার এখানে (পেটে) দেওয়া হয়েছে। নবদ্বার দিয়ে যা বেরোয় সব আবার দিতে হয় - এই আমাদের মত"।' (স্মৃতিকথা, স্বামী অখণ্ডানন্দ, উদ্বোধন, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ - ১৯-২০)।

এই ধরণের ঘটনাগুলি আপনি যদি স্বাভাবিক মনে করেন তো স্বাভাবিক। আমার যেন একটু অন্য রকম ঠেকে।

বিবাহ ও ষোড়শী পূজা

শ্রীরামকৃষ্ণের বয়স প্রায় চব্বিশ। বিয়ের উপযুক্ত হয়ে উঠেছেন। কিন্তু বিয়ে হবে কি, গ্রামময় রটেছে গদাই পাগল হয়ে গেছে। চন্দ্রমণি দেবীও শুনেছেন সে সব কথা। তিনি ছেলের জন্য ভীষণ চিন্তায় দিন কাটাচ্ছেন। দক্ষিণেশ্বর থেকে ফিরলে ওঝা ডেকে ঝাড়ফুক থেকে শুরু করে বহু চেষ্টা করেছেন ছেলের আরোগ্যের জন্য। এসব করে বিশেষ কিছু উন্নতি হয়নি। তবে একদমই যে কিছু হয় নি তা নয়, মায়ের যত্নে এখন তিনি চান খাওয়াটা মোটামুটি সময়মত করছেন। একটু যেন প্রকৃতিস্থ হয়েছেন।

চন্দ্রমণি দেবী এবং দাদা রামেশ্বর গোপনে পরামর্শ করেন, এই সময় গদাধরের একটা বিয়ে দিয়ে দিতে পারলে হয়তো অপ্রকৃতিস্থ ভাবটা কেটে গেলেও যেতে পারে। হয়তো ঘর সংসারের দিকে একটু মন আসলেও আসতে পারে। পরামর্শ গোপনে হলেও রামকৃষ্ণদেব টের পেয়েছেন। বেশ আনন্দেই আছেন। মানে বিয়েতে অসম্মতির কিছু নেই। কিন্তু রামকৃষ্ণদেব রাজী হলেই তো আর মেয়ের বাবারা রাজী হচ্ছে না। সবাই জানে এ ছেলে পাগল। এর হাতে কেউ জেনেশুনে মেয়ে দেয়। যাও বা দু-একজন রাজী হচ্ছে, কিন্তু কন্যাপণ এমন হেঁকে বসছে যে রামেশ্বরকে সরে আসতে হচ্ছে। এখানকার রেওয়াজ অনুযায়ী বিয়ে করতে গেলে মেয়ের বাবা নয় ছেলে পক্ষকেই পণ দিয়ে বিয়েতে বসতে হত। শ্রীরামকৃষ্ণের লেগেছিল তিনশ টাকা।

কেউ বা পাগল বলে সরে যায়, কেউ বা পয়সার অঙ্ক বাড়িয়ে দিয়ে কাটিয়ে দেয়। অবস্থা এমনই চলছিল। এমন সময় রামকৃষ্ণদেব হঠাৎ বলে দেন 'জয়রামবাটী গ্রামের শ্রীরামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্যা পাত্রী হিসাবে কুটা বাঁধা হয়ে আছে।'

ওরে বাবা, এ কথা শুনে যে সেই ফরাসী ভবিষ্যৎ বক্তা নস্ত্রাদামস্-এর কথা মনে এসে যাচ্ছে। পাঁচশ বছর আগেই যিনি বলে গেছিলেন ইন্দিরাগান্ধীর বুকে কটা বুলেট ঢুকবে। এমন ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা পুরুষ তো রামকৃষ্ণদেব নন। তেমন কোন না দেখা ঘটনা, বা না শোনা ঘটনার বর্ণনা তাকে কোনদিন করতে দেখা যায় নি। যাও বা নিজের সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন 'একশ বছর পরে আবার আসবেন' সেও একটা কথার কথা। এহেন রামকৃষ্ণদেব কোন্ গ্রামে, কার ঘরে, কার মেয়ে তার জন্য কুটা বাঁধা হয়ে আছে বলে ফেললেন কি ভাবে!

অবাক হবার মতই ঘটনা। আগেও বলেছি এই রকম অবাক করা ব্যাপার শুধু অবাক হয়েই ছেড়ে দিতে নেই। একটু তলিয়ে দেখতে হয়। অনেক অজানা তথ্য বেরিয়ে পড়বে,

যা এতই সহজ সরল যে পরে হাত কামড়াতে ইচ্ছে হবে। মনে হবে কি বোকাটাই না বনেছি।

এ জায়গায় ঋষি অরবিন্দের কিছু অলৌকিক ক্ষমতার কথা আমি উল্লেখ করতে চাই। কোন কার্যকারণ সম্বন্ধ দিয়ে যার তল খুঁজে পাই নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উপর বেশ কিছু বই আমরা প্রায় সকলেই পড়েছি অথবা বিখ্যাত কিছু সিনেমাও আমরা দেখেছি। কিন্তু এই মহাযুদ্ধ থামার পেছনে ঋষি অরবিন্দের মহা যোগশক্তি ক্রিয়াশীল হয়েছিল এ কথার উল্লেখ কোথাও পাইনি। অথচ বিদেশিরা যে শ্রী অরবিন্দ পড়েনি তাও নয়। তার নিজের এবং তার সম্বন্ধে প্রায় সব লেখাই ইংরাজী ভাষায় লেখা। তা সত্ত্বেও এক ভেতো বাঙালীর মহান ঐশ্বরিক শক্তি তারা স্বীকার করে না। ঋষি অরবিন্দের একান্ত ভক্ত এবং মীরা মার স্নেহধন্য ডঃ পশুপতি ভট্টাচার্য তার 'বাংলার মহাপুরুষ' গ্রন্থে গুরুদেবের যোগশক্তি সম্বন্ধে বলছেন :— 'দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হিটলারের দাপটে ইংলন্ডের যে কি অবস্থা এসেছিল সে কথা সকলেই জানে। ডান্‌কার্কে মারাত্মকভাবে পরাজিত হবার পর ইংলণ্ডের তখন যায় যায় অবস্থা, হিটলার বললে ইংলন্ডের রাজপ্রাসাদে চড়াও হয়ে বসে সে ডিনার খাবে, তার তারিখ পর্যন্ত দেওয়া রইল ১৫ই আগস্ট, ঠিক শ্রী অরবিন্দের জন্মদিনে। ঐ সময়ে শ্রী অরবিন্দ তাঁর যোগশক্তি প্রয়োগ করেছিলেন। নিজেই তিনি সে কথা বলেছেন। তার ফলেই বল, কিংবা যেকোন কারণেই বল, যুদ্ধের অবস্থার যে হঠাৎ মোড় ফিরে গেল এ কথাও সকলে জানে। আবার জাপান যখন ভারতকে আক্রমণ করবে স্থির করেছিল, তখনও তিনি তার যোগশক্তি প্রয়োগ করেছিলেন। দেশের পর দেশ জয় করে আসতে আসতে হঠাৎ যুদ্ধের অবস্থার মোড় ঘুরে গিয়ে শেষ পর্যন্ত জাপানের কি দুর্দশা ঘটল সে কথাও সকলে জানে। এই সকল ব্যাপারে শ্রীঅরবিন্দ তার আধ্যাত্মিক শক্তিকে প্রয়োগ করেছিলেন, যাতে আসুরিক ও অশুভ শক্তির প্রাধান্য জগতে এসে না পড়ে।' (বাংলার মহাপুরুষ — পশুপতি ভট্টাচার্য, মডার্ন বুক্ এজেন্সি, প্রথম মুদ্রণ ১৫ আগষ্ট ১৯৫৫, পৃষ্ঠা - ১১১)।

এই বর্ণনাটাই ঋষি অরবিন্দের 'নিজের কথা' গ্রন্থের ৩৭-৩৮ পাতা থেকে হুবহু তুলে দিচ্ছি। সেখানে বর্ণনাটি আরো বিস্তারিত ভাবে পাওয়া যাবে। ঋষি অরবিন্দ তাঁর লেখা-লেখিতে কখনও বা নিজেকে গুপ্ত রাখতে ভালবাসতেন। 'আমি ভালবাসি' না বলে কখনও তিনি বলতেন 'ঋষি অরবিন্দ ভালবাসেন'। 'আমি দুধ খেতে ভালবাসি' না বলে 'ঋষি অরবিন্দ দুধ খেতে ভালবাসেন' এভাবেও তিনি বলতেন। 'নিজের কথা' (শ্রী অরবিন্দ সোসাইটি, পন্ডিচেরী, শতবার্ষিকী সংস্করণ, ১৯৭২) গ্রন্থটির প্রস্তাবনায় একদম শেষ অনুচ্ছেদটিতে বলা হয়েছে 'কোনে কোনো স্থলে তিনি নিজের সম্বন্ধে সরাসরি 'আমি' না বলে তৃতীয় ব্যক্তিরূপে বা উত্তম পুরুষে (third person) নিজের নাম দিয়ে বলেছেন, সে স্থলে সেই ভাবেই তা এখানে লিখিত হয়েছে, যদিও কথাগুলি তাঁর নিজেরই বলা'। এই কথাগুলি এখানে বলা হলো কারণ আমরা গ্রন্থটির যে অংশটুকু ব্যবহার

করতে চলেছি তা তৃতীয় ব্যক্তিরূপে বা উত্তম পুরুষে লেখা হয়েছে। পাঠক যাতে না ভেবে বসেন এ তো তাঁর নিজের লেখা নয়, অন্য কেউ লিখেছে। অতএব তার প্রামাণ্যতা নাও থাকতে পারে। না, না, এ রকম ভাববেন না। এ তাঁর সম্পূর্ণ নিজে হাতে লেখা প্রামাণ্য দলিল বিশেষ, যেখানে তিনি বলতে চাইছেন স্রেফ যোগ শক্তি প্রয়োগ করে তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থামিয়ে দিয়েছেন। আমি তার লেখাটি হুবহু তুলে দিচ্ছি। পাঠক এই উত্তম পুরুষ আর প্রথম পুরুষের গন্ডগোলটা মিটিয়ে নিয়ে পড়বেন। 'এইরূপ শক্তি শ্রী অরবিন্দ লাভ করেছিলেন, (পড়তে হবে— আমি লাভ করেছিলাম) এবং প্রথমে ব্যক্তিগত বিষয়ে সাফল্য পেয়ে সেই শক্তিকে তিনি জগতে ক্রিয়াশীল শক্তিগুলির উপর নিত্য প্রয়োগ করেছেন। এর সাফল্য তিনি যথেষ্টই দেখেছেন, তাই অন্যরূপ কোন বাহ্যক্রিয়ার প্রয়োজন বোধ করেন নি। দুবার অবশ্য এর উপরে আরো কিছু প্রকাশ্য কাজের দরকার হয়েছিল। প্রথম হয়েছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়। প্রথমে ঐ নিয়ে তিনি (আমি) কিছু মাথা ঘামান নি, কিন্তু যখন দেখলেন যে হিটলার অন্য সব শক্তিকে চূর্ণ করে দিয়ে জগতে নাৎসি প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, তখন তিনি সক্রিয় হলেন। নিজেকে তিনি মিত্র শক্তিদের স্বপক্ষে বলে ঘোষণা করলেন, যুদ্ধের তহবিলে কিছু অর্থ দিলেন এবং যারা এই যুদ্ধে যেতে চায় তাদের উৎসাহিত করলেন। আর তলে তলে তিনি (আমি) ডানকার্কের পরাজয়ের পর থেকেই মিত্র শক্তিদের সপক্ষে আধ্যাত্মিক শক্তি প্রেরণ করতে থাকলেন। যখন সকলেই মনে করেছে যে এবার ইংলন্ডের পতন আসন্ন ও হিটলারের জয় অবশ্যম্ভাবী, তখন হঠাৎ দেখা গেল যে জার্মান বিজয় লাভের গতি থেমে গেছে, যুদ্ধের ফলাফল বিপরীত দিকে মোড় নিয়েছে। এ কাজটি তিনি করেছিলেন, (পড়তে হবে— আমি করেছিলাম) কারণ তিনি দেখলেন যে হিটলারের পশ্চাতে রয়েছে মারাত্মক সব আসুরিক শক্তি, সুতরাং তাদের জয় হওয়া মানেই জগতের মানুষকে অসুভ শক্তির অত্যাচারের দাস হয়ে থাকতে বাধ্য করা, তাতে মনুষ্য জগতের আধ্যাত্মিক বিবর্তনের ধারা একেবারে থেমে যাবে; .....জাপানী তৎপরতার সময় তিনি নানা কারণে কিছু করতে চান নি, যতক্ষণ পর্যন্ত বোঝা না গেল যে তারা ভারতকেও আক্রমণ করতে চায়। .....যখন ও প্রস্তাব ভেঙ্গে গেল তখন শ্রী অরবিন্দ আততায়ীদের বিরুদ্ধে আপন অধ্যাত্ম শক্তি প্রয়োগ করতে থাকলেন, (প্রয়োগ করতে থাকলাম), তাতে দেখলেন যে এতদিন পর্যন্ত জাপানীরা যে দ্রুত জয়ের পর জয় লাভ করছিল তা থেমে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে সব কিছু উলটে গিয়ে শেষ পর্যন্ত তাদের চরম ও মারাত্মক পরাজয় ঘটল। আর এটাও তিনি দেখলেন যে তার ভবিষ্যত দৃষ্টি সফল হয়েছে, ভারত স্বাধীন হয়েছে, যদিও আভ্যন্তরীণ গণ্ডগোল রয়ে গেছে।" (নিজের কথা - শ্রী অরবিন্দ, পৃষ্ঠা ৩৭-৩৮)।

'নিজের কথা' গ্রন্থখানি ঋষি অরবিন্দের অনুমতি না নিয়েই ছাপা হয়েছে এমন ভাবার কোন কারণ নেই। এ মহাসমর থামিয়েছিলেন তিনিই, ইহাই সত্য। তবে এত দেরি করে যোগ শক্তি প্রয়োগ না করে আরো একটু আগে তিনি সক্রিয় হলে বহু মানুষ প্রাণে বাঁচত।

যাক, যা হয়নি তা হয়নি। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে যেন একটু আগে আগেই যোগ শক্তি প্রয়োগ করা হয়, ঋষির পায়ে এই প্রণতি জানিয়ে আমরা শ্রী রামকৃষ্ণের বিবাহ বাসরে প্রবেশ করি।

স্বামী গম্ভীরানন্দ শ্রীমা সারদাদেবী গ্রন্থে (পৃষ্ঠা-২৮) বলছেন —'শিহড়ে রামকৃষ্ণের ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত হৃদয়রাম মুখোপাধ্যায়ের গৃহ ছিল। এই সূত্রে ঠাকুর তথায় যাতায়াত করতেন। শ্রীমায়ের মাতুলালয়ও ঐ একই গ্রামে। এতদ্ব্যতীত শান্তিনাথ শিবের প্রাচীন স্থাপত্যানুযায়ী প্রস্তর নির্মিত মন্দিরকে কেন্দ্র করিয়া যে উৎসবাদি হইত তদুপলক্ষ্যে কিংবা সঙ্গতি সম্পন্ন গৃহস্থ গৃহে কীর্ত্তন ও যাত্রাভিনয়াদি দর্শনার্থে জয়রামবাটী নিবাসি অন্যান্য নরনারীর সহিত শ্রীমায়ের পিত্রালয়ের অনেকেই মধ্যে মধ্যে শিহড়ে যাইতেন। আশেপাশের গ্রামের অনেকেই আসিতেন। ক্ষুদ্র বালিকা সারদা ঐ সঙ্গীতের আসরে এক মহিলার ক্রোড়ে বসিয়াছিলেন। গীত সমাপনান্তে ঐ মহিলা তাহাকে সাদরে জিজ্ঞাসা করিলেন "এই যে এত লোক এখানে রয়েছে, এদের মধ্যে কাকে তোর বিয়ে করতে সাধ যায়?" অমনি উভয় বাহু তুলে সারদা অদূরে উপবিষ্ট রামকৃষ্ণকে দেখিয়ে দিলেন।'

তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি শিহড় গ্রামে ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের ভাগনে বাড়ি। আবার সারদাদেবীর মামার বাড়ি। দুজনেরই যাতায়াত ছিল, দেখা হয়ে থাকতেই পারে। মন্দিরে যাত্রা-কীর্ত্তনের অনুষ্ঠান হত, আশেপাশের গ্রাম থেকে লোকজন আসত। একজনের ভাগনে বাড়ি অপর জনের মামা বাড়ি থাকার সুবাদে দুজনেরই অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া খুব স্বাভাবিক। আর সেখানে তাদের দেখা হওয়া আরো স্বাভাবিক।

'শ্রীশ্রী মায়ের কথা' প্রথম খণ্ডে পরিচয় দান কালে (অষ্টম সংস্করণ, পৃষ্ঠা-১) শ্রীমতী সরলাবালা দাসী একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন—'এই যে বিবাহ, ইহা একটি আশ্চর্য পরিণয়। শোনা যায়, বিবাহের পূর্বেই রমণীগণের বনভোজন স্থলে ঠাকুর ও মা যখন নিজ নিজ জননীর সঙ্গে বনভোজনে আসিয়াছিলেন তখন তাহাদের প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল। ইহার পর যখন ঠাকুরের নানা স্থানে বিবাহ সম্বন্ধ হইতেছিল তখন কন্যা যে নির্দিষ্ট হইয়াই আছেন একথা ঠাকুর স্পষ্টই জানাইয়া ছিলেন এবং জয়রামবাটী গ্রামের সেই ছয় বৎসরের কুমারীটিই তাহার মনোনীতা ও নিরূপিতা বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন।'

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে বিয়ের আগেই কোনো ভাবে রামকৃষ্ণদেব সারদাদেবীকে দেখেছিলেন এবং পরে পাত্রী নির্বাচনের সময় সর্বত্র প্রত্যাখ্যাত হয়ে তার থেকে বয়সে প্রায় আঠারো বছরের ছোট সারদাদেবীর নামটি উত্থাপন করেছিলেন।

'জয়রামবাটীতে পাত্রী কুটো বাঁধা আছে' এই কথাটা অনেকে এমন ভাবে উপস্থাপিত করে যেন 'দেখেছ, যাকে কোনদিন দেখেনি, যার সম্বন্ধে কিচ্ছুটি জানে না পর্যন্ত, তাকেই কোন গণ্ড গ্রাম থেকে খুঁজে এনে বিয়ের পিঁড়িতে বসিয়ে দিলে।' ভাবখানা এই রকমই। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা আদৌ তা নয়। রামকৃষ্ণদেব সারদাদেবীকে ভালোভাবেই জানতেন।

আর একটু কথা এখানে যোগ করে দিই। সারদাদেবীর সাথে বিয়ের আগে সম্পর্কে সারদার এক মাসীর সাথে শ্রীরামকৃষ্ণের বিয়ে ঠিক হয়েছিল। কিন্তু ছেলে পাগল বলে ভাবিনী মাসীর বাবা জয়রাম মুখুজ্যে সেই বিয়ে ভেঙ্গে দেন। ভাবিনী মাসী পরবর্তী কালে একবার সারদাদেবীর ঘরে ফল মিষ্টির পাহাড় দেখে দুঃখ করে বলেছিলেন "পরমহংস দেবের সাথে বিয়ে হবার কথা ছিল আমারই। সেই বিয়ে হলে আজ এ সমস্ত হত আমার। অপরের মুখ চেয়ে থাকতে হত নি, বরং আমি কত বিলোতাম।" (মাতৃ সান্নিধ্যে—স্বামী ঈশানানন্দ, তৃতীয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা-১৫৫)।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে কেউ যেখানে বিয়ে দিতে রাজি হচ্ছে না রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কেন সেখানে তার মেয়ের বিয়ে দিলেন? আসল ঘটনা রামচন্দ্র পাত্র সম্বন্ধে যথেষ্ঠ খবরাখবর নিয়ে উঠতে পারেন নি। আর যাও বা খবর নিয়েছেন হৃদয়রাম, জয়রাম মুখুজ্যেরা 'খুব ভালো ছেলে' এই রকম বলে তাকে ভুল বুঝিয়েছে। রামকৃষ্ণ পুঁথির ১৩৫ পাতা থেকে কিছু অংশ এখানে তুলে দিচ্ছি। হৃদয়রামের দাদা হয়েছিলেন এই বিয়ের ঘটক।

মাতোয়ারা প্রভু যবে সাধনার চোটে।
প্রভুর প্রমত্ত কথা স্বদেশেতে রটে।।
শ্রীপ্রভুর শ্বশুর শাশুড়ি শুনি কথা।
মেয়ে পানে চেয়ে পান নিদারুণ ব্যথা।।
হৃদয়ের সঙ্গে দেশে দেখা হলে পরে।
ঘটকের ভাই হৃদু তাই হেতু ধরে।।
হেন বরে ঘটাইয়া কি মিটালে সাধ।
এত বলি স্ত্রী-পুরুষে করেন বিবাদ।।

'কন্যার এরূপ দূর্দশা দেখিয়া মার প্রাণ কি দিয়া প্রবোধ মানিবে? তিনি তনয়ার সর্ব্বনাশ দেখিয়া দশদিক শূন্যময় দেখিলেন।' (জীবনবৃত্তান্ত—রামচন্দ্র দত্ত, পৃ-৬১)।

'তবে জানা যায়, মা কচিৎ কখন ভক্তিমতী ভানুপিসির ঘরের বারান্দায় গিয়া আঁচল পাতিয়া শুইয়া থাকিতেন। হয়তো একটুক্ষণ বাহিরে থাকিবার ইচ্ছায় ঐরূপ করিতেন। হয়তো বা পিতৃগৃহেও তিনি সময়ে সময়ে কিছু অস্বস্তিবোধ করিতেন। কারণ, জামাই অসংসারী বলিয়া তাহার মায়ের মনে দুঃখের কোন পারাপার ছিল না। তিনি কখন কখন কন্যার সমক্ষেই মন্তব্য করিয়া বসিতেন, "একটা পাগ্‌লার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়েছি, মেয়েটাকে হাত পা বেঁধে জলে ফেলে দিয়েছি।" ইহাতে যে মেয়ের মনে আঘাত লাগে তাহা তিনি বুঝিলেও সামলাইতে পারিতেন না।' (শ্রী শ্রী মা সারদামণি দেবী - মানদাশঙ্কর দাশগুপ্ত, দ্বিতীয় সং ১৩৯০, পৃষ্ঠা-১৬-১৭)।

পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে জামাই সম্বন্ধে সঠিক খবর তারা বিয়ের আগে পান নি। তাই বিয়ের পরে তাদের এত আক্ষেপ। অন্যের ক্ষতিতে আনন্দ পাবার স্বভাব তো আমাদের

আছেই। এখানেও ঠিক তাই ঘটেছে। ঘটকালি বাবদ কিছু প্রাপ্তি যোগ তো আছেই। অতএব যাহোক করে বিয়েটা দিয়ে দিতে পারলেই হল। কার কি ক্ষতি হল তাতে ঘটকের কি এসে যায়।

পরবর্তীকালেও দেখি সারদাদেবীর মা শ্যামাসুন্দরীদেবী সারা জীবন এই বিয়ের জন্য আক্ষেপ করেছেন। হয়তো সঠিক খবর পেলে তিনি এই বিয়েতে রাজিই হতেন না। একথা জোর দিয়ে বলছি এই কারণে, শ্যামাসুন্দরীদেবী যদি আগে থেকে জেনে মেয়ের বিয়ে দিতেন যে তার হবু জামাই আধ পাগলা তাহলে তার সারাজীবন দুঃখ করার কোন কারণ থাকে না। কিন্তু তিনি তো বিয়ের জন্য আক্ষেপ করেছেনই। তার মানে তিনি জামাই সম্বন্ধে আগে থেকে সঠিক খবর পান নি।

শেষে বলি, রামকৃষ্ণদেব আগে থেকে সারদামণিকে জানতেন বলেই তাকে 'কুটো বাঁধা' করেছিলেন, না জেনে নয়।

বিয়ের পর সারদাদেবী তার বাপের বাড়ি চলে যান, শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে। এর অনেকদিন পর একবার রামকৃষ্ণদেব শ্বশুরালয়ে ঘুরতে যান। সারদাদেবীকে নিজে হাতে স্বামীর পা ধুইয়ে দিতে হয়, মাথার চুল দিয়ে পা মুছিয়ে দিতে হয়। জানিনা পা ধোয়া জল তাকে খেতেও হয়েছিল কিনা। তবে অনেকে খায়। আজকের যুগে মেয়েরা নারী স্বাধীনতা আন্দোলন করছে। সে সময় সারদাদেবী নিজের অজ্ঞাতে নারীত্বের যে অবমাননা মেনে নিয়েছিলেন আজকের মেয়েদের তার প্রতিবাদ করা উচিত। মহিমান্বিত নয়।

কেউ বা বলতে পারেন যুগ অনুযায়ী সেটাই ছিল স্বাভাবিক আচার। আমি বলি কি, সব প্রচলিত আচার মেনে চলার নাম গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসানো। বিধবা পুড়ছে, প্রচলিত ধারা, অতএব পুড়ুক। এর প্রতিবাদ করাই মহাপুরুষীয় লক্ষণ।

শ্রীরামকৃষ্ণ সারদাদেবীকে ষোড়শী পূজা করেছিলেন। কিন্তু এখানেও মনে নানা প্রশ্ন জট পাকিয়ে রয়েছে। আসলে আমাদের মন গুলোই এমন জট পাকানো যে সব কিছুর মধ্যেই জট খুঁজে পাই। আপনাদের মনে কি এ প্রশ্ন জাগে না উনিশ বছর বয়সের একটি বিবাহিতা মহিলাকে কেন ষোড়শী রূপে পূজা করা হল? যদিও তন্ত্র মতে উনিশ বছরের মেয়েরও ষোড়শী পূজা হতে পারে, মেয়েটি সুন্দরী হওয়া বাঞ্ছণীয়। যাক, কোন্ মতে কি পূজা হতে পারে, আর তাকে কতটা সুন্দরী হতে হবে এসব বিষয় এখানে আলোচ্য নয়। আমরা জানতে চাই হঠাৎ সারদাদেবীকে পূজো করা হল কেন।

সারদাদেবীর যখন বিয়ে হয় তিনি তখন নেহাত শিশু মাত্র। তারপর অনেকগুলো বছর কেটে গেছে, দু একবার শ্রীরামকৃষ্ণের সাথে তার দেখাও হয়েছে। কিন্তু স্বামীর সাথে একত্রে বাস এখনও হয়ে ওঠেনি। ১৮৭২ সালের চৈত্র সংক্রান্তির সময় তিনি দক্ষিণেশ্বরে এসে পৌঁচেছেন। প্রায় দু মাস হয়ে গেল সেখানেই রয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সাথে এক বিছানায়

শয়নও করছেন। ঠিক এই সময়কার অবস্থাটা যে ভাবে বুঝেছি প্রকাশ করার চেষ্টা করব। সেই সাথে এই সময় শ্রীরামকৃষ্ণের এবং সারদাদেবীর মানসিক অবস্থাটাও আমার দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী প্রকাশ করবার চেষ্টা করব।

শ্রীরামকৃষ্ণ আজীবন স্ত্রী সঙ্গের ঘোরতর বিরোধী। তার কাছে নতুন কেউ এলে প্রথমেই তিনি জিজ্ঞেস করতেন বিয়ে হয়েছে কিনা। বিয়ে হয়ে গেছে শুনলে তিনি হতাশ হয়ে পড়তেন। এ অবস্থায় কি ভাবে স্ত্রীকে পাশ কাটিয়ে সাধন ভজন নিয়ে থাকা যায় তার পরামর্শ দিতেন। এমন কি স্ত্রীকে ছেড়েছুড়ে ভগবৎ ভজনায় জীবন কাটানোর ব্যবস্থাও তিনি করে দিতে পারেন, এমন কথাও বলতেন।

সদ্য বিবাহিত শিষ্যকে তিনি বলছেন—"একদিন স্ত্রীকে এখানে নিয়ে আসিস-তাহাকে ও তোকে সেইরূপ করিয়া দিব ; আর যদি সংসার ত্যাগ করিয়া ঈশ্বর লাভ করিতে চাস, তা হইলে তাহাই করিয়া দিব।" (লীলাপ্রসঙ্গ, পৃষ্ঠা-৭৬৫)। অথবা মহেন্দ্র মাস্টারের সাথে কথোপকথন—'মণি (রামকৃষ্ণের প্রতি)—"স্ত্রী যদি বলে, আমায় দেখছো না, আমি আত্মহত্যা করব। তাহলে কি হবে?" শ্রীরামকৃষ্ণ (গম্ভীর স্বরে)—"অমন স্ত্রী ত্যাগ করবে। যে ঈশ্বর পথে বিঘ্ন করে। আত্মহত্যাই করুক , আর যাই করুক "।' (কথামৃত, দ্বিতীয় ভাগ, পৃ - ১১)।

ঠিক এই ঝামেলাতে ডুবে গিয়েই স্বামী ব্রম্মানন্দের স্ত্রী বিশ্বেশ্বরীদেবী গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। যার স্বামী, স্ত্রী ও শিশু পুত্রকে ফেলে রেখে শ্রীরামকৃষ্ণের কোলে শুয়ে দুধ খায়, ঘরে ফিরে আসার আর কোন আশাই নেই, তার পক্ষে আত্মহত্যাই বাঁচবার একমাত্র রাস্তা। তিনি মরে বেঁচেছেন। (ব্রম্মানন্দ লীলাকথা—ব্রম্মচারী অক্ষয়চৈতন্য, পৃ - ২০)।

শ্রীরামকৃষ্ণ, তার ভক্ত শিষ্যরা যদি বিয়ে না করে থাকে বা তাদের যদি বিয়ে করার ইচ্ছে নেই শোনেন তো আনন্দে আটখানা হয়ে উঠতেন। একটি দুটি ছেলেমেয়ে হয়ে গেলে সংসারী কেমন ভাই বোনের মত থাকবে, এই সব বোঝাতেন। তাকেই তিনি মরদ মানতেন যে স্ত্রীর পাশে শুয়ে নাক ডেকে ঘুমোবে। এই রকম সব চিন্তা ভাবনা শ্রীরামকৃষ্ণের মনে সব সময় গিজ গিজ করত। একান্ত পার্ষদদের আশীর্বাদ করতেন—'তোদের বংশ নির্বংশ হয়ে যাক'।

তা রামকৃষ্ণদেব এখন করেন কি। হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় বিয়েতে রাজি হয়ে গেছেন। এতদিন স্ত্রীকে ফেলে রেখে দক্ষিণেশ্বরে দিব্যি কাটছিল। এখন আবার তিনি এসে হাজির। আবার এক ঘরে শুচ্ছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের পক্ষে এসব মেনে নেওয়া ভীষণ কঠিন। তার মনের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে গেছে। পাশে শায়িতা স্ত্রীর দিকে যাবেন, না ঠাকুর দেবতা নিয়ে যেমন আছেন তেমনই থাকবেন। মনের মধ্যে তীব্র ঝড় বয়ে যাচ্ছে। সেই ঝড়ের বেগ তার দুর্বল, অসুস্থ, হিষ্টিরিয়া রোগগ্রস্ত শরীর সহ্য করতে পারছে না। তিনি অচৈতন্য হয়ে

পড়ছেন। (শ্রীশ্রী মা সারদামণী দেবী—মানদাশঙ্কর দাশগুপ্ত, পৃ - ২৩)। এই অচৈতন্য হয়ে পড়ার নামই ভাব সমাধি। ভক্তেরা ভক্তি মার্গের লোক, সমাধি টমাধি তারাই বোঝেন ভাল। আমরা সে অমৃতে বঞ্চিত। আসলে পরমেশ্বর আমাদের মতো অপাঙ্‌ক্তেয়দের জন্য এ বোধটুকুও বরাদ্দ করেন নি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—"বিয়ের পর ব্যাকুল হয়ে জগদম্বার কাছে প্রার্থনা করেছিলুম, মা, আমার স্ত্রীর ভেতর থেকে কামভাব একেবারে দূর করে দে।" (ঐ, পৃ-২৩)।

শ্রীরামকৃষ্ণ চান ভগবান। কিন্তু সারদাদেবী তো তা চান না, তিনি চান সন্তান। 'মা'র প্রাণে সত্যই ছেলের জন্য একটা দুর্দমনীয় বাসনা ছিল। তিনি নিকুঞ্জদেবীর নিকট বলিয়াছেন, "ঠাকুর একদিন বলিলেন, ছেলে কি হবে? এই দেখছো সব মরছে। তা আমি বললাম সব কি যায়! আর রামদত্ত প্রভৃতিকে একদিন বললেন, দেখ, বড় ছেলে ছেলে করে। তোমরা একবার নহবতে যাও, আর বলে এসো আমরাই আপনার ছেলে।" মার এই উক্তি দুইটি হইতে বোঝা যায় ছেলের জন্য তাহার প্রাণে কি গভীর আকাঙ্ক্ষা জাগিত।' (ঐ, পৃষ্ঠা- ৮৮)। শ্রীরামকৃষ্ণ তাকে বোঝাচ্ছেন 'তুমি একটি সন্তান চাইছ, কালে হাজার সন্তানের মা মা ডাক তোমাকে শুনতে হবে।' 'মন্দিরে মূর্তি হয়ে যে পূজা নিচ্ছে, আমার পা টিপে সেবা করছেও সে।'

ভগবানের স্ত্রী। সুতরাং ভগবতী হবার একটা সম্ভাবনা সারদাদেবীর রয়েই গেছে। রামকৃষ্ণদেব চাইছেন সেই দরজাটা খুলে দিতে। যাতে তিনি নিজেই ভাবতে পারেন, আরে, আমি কি একটা সাধারণ মেয়ে যে একটা ছেলের জন্য বায়না ধরব! আর এতেই রামকৃষ্ণদেবের মুক্তি। তাই রামকৃষ্ণদেব সারদাদেবীর মনকে প্রভাবিত করতে চাইছেন। মন্দিরের দেবতা আর যে আমার পা টিপছে অর্থাৎ সারদাদেবী, এরা আদতে একই।

এই সব বলে তিনি তার সমস্যাকে চাপা দিচ্ছেন, কিন্তু এতে সমস্যার স্থায়ী সমাধান হচ্ছে না। চাই বরাবরের মত নিষ্কৃতি। তার জন্য যদি স্ত্রীকে পুজো করতেই হয়, তাই তিনি করবেন।

কুমারী পূজো চলবে না। উনিশ বছর বয়স হলেও ষোড়শী পূজো চলতে পারে। তাই হোক, এসব করে যদি সারদাদেবীর মনের সন্তান বাসনাকে চাপা দেওয়া যায়। যদি একবার তাকে ভাবান যায় 'আমি তো ভগবতী, আমার আবার কামনা বাসনা কিসের!'

ফলহারিণী কালী পূজার অমাবস্যা তিথিতে সারদাদেবীকে রামকৃষ্ণদেব ষোড়শী রূপে পূজো করলেন। দীনু পূজারী নামে সারদাদেবীর এক ভাসুর পুত্র এই পূজোয় শ্রীরামকৃষ্ণকে সাহায্য করেন। পূজো হয়ে গেল, সারদাদেবী ভগবতী হয়ে তার ঘরে চলে গেলেন। রামকৃষ্ণদেব অর্ধচৈতন্য অবস্থায় পড়ে রইলেন তার ঘরে।

ষোড়শী পূজোর কারণ একটাই, সারদামণির মন থেকে সন্তান বাসনা মুছে ফেলা। সারদাদেবী জানলেন, যে তাকে ভগবতী জ্ঞানে পূজো করেছে তার কাছ থেকে ফুল চন্দন চাওয়া যায়, সন্তান কামনা, সে হতে পারে না।

ষোড়শী পূজো সারদাদেবীর কাছে একটা অলিখিত শর্ত হয়ে রয়ে গেল, যে শর্ত বলে তিনি স্বামীর কাছে সন্তানবতী হবার আবদারটুকু থেকেও বঞ্চিত হলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ঠিক এটাই চেয়েছিলেন। কিন্তু এসব করেও রামকৃষ্ণদেবের মনে ভয়ও কম ছিল না। 'শ্রীশ্রী লক্ষ্মীমণিদেবী'—শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র সেনগুপ্ত, ৫৭ পাতা থেকে কিছু অংশ এখানে তুলে দিলাম—

ঔষধ না করিতে শ্রীমাকে ঠাকুরের অনুরোধ

'কোন কোন স্ত্রী স্বামীকে বশীভূত করিবার জন্য ঔষধ প্রয়োগ করে। সেই প্রসঙ্গ লইয়া ঠাকুর শ্রীমাকে যাহা বলিয়াছিলেন, মা (লক্ষ্মীমণিদেবী) তাহার আবৃত্তি করিয়া বলিতেছেন,— "দেখ, ওরা (নানান জায়গার মেয়েরা) সব এসে হাঁস পুকুরে ঘুরে বেড়ায়। আর আমায় দেখে শুনে গিয়ে সব আপনাদের ভিতর কত কথাবার্তা কয়। আমি সব শুনতে পাই। বলে—এর সবই ভালো, তবে ঐ যে রাত্তিরে স্ত্রীর সঙ্গে একত্তরে শোন না-এই যা। ওদের কথাবার্তা, পরামর্শ তুমি শুনোনি বাপু । ওরা সব বলবে, এর মন ফেরাতে ঔষধ পালা কর। দেখ বাপু, ওদের কথায় আমায় ওযুধ পালা করোনি। আমার সব আছে। তবে ভগবানের জন্য, সব শক্তি তাকে দিয়ে দিয়েছি। শ্রীমা আলতো আলতো ভাষায় জবাব দিতেন—না না। সে কি কথা।" (অথবা, শ্রীশ্রী মায়ের পদপ্রান্তে, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-৯০৪)।

যে সারদাদেবীকে রামকৃষ্ণদেব পূজো করছেন, সকলের কাছে বলছেন এ মানুষ নয়, সাক্ষাৎ ভগবতী। দেবী সরস্বতী, রূপ লুকিয়ে এসেছে, আরো কত কি। আবার তাকেই তিনি ভয় পাচ্ছেন, তাকে ওযুধ পালা না করে ফেলে। কিন্তু এ সব তো গ্রামের অশিক্ষিতা মেয়েরা তাদের স্বামীকে বশে আনতে করে থাকে। যে কিনা সাক্ষাৎ ভগবতী তার কাছ থেকে এ ভয় কেন?

ঐ বইয়ের ২৩৬ পাতায় একই বিষয়ের আর একবার উল্লেখ পাচ্ছি। স্বামী সারদানন্দ এসেছেন লক্ষ্মীমণিদেবীর সাথে দেখা করতে। একথা সেকথার মধ্যে লক্ষ্মীদেবী বললেন "ঠাকুর তার মানসিক পরিবর্তনের জন্য ঔষধ প্রয়োগ করতে শ্রীমাকে মধ্যে মধ্যে বারণ করিতেন।....." শরৎ মহারাজ ইহা শুনিয়া বলিলেন, "ঠাকুরকে ঔষধ করিবার জন্য কয়েকবার চেষ্টা হইয়াছিল।" স্বামী চেতনানন্দের 'শ্রী রামকৃষ্ণকে যেরূপ দেখিয়াছি', প্রথম সংস্করণ, পৃষ্ঠা-১৩, সেখানেও ওযুধপালা বিষয়ের সাক্ষ্য পাওয়া যায়।

একবার নহবতে সারদাদেবী আর ভাইঝি লক্ষ্মীকে ভাগ্নে হৃদয় প্রসাদ দিতে গিয়ে একটু বেশি সময় হাসি ঠাট্টা করেছে। রামকৃষ্ণদেব কিন্তু সব লক্ষ্য রেখেছেন। হৃদয় ফিরে এলে দেরী করার জন্য তাকে তিরস্কার করে বলছেন "যাবি আর দিয়ে চলে আসবি। খবরদার, কখনো যেন আর দেরী না হয়।" (শ্রীশ্রী সারদামণি দেবী—মানদাশঙ্কর দাশগুপ্ত, পৃ - ৫৭)। শ্রীরামকৃষ্ণের এ ধমকের কারণ যেন কিছুর ইঙ্গিতবাহী।

রামকৃষ্ণ উত্থানের আর একটি কারণ

রাণী রাসমণি পর্বে মথুর বাবুর চেষ্টায় শ্রীরামকৃষ্ণ উত্থানের একটি কারণ বর্ণনা করেছিলাম। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ 'ফ্যাক্টর' এখন আলোচনা করব। এই ফ্যাক্টরটি সম্পূর্ণ ভাবে সামাজিক। ঠিক সেই সময়কার সামাজিক পরিস্থিতি।

বহু গ্রন্থেই এই বিষয়ে আলোচনা দেখতে পাই। সব বর্ণনাই সে সময়কার সামাজিক পরিস্থিতি সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছে। তার মধ্যে থেকে আমার পছন্দ মতো 'শ্রীশ্রী লাটু মহারাজের স্মৃতি-কথা'—শ্রী চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়-এর বর্ণনা এখানে ব্যবহার করলাম। (দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা-১৯-২২)। তিনি 'রামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব' পর্বে যা লিখেছেন হুবহু তা তুলে দিলাম—

'আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, ধর্ম ও রাষ্ট্র জগতের দিক হইতে তাহাকে সন্ধিক্ষণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তখন সবে মাত্র কোম্পানী রাজ্যের অবসান ঘটিয়াছে। সিপাহী বিদ্রোহের পরে এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া ভারতের জনগণ পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা দীক্ষা ও আদর্শের সম্মুখীন হইয়াছে। ভারতের যা কিছু কৃষ্টি, সভ্যতা, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য ভাব ধারার কষ্টি পাথরে যাচাই হইতে চলিয়াছে। সে-হেন যুগ সন্ধিক্ষণে নানা আদর্শের সংঘাতে ও নানা আন্দোলনের মাঝে বাংলার তথা ভারতের হিন্দু সমাজ লক্ষ্য হারা হইতে বসিয়াছিল।

তৎকালীন চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের অধিকাংশেরই মধ্যে প্রশ্ন জাগিয়াছিল—তাহারা যে পথে চলিয়াছেন, যে ধারায় জীবন যাপন করিতেছেন, তাহাতে ঐহিক ও পারলৌকিক সার্থকতা আছে কি-না। তাহাতে জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে কি না। চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের দৃষ্টি ভঙ্গির মধ্যে বিভিন্নতা থাকায় তাহারা ঐ একই প্রশ্নের সমাধানে বিভিন্ন পথের নির্দেশ দিলেন। কেহ কেহ বলিলেন, সমাজ তরণীখানিকে ভারতীয় আদর্শ বন্দর হইতে নোঙর মুক্ত করা হউক ; কেহ কেহ বলিলেন পাশ্চাত্ত্য আদর্শ ও ভাবধারার মধ্যে যেগুলি ভালো ও গ্রহণীয় তাহাই ভারতীয় সমাজের মধ্যে প্রচলিত করা হউক ; আবার কেহ কেহ নির্দেশ দিলেন, যা কিছু পাশ্চাত্ত্য তাহাই ত্যাজ্য এবং যা কিছু ভারতীয় তাহাই রক্ষণীয়। এইরূপ নানা লোকের নানা মতে ও বিভিন্ন বিধানে সমাজের ক্ষীণ প্রাণশক্তির ওপর নানা অত্যাচার আরম্ভ হইয়া গেল। সকলেরই উদ্দেশ্য ছিল সমাজকে ব্যাধি মুক্ত করিতে, কিন্তু একই কালে সমাজ দেহের ওপর সকলের চিকিৎসা বিধান চালু হওয়ায় সমাজের ব্যাধি দূর হওয়া দূরে থাকুক, তাহাতে অধিকতর জটিলতা আসিয়া উপস্থিত হইল।

তৎকালীন চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের বিধানের ফলে সমাজ স্তরে তিনটি বিভিন্ন দল, তিনটি ভিন্ন ভিন্ন মত ও পথ হইয়াছিল। এক দল প্রাচীন নিথর সমাজকেই প্রাণবন্ত বলিয়া চালু করিবার চেষ্টা করিলেন; তাহারা পুরাণবাদকে আঁকড়াইয়া রহিলেন, অদৃষ্টকে জীবনের শ্রেষ্ঠ নিয়ামক বলিয়া রাষ্ট্র ও ধর্ম বিপর্যয়ে আপনাদের পুরুষকার হীন অনুদ্যমকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। পারলৌকিক সুখ ভোগকে তাহারা কবিত্বময় করিয়া সাধারণের সমক্ষে ধরিলেন এবং ইহলৌকিক দুঃখ দুর্দশা গুলিকে পরীক্ষার মানদণ্ড হিসাবে গণ্য করিয়া তাহাতে সন্তুষ্ট থাকিতে উপদেশ দিলেন। তাহারা সামাজিক বিধিগুলির অপেক্ষা নিষেধ গুলির উপর জোর দিতে চাহিলেন। এবং যে কেহ নিষেধাত্মক কর্মগুলির সম্পাদনে দুঃসাহস দেখাইলেন তাহাদিগকে সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া শাস্তি প্রদান করিলেন।

তৎকালীন প্রচলিত কৌলিন্য ও ছুঁতমার্গকে তাহারা ধর্মের অঙ্গ করিয়া তুলিলেন এবং দেশাচারে লোকাচারে (কুসংস্কার প্রচলিত থাকিলেও) রক্ষণশীল হওয়াকেই গৌরবের ও পৌরুষের বিষয় বলিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন। এই দলের মধ্যে তৎকালে শাস্ত্র পাণ্ডিত্যই প্রশংসনীয় হইয়া উঠিয়াছিল এবং আড়ম্বর ও গড্ডলিকাই সম্মানজনক স্থান পাইয়াছিল। তাহাদেরই দূরদৃষ্টির অভাবে দলের মধ্যে ভাঙন ধরিয়াছিল। এবং সেই ভাঙনে অপর দুটি দল নিজেদের পুষ্ট করিয়া লইতেছিল।

অপর দুটি দলের মধ্যে একটি ছিল পাশ্চাত্ত্য আদর্শ মুগ্ধ শিক্ষিত সমাজ। এই দলে অধিকাংশ ব্যক্তিই হিন্দুয়ানীতে বিশ্বাস হারাইয়া ছিলেন। তাহাদের ধারণায় ভারতীয় যা কিছু তাহাই নিকৃষ্ট, আর পাশ্চাত্ত্য যা কিছু তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা বৈজ্ঞানিক জড়বাদকে গ্রহণ করিয়া পার্থিব ভোগবাদকে জীবনের কাম্য জ্ঞান করিতেন। ভোগ পরিপন্থী ত্যাগ ও সন্ন্যাসবাদকে অশ্রদ্ধেয় গণ্য করিয়া আচারহীন উচ্ছৃঙ্খল তৃপ্তিকে তাহারা পরমারাধ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐহিক সার্থকতাই তাহাদের নিকট শ্রেষ্ঠ সাধনা বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিল।

তৃতীয় দলটি পাশ্চাত্ত্য আদর্শ মুগ্ধ হইলেও সনাতন হিন্দু ভাব ধারাতে আস্থাহীন হন নাই, যদিও প্রচলিত হিন্দু ধর্মের উপর তাহাদের শ্রদ্ধা ছিল না। তাহারা চাহিয়াছিলেন প্রচলিত হিন্দু ধর্ম ও অনুষ্ঠানগুলির সংস্কার এবং এই অপরাধে তাহারা সমাজচ্যুত হইয়াছিল। তৎকালীন হিন্দু সমাজ যাহাদের বর্জনের নির্দেশ দিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে যাহারা অন্তরে বৈদিক ও ঔপনিষদিক ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন, তাহারা বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সমাজ স্থাপন করিয়া সনাতন হিন্দু আদর্শের প্রতি সাধারণকে সচেতন করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। তাহাদেরই প্রচারের ফলে সমাজের মধ্যে বিরাট আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয় দলের প্রচারে সমাজে অনাচার ও বিশৃঙ্খলা আসিয়াছিল, কিন্তু এই তৃতীয় দলের প্রচারে সমাজের মধ্যে বিপ্লব মাথা তুলিয়াছিল।

এ-হেন সঙ্কটকালে সকলেই একজন সুচতুর কাণ্ডারীর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়াছিলেন। যিনি তৎকালীন জীর্ণ সমাজ নৌকাকে বাক্‌বিতণ্ডার ঝড় হইতে বাঁচাইয়া, সংকীর্ণতা মলিন অভিমান তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাত হইতে রক্ষা করিয়া, মোহসমুদ্রের অগাধ গভীরতা হইতে উদ্ধার করিয়া, ভারতীয় আদর্শ ধারার ও জীবন বিধানের সনাতন আলোক স্তম্ভকে দেখাইয়া দিতে পারেন; যিনি ভগ্ন তরীকে সংস্কার মার্জিত করিয়া পুনরায় ব্রহ্মসাগরগামী করিয়া তুলিতে পারিবেন; যাহার স্পর্শে মুমূর্ষু সমাজ নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া ধীরে সুস্থে সরল ও প্রাণবন্ত হইয়া উঠিতে পারিবে, সে-হেন কাণ্ডারী কে? তৎকালীন অনেকেই জানিতে বা অনুমান করিতে পারেন নাই যে, তিনি আসিয়াছেন।'

সব মিলিয়ে সে সময় সমাজে এক চরম অসহিষ্ণু অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। যুব সমাজ যা কিছু পৌরাণিক, প্রগতি বিরোধী সমস্ত কিছু ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বিজ্ঞান, যুক্তিবাদকে জীবনে অঙ্গীভূত করতে চাইছিল। আর এক দিকে ছিল সমাজের মূল অংশ, প্রাচীন পন্থী, সনাতন পন্থীর দল। যারা অষ্টপ্রহর নামগান, হরিকীর্ত্তন, তিথি নক্ষত্র নিয়ে জীবন কাটাতে চায়। কিন্তু এই নব যুবক দল যেন তাদের সামনে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে। এরা পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠছে। সেই সঙ্গে আছে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার গুরুপাক ভোজনের কিছু বদহজমও। এদেরকে বুঝতে হবে। ফিরিয়ে আনতে হবে সেই প্রাচীন ভারতবর্ষ। যেখানে মুনি ঋষিরা গাছ তলে বসে পাঁচ হাজার বছর ধরে কঠোর তপস্যায় রত। সন্ধ্যা হলেই তুলসী তলে পিদিম জ্বালার ধুম পড়ে যাবে। পাঁজি পুঁথি ঘেঁটে দেখতে হবে কোন কাজটা কখন করলে ফলবতী হবে। এই যুব সম্প্রদায়ের পাল্লায় পড়ে সে সব সনাতনী প্রথা যেন লোপ পেতে বসেছে। দেশটা রসাতলে গেল। বিদেশী শত্রুর হাত থেকে কে দেশ বাঁচায় তা নিয়ে মাথাব্যাথা নেই, এই সনাতনী প্রথা বিরোধী যুবক দলকে বুঝতে হবে।

চাই হাতিয়ার। এমন কোন হাতিয়ার যা সামনে রেখে ধর্ম রাজ্যের সেই ছেঁড়া পতাকাটা আবার উড়িয়ে দেওয়া যায়। আর ঠিক এই আবহবর্তেই শ্রীরামকৃষ্ণের আগমন। মথুর বাবুর প্রচারে লোকের মুখে মুখে ফিরছে শ্রীরামকৃষ্ণের নাম। রবীন্দ্রনাথের কবিতার সাথে জগাখিচুড়ি পাকিয়ে এই ভাবে বলা যায়—

গ্রামে গ্রামে সেই বার্তা রটি গেল ক্রমে।
এক মহা সাধক এসেছেন দক্ষিণেশ্বর ধামে।।

তিনি পথে ঘাটে পড়ে 'মা মা' করে কাঁদছেন। এই সজ্ঞান, এই অজ্ঞান। ঈষৎ তোতলা, বচনে অপরিশীলিত, অথচ কথার মধ্যে এমন এক মোহিনী শক্তি আছে যা উপেক্ষা করে কার সাধ্য। তার ধর্ম বাণী শোনার জন্য আপামর শিক্ষিত অশিক্ষিত জনসাধারণ দক্ষিণেশ্বরে জড় হতে লাগল। এই সেই প্রাচীন ভারত, যাকে ফিরে পেতে চেয়েছে লক্ষ

লক্ষ প্রাচীন পন্থী ভারতবাসী। যাকে খোঁজা হচ্ছিল তাকে পাওয়া গেল, যাকে পাওয়া যাচ্ছিল সে হারিয়ে গেল।

হালের উন্নতিশীল নব্য সভ্যগণে।
সাকারের প্রতিবাদী সাকার না মানে।।
ইংরাজী শিক্ষার গুণে প্রায় এই ফল।
তদুপরি ব্রাহ্মধর্ম দেশেতে প্রবল।।
তন্ত্র গীতাপুরানাদি গেছে রসাতলে।
ইংরাজী বিজ্ঞান শাস্ত্র তাদের বদলে।।
এহেন মার্জিত বুদ্ধি উদ্ধারের তরে।
শ্রী প্রভুর আবির্ভাব লীলার আসরে।। (পুঁথি, পৃ - ৬০১)

স্বামী সারদানন্দ তার বাল্যকাল সম্বন্ধে বলছেন—'আমাদের বাল্য জীবনটা বাংলা দেশে ভাঁটার মত হইয়াছিল। অর্থাৎ সেই সময় পুরাতন বাংলা শেষ হইয়া যাইতেছিল, একেবারে কাদা পাঁক জমিয়াছিল এবং নতুন বাংলা আসিবার উপক্রম করিতেছিল, ঠিক এই দুইয়ের মধ্যস্থলে আমাদের বাল্য জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল।'

স্বামী সারদানন্দের বাল্যকাল মানে ঠিক শ্রীরামকৃষ্ণের উত্থানের সময়। ঠিক যে সময় পুরাতন বাংলা শেষ হয়ে নতুন বাংলা জেগে উঠছে। কিন্তু বাংলা তো জাগল না। জাগলেন ধর্মের খোলকর্ত্তাল বাজিয়ে, কীর্ত্তন গাইতে গাইতে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব। এই রকম টালমাটাল সামাজিক পরিস্থিতির মধ্যেই শ্রীরামকৃষ্ণের উত্থান। উত্থান না বলে বলা উচিত তাকে খুঁজে বার করা হল, দোদুল্যমান সমাজের চিত্ত স্থিতিশীল করার জন্য। কিন্তু কি পেলাম আমরা এই উত্থানের মধ্যে দিয়ে? রমাঁ রলাঁর মাঝে মাঝে রামকৃষ্ণের ভাব দেখে সংশয় হচ্ছে তিনি এ যুগে আছেন, না হাজার বছরের প্রাচীন কোন গীর্জায় বসে আছেন। (রামকৃষ্ণের জীবন, প্রথম প্রকাশ, পৃষ্ঠা-২৪)। আমাদের পাওনাও এইটুকুই। হাজার বছর পিছিয়ে যাওয়া।

শ্রীরামকৃষ্ণের উত্থানে এক ভৈরবী ব্রাহ্মণীর আগমন অত্যন্ত সহায়ক রূপে দেখা দিয়েছিল। হয়তো ঐ ভবঘুরে মহিলা ভবঘুরে সাধু সন্ন্যাসীদের কাছে খবর পেয়েছিলেন দক্ষিণেশ্বরে জীবন্ত ভগবান বাস করছেন। 'যাও একবার গিয়ে দেখে এসো,' সেই সঙ্গে কিছু দিনের থাকা খাওয়ার নিশ্চিন্তি।

এই ভৈরবী অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্খী মহিলা। তিনি নিজেকে নিজেই মা মনসা বলে ভাবেন। তার আশা ধরাধামে একটি অবতার উত্থানে তার যদি কিছু হাত থাকে! এতকাল বিস্তর জপতপ নিয়ে কাটিয়েছেন। এখন ইচ্ছা যদি একটি অবতারের জন্ম দিতে পারেন তো তোফা হয়। মাধ্যমিক পরীক্ষায় ফাস্ট বয় তৈরি করলে যেমন মাস্টারমশাইয়ের গ্রেড বেড়ে যায়, সে রকম আর কি।

দক্ষিণেশ্বর পৌঁছেই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে বলছেন "বাবা, তুমি এখানে রহিয়াছ! তুমি গঙ্গা তীরে আছ জানিয়া তোমায় খুঁজিয়া বেড়াইতেছিলাম। এতদিনে পাইলাম।" আমরা দেখেছি ভৈরবী নৌকা যোগে সোজা দক্ষিণেশ্বরে এসে উঠেছেন। অন্য কোথাও খোঁজাখুঁজি করেছেন বলে তো মনে হয় না। আর নৌকোয় চড়ে যদি গোটা গঙ্গা চষে বেড়াতে হয়, এত নৌকা ভাড়া তাকে যোগায় কে? তবে কম বয়সী সুশ্রী ভৈরবী, দু চারটি গৌরী সেনের মত ভৈরব তার থাকতেও পারে।

তারপর ভৈরবী বলছেন "তোমাদের তিন জনের সাথে দেখা করিতে হইবে, একথা জগদম্বার কৃপায় পূর্বে জানিতে পারিয়াছিলাম। দুই জনের দেখা পূর্ব (বঙ্গ) দেশে পাইয়াছি, আজ এখানে তোমার দেখা পাইলাম।" স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে ভৈরবী হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছেন এমন একজনকে যাকে তিনি অবতার রূপে সকলের সামনে তুলে ধরতে পারবেন।

এ ব্যাপারে ঈর্ষাকাতর হতেও তার আপত্তি নেই। ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য বলছেন— 'ধর্ম সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া যদি কেহ বলিত, ঐ বিষয়ে সে ঠাকুরের মতামত গ্রহণ করিবে, ব্রাহ্মণী তাহাতে রুষ্ঠা হইয়া বলিতেন, "সে আবার বলবে কী? তার চক্ষুদান তো আমিই করেছি"।' (ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, পৃ - ১৫১)।

পূর্ববঙ্গে দুজনের (চন্দ্র ও গিরিজা) পিছনে জোর চেষ্টা চালিয়েছিলেন। কিন্তু তেমন ফললাভ হয় নি। এখন শ্রীরামকৃষ্ণকে নিয়ে পড়বেন। তাকে নানা উপায়ে সাধনা টাধনা করিয়ে তৈরি করার চেষ্টা করবেন। (তন্ত্র সাধনকালে রামকৃষ্ণদেবকে নর মাংসও খাইয়ে ছাড়েন তিনি)। তারপর মথুর বাবুকে দিয়ে পণ্ডিত ডাকিয়ে, সভা সমিতি করে প্রমাণ করার চেষ্টা করবেন শ্রীরামকৃষ্ণ সত্যিই অবতার। এবং অবতারের শিক্ষক অন্য কেউ নয়, তিনি নিজে।

তার এই প্রচেষ্টায় তিনি কিছুটা সফলও হয়েছিলেন। মথুর বাবুর প্রচার, সমাজের ধর্মীয় চাহিদা, এই সব নানা কারণ একমুখী হয়ে ভৈরবীর সাফল্য লাভে সহায়তা করেছিল। এত কিছুর পরও ভৈরবী রামকৃষ্ণমণ্ডলীতে বেশি দিন টিকতে পারেন নি। সারদাদেবী এবং হৃদয়ের সাথে মনমালিন্য তাকে চলে যেতে বাধ্য করে। যদিও জার্মান গবেষক ফ্রেডারিখ ম্যাক্সমূলার এই ভৈরবী ব্রাহ্মণী চরিত্রটি নিয়েই সন্দিহান। তার মতে এটি একটি ভক্তদের মস্তিষ্ক প্রসূত কাল্পনিক চরিত্র। অগত্যা আমরা আর কি করি। দেড়শো দুশো বছর আগের ব্যাপার, লেখক যেটুকু জানাবেন তার বাইরে আর জানার উপায় কোথায় !

ভাগ্নে হৃদয়রামও শ্রীরামকৃষ্ণ উত্থানে কিছুটা সহায়ক ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তবে একটু অন্যভাবে। তিনি ছিলেন অভাবী লোক। মামার অবতারত্ব প্রচার করে বেশ দু পয়সা

কামিয়ে নেওয়াই তার মতলব ছিল। তবে মতলব যাই থাকুক না কেন তার এই প্রচারটুকুও রামকৃষ্ণ উত্থানে কিছুটা সহায়তা তো করেইছে। তাকেও একটি ছোট 'ফ্যাক্টর' রূপেই গণ্য করা উচিত। রামকৃষ্ণমণ্ডলী সম্পর্কে আজ আমরা যত খবর পাই তার একটা বড় অংশ হৃদয়রামের থেকেই সংগৃহীত।

প্রসঙ্গক্রমে ভৈরবীর অপর দুই শিষ্য 'চন্দ্র ও গিরিজা' সম্বন্ধেও কিছু আলোচনা করা যায়। এরা সত্যিই দুটি রত্ন ছিলেন। ভৈরবী এদেরকেও দক্ষিণেশ্বরে এনে হাজির করেন। এদের সম্বন্ধে রামকৃষ্ণদেব বলতেন "চন্দ্র ভাবুক ঈশ্বর প্রেমিক ছিলেন। তাহার 'গুটিকা সিদ্ধি' লাভ হইয়াছিল। মন্ত্রপূত গুটিকাটি অঙ্গে ধারণ করিয়া তিনি সাধারণ নয়নের দৃষ্টি বহির্ভূত বা অদৃশ্য হইতে পারিতেন। এবং অদৃশ্য হয়ে যেখানে সেখানে যেতে পারতেন।" (লীলাপ্রসঙ্গ, পৃষ্ঠা-৪৮৪)। এই বিদ্যাকে বলে তিরস্করণী।

আর একজন শিষ্য গিরিজাকে নিয়ে রামকৃষ্ণদেব শম্ভু মল্লিকের বাগানে ঘুরতে গেছেন। ফিরতে একটু বেশি রাত হয়ে গেছে। অন্ধকারে কিছু দেখতে পাচ্ছেন না। শ্রীরামকৃষ্ণের এরকম কষ্ট দেখে গিরিজা আর থাকতে পারলেন না। বললেন "দাদা, একবার দাঁড়াও, আমি তোমায় আলো দেখাইতেছি।" এই বলিয়া পশ্চাত ফিরিয়া দাঁড়াইলেন এবং তাহার পৃষ্ঠদেশ হইতে জ্যোতির একটা লম্বা ছটা নির্গত করিয়া পথ আলোকিত করিলেন। ঠাকুর বলিতেন, সে ছটায় কালী বাড়ির ফটক পর্যন্ত বেশ দেখা যাইতে লাগিল ও আমি আলোয় আলোয় চলিয়া আসিলাম। (লীলাপ্রসঙ্গ, পৃষ্ঠা-৪৮৬)।

চন্দ্র ও গিরিজাকে মিউজিয়ামে রাখা উচিত ছিল। ভেবে দেখুন কি আশ্চর্য সব ঘটনা। একটা পুরোদস্তুর মানুষ অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। তার চামড়া, মাংস, হাড়গোড় থেকে শুরু করে পোষাক আশাক পর্যন্ত। এই জামাকাপড় অদৃশ্য হওয়াটা আমার বড় আশ্চর্য ঠেকে। লক্ষ্য করে দেখবেন যারা ভূত দেখেছে প্রায় সবাই বলে ভূতটা একটা সাদা কাপড় পরেছিল। তারপর সব সমেত অদৃশ্য হয়ে গেল।

তা ভূতেরা নয় দৃশ্য-অদৃশ্য সব রকম হতে পারে। কিন্তু তার সাদা কাপড়টা (অন্য রংও হতে পারে) অদৃশ্য হয় কি করে? কাপড়েরও কি আত্মা, প্রেতাত্মা, কামনা-বাসনা এসব আছে নাকি? বুদ্ধিমান ভূত বিশ্বাসী বলবেন মৃত্যুকালে যে পোশাক সে পরেছিল তার প্রতি প্রেতাত্মার একটা টান থেকে যায়। তাই সে ঐ পোশাকেই দেখা দেয়। সমস্যা কিন্তু একই রয়ে গেল। পোশাক যখন অদৃশ্য হচ্ছে তাহলে তারও আত্মা বা বাসনা থাকতে হয়। ভেজালের দেশ হলেও এমন কোন কোম্পানীর নাম তো কখনো শুনিনি যারা আত্মা বা কামনা ভেজাল মিশিয়ে কাপড় তৈরি করে।

আর পিঠ থেকে আলো বার করে শ্রীরামকৃষ্ণকে পথ দেখানো! সত্যি, পড়তে পড়তে মনে রোমাঞ্চ জাগে। নিজেদের মনে হয় অতি অকিঞ্চিৎকর। না পিঠের আলো, না চোখের

আলো, না জ্ঞানের আলো। তবে স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যম ভ্রাতা শ্রী মহেন্দ্র নাথ দত্ত তার 'রামকৃষ্ণের অনুধ্যান' (পৃষ্ঠা-১৭১) গ্রন্থে পিঠ থেকে আলো বেরনোর অপূর্ব যুক্তিপূর্ণ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়ে গেছেন। সেই যুক্তিজাল যদি মেনে চলতে পারেন লোডশেডিং-এ আপনার আর কোন চিন্তা নেই।

স্বয়ং ব্রহ্ম

সাংখ্য দর্শন, ঈশ্বর আদৌ আছেন কি নেই এই নিয়ে এক জটিল সমস্যা তৈরি করে রেখেছেন। আত্মা প্রসঙ্গে সেখানে বলা হয়েছে—'আত্মা যদি বদ্ধ হন, তাহলে আত্মা ক্রীতদাস স্বরূপ। ক্রীতদাস সৃষ্টি করে না। আর আত্মা যদি মুক্ত হন তাহলে বাসনা রহিত। যার বাসনা নেই, সে সৃষ্টি করবে কেন?'

আত্মা, ঈশ্বর, ভগবান নিয়ে প্রশ্ন যতই থাকুক, তাতে শ্রীরামকৃষ্ণের কিছু এসে যায় না। কারণ শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে একটা ধারণা তৈরি করানো হয়েছিল তিনি মানুষ নন, ভগবান। এই ধারণাটাই তার মনকে এমন পেয়ে বসেছিল যে তিনি নিজেও নিজেকে ভগবানের থেকে আলাদা করতে পারতেন না। মাঝে মাঝে ভক্তদের দিয়ে যাচাই করিয়ে নিতেন সত্যই তিনি ভগবান কিনা। এই ব্যাপারটা তিনি খুব উপভোগও করতেন।

'শ্রী রামকৃষ্ণ আবার (নরেন্দ্রকে) ইঙ্গিত করিতেছেন,—দেখলাম, তিনি (ঈশ্বর) আর হৃদয় মধ্যে যিনি আছেন এক ব্যক্তি।' (কথামৃত, তৃতীয় ভাগ, পৃ-৩১৬)। রামকৃষ্ণ — "তাদের মধ্যে (বিভিন্ন অবতারদের) এই রূপটিও দেখছি (নিজের শরীর)। ভগবান এ শরীরেও অবতীর্ণ হয়েছেন।" (কথামৃত, তৃতীয়ভাগ, পৃ - ৩০৫)। "এ শরীরের ভিতর দুটি আছে। একটি জগদম্বা অপরটি তার ভক্ত।" (কথামৃত)। "তোমাদের বেশি কিছু করতে হবে না। আমি কে, আর তোমরা কে, এটি জানলেই হবে।" এই 'আমি' হচ্ছে নররূপে তিনি অবতার। অথবা গিরিশ ঘোষকে বলছেন—"আমি সত্য মিথ্যার পার।" বলতেন—"আমাকে ধ্যান করলেই হবে।" শ্রী ম আরও জোর দিয়ে বলছেন—"হ্যাঁ, অনেক বার, কতবার বলেছেন 'আমাকে ধ্যান করলেই হবে'।"

এই যে ভগবানের সাথে নিজেকে একীভূত করে ফেলা, মথুর বাবুর শ্রেষ্ঠ কীর্তি এটিই। তিনি বহু সংশয়ের মধ্যে থেকেও দারুণ বুদ্ধি বলে শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে এই বোধটাই জাগাতে চেয়েছিলেন 'তিনি ভগবান'। মথুর বাবু দুশো ভাগ সফল।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন "আমি অদ্বৈত-চৈতন্য-নিত্যানন্দ একাধারে তিন।" (কথামৃত, তৃতীয় ভাগ, প -৩২৯)। 'ঠাকুর ইঙ্গিত করিয়া বলিতেছেন, যিনি আদ্যাশক্তি তিনিই নররূপী রামকৃষ্ণ হইয়া আসিয়াছেন।' (কথামৃত, চতুর্থ ভাগ, পৃ-৬২)। 'একজন ভক্ত (শ্রীম)

—"যারা অবতার দেহ ধারণ করে এসেছেন, তাদের কি বাসনা—?" শ্রী রামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—"দেখেছি, আমার সব বাসনা যায় নাই। এক সাধুর আলোয়ান দেখে বাসনা হয়েছিল ঐ রকম পরি। এখনও আছে। জানি কি না আর একবার আসতে হবে।" (কথামৃত, চতুর্থ ভাগ, পৃ - ২১৫)।

শ্রীম- 'ঝাউতলায় দাঁড়িয়ে বলেছিলেন নিজ মুখে, আমি অবতার। আমি ঈশ্বর, মানুষ হয়ে এসেছি। বলেছিলেন, আবার একবার আসতে হবে।' (শ্রীম দর্শন - ষষ্ঠ খণ্ড ২০৪)।

তা কবে আর তিনি আসবেন তিনিই জানেন। বলেছিলেন একশ বছর পরে আবার আসবেন। জন্ম মৃত্যু দুদিক থেকে হিসেব করেই একশ বছর পেরিয়ে গেছে। এখনও এলেন না। আবার আসুন আর নাই আসুন এখন কিন্তু দেখতে পাচ্ছি তিনি নিজেকে আর সাধারণ মানুষ বলে ভাবেন না। শুধু অব্রাম্মণের ছোঁয়া অন্ন হলেই তিনি ব্রাম্মণ। বাকি সময় অবতার।

'উত্তর যোগী' নামটা চেনা চেনা ঠেকছে কি? আমরা একটু অন্য প্রসঙ্গে চলে এসেছি। অনেক কাল আগে এক তামিল যোগীর দেওয়া বর্ণনার সাথে নিজের নিখুঁত মিল খুঁজে পেয়ে ঋষি অরবিন্দ বলেছিলেন 'উত্তর যোগী আমারই নাম।' (নিজের কথা—ঋষি অরবিন্দ, পৃষ্ঠা - ২৮৭)। ভগবান বা অবতারদের দেখি নিজেদের অতি সহজেই চিনে ফেলেন। দেরি করে মূর্খ মানুষগুলোই। ঋষি অরবিন্দ তীব্র যোগশক্তি প্রয়োগ করে শয়ে শয়ে মানুষের রোগমুক্তি ঘটিয়েছেন। এমনকী নিজের শরীরের ব্যাধি পর্যন্ত থামিয়ে দিয়েছেন। (ঐ, পৃষ্ঠা - ২১২-১৬)। এই যোগ দিয়ে রোগ বিয়োগের ক্ষেত্রে অনেকগুলি শর্ত তিনি দিয়েছেন। শর্তগুলি পূরণ হলেই কেল্লা ফতে। ডাক্তার-মোক্তার চুলোয় যাক। এমনকি এই যোগশক্তি যখন দারুণ বাড়-বাড়ন্ত, তখন দূর থেকে চিঠি দিয়ে প্রতিকার চেয়ে পাঠালেও কাজ হয়ে যেত। ঋষিজী নামের ওপর যোগশক্তি প্রয়োগ করে দিতেন। ব্যাস, রোগের আর সাধ্য কি, ব্যাটারা পালাবার পথ পায় না। স্বামী বিবেকানন্দেরও কিছুটা এরকম শক্তি ছিল। তবে রামকৃষ্ণদেবের এরকম যোগ বিয়োগ কোন শক্তিই না থাকায় রোগ হলে ডাক্তারেই ভরসা। আসুন দেখি সেখানে কি হয়।

শরীর খারাপ। ডাক্তার বলেছেন জল খাওয়া চলবে না। বেদানার রস খেয়ে থাকতে হবে। সকলে ভাবছে জল না খেয়ে থাকবে কি করে। রামকৃষ্ণ বলছেন "আমি রোক কল্লুম, আর জল খাব না। পরমহংস! আমি তো পাতি হাঁস নই— রাজ হাঁস, দুধ খাব।" (কথামৃত, দ্বিতীয়ভাগ, পৃ - ৬১)। শ্রীরামকৃষ্ণের ধারণাটা লক্ষ্য করুন, তিনি বুঝে গেছেন তিনি আর আতি পাতি হাঁসের দলে নেই, তিনি এখন রাজকীয় রাজহাঁস।

একবার এক ভক্তের বাড়ি রামকৃষ্ণদেব বিনা নিমন্ত্রণে গিয়ে হাজির। ভক্ত লজ্জিত "কোথায় আমি যাব, না আপনিই এয়েছেন।" রামকৃষ্ণদেব হেসে বলেন "ছুঁচও কখনো

কখনো চুম্বককে টানে।" (শ্রীম-দর্শন—স্বামী নিত্যাত্মানন্দ, দ্বিতীয় ভাগ, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা-৫৯)। রামকৃষ্ণদেব বুঝে গেছেন তিনি আর ছুঁচ, পেরেক, নাটবল্টু নন, মস্ত একটি ভূ-চুম্বক। যদিও মুখে মাঝে মাঝে বলতেন "ঝাঁটা মারি লোক মান্যে।" তবুও দেখতে পাচ্ছি লোক মুখে এবং ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিজের মুখে নিজের গুণগান খুব একটা অপচ্ছন্দ তিনি করতেন না।

মহেন্দ্র মাস্টারের সাথে কথা বলতে বলতে রামকৃষ্ণদেব নিজের ঘরের দিকে চলেছেন। জিজ্ঞাসা করছেন, "আচ্ছা, এই যে কেউ কেউ অবতার বলছে, তোমার কি বোধ হয়?" মাস্টার উত্তর দেন নি। কথায় কথায় দুজনে ঘরের মধ্যে এসে বসেছেন। অন্য ভক্তদের থেকে একটু তফাতে। আস্তে আস্তে রামকৃষ্ণদেব মাস্টারকে আবার একই কথা জিজ্ঞাসা করছেন, "তুমি কি বল?" মাস্টার "আজ্ঞা, আমারও তাই মনে হয়। যেমন চৈতন্যদেব ছিলেন।" শ্রীরামকৃষ্ণ—"পূর্ণ, না অংশ, না কলা?—ওজন বল না?" (কথামৃত, দ্বিতীয় ভাগ, পৃ - ২০৫)।

এই আলোচনার বেশ কিছু পরের আর একটি আলোচনার কথা বলছি। কথামৃতে মহেন্দ্র মাস্টার বেশ কিছু ছদ্ম নামে নিজেকে গোপন রেখেছেন। যার একটি 'মণি'। 'রামকৃষ্ণ—আচ্ছা তোমার এসব দেখে কি বোধ হয়? মণি—আমার বোধ হয় তিন জনেই একই বস্তু। যীশুখৃষ্ট, চৈতন্যদেব আর আপনি একব্যক্তি। শ্রী রামকৃষ্ণ—এক এক। এক বই কি। তিনি (ঈশ্বর) দেখছ না, যেন এর উপর এমন করে রয়েছে। এই বলিয়া ঠাকুর নিজের শরীরের উপর অঙ্গুলী নির্দেশ করিলেন—যেন বলছেন, ঈশ্বর তারই শরীর ধারণ করে অবতীর্ণ হয়েই রয়েছেন। মণি—সেদিন আপনি এই অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাপারটি বেশ বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। রামকৃষ্ণ—কি বল দেখি। মণি— যেন দিগদিগন্ত ব্যাপী মাঠ পড়ে রয়েছে। ধু ধু করছে। সম্মুখে পাঁচিল রয়েছে বলে আমি দেখতে পাচ্ছি না। সেই পাঁচিলে কেবল একটি গোল ফাঁক। সেই ফাঁক দিয়ে অনন্ত মাঠের খানিকটা দেখা যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ—বল দেখি সে ফাঁকটি কি? মণি— সে ফাঁকটি আপনি। আপনার ভিতর দিয়ে সব দেখা যায়। সেই দিগদিগন্তব্যাপী মাঠ দেখা যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ অতিশয় সন্তুষ্ট, মণির গা চাপড়াতে লাগলেন। আর বললেন,—তুমি যে ঐটে বুঝে ফেলেছ—বেশ হয়েছে। মণি—ঐটি শক্ত কিনা, পূর্ণব্রহ্ম হয়ে ঐটুকুর ভিতর কেমন করে থাকেন। ঐটি বুঝা যায় না।' (কথামৃত, তৃতীয়ভাগ, পৃ - ২৫৮)।

সাধু নাগ মহাশয়কে 'রামকৃষ্ণ একদিন নিজ দেহ দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন— "তোমার এটা কি বোধ হয়?" নাগমশাই করজোড়ে বলিলেন—"ঠাকুর, আর আমায় বলতে হবে না। আমি আপনারই কৃপায় জানতে পেরেছি আপনি সেই।" ঠাকুর অমনি সমাধিস্থ হইয়া নাগমশায়ের বক্ষে দক্ষিণ চরণ অর্পণ করিলেন। নাগ মহাশয়ও নানা দিব্য জ্যোতি দর্শন করিতে লাগিলেন'। (সাধু নাগ মহাশয়, পৃ-৬৯)।

আমেরিকা থেকে ডাক্তার হামেল নামে এক ভক্ত এসেছেন। শ্রীম তাকে কথামৃত পড়ে শোনাচ্ছেন। ডাক্তারের প্রতি—"এই শুনুন, ঠাকুর বলছেন, আমি দেখছি, স্পষ্ট বুঝতে পারছি এই সমস্ত জগৎ যা কিছু দেখা যাচ্ছে এর প্রত্যেকটি বস্তু—এর (নিজের শরীর দেখাইয়া) থেকে এসেছে। ঠাকুরের শরীরে যে ভগবান অবতীর্ণ হয়েছেন—এর আর একটি সংশয়হীন উক্তি, সুস্পষ্ট ঘোষণা—তার নিজের মুখের এই মহাবাক্য।" (শ্রী ম-দর্শন, স্বামী নিত্যাত্মানন্দ, পঞ্চম ভাগ, প্রথম সংস্করণ, পৃষ্ঠা-১৩৮)। ব্যস, রামকৃষ্ণদেব নিজেই বলেছেন তিনি অবতার, মানতে তো হবেই।

এই অবতার বোধটি যে শুধুমাত্র রামকৃষ্ণদেবের মধ্যেই কাজ করেছিল তা নয়। আরও অনেক অবতার দেখেছি যারা দিব্যি বুঝতেন 'আমি অবতার।' এ প্রসঙ্গে ঋষি অরবিন্দের সাথে এক ভক্ত প্রশ্নকর্তার দীর্ঘ আলাপচারিতার কিছু অংশ এখানে তুলে দিলাম। প্রশ্নোত্তরে স্পষ্ট ঋষি নিজেকে এবং তার আদ্যাশক্তি মীরা মা'কে নিশ্চিৎ অবতার রূপেই জ্ঞান করতেন।

প্রশ্ন ঃ আমরা জানি যে আপনি ও মা দুজনেই অবতার। কেবল এই জন্মেই কি আপনাদের দিব্যত্ব প্রকাশ করলেন? সৃষ্টির পর থেকেই তো আপনারা পৃথিবীতে ছিলেন। পূর্ব পূর্ব জন্মে কি করেছিলেন আপনারা?

শ্রী অরবিন্দ ঃ বিবর্তনের কাজ করছিলাম।

প্রশ্ন ঃ অতীত কালের লোকেরা হয়তো আপনাদের চিনতে পারেনি। কারণ আপনারা সাধারণ মানুষের মতোই ছিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বা বুদ্ধ বা খ্রীষ্ঠ কি আপনাদের উপস্থিতির কথা জানতে পারেননি?

ঋষি অরবিন্দ ঃ উপস্থিতি কোনখানে এবং কার মধ্যে? দেখা সাক্ষাৎ না হলে তো চেনা যায় না। আর যদি তা হয়ে থাকে তথাপি আমাদের আবরণ উন্মোচিত হবে কেন। তখন তো তার কোনো প্রয়োজন ছিল না।

প্রশ্ন ঃ আপনি বলছেন "উপস্থিতি কোথায় এবং কার মধ্যে?" এ প্রশ্ন কেন?

শ্রী অরবিন্দ ঃ উপস্থিতি হবে নিশ্চয় কারো বাহ্য ব্যক্তিত্বের মধ্যে। আর "উপস্থিতি" হবে জগতের কোন অংশে! বুদ্ধের সময় মা যদি থাকতেন রোমে, তাহলে বুদ্ধ কেমন করে তা জানতেন। বুদ্ধ তো রোমের নামও শোনেন নি।

প্রশ্ন ঃ তবুও আমি একটা কথা বুঝতে পারছি না। আপনি আবরণ খুলে না ফেললেও, বুদ্ধ, যীশুখৃষ্টের মতো মহাপুরুষরা কেন তাদের মিথ্যার আবরণ ফেলে দিলেন না আপনাকে চিনবার জন্য?

ঋষি অরবিন্দ ঃ কেন তারা তা করবেন? তাদের কাজের জন্যই তাদের আবরণের প্রয়োজন ছিল। সেটা ছুঁড়ে ফেলে দেবার কি কারণ থাকতে পারে? সুতরাং শ্রীমার যদি যীশুখৃষ্টের সময় তার সঙ্গে সংযোগ ঘটেই থাকে, তিনি সেখানে ভাগবতী চেতনার

বিকাশ রূপে ছিলেন না। সম্পূর্ণ মানুষী রূপেই ছিলেন। তাকে যদি ভগবান রূপে তখন চেনা যেত তাহলে আসত দারুণ বিপর্যয়, আর খৃষ্ট যা করতে এসেছিলেন তা ব্যর্থ হত সীমানা ছাড়িয়ে যাবার জন্য। (নিজের কথা — ঋষি অরবিন্দ, পৃষ্ঠা - ৩৫৯-৩৬৬) প্রশ্নোত্তর আরও অনেকগুলি আছে। আমি কয়েকটি মাত্র ব্যবহার করলাম। অন্য গুলিও মূল গ্রন্থ থেকে পড়ে দেখতে পারেন এবং নিশ্চিৎ ভাবেই প্রমাণ করতে পারেন ঋষির নিজের সম্বন্ধে অবতার জ্ঞান ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের মতই অটুট।

ভক্ত চায় ভগবান। এমন এক ভগবান যে ভক্তের সাথে কথা কইবে, হাসবে, খেলবে, গল্প গুজব করবে। কুসংস্কারই একমাত্র বিষয় যেখানে বিশ্বাসীরা পন্ডিত মূর্খ নির্বিশেষে, গোটা বিশ্ব জোড়া, বিশেষত আমাদের মত অনুন্নত দেশে অনেক অসম্ভবকেও সম্ভব বলে মেনে নেয়।

মনে পড়ে কয়েক বছর আগে গণেশ ঠাকুর হঠাৎ কাঁচা দুধ খাওয়া শুরু করেছিল। গোটা দেশ গণেশকে দুধ খাওয়াতে মেতে উঠেছিল। আমি নিজে দেখেছি হাইকোর্টের বাঘা বাঘা উকিল-ব্যারিস্টার, যাদের কেউ কেউ পরবর্তীকালে বিচারপতির পদ আলোকিত করেছেন, মামলাপত্র ফেলে বাড়ি দৌড়চ্ছেন। স্ত্রী কন্যার ফোন এসেছে 'বাবা শীগগির বাড়ি এসো, আমাদের গণেশ দুধ খাচ্ছে।' প্রধান বিচারপতিকে দেখেছি রক্ষী বেষ্টিত হয়ে হাইকোর্টের মন্দিরে চলেছেন গণেশকে দুধ খাওয়াতে। এরা কি অতি অবুঝ লোক? আর আমরা খুব জ্ঞানী? তা মোটেও নয়। আসলে কুসংস্কার যাদেরই মাথায় ঢুকেছে, এইসব ব্যাপারে প্রশ্ন তোলার ক্ষমতাটাই তাদের লোপ পেয়ে গেছে। এ ব্যাপারে মূর্খ আর জ্ঞানীর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। মূর্খ লোকের মধ্যেও যেমন প্রশ্ন জাগে না, জ্ঞানীজনের মধ্যেও তেমনি প্রশ্ন জাগে না হঠাৎ গণেশ কেন দুধ খেতে যাবে। বৈকুণ্ঠে সুরভী গাই থাকতেও দুধের এত অভাব দেখা দিল কেন?

আজই ঘরে বসে পরীক্ষা করে দেখুন যেভাবে গণেশ দুধ খেয়েছিল ঠিক সেই ভাবে যে কোন লঘু তরল, এমনকি তা অখাদ্য হলেও গণেশ খেয়ে নেবে। যার এত মহিমা, এক চামচ দুধ খেয়ে সে আর নিজের কি মহিমা প্রকাশ করবে। বিজ্ঞানের সাধারণ একটা নিয়ম এখানে কাজ করছে। কুসংস্কার এই সামান্য কথাটা মাথায় আসতে দেয়না গুণীজনেরও। এটাই দুঃখের। রবীন্দ্রনাথের কথায় 'চৈতন্য না জাগা চেতনার ভ্রম'।

আমরা বলি, 'সমাজকে যা ধারণ করে তাই হল ধর্ম'। কথাটা কিন্তু একবারেই ঠিক নয়। সমাজকে ধরে রাখার সাথে ধর্মের কোন সম্বন্ধ নেই। সমাজকে ধরে রাখে সামাজিক রীতিনীতি, সামাজিকতা বোধ। যার সাথে ধর্মের কোনই সম্পর্ক নেই। পূজো-আচ্চা, জপতপ, ধ্যান-তপস্যা, খোল-করতাল নিয়ে কীর্ত্তনানন্দে মাতোয়ারা, এ সবই ঈশ্বর লাভের পথ। আর ঈশ্বর লাভের পথই ধর্ম। রামকৃষ্ণদেব এক ভক্তকে বলছেন—"তুমি বরং কেঁদে কেঁদে ব্যাকুল হয়ে বল, দর্শন দাও"। তাকে দর্শন করা এই যথার্থ ধর্ম।

'ধৃ' ধাতু থেকে ধর্ম কথার অর্থ ধারণ করাই হয়। কিন্তু তা সমাজ ধারণ নয়। হবে, ঈশ্বরকে যা ধারণ করে তাই 'ধর্ম'। নানা ধর্ম শাস্ত্র পড়ে দেখুন ধর্ম সম্বন্ধে সেখানে কি বলা আছে। সমাজ ধারণের তত্ত্ব সেখানে পাবেন না। এই তত্ত্বটা আমরাই আবিষ্কার করেছি। স্বামী বিবেকানন্দ একটি চিঠিতে বলেছেন, "ধর্মের সবচেয়ে বড় ভুল সামাজিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা। সামাজিক বিধিনিয়ম প্রণয়নের কোন অধিকার ধর্মের নেই।" তিনি তার শিষ্যদের বলেছেন সমাজ থেকে ধর্মকে দূরে থাকবার নির্দেশ প্রচার করতে। (স্বামী বিবেকানন্দ—ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রথম সংস্করণ, পৃ - ২৪৭-২৪৮)। তার ধারণায় এর ফলে সমস্ত অন্যায় দূর হবে। অন্যায় দূরে যাক বা কাছে আসুক, আমাদের বর্তমান প্রসঙ্গ তা নয়। শুধু এইটুকু বলতে চাই সমাজ আর ধর্ম এই দুটি ভিন্ন বস্তুকে এক করে দিয়ে স্বামী বিবেকানন্দের বিরোধিতা নাই বা করলাম।

একবার, জাতিভেদ প্রথায় তিনি বিশ্বাস করেন কিনা প্রশ্ন করায় স্বামীজী বলেন—"জাতিভেদ একটি সামাজিক প্রথা, ধর্মের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই। আমি সকলের সাথে মিশি"। (স্বামীজীর বাণী ও রচনা, দশম খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, পৃষ্ঠা-১২)। বেশ বোঝা যাচ্ছে 'সামাজিক প্রথা এবং ধর্ম' দুটি এক বস্তু নয়। সমাজকে ধরে রাখার দায়ও ধর্মের নয়। তবুও কেন যেন এ দুটিকে মিশিয়ে দেবার একটা চেষ্টা চলতেই থাকে।

শ্রী-ম বলছেন, যাতে ভগবানে ঠিক ঠিক মন যায় তাই ধর্ম। স্বামী অভেদানন্দের মতে—'ধর্ম হচ্ছে আত্মজ্ঞান। আত্মজ্ঞান লাভ করাই ধর্ম।' 'তাকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করাকেই ধর্ম বলে। প্রত্যক্ষভাবে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব উপলব্ধিই ধর্ম। এ ছাড়া ধর্মের আর কোন অর্থ হয় না।' স্বামী বিবেকানন্দের ধারণায় "ধর্মের উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ, ঈশ্বর দর্শন।" এ রকম অজস্র উদাহরণ দেখানো যায়, যার থেকে অতি সহজেই বোঝা উচিত ধর্ম ও সমাজ এক বস্তু নয়। এই সব দেখেই স্বামীজীর ভাই ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বলেছিলেন—"ধর্ম সম্বন্ধে বাঙালীর ধারণা হাস্যকর, ধোঁয়াটে এবং ভ্রমযুক্ত।" (স্বামী বিবেকানন্দ, পৃ-৯৬)।

আবার ধর্মের মাহাত্ম্য প্রকাশ করতে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের এক ইউরোপীয় জীবনীকার ফ্রেডারিখ ম্যাক্সমূলার বলেছেন—'ধর্মের মত মানবীয় বিষয় আর কিছুই নাই, আর কিছুতেই মানব প্রকৃতির দৌর্বল্য এমন করে প্রকাশিত হয় না।' (রামকৃষ্ণদেব-জীবন ও বাণী, অনুবাদক সলিল গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ - ৩৯)। প্রফেসরের কথায় দুর্বল চিত্ত মানুষের শেষ অবলম্বন 'ধর্ম'। যার সাথে সমাজকে ধারণ করার কোন সম্পর্ক নাই। অ্যালবার্ট আইনস্টাইন একটি চিঠিতে বন্ধু দার্শনিক এরিক গুডকিন্ডকে লিখছেন—'আমার কাছে ঈশ্বর আসলে মানুষের দুর্বলতার প্রকাশ ছাড়া কিছু নয়।' এই ঈশ্বর লাভের পথই ধর্ম। জপ, তপ, হরিকীর্তন এগুলি মাধ্যম। সমাজ ধারণ, ভুল কথন।

ধর্ম যে আমাদের কত সহজে বোকা বানায় তার আর একটি জলজ্যান্ত নমুনা মাদার টেরিজার সেবা প্রতিষ্ঠান। রামকৃষ্ণ মিশনের পরেই পৃথিবীর সর্ববৃহৎ সেবা প্রতিষ্ঠান। কুষ্ঠ রোগীর দগদগে ঘা মাদার নিজে হাতে পরিষ্কার করে দিচ্ছেন, ওষুধ লাগিয়ে দিচ্ছেন, তাকে সস্নেহে খাইয়ে দিচ্ছেন, আমরা সকলেই দেখেছি। তবুও সেই মাদারের নামে সমালোচনা! যদি বলা হয় করো দেখি অমন সেবা, তারপরে কথা বলবে। আগেই মেনে নিচ্ছি পারব না। ওইভাবে জরাগ্রস্থের সেবা করা সাধারণের সাধ্যের বাইরে। শুধু নিন্দা রটাতে পারি, মন দিয়ে সেই চেষ্টাই করব। জেনে রাখুন এই সেবার পেছনে প্রতি বছর 'প্রতিষ্ঠান' করেক হাজার খ্রীষ্টানের সংখ্যাও বাড়িয়ে চলেছে। সেবা 'প্রকট' উদ্দেশ্য, ধর্মীয় আগ্রাসন 'প্রচ্ছন্ন' উদ্দেশ্য। কিন্তু দুটো উদ্দেশ্যই প্রধান। পদ্ধতি অতি সরল। আর এত সরল বলেই বুঝে ওঠা ভীষণ কঠিন। সময়মতো এই নিয়ে আরও একটু আলোচনার ইচ্ছে রইল।

শ্রীরামকৃষ্ণ বার বার বলেছেন "পূর্ব পূর্ব যুগে যিনি রাম ও কৃষ্ণাদি রূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তিনিই ইদানিং (নিজ শরীর দেখাইয়া) এই খোলটার ভিতর আসিয়াছেন।" (লীলামৃত, পৃ-১৯৩)। তবে স্বামী বিজ্ঞানানন্দকে একবার তিনি নিজেকে লক্ষ্মণ বলে উল্লেখ করেছিলেন। (সৎপ্রসঙ্গে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ—স্বামী অপূর্বানন্দ, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ-১১০)। যদিও রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, নকুল, সহদেব এরা তো সব অভেদই। যীশু, চৈতন্য, মহম্মদ সব সমান সমান কিন্তু শ্রেষ্ঠ অবতার রামকৃষ্ণদেব। "অমন ভাব সমাধি কারও নেই দাদা"—বলেছেন স্বামী বিজ্ঞানানন্দ। (ঐ, পৃ -১১১)।

ঠিক এই ধারণাটাই শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। রামকৃষ্ণ মিশনের বহু কেন্দ্রে আমার যাতায়াত আছে। সেখানে অনেক সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী এবং ভক্তের মুখেই শুনেছি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মত কমপ্লিট অবতার আগেও কেউ আসেনি, ভবিষ্যতেও কেউ আসবে না। এমনকি রামকৃষ্ণদেব নিজেও বেশ বুঝতেন যে তার মত অবতার আর কেউ আসেনি। এটি বোঝাবার জন্য ভক্তদের তিনি বলতেন "নবাবী আমলের মুদ্রা বাদশাহী আমলে চলে না।" অর্থাৎ পুরোনো অবতাররা এ যুগে অচল। এ যুগের ঠিক ঠিক তিনিই।

বলতেন "তোমার ইষ্ট (আপনাকে দেখাইয়া) ইহার ভিতর আছেন, ইহাকে ভাবিলেই তাহাকে ভাবা হইবে।" (লীলাপ্রসঙ্গ, পৃষ্ঠা-৭৫৮)। "আমি যেরূপ বলিতেছি সেইরূপে যদি চলিয়া যাস্, তাহা হইলে সোজাসুজি গন্তব্যস্থলে পৌছাইয়া যাইবি"।

এই যে রামকৃষ্ণদেব বলছেন তার কথা শুনে চললেই গন্তব্যস্থলে পৌছানো যাবে, এই অলীক 'গন্তব্যস্থল'টিই ভক্তদের কাছে সব চেয়ে বড় ধর্মীয় প্রহেলিকা। গন্তব্যস্থল বলতে মোক্ষ, মানে মুক্তি। এই মুক্তি লাভের আশাতেই বিশ্বজোড়া এতো ধর্ম পালন।

রামকৃষ্ণ মিশনের এত সেবা-টেবার কারণও ঐ মুক্তি। 'আত্মনো মোক্ষর্থং জগদ্ধিতায় চ'— নিজের মুক্তির জন্য জগতের উপকার। 'নিজের মুক্তি' এইটি উদ্দেশ্য, পন্থা জগতের উপকার। নিজের মুক্তির আশা যদি না থাকত 'জগতের উপকার' থাকত কিনা কে জানে।

সামনে কিন্তু এই ভাবটি প্রকাশ পায় না। মনে হয় যেন কি উপকারী লোকজন সব। বন্যায় বাড়ি ঘর ডুবলেই থালা থালা খিচুড়ি নিয়ে হাজির। কিন্তু কেন যে খিচুড়ি খাওয়াচ্ছে সে আর কে বোঝে। তোমার খিচুড়ি খাওয়ার উপর নির্ভর করছে আমার ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তির আশা।

বন্যাও দরকার, তোমার আমার বাড়ি ঘর ডুবে যাওয়াও দরকার, তবেই পাবে শিবজ্ঞানে জীব সেবা। বিনিময়ে সন্ন্যাসী ঠাকুরের মোক্ষলাভ। কি সহজ সরল লেনদেন। আর অতি সহজ বলেই পাকা ব্যবসায়ী ছাড়া লাভের অঙ্ক খুঁজেই পাবে না কেউ। সেবাশ্রমের সেবা ব্যাপারটা খুবই সহজ সরল। আবার সহজ সরল নয়ও। শশী মহারাজ বলছেন "অপরের সেবাই আত্মোন্নতির উপায়।"............"মনে কর যদি কোন গ্রহীতাই নেই তাহলে তোমার অবস্থা কি হবে?" ঠিক কথাই, 'গ্রহীতা' টিকিয়ে রাখা দরকার। বন্যা দরকার, অভাব-দারিদ্র্য দরকার, অশিক্ষা দরকার অর্থাৎ 'গ্রহণ' করার লোকের প্রবাহটা দরকার। মোক্ষের পথে পাড়ি দেবার মাধ্যম এই গ্রহীতারাই।

স্বামী বিবেকানন্দ বলে গেছেন 'যা করছিস নিঃস্বার্থ ভাবে করে যা। ফল লাভ একদিন হবেই।' এই কারণেই ঘরে ঘরে আমাদের মা বোনেরা নিঃস্বার্থ ভাবে লক্ষ্মীর পাঁচালী পড়ে চলেছে, যদি ছেলের চাকরিটা লেগে যায়।

ব্রিটেনের চ্যারিটিজ অব ফাউন্ডেশন সংস্থা ১৫৩টি দেশে সমীক্ষা করে জানতে চেয়েছিলেন, কোন দেশের মানুষ কেমন দান ধ্যান করে, অচেনা মানুষকে সাহায্য করতে তারা কেমন তৎপর। পরীক্ষায় যৌথ ভাবে অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ড প্রথম, এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে শ্রীলঙ্কা প্রথম সারিতে জায়গা পেয়েছে। আর 'জীবে প্রেম করে যেই জন'-এর দেশ ভারতবর্ষ একদম পিছনের সারিতে। প্রায় ২২ কোটি মানুষ না খেয়ে অথবা আধপেটা খেয়ে কষ্টভোগ করেন প্রতিদিন। কেউ তাদের খবর রাখে না। তবে ভগবান সব দেখেন। তিনি দেখতে ভালবাসেন। পাঁচ বছরের শিশু কন্যার উপর পঞ্চাশ বছরের লোকটা পাশবিক অত্যাচার চালাচ্ছে, ভগবান সব দেখছেন, প্রতিকার করেন না। তিনি দেখতে ভালবাসেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তকে বলছেন 'আরশোলাটাকে বাইরে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেল।' ভক্ত মেরে না ফেলে ছেড়ে দিয়ে এসেছে। রামকৃষ্ণদেব জিজ্ঞেস করছেন 'কিরে, মেরে ফেলেছিস তো?' 'না মশাই ছেড়ে দিয়ে এসেছি।' উত্তর শুনে রামকৃষ্ণদেব রেগে যাচ্ছেন, বলছেন 'তোকে মেরে ফেলতে বললাম, আর তুই কিনা ছেড়ে দিয়ে এলি! যেমনটি বলব

ঠিক তেমনটি করবি। এরকম নিজের মতে চলে একদিন বিপদে পড়বি। তখন পশ্চাত্তাপ উপস্থিত হবে।' (লীলাপ্রসঙ্গ, পৃষ্ঠা-৭৫৫)। রামকৃষ্ণদেব চান না কেউ তার কথার একটু নড়চড় করে। 'চার খুঁট ঘুরে আয়, দেখবি কোথাও কিছু নেই, যা কিছু আছে (নিজের শরীর দেখিয়ে) সব এখানে।' (লীলাপ্রসঙ্গ, পৃষ্ঠা-৫৬৩)। এই রকম ধারণা যার তৈরি হয়েছে সে তো একটু আত্মবিশ্বাসী হবেই। তিনি মা কালীর কাছে প্রার্থনা করতেন যেন তার কিছু শিষ্যের মধ্যে কতকটা শক্তির প্রকাশ ঘটে। যাতে নবাগতরা তাদের কাছে কিছুটা তৈরি হয়ে তবেই তার কাছে আসে। এতে তার পরিশ্রম কিছুটা লাঘব হবে। তিনিও তাদের সিঁড়ি বেয়ে স্বর্গে যাবার রাস্তা দেখিয়ে দেবেন। আর এর জন্য যদি তাকে লক্ষ বার জন্ম নিতে হয় তাতেও তিনি পিছপা নন। নিজে মুখে তিনি একথা বলে গেছেন। (লীলা প্রসঙ্গ, পৃষ্ঠা-৮৩৭)।

পুঁথিকার বলছেন—

বলিতেন প্রভুদেব ভাবের আবেশে।
শেষ জন্ম যার সে আসিবে মম পাশে।।

তা রামকৃষ্ণদেব তো আজ থেকে বেশ অনেক দিন আগেই এসেছেন। সে সময় যারা তার কাছে গেছে টেছে তারা সব উদ্ধার হল। রসকে মেথর থেকে শুরু করে যে ছারপোকাটি তিনি টিপে মেরেছেন সেটি পর্যন্ত। আমাদের কি গতি হবে? যতই বলা হোক না কেন তার নাম নিলেই মুক্তি। এ কখনো হতে পারে? তার সামনে দাঁড়িয়ে আর্জি জানিয়ে যে ফল ফলত, আজ সে পৃথিবীতেই নেই, একই ফল পাওয়া সম্ভব কখনো! স্বামী অরূপানন্দ শ্রীমকে প্রশ্ন করছেন—"তাকে দেখে যে আনন্দ হয়েছে লোকের, এখন লাখ বর্ণনা দিয়েও তার এক কণা পাওয়া যায় না।" শ্রীম—(অন্যমনস্ক ভাবে) "তা আর বলতে।" (শ্রীম দর্শন, দ্বিতীয় ভাগ, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা-৫৭)। যতই চেষ্টা করুন, এখন আর পুরো মুক্তি পাওয়া যায় না।

ঠাকুর বলে গেছেন 'সাধু দর্শনে এলে হাতে করে একটি হরতকী অন্ততঃ আনবে।' খালি হাতে সাধু দর্শন মানা। তা একটি হরতকী এনে নিজের দৈন্য প্রকাশ করে কে। ভালোমন্দ কিছু নিয়ে যাওয়াই রেওয়াজ। শ্যামবাজার এ.ভি. স্কুলের বিপরীতে 'ষোড়শী ভবন' ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের বাড়িতে একদিন আধঘন্টার জন্য বসেছিলাম। জনা কুড়ি ভক্তকে ঢুকতে দেখলাম। প্রত্যেকের হাতেই ছোট, বড়, মাঝারি মিষ্টির প্যাকেট। পকেটের ক্ষতি সোজা রাস্তায় না হলেও বাঁকা পথে হয়ই। মুক্তির আশায় আছেন? সে গুড়েও বালি। ঠাকুর নিজেই বদ্ধ। বদ্ধ জীব মুক্তি দেবে কিভাবে! 'বদ্ধ' বলার কারণটাও বলছি—রামকৃষ্ণদেব ভগবান, অবতার হয়ে এসেছেন। অবতার পৃথিবীতে আসেন কেন? প্রধানতঃ তিনটি কারণে। প্রথমত—সাধুগণের পরিত্রাণ, দ্বিতীয়—দুষ্টগণের বিনাশ, তৃতীয়—ধর্ম সংস্থাপন। তা হলে দেখা যাচ্ছে অবতার রূপী ভগবান তিন তিনটি কামনা নিয়ে ধরাধামে

অবতীর্ণ হন। আর শাস্ত্র বলছেন যার কামনা আছে সে কামনার বস, সে মুক্ত হবে কিভাবে? সেও তো কামনারই দাস। ভগবানের তো আর টাকা চাই, বৌ চাই, এ রকম কামনা থাকে না। তার কামনাগুলোও বড় বড় । কিন্তু সেও তো কামনাই। তিনি এই সব কামনা নিয়েই এসেছেন। অতএব অবতারও মুক্ত নন। বাসনা দ্বারা বন্ধ। যে নিজেই বন্ধ, সে অন্যকে মুক্ত করবে কিভাবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথকে বলছেন "গৌরাঙ্গের নাম শুনেছিস। এই যে লোক গৌর গৌর বলে, আমি সেই গৌরাঙ্গ।" (শ্রী ম দর্শন, দ্বিতীয় ভাগ, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা-৫০)। তিনি কোনদিন পুরীতে যাননি। বলতেন ওখানে গেলে শরীর ত্যাগ হয়ে যাবে। পূর্ববারের অনেক স্মৃতি রয়েছে কিনা ওখানে চৈতন্য অবতারের। সেই সব স্মরণ হলে সমাধিতে শরীর চলে যাবে। চৈতন্যদেবই গৌরাঙ্গ কিনা! আর তিনি তো নিজেই গৌরাঙ্গ। অগত্যা তার আর পুরী দর্শন হয়ে ওঠেনি। এই একই কারণে তিনি গয়াতেও যাননি। বুদ্ধদেবও তো তিনিই। আবার সব মনে পড়ে যাবে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে বোঝানো হয়েছিল তুমি ভগবান। পরবর্তীকালে তিনি আর সেই ভগবানের ভূত থেকে বেরিয়ে মানুষ হয়ে উঠতে পারেন নি। ভক্তরাও চায় না তিনি মানুষ হয়ে উঠুন। আস্ত একটা ভগবান কম পড়ে যাওয়া যে কত বড় ক্ষতি ভক্তরা তা শ্রীরামকৃষ্ণের মৃত্যুর পর হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ গেছিলেন নিত্যগোপালের কাছে। যাতে নিত্যগোপাল শ্রীরামকৃষ্ণের আসনে বসে তাদের ভগবানের অভাব পুষিয়ে দেন। (নিত্যগোপাল চরিত্রামৃত, পৃ - ১১৩)। রক্ষে, নিত্য সে রকমটি হতে দেন নি। ভক্ত চায় ভগবান। ভগবানত্বে রামকৃষ্ণদেব এমনই একাত্ম যে, একশো-দেড়শো বছর পরেও মানুষ রূপে তার দ্বিত্ব সত্তাটি খুঁজে পাওয়াই ভার। আমাদের চেষ্টা ওই টুকুই, দোষে গুণে শ্রীরামকৃষ্ণের মনুষ্য রূপটি ফুটিয়ে তোলা।

জীবনের মধ্যে মাত্র যদি একবার।
স্মরণ করহ মোরে হইবে উদ্ধার।।

যাক, একটু ঝক্কি কমেছে। সারাজীবন স্মরণ মনন না করলেও চলবে। একআধবার একটু আধটু ডাকলেও রাবণের না করা সিঁড়িটা ঠিক পাওয়া যাবে।

অন্তরঙ্গ ভক্ত তার দেবেন্দ্র ব্রাহ্মণ।
দ্বিতলে ডাকিয়া তায় প্রভুদেব কন।।
স্থিরতর কর কথা তোমরা সকলে।
রাম কি কারণে মোরে অবতার বলে।। (পুঁথি, পৃষ্ঠা-৬১৪)

ভক্তদের একটু বাজিয়ে নিচ্ছেন। বল তোমরা, সবাই কেন অবতার বলছে। শুনতেও বেশ লাগে।

ভক্ত সঙ্গে কীর্ত্তনে মাতোয়ারা। রামকৃষ্ণদেব উদ্দাম। ভক্তের ভয়, যদি ঠাকুর অসুস্থ হয়ে পড়েন! সকলকে স্থির হতে বলবেন কি?

অতুল বলেন তবে মানা করি গিয়ে।
প্রভু কন্ না-শালারা লিগ্ মরে দুয়ে।।

খোল-কর্তাল বাজিয়ে কীর্ত্তন গেয়ে নেচে কুঁদে দশের মঙ্গল। তার একটা ধারণা তৈরি হয়ে গেছে তাকে নিংড়ে নিলেও লোকের উপকার।

ভাবাবেশে বলিতেন অখিলের রাজা।
ক্রমে পরে ঘরে ঘরে হবে মোর পূজা।।

হ্যাঁ, পূজা তিনি পেয়েছেন। রজনীশ, তৈলঙ্গস্বামী, লোকনাথ বাবা, অনুকূল ঠাকুর, আশারাম বাপুজীর মতো কত ঠাকুরই এমন পূজা পেয়ে থাকেন। শ্রীরামকৃষ্ণের আশা পূর্ণ হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দও মনে মনে ঠিক একই আশা পোষণ করতেন। বলতেন, "মৃত্যুর দশ বছরের মধ্যে আমি ভগবান রূপে পূজিত হব।" (উদ্বোধন, বৈশাখ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৪১৫, ১১০তম বর্ষ, পৃ - ২৫০)। অথবা, "একশো বছরের মধ্যে আমার মাথার একটা চুলের জন্য লাখ টাকা লোকে দেবে, বুঝলি"। (জোসেফাইন ম্যাকলাউড, পৃ-৩৯৬)।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব অনেকটা লোকনাথ বাবার ঢঙে বলতেন, "বিশ্বাস কর্, তোদের জন্য ভাত বেড়েছি, খেয়ে আনন্দ কর।" (লীলামৃত, পৃষ্ঠা-৩২)। কথাটা লোকনাথ বাবার মত হলেও লোকনাথ বাবা কিন্তু রামকৃষ্ণদেবকে মোটেও পছন্দ করতেন না। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের নাম পর্যন্ত সহ্য করতে পারতেন না।

'বারদী' নামে যে স্থানে লোকনাথ বাবার আশ্রম ছিল তারই কাছাকাছি দেওভোগ গ্রামে শ্রীরামকৃষ্ণের পরম ভক্ত সাধু নাগ মহাশয়ের নিবাস। লোকনাথ বাবা সিদ্ধাই শক্তির উপর আস্থাশীল ছিলেন। নাগ মহাশয় যা পছন্দ করতেন না। ফলতঃ নাগ মহাশয় কখনো লোকনাথ বাবার কাছে ঘেঁসতেন না। একবার লোকনাথ বাবার এক ভক্তের (ব্রমানন্দ ভারতী) দ্বারা বারংবার অনুরুদ্ধ হয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি লোকনাথ বাবার কাছে যান। এবং যাওয়া মাত্র 'বারদীর ব্রমচারীর' তোপের মুখে পড়েন। নাগ মহাশয়ের নিয়ে যাওয়া কিছু ফল মিষ্টান্ন একটি ষাঁড়কে দিয়ে খাইয়ে দেওয়া হয় এবং রামকৃষ্ণের নামে কটূক্তি বর্ষণ করতে থাকেন। গুরু নিন্দা সহ্য করতে না পেরে নাগ মশাই কোনক্রমে সে স্থান ত্যাগ করে চলে আসেন। (ভক্ত মালিকা—স্বামী গম্ভীরানন্দ, দ্বিতীয় ভাগ, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা-১৭৭, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃষ্ঠা-১৮০, অথবা, সাধু নাগ মহাশয়—শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী, পৃষ্ঠা-৯৯-১০১)।

এই প্রসঙ্গে একটি মৌখিক আলোচনা এখানে তুলে দিচ্ছি। যদিও এর কোন প্রমাণ দিতে পারব না। লোকনাথ ব্রমচারীর রামকৃষ্ণ অবমাননা নিয়ে আমি মিশনের অনেক সন্ন্যাসীর কাছে কথা তুলে দেখেছি সকলেই মোটামুটি একই উত্তর দেন। 'কে কি বলল তাতে আমাদের কিছু এসে যায় না।' আমি জিজ্ঞাসা করি, উনি তো একজন সাধারণ

লোক নন, মস্ত বড় সাধক। উত্তরে প্রায় সকলেই বলেন 'মস্ত বড় সাধক আবার হলেন কবে লোকনাথ ব্রহ্মচারী। ওনার তো আজীবন ব্রহ্মচর্যই কাটল না। সাধক আর হলেন কবে।'

একবার রামকৃষ্ণদেব নাগ মহাশয়কে জিজ্ঞেস করেন—"ওগো, তোমাদের দেশে কেমন সব সাধু আছেন?" নাগ মহাশয় বলেন "ওদেশে কোন বিশিষ্ট সাধু ভক্তের দর্শন পাই নাই।" (সাধু নাগ মহাশয়—শ্রী শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী, পৃষ্ঠা-৯৭)। অথচ নাগ মহাশয়-এর বাড়ির খুব কাছেই 'বারদীর ব্রহ্মচারী' বা লোকনাথ বাবার আশ্রম।

লোকনাথ বাবা তাকে আমল দিক আর না দিক রামকৃষ্ণদেব কিন্তু নিজেকে ভাবতেন তিনি 'জগজ্জননীর গর্ভজাত সন্তান'। (লীলামৃত, পৃষ্ঠা-১১৫)। এবং বলতেন "জগন্মাতা এই শরীরটা এমন উপাদানে গড়েছেন যে, উৎকট তপস্যায় আর ভাব সমাধিতে অস্থিগুলো চূর্ণ হলেও সাধারণের মত বেঁচে আছি। যে মহাভাবের বন্যা ইহার উপর দিয়া গেছে, মানুষ তার কণামাত্র একদিন ধারণ করতে পারে না।" (লীলামৃত, পৃষ্ঠা-১৩৫)। অর্থাৎ তিনি যা করতে পারেন সাধারণ মানুষের পক্ষে তা অসাধ্য। বলতেন 'সাপ হয়ে কামড়াই আমি, ওঝা হয়ে ঝাড়ি, চোর হয়ে চুরি করি, প্যায়দা হয়ে মারি' (লীলামৃত, পৃষ্ঠা-১৩৮)।

এক ভক্তকে বলছেন "কত কত লোক আমাকে অবতার বলছে, তোর কি বোধ হয়?" ভক্তের তাৎক্ষণিক উত্তর "যারা আপনাকে অবতার বলে তারা ইতর।" রামকৃষ্ণদেব ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছেন। "সে কিরে, গিরিশ, রাম, মনোমোহন সবাই বলছে আমি অবতার, আর তুই কিনা এদের ইতর বললি।" ভক্ত "অবতার কিনা অংশ মাত্র, আপনি তো পূর্ণ ব্রহ্ম। ধ্যানে বসলেই শিবের বদলে আপনাকে দেখি। আপনি অংশ নন সাক্ষাৎ শিব।" এবার রামকৃষ্ণদেব আনন্দে ডগমগ। "ওরে, তোর ভাবে তুই ঠিক, আমি তোর লোমের যোগ্য নই।" (লীলামৃত, পৃষ্ঠা-১৪৫, ১৪৬)।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভালবাসেন ভক্তদের মুখে তার প্রশস্তি শুনতে। এমন কি কোনদিন যদি ভক্তদের মুখে নিজের প্রশস্তি শোনা একটু কম হয়ে যেত, তিনি চিন্তায় পড়ে যেতেন। কথামৃতে শ্রী ম এই কথাটি উল্লেখ করেন নি। কিন্তু ভক্তদের সামনে গুরুদেবের কথা বলতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন। শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—'ঠাকুর বলেছিলেন, "মা আমায় এমন একটি অবস্থায় রেখেছিলেন তখন পাঁচজনে আমায় পুজো না করলে অশান্তি হত"।' (শ্রীম দর্শন, দ্বিতীয় ভাগ, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা-২৩০)। সবাই পুজো করুক, হইচই করুক, তুমি ভগবান-তুমি ভগবান বলুক, এ তো আমাদের দেশে কত কত বাবাজী, সন্তজী চেয়ে এসেছে, কেউ বা পেয়েছে, কারও বা চিঁড়ে ভেজেনি। টাকা পয়সা ব্যাঙ্ক ব্যালান্স কেউই চায় না। কিন্তু সন্তানের মুখে 'মা' ডাক , আহা বড় মধুর।

স্বামী অভেদানন্দের ভাগ্য অতি প্রসন্ন। ধ্যানে বসে তিনি দেখেছেন সব অবতার রামকৃষ্ণ শরীরে লীন হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ সব অবতারের সব বৈশিষ্ঠ্য নিয়ে রামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব। রামকৃষ্ণদেব বললেন "যা, তোর বৈকুণ্ঠ দর্শন হয়ে গেল।" কোন এক উইলিয়াম শ্রীরামকৃষ্ণকে যীশুখ্রীষ্ট মেনেছিল। (লীলামৃত, পৃষ্ঠা-১৪৬)। জানিনা খ্রীষ্টানরা উইলিয়ামকে আর খ্রীষ্টান মেনেছিল কিনা।

শেষ বয়সে রামকৃষ্ণদেব যখন ক্যান্সারে আক্রান্ত, বলতেন 'ইচ্ছে করলেই দেহটাকে সুস্থ করে তুলতে পারি। কিন্তু সব মনটা জগন্মাতাকে দিয়ে ফেলেছি, শরীরের জন্য তার কাছে আর প্রার্থনা করতে পারব না।' বলতেন 'সকলের (স্থানান্তরে গিরিশের) পাপ নিয়ে তার এই রোগ।' এখানে আমার একটু আপত্তি আছে। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল দত্ত শ্রীরামকৃষ্ণকে পরীক্ষা করে বলেছিলেন 'ছোটবেলায় রামকৃষ্ণের গলায় গণ্ডমালা (Scrofula) হয়েছিল।' (শ্রীরামকৃষ্ণের অন্ত্যলীলা—স্বামী প্রভানন্দ, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, পৃষ্ঠা-২২৩)। তখনকার চিকিৎসা ব্যবস্থা তো আজকের মতো উন্নত ছিল না। সে সময় রোগটা হয়ত সম্পূর্ণ নিরাময় হয় নি। চাপা পড়েছিল। পরবর্তীকালে সেটাই ক্যান্সার রূপে প্রকাশ পায়। এমনটা কি হতে পারে না। অতএব পরের পাপ নিয়ে তার এই রোগ এ কথা মানাটা যুক্তিযুক্ত নয়। এর সাথে শ্রীরামকৃষ্ণের ধূমপানের কথাটাও খেয়াল রাখতে হবে। স্বামী সারদানন্দের সাক্ষ্য, "শিশুকালে গণ্ডমালা ছিল। পরে ক্যানসার হয়।" (স্বামী সারদানন্দের স্মৃতিকথা—স্বামী চেতনানন্দ, পৃ-৩০৯)।

রোগ যখন খুব বাড়াবাড়ি, ডাক্তার কোটস নামে এক ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞ ডাক্তারকে ঠাকুরের কাছে আনা হয়। তিনি পরীক্ষা করে চলে যাবার পর ঠাকুরের আদেশে বিছানায় গঙ্গাজল ছিটানো হয়। বেজাতের ছোঁয়াছুয়ি তো, গঙ্গাজল না ছিটোলে খুব খারাপ হতে পারে।

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্বাস দিয়েছেন কর্ম বিপাকে যে ভক্তের রামকৃষ্ণ লোক প্রাপ্তির আশা ক্ষীণ, তাকেও তিনি মৃত্যুর সময় এসে তার আলোকে, তারই ধামে নিয়ে যাবেন। বিধবার শেষ সম্পদটুকু জালিয়াতি কর, ক্ষতি নেই। ভক্ত হলেই উদ্ধার। ভক্তিহীনের অখণ্ড নরকবাস।

এবার একটি কাহিনী বর্ণনা করব। যার থেকে এক সাথে অনেক গুলো ব্যাপার নিশ্চিত ভাবে প্রমাণ করা যাবে। হতে পারে একটি প্রক্ষিপ্ত কাহিনী এটি। তবে এখান থেকেই রামকৃষ্ণদেবের মত স্থবির চিত্তের মানুষেরা কিভাবে অতি সহজেই দৃষ্টি বিভ্রমের শিকার হন তারও নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যেতে পারে। নিজেকে ভগবান ভাবতে গিয়ে কি আশ্চর্য সব কথাবার্তা তিনি বলে ফেলছেন সেটাও লক্ষ্য করার বিষয়। শ্রীরামকৃষ্ণের যে কোন জীবনী গ্রন্থেই এ গল্প পাওয়া যাবে। এখানে স্বামী সারদানন্দের 'লীলাপ্রসঙ্গ' (পৃ - ৫৩১) ব্যবহার করা হল।

দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে তখন সাধু সন্ন্যাসীদের ভীড় লেগেই থাকত। এক রামৎ বাবাজী এসেছেন সঙ্গে এক রামলালা মূর্তি। বালকবেশী রামচন্দ্রের অষ্টধাতুর মূর্তি। এটিকে নিয়েই বাবাজীর দিন কাটে। দক্ষিণেশ্বরে আসার পর শ্রীরামকৃষ্ণও বাবাজীর কাছে যাওয়া শুরু করেছেন। এর পরের অংশ শ্রীরামকৃষ্ণের মুখেই শোনা যাক—

"দিনের পর দিন যেতে লাগল। রামলালারও তত আমার ওপর পিরীত বাড়তে লাগল। আমি যতক্ষণ বাবাজীর কাছে থাকি ততক্ষণ সেখানে সে বেশ থাকে, খেলাধূলা করে ; আর আমি যেই সেখান থেকে নিজের ঘরে চলে আসি, তখন সেও আমার সঙ্গে সঙ্গে চলে আসে। আমি বারণ করলেও সাধুর কাছে থাকে না। প্রথম প্রথম ভাবতুম বুঝি মাথার খেয়ালে এই রকম দেখি। নইলে তার চিরকেলে পূজো করা ঠাকুর, ঠাকুরটিকে সে কত ভালবাসে—ভক্তি করে, সন্তর্পণে সেবা করে, সে ঠাকুর তার চেয়ে আমায় ভালবাসবে—এটা কি হতে পারে? কিন্তু ও ভাবলে কি হবে?—দেখতুম, সত্যি সত্যিই দেখতুম—এই যেমন তোদের সব দেখছি, এই রকম দেখতুম—রামলালা সঙ্গে সঙ্গে কখনো আগে কখনো পিছনে নাচতে নাচতে আসছে। কখনোও বা কোলে ওঠবার জন্য আবদার কচ্চে। আবার হয়তো বা কোলে করে রয়েছি—কিছুতেই কোলে থাকবে না, কোল থেকে নেমে রোদে দৌড়াদৌড়ি করতে যাবে, কাঁটা বনে গিয়ে ফুল তুলবে বা গঙ্গার জলে নেমে ঝাঁপাই জুড়বে। যত বারণ করি, 'ওরে, ওমন করিস নি, গরমে পায়ে ফোস্কা পড়বে। ওরে, অত জল ঘাঁটিস নি, ঠাণ্ডা লেগে সর্দি হবে, জ্বর হবে—সে কি তা শোনে? যেন কে কাকে বলছে। হয়তো সেই পদ্ম পলাশের মত সুন্দর চোখ দুটি দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে ফিক্ ফিক্ হাসতে লাগল, আর আরও দুরন্তপনা করতে লাগল বা ঠোঁট দুখানি ফুলিয়ে মুখভঙ্গি করে ভ্যাঙ্চাতে লাগল। তখন সত্যসত্যই রেগে বলতুম, "তবে রে পাজি, রোস্—আজ তোকে মেরে হাড় গুঁড়ো করে দেবো।—বলে রোদ থেকে বা জল থেকে তুলে নিয়ে আসি। আর এ জিনিসটা ও জিনিসটা দিয়ে ভুলিয়ে রাখি।"

এখানে একটু থামা যাক। যে আশ্চর্য ঘটনার বর্ণনা করা হল এবার তা একটু ভেবে দেখা যাক। একটা অষ্ট ধাতুর মূর্তি হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে, বদমায়েশী করছে। রামকৃষ্ণদেবও তাকে নিয়ে ব্যস্ত, তার পায়ে ফোস্কা পড়বে, জ্বর আসবে, আরও কত কি। গুরুদেবের মাহাত্ম্য বাড়াবার জন্য শিষ্যদের প্রচার হলে আলাদা কথা। কিন্তু আমার মনে হয় এগুলো মিথ্যে প্রচার নয়। শ্রীরামকৃষ্ণের মানসিকতা এমন এক স্তরে পৌঁছেছিল যেখান থেকে তিনি যখন তখন দৃষ্টি বিভ্রমের শিকার হতেন। আপনার কি মনে হয় একটা লোহা, তামা, সীসের তৈরি মূর্তি হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে, এ কখনো সম্ভব? 'সমস্তটাই ভাব রাজ্যের ব্যাপার' বললেও হয় না, রামকৃষ্ণদেব যথেষ্ট জোরের সাথেই বলছেন 'এই তোদের যেমন স্পষ্ট দেখছি তেমনই স্পষ্ট দেখতাম।' হ্যাঁ, তিনি দেখতেনই। এই ভাবেই তিনি মন্দিরে বসে

মা কালীকে নড়তে চড়তে দেখতেন। মন্দিরের বারান্দায়.দাঁড়িয়ে মা কালী কলকাতা দর্শন করছেন, তাও দেখতেন।

আমরা যেমন ভূত প্রেত দেখি না, এও তেমনি ব্যাপার। অন্ধকার পথে একা একা চলতে গিয়ে মনে হচ্ছে কে যেন পেছনে আসছে। মনের মধ্যে ভয় তৈরি হচ্ছে। এই বুঝি পেছন থেকে কে এসে ধরল। চলার গতি বেড়ে গেছে। কি যেন একটা নড়ল মনে হল। হয়তো অজ্ঞান হয়েই পড়ে গেলাম। নতুবা কোনক্রমে দৌড়ে বাড়ি ঢুকে হাঁপাতে হাঁপাতে সকলের কাছে ভূত সমাচার জ্ঞাপন। আসলে মনের মধ্যে ভূত থাকলে তবেই ভূত দেখা যায়। ঠিক ওই সময়কার মানসিক পরিস্থিতিই আমাদের ভূত দর্শন করিয়ে ছাড়ে। একই রকম পরিস্থিতিতে শ্রীরামকৃষ্ণের ভগবান দেখাও এমন কিছু আশ্চর্য ঘটনা নয়। তামা লোহার মূর্তিও তার পেছনে দৌড়ে বেড়ায় এতে অবাক হবার কিছু নেই।

আবার আমরা লীলাপ্রসঙ্গে ফিরে যাই। এখনো অনেক খেলাই বাকি পড়ে আছে। "আবার কখনো বা কিছুতেই দুষ্টামি থামছে না দেখে চড়টা চাপড়টা বসিয়েই দিতাম। মার খেয়ে সুন্দর ঠোঁট দুখানি ফুলিয়ে সজল নয়নে আমার দিকে দেখত। তখন আবার মনে কষ্ট হত, কোলে নিয়ে কত আদর করে তাকে ভুলাতাম। এরকম সব ঠিক ঠিক দেখতুম।" দেখুন রামকৃষ্ণদেব কিন্তু বারে বারে শিষ্যদের খেয়াল করিয়ে দিচ্ছেন, তার দেখাটার মধ্যে কোন খাদ নেই। নিশ্চিত ভাবেই তিনি দেখেছেন। ঠিক যেমন স্পষ্ট ভগবান দেখার কথা বলেছিলেন বিবেকানন্দকে।

"একদিন নাইতে যাচ্ছি, বায়না ধরলে সেও যাবে। কি করি নিয়ে গেলুম। তারপরে সে আর জল থেকে কিছুতেই উঠবে না, যত বলি কিছুতেই শোনে না। শেষে রাগ করে জলে চুবিয়ে ধরে বললুম—তবে নে কত জল ঘাঁটতে চাস ঘাঁট। আর সত্য সত্য দেখলুম জলের মধ্যে সে যেন হাঁপিয়ে শিউরে উঠল। তখন আবার তার কষ্ট দেখে, কি করলুম বলে কোলে করে জল থেকে তুলে নিয়ে আসি।"

"আর একদিন তার জন্য মনে যে কষ্ট হয়েছিল, কত যে কেঁদে ছিলুম বলার নয়। সেদিন রামলালা বায়না করছে দেখে ভোলাবার জন্য চারটি ধান শুদ্ধ খই খেতে দিয়েছি। তারপর দেখি খই খেতে খেতে ধানের তুষ লেগে তার নরম জিভ চিরে গেছে। তখন মনে যে কষ্ট হল, তাকে কোলে করে ডাক ছেড়ে কাঁদতে লাগলুম আর মুখখানি ধরে বলতে লাগলুম—'যে মুখে মা কৌশল্যা লাগবে বলে ক্ষীর, সর, ননীও অতি সন্তর্পণে তুলে দিতেন, আমি এমন হতভাগা যে, সেই মুখে এই কদর্য খাবার দিতে মনে একটুও সঙ্কোচ হল না।'—কথাগুলি বলিতে বলিতেই ঠাকুরের আবার পূর্ব শোক উথলিয়া উঠিল এবং তিনি আমাদের সম্মুখে অধীর হইয়া এমন ব্যাকুল ক্রন্দন করিতে লাগিলেন যে, রামলালার সহিত তাহার প্রেম সম্বন্ধের কথার বিন্দু বিসর্গও আমরা বুঝিতে না পারিলেও আমাদের চক্ষে জল আসিল।"

রামলালা বৃত্তান্ত এখানেই শেষ নয়, আরও আছে। আমরা আর এগোচ্ছি না, এই পর্যন্তই যথেষ্ট। তিনি যে চূড়ান্ত হ্যালুসিনেসনের শিকার এখনো যদি না বোঝা যায় তাহলে বুঝে নেব আমারই বোঝা এবং প্রকাশ করা দুটোতেই গলদ আছে।

রামলালা কেন রামৎ সন্ন্যাসীকে ছেড়ে রামকৃষ্ণের কাছে চলে আসছে বলতে পারেন? রামকৃষ্ণদেব জানেন সাধারণ সাধু সন্ন্যাসীর থেকে তিনি অনেক উঁচু স্তরের সাধক। ঠাকুর দেবতার ওপর মালিকানার দাবীও অন্যদের থেকে তারই বেশী। এজন্যই এমনতর দেখছেন তিনি। ওই মূর্তিটি নিয়ে তিনি এমন ভাব রাজ্যে পড়েছিলেন যে সেই রামৎ সন্ন্যাসী রামলালার মায়া ত্যাগ করে মূর্তিটি শ্রীরামকৃষ্ণকে দান করে দক্ষিণেশ্বর ছেড়ে চলে যান। সম্ভবতঃ মূর্তিটি এখনও দক্ষিণেশ্বরে আছে।

ছোটবেলায় জুল ভার্ণ, এইচ. জি. ওয়েলস-এর কল্প বিজ্ঞান পড়ে মজা পেতাম। শ্রীরামকৃষ্ণ-রামলালা বৃত্তান্ত সেই কল্প বিজ্ঞানের চেয়ে কম কিছু নয়। রোবট এই দুদিন আগে এসেছে। রামকৃষ্ণদেব কিন্তু দেড়শো বছর আগেই রোবট নিয়ে খেলেছেন।

তিন ব্যক্তির সাথে আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ট পরিচয় আছে, এদের একজন আমার বোনের দেবর, একজন পাড়ার দাদা, আর একজন স্কুলের বন্ধু। এদের তিন জনের সাথে রামকৃষ্ণদেবের একটি বিষয়ে বেশ মিল আছে। কারণ এদেরও শ্রীরামকৃষ্ণের মতই ঈশ্বর সাক্ষাৎকার ঘটেছে। কেউ বা সাদা চোখে ভগবানকে দেখে, কেউ বা স্পষ্ট ভগবানের বাণী শুনতে পায়। মিথ্যাবাদী কেউ নয়। সত্যিই এরা এরকম দেখে-শোনে। যে কেউ প্রমাণ চাইলে এদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে পারি। কথা বললেই স্পষ্ট বোঝা যাবে এরা কেউ মিথ্যা বলছে না। সেরকম লোক এরা কেউ নয়। বর্তমানে তিনজনেই ডাক্তারের চিকিৎসাধীন। শ্রীরামকৃষ্ণও যদি মথুর বাবুর বদলে এমন এক ডাক্তার পেতেন, অবতার হবার ঝক্কি থেকে মুক্তি পেতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে এই যে ভাব তৈরি হয়েছিল তিনি ভগবান অথবা ভগবানের অংশ স্বরূপ অবতার, তার শিষ্যদের অনেকের মধ্যেও প্রায় একই রকম ভাবের সঞ্চার ঘটিয়েছিল। ভগবান তারা নিজেদের ভাবতেন না ঠিকই, কিন্তু সাধারণ মানুষের থেকে অনেক উঁচুতে একটা মস্ত কেউ-কেটা যে তারা হয়েছেন এ তারা খুব বুঝতেন। জনে জনে উদাহরণ দেবার দরকার নেই। কয়েকটা উদাহরণ দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করব এরা কেমন নিজেদের এক একজন মহারথী ভেবে নিয়েছিলেন। তবে শুধু শ্রীরামকৃষ্ণ বা তার শিষ্যরাই নন, ঋষি অরবিন্দকেও দেখেছি একই রকম ধারণা পোষণ করতেন। তার সম্বন্ধে একটু বলে নিয়ে মূল প্রসঙ্গে ঢুকে পড়ব।

একবার মায়ার প্রভাব কাটাতে শিষ্যদের বলছেন ঃ— 'মা আর আমি যে তোমাদের নিরাপত্তা দান করে থাকি তার উপর নির্ভর করে থাকার মতো শক্তি পেতে অভ্যাস

করা উচিৎ। সেই কারণেই বলি যে, বাহ্য মনের দ্বারা বিচার করা বা খুঁত ধরা বা একটা ধারণা করে নিয়ে তাকে পোষণ করা, এগুলো ছাড়তে হবে। এসব জিনিস মনের মধ্যে জেগে উঠতে চেষ্টা করলেই তখন মনে মনে বার বার বলতে থাকবে, "শ্রী অরবিন্দ এবং মা আমার চেয়ে অনেক ভাল বোঝেন—তাদের মতো জ্ঞান ও অনুভূতি আমার নেই—তারা সাধারণ জ্ঞানের চেয়ে বৃহত্তর জ্ঞানালোকে যা করবেন তাই হবে সবচেয়ে ভালো।" এই ভাবটি বলতে বলতে যদি স্থায়ী হয়ে যায় তাহলে অন্ধকার মুহূর্তেও তা থাকবে, তাতে আসুরিক মায়ার প্রভাবকে অনায়াসে প্রত্যাখ্যান করতে পারবে।' (নিজের কথা - ঋষি অরবিন্দ, পৃ-৪১০)। লক্ষ করে দেখুন কি সাংঘাতিক ঔদ্ধত্যের সঙ্গে নিজের মহিমা প্রচার করা হচ্ছে। আমরা যখন কাউকে অবতার হতে সাহায্য করি তাকে যা খুশি বলার স্বাধীনতাও দিয়ে থাকি। জার্মানি, ইতালি, ইংলন্ডে তো এমন আঙুরের মতো থোকা থোকা অবতার গজায় না। এ শুধু এই হতভাগা দেশটারই সম্পত্তি। উন্নত বিশ্বের লাথি-ঝ্যাটা বুকে নিয়ে, আর ভূত ভগবান-অবতার মাথায় নিয়ে দিব্যি আছি আমরা।

এক ভক্তের প্রশ্ন, "যখন মাকে স্বপ্নে ডাকি তখন তার শক্তির ক্রিয়াতে, আর যখন বলি 'শ্রী অরবিন্দ-মীরা' তার ক্রিয়াতে কোনও তফাৎ আছে কী? শ্রী অরবিন্দ ঃ— "তেমন কিছু নেই। মায়ের নামেই রয়েছে সম্পূর্ণ শক্তি। তবে দুজনের নামে কোনও কোনও ক্ষেত্রে বিশেষ ফল হতে পারে।" মন্ত্র কি হবে জিজ্ঞাসা করায় বলেছেন, "ওঁ শ্রী অরবিন্দ মীরা। আমার মনকে, আমার হৃদয়কে, আমার জীবনকে যেন তোমাদের আলোতে, তোমাদের শক্তি ও তোমাদের প্রেমের দিকে উন্মীলিত করে। সব কিছুতে যেন আমি ভগবৎ সাক্ষাৎ লাভ করি।" (নিজের কথা - ঋষি অরবিন্দ, পৃষ্ঠা - ৪২৬-২৭)। মন্ত্র, সেও হবে আমারই নামে। এমন দুঃসাহস রামকৃষ্ণদেবের মধ্যে ছিল না।

শ্রী মা সারদামণিকেও দেখেছি যখন তখন বলে বসতেন তিনি ভগবান। তারপরেই জিব কেটে বলতেন, এ-মা তোমরা শুনে ফেলনি তো, কি যে বলে ফেললাম। আর কাউকে বলো না যেন এ কথা। সারদামণির ছায়াসঙ্গিনী ছিলেন যোগীন মা আর গোলাপ মা নামে দুই বালবিধবা। এরা যেন সব সময় ভগবান ধরার তালেই থাকতেন। মায়ের মুখে ভগবানত্ব শুনেই এনাদের কেউ একজন বলে বসতেন, তবে মা, বলে ফেললে তো। যতই গোপন করার চেষ্টা করো না কেন, বেরিয়ে পড়লো তো। এই যে ভগবানকে হাত বাড়ালেই পাওয়া যাচ্ছে এটাই আনন্দ। সারদামণির এই নিজেকে ভগবান প্রচার করার হাজার খানেক নমুনা আমার কাছে আছে। তবে এক্ষুণি এই এক হাজার ভগবান পাঠককে উপহার দিচ্ছি না। এখন তালা বন্দি থাক। সম্ভব হলে অন্য কোন সময় তালা খুলে দেব। তবে দু-একটি উদাহরণ না দিলে সমালোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। "শ্রীশ

চন্দ্র ঘটক জয়রামবাটী চলেছেন। বর্ষাকাল, সাপ খোপের উপদ্রব ভীষণ। এসে সারদামণিকে প্রণাম করতে মা বলেন— "ঠিকমত এসেছ তো বাবা? এখন বর্ষাকাল, ওরা (সর্পকুল) এখন আমার কথা শুনবে কেন। আনন্দ মনে স্বাধীন ভাবে ঘুরে বেড়াবে। অনেক করে ভুলিয়ে ভালিয়ে তাদের অন্যত্র করতে হয়েছে। যাক, ঠাকুরের দয়ায় ভালয় ভালয় এসেছ।"

"দলঘাস কাটবার সময় দেখতুম, আমারই বয়সী আর একটি মেয়ে আমার সঙ্গে সঙ্গে দল কাটছে। একটি দল কেটে উপরে রেখে এসে যেই আর একটি কাটতে যাব, দেখতুম সেটি আগে থেকেই কাটা হয়ে রয়েছে। মেয়েটি কে কিছুই বুঝতে পারিনি।" সে সময় বয়স কম থাকায় বোঝা কঠিন হয়ে পড়েছিল। কিন্তু বয়স যখন হয়েছে মা নলিনীবাবুর প্রশ্নের উত্তরে একদিন বলেন, "আমিই রাধা"। বয়স বেড়েছে, এখন সব ঠিক ঠিক বুঝতেও পারছেন। থাক, এ নিয়ে আর এখন আলোচনা নয়। আগের প্রসঙ্গে ফিরে যাই।

মহাপুরুষ মহারাজ বা স্বামী শিবানন্দ, এক মহিলা ভক্তকে বলছেন—"আমাদের তিনি এখনো স্থূল দেহে রেখেছেন। এ দেহ নষ্ট হয়ে গেলে আমরাও চিন্ময় দেহে ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে অবস্থান করব। আমরা যাদের আশ্রয় দিয়েছি তাদের ইহকাল ও পরকালের সব ভার আমাদের নিতে হয়েছে। ভক্তেরা পবিত্র হৃদয়ে ব্যাকুল ভাবে ডাকলে আমাদের দেখাও পাবে।" (শিবানন্দ বাণী—স্বামী অপূর্বানন্দ, দ্বিতীয় ভাগ, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা-৯১)। ভাবখানা লক্ষ্য করে দেখুন, বলছেন মৃত্যুর পর তারা সরাসরি ভগবানের সাথে এক হয়ে যাবেন। কার্-কার্ ভারও আবার নিয়ে রেখেছেন। তাদের ইহকাল পরকাল সব সামলাতে হয়। মন দিয়ে ডাকাডাকি করলে মৃত্যুর পরও এসে দেখা দিয়ে যাবেন।

এই দেখা পাওয়া, দেখা দেওয়া ব্যাপার গুলো এদকম বুঝে উঠতে পারি না। ধরা যাক শিব ঠাকুর এসে দেখা দিয়ে গেল। তো হলটা কি? চারটে হাত গজাল না দুটো মাথা। ভক্তের সাথে ভগবানের এ এক দিব্য প্রহসন।

ভগবান ভক্ত সম্পর্কের মধ্যে আরও একটা কথা খুব ওঠে। ভক্তরা বলেন বিজ্ঞান কি মানুষকে 'শান্তি' দিতে পারে? শান্তি লাভ করতে গেলে ভগবানের ছাতার তলায় দাঁড়াতেই হবে। হ্যাঁ, কথাটা ঠিক। বিজ্ঞান তো মানুষকে প্রকৃত শান্তি এনে দিতে পারে না। এতো বাজারে বিকোয় না। তবে এখানে একটা প্রশ্ন আছে, আমাদের দেশে কম বেশি নিরানব্বই শতাংশ মানুষই ঈশ্বর ভক্ত। তবে কি ধরে নেব ভারতের এই নিরানব্বই শতাংশ মানুষের মধ্যেই শান্তি প্রতিষ্ঠিত? আসলে সেটাও শান্তি লাভের মিথ্যে প্রহসন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু) এর একটি পরিসংখ্যান জানাচ্ছে, পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক বিষাদগ্রস্থ মানুষের বাস ভারতবর্ষেই। প্রতি দু'মিনিটে একটি আত্মহত্যা, তাও ভারতবর্ষেই। (আজকাল - ২৮ জুলাই ২০১১)।

মহারাজ ভক্তদের বার বার বলতেন "আমাদের ওপর মানুষ বুদ্ধি এলেই মারা যাবি।" (শিবানন্দ বাণী, পৃষ্ঠা-১৯৩)। সাবধান করে দিচ্ছেন তাদের যেন কেউ সাধারণ মানুষ বলে ভেবে না বসেন। স্বামী অভেদানন্দ ভক্তদের বলছেন—'তোরাও কোথায় চলে যাবি, আমিও কোথায় চলে যাবো। আর কি দেখা হবে? তোদের একটা লাভ হল যে, আমার সঙ্গ করে নিলি, সেবা করলি। এইটিই তোদের জীবনের মস্ত বড় লাভ।' (যেমন শুনিয়াছি, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ২৬৫)।

শ্রীরামকৃষ্ণ তার শিষ্যদের সম্বন্ধে বলতেন, এ সপ্তর্ষি মণ্ডলের ঋষি, ও ঈশ্বর কোটি, কেউ বা ব্রজের রাখাল, কেউ বা চৈতন্যদেবের পার্ষদ, কেউ বা যীশুখ্রীষ্টের ডান হাত, এই রকম সব। স্বামী শিবানন্দ তার অন্তরঙ্গ সন্ন্যাসী শিষ্যদের একজন হলেও এনার সম্বন্ধে তিনি তেমন কোন নির্দেশিকা রেখে যান নি। এই আক্ষেপ তিনি নিজেই মিটিয়ে নিচ্ছেন "আমি বুদ্ধের সঙ্গে এসেছিলাম" বলে। (দেবলোকে—স্বামী অপূর্বানন্দ, প্রথম প্রকাশ, পৃষ্ঠা-১২০)। "যদি বলি, গাছ মুক্ত হয়ে যা, তাই হবে।" (দেবলোকে, পৃষ্ঠা-১৯২)। খাওয়া পরার চিন্তা নেই, এসব নিয়ে দিব্যি কাটিয়ে দিলেন। লাটু মহারাজ বলেন—'শরোট (শরৎ, স্বামী সারদানন্দ) আমরা যে কে, কীভাবে এসেছি, একটু লিখে রেখো। স্বামীজী শরীর থাকতে প্রকাশ করতে নিষেধ করেছিলেন। পরে ছাপা হবে।' (স্বামী সারদানন্দের স্মৃতিকথা, পৃষ্ঠা - ৩৪৫)।

স্বামী অখণ্ডানন্দ বলছেন "আমাদের কি বুঝবি? আমরা বিরাট, অনন্ত, দশের জন্য আমাদের জন্ম।" শ্রীরামকৃষ্ণের ঈশ্বর কোটি, হাড় পর্যন্ত শুদ্ধ, স্বামী প্রেমানন্দের একটু অবতার হবার দিকে ঝোঁক ছিল। "যিনি ঠাকুরের ভিতর ছিলেন, যিনি স্বামীজীর ভিতর ছিলেন, তিনি এর ভিতর (নিজের) আছেন।" নিজেই বলে দিয়েছেন। (স্বামী প্রেমানন্দ—স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ, পৃষ্ঠা-১১০)। মাঝে মাঝে কাউকে বা বলতেন "তোকে অহেতুক দয়া করলাম।" (ঐ, পৃষ্ঠা-১১৫)।

বাবুরাম মহারাজ, স্বামী প্রেমানন্দ একবার ঢাকায় স্বামী ব্রহ্মানন্দকে বলেছিলেন "স্বামীজী ছিলেন অধম তারণ পতিত পাবন"। ব্রহ্মানন্দ তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন "আমিও অধম তারণ পতিত পাবন।" (ব্রহ্মানন্দ লীলাকথা—ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য, পৃষ্ঠা-১২০)। কেউ কারও চেয়ে কম যায় না আর কি! 'মহারাজ ভাবস্থ হইয়া তাহার এক অন্তরঙ্গ শিষ্যকে বলিয়াছিলেন, "জ্ঞাত ও অজ্ঞাতের মধ্যে, মানুষ ও ভগবানের মধ্যে যে ব্যবধান, আমি তার সংযোগ সেতু"। স্বামী জ্ঞানেশ্বরানন্দ কথিত। (ব্রহ্মানন্দ চরিত, স্বামী প্রভানন্দ, পৃষ্ঠা - ৩০৩)।

একবার এক ভক্ত শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্যদের নিয়ে কিছু লেখার উদ্দেশ্যে গিয়ে স্বামী অখণ্ডানন্দের তাড়া খেয়ে ব্রহ্মানন্দের কাছে আশ্রয় নেন। তাতে মহারাজ বলেন "আহা, লিখুকগে। ঠাকুরের কথা নিয়ে কথামৃত লেখা হয়েছে। ওরাও না হয় মহাপুরুষদের

কথা নিয়ে কিছু লিখবে, তাতে আমাদের কি?" (ব্রহ্মানন্দ লীলাকথা, পৃষ্ঠা - ২০০-২০১)। নিজেরাই নিজেদের মহাপুরুষ বলে দিব্যি চিনে ফেলেছেন। এ প্রসঙ্গে আমি ঋষি অরবিন্দকেও এই আলোচনায় আনতে চাই। কারণ তার মধ্যেও 'আমি অবতার' 'আমার মধ্যে দিয়ে ভগবানের বিকাশ' এই ভাবের কমতি ছিল না। কোন এক শিষ্যকে বলছেন ঃ— 'যা কিছু পাবে মায়ের কাছ থেকে, জানবে যে তা আমার কাছ থেকেও আসছে — কোনো তফাৎ নেই। তেমনি আমি যদি কিছু দিই, তাও জানবে যে মায়ের শক্তিতে সাধকের কাছে গিয়ে পৌঁছচ্ছে।

কেউ একজন জোরদার স্বপ্ন দেখে এসেছে। স্বপ্ন দেখতে বা ভাব দর্শনে খরচ নেই এক পয়সাও। তাই যে যা খুশি স্বপ্ন দেখে বেড়ায়। স্বপ্ন দর্শনের ওপর কিছু মাসুল ধার্য হলে ভাল হতো। যাক, স্বপ্ন দেখা ভক্তকে ঋষি বলছেন—'মা এবং আমি একই শক্তির দুই রূপ—যা স্বপ্নে দেখেছ তা খুবই যুক্তিসঙ্গত। ঈশ্বর-শক্তি, পুরুষ-প্রকৃতি, এ হলো একই ব্রহ্মের দুই দিকের বিকাশ।' একজনের তীব্র অনুভূতির উত্তরে বলছেন ঃ— দুটি মূর্তি মিলে এক হয়ে গেল, এই যে অনুভূতি, অর্থাৎ আমি ও মা এক এবং অভিন্ন, এটি খুবই সাধারণ সত্য অনুভূতি।

ঋষি অরবিন্দ সম্পর্কে সামান্য কিছু পড়তে গিয়ে একটা ব্যাপার খুব লক্ষ্য করেছি, সেখানে বিভিন্ন আলো-আঁধারী, রঙ-বেরঙ-এর খেলা একটা আছে। এই, আমার আলো নীল শ্রীকৃষ্ণের আলোও নীল। মায়ের আলো হালকা, ফিকে ফিকে। পতাকার রঙ অমুক, প্রকৃতির রঙ তমুক, ফিকে নীল রং আমারই। যাকে বলে ফিকে ল্যাভেন্ডার ব্লু, এই নীল লাল, রং-বেরং শুনতে শুনতে ভক্তদের মনেও যে রঙ ধরবে এতে আর আশ্চর্য কী। এক ভক্ত এসেছেন তার রঙ্গিন আর্জি নিয়ে। প্রশ্ন ঃ — আমি ভিতরকার দৃষ্টিতে প্রায়ই যে সব আলোর খেলা দেখি তাতে গভীর রকমের ধারণা আসে যে শ্রী অরবিন্দকে ও মাকে দুই বিভিন্ন দেহে দেখা গেলেও তারা একই। ঠিক কথা কি? ঋষি অরবিন্দ— হ্যাঁ। ঐ ভক্তটিকেই কিছুদিন পরে আবার বলছেন ঃ— "তোমার ঐ স্বপ্নই ইঙ্গিত করছে যে মা আর আমি কারা এবং কিসের প্রতিনিধি—ওর চেয়ে বেশি কিছু বলার দরকার নেই। ওতেই বোঝা যাচ্ছে যে আমরা আছি ভগবৎ প্রেম ও আনন্দকে সম্পূর্ণ করতে।"

আর একজনের প্রশ্ন ঃ আজকাল শ্রী অরবিন্দের আলো প্রায়ই দেখি কিন্তু বিভিন্ন রূপে — কখনো একটি বড় নক্ষত্রের মতো, কখনো চাঁদের মতো, কখনো ঝলকের মতো। একই রূপে কেন দেখি না?

শ্রীঅরবিন্দ ঃ ঘটনার বিভিন্নতায় সেটা হয়। একই রকম সব সময়ে হবে কেন? (নিজের কথা — ঋষি অরবিন্দ, পৃষ্ঠা ২০১)।

প্রশ্ন ঃ কাল রাত্রে আমি দেখলাম যেন শ্রী অরবিন্দ একটি চেয়ারে বসে কিছু লিখছেন। তার মাথার পিছন ঘিরে আছে এক সবুজ আলো। এর অর্থ কি হবে?

শ্রীঅরবিন্দ ঃ 'সবুজ আলো হল সক্রিয় প্রাণশক্তির (কর্মের)। আমি যখন লিখছিলাম—অর্থাৎ কাজ করছিলাম—তখন আমার মাথার পিছনে সবুজ আলো দেখা যাবে এটাই স্বাভাবিক।' (ঐ, পৃষ্ঠা - ২০৪)।

ঋষি অরবিন্দের জীবন উদ্দেশ্য ছিল অতিমানস নামে এক দৈব সত্ত্বাকে পৃথিবীর বুকে নামিয়ে আনা। প্রতিটি মানুষ এই দৈব চেতনায় আবিল হয়ে পৃথিবীর বুকে বিচরণ করবে এমনটাই তার যোগ সাধনার উদ্দেশ্য। ওঝা-গুনিনরা যেমন ভূত নামায় চন্ড নামায় তিনিও এসবের এক বিপরীত সত্ত্বা অতিমানসকে ধরার বুকে নামিয়ে আনতে চেয়েছিলেন। কতটা নেমেছিল জানি না, তবে চেষ্টা তিনি করেছিলেন।

এক প্রশ্নকারীর প্রশ্ন ঃ ক বলছেন খ কে ১৯২৬ থেকে মা ভার নেবার আগে সাধকরা বিশ্বচেতনা অনুভব করেছে এবং তখনকার সাধনা এখনকার চেয়ে আরো ভালো ও গুরুত্বপূর্ণ হতো। এ কথা কতখানি সত্য? ঋষি অরবিন্দ ঃ— 'মায়ের আসার আগে সকলেই ছিল মনের অনুভূতি ও উপলব্ধি নিয়ে। প্রাণসত্তা প্রভৃতি অবিশুদ্ধ আর চৈত্য ছিল অন্তরালে। কেউ বিশ্ব চেতনা পেয়েছিল কিনা জানিনা। আমি তখন রূপান্তর ও অতিমানসে যাবার পথ খোঁজাতে লেগে আছি। যারা সাধারণ সাধক ছিল তাদের লাগাম ঢিল দিয়েছি। ক হলেন তাদেরই একজন—ওরা তখন যে প্রাণ-স্বাধীনতা ও নিয়মমুক্তির মধ্যে ছিল তারই অভাব বোধ করছে।' (ঐ, পৃষ্ঠা ৩৭২-৭৭)।

প্রশ্ন ঃ গত রাত্রে স্বপ্নে আপনাকে দেখলাম আপনি বাইরে বেরিয়ে এসেছেন। বয়স কম, শ্যামল দেহ। ভাবলাম, এমনই কি শ্রী অরবিন্দের পূর্বেকার চেহারা ছিল?

ঋষি অরবিন্দ ঃ 'তা নয়। ওটা বোধ হয় একরূপ সূক্ষ্ম দেহ, আমার ভিতরকার শিব অংশ হবে। নিজেকেও আমি ঐরূপ দেখেছি আমার শিব অংশ সম্পর্কে।' (ঐ, পৃষ্ঠা :—২০৫)।

শ্রী অরবিন্দ ঃ উচ্চশক্তি যে আরো বেশি জোরে অবতরণ করছে এ কথা ভুল নয়। অনেকেই এখন মাকে ঘিরে নানারকম আলো ও বর্ণালি দেখতে পাচ্ছে এবং তার সূক্ষ্ম জ্যোতির্ময় দেহও দেখা যাচ্ছে—তার মানে তাদের অতিভৌতিক দৃষ্টি খুলছে, কোনো মিথ্যা মায়া নয়। আর যে সব আলো বা রং তোমরা দেখ ওগুলি হলো বিভিন্ন স্তরের শক্তি, প্রত্যেকটি বর্ণের আলাদা আলাদা শক্তি বিকাশ। অতিমানস শক্তি নামছে, কিন্তু এখনও দেহ বা জড়বস্তুকে অধিকার করেনি—তার পক্ষে এখনও অনেক বাধা রয়েছে। এখন কেবল অতিমানসগত অধিমানস এসে স্পর্শ করেছে। এর পরে যে কোনো মুহূর্তে ও বদলে অতিমানস স্বয়ং তার আপন শক্তিতে এসে দখল নিতে পারে। (নিজের কথা,

পৃষ্ঠা - ৩৮৯)। এই অতিমানসটি নেমে আসাই যা অপেক্ষা, একবার নেমে এলেই ব্যস, কেল্লা ফতে।

এই সব অদ্ভুতুড়ে কথা মানুষ হজম করে কি করে কে জানে। তবে হজম নিশ্চয়ই হয়, দেশের দুরবস্থার দিকে তাকালেই সেটা বোঝা যায়।

আবার আগের প্রসঙ্গ, স্বামী নির্লেপানন্দ এসেছেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দকে উদ্বোধনে যাবার জন্য অনুরোধ জানিয়ে বললেন সেখানে স্বামী সারদানন্দ আছেন, গেলে খুব আড্ডা হবে। উত্তরে স্বামী ব্রহ্মানন্দ বললেন "এক বনে কি দুই সিংগি থাকে রে?" (ব্রহ্মানন্দ লীলাকথা, পৃষ্ঠা-২২৩)। অসুস্থ মহারাজকে সেবকরা উঠিয়ে নিয়ে যেতে গিয়ে বোঝে ওজন নেহাত কম নয়। মহারাজ বলেন "ওরে মরা হাতী লাখ টাকা।" (ঐ, পৃষ্ঠা-২৪৪)। 'মহারাজ দিনের বেলায় ভাত ও রুটি খাইতেন। দই দিয়া আটা মাখিয়া প্রায় দুই ঘণ্টা জলে ভিজাইয়া রাখিয়া রুটি করা হইত। দুই বেলা আহার্যের মধ্যে ফল, দুধ অধিক পরিমাণে থাকিত। রাত্রে ফল দুধ মিষ্টি, কখনো বা এক আধখানা রুটি।' (ঐ, পৃ - ২১০)। এমন মেনু যদি রোজ পাওয়া যায় ওজনের আর দোষ কি, সেতো একটু বাড়বেই।

পুরোনো দিনের এক বন্ধুর সাথে দেখা হয়েছে স্বামী বিজ্ঞানানন্দের। পূর্বকালে দুজনেই ছিলেন ক্ষীণকায়। নানা কথাবার্তার মধ্যে বলছেন, 'আপনাকে খেটে খেতে হয় তাই আপনি কৃশই আছেন, আমাকে রোজগার করতে হয় না বলে আমি মোটা হয়ে গেছি।' (প্রত্যক্ষদর্শীর স্মৃতিপটে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ, পৃ - ২০৬)। 'দুটো-আড়াইটা বাঁধাকপির তরকারি ভিন্ন তাহার পছন্দ হত না, সন্দেশ সের দেড়েক খেয়ে ফেলতেন।' (ঐ, পৃ - ২১৩)। 'আমি (জোসেফিন ম্যাকলাউড) বললাম, "স্বামীজী, আপনি যতদিন জীবিত থাকবেন ততদিন প্রতি মাসে পঞ্চাশ ডলার আমি আপনার সেবার জন্য নিয়মিত দিয়ে যাব।" মুহূর্তকাল চিন্তা করে স্বামী বিবেকানন্দ বললেন, "ওতে কি আমার চলবে?" আমি বললাম, "হ্যাঁ, তা একরকম চলে যাবে, তবে ঐ সামান্য টাকায় আপনার বোধহয় ক্রীম খাওয়াটা হয়ে উঠবে না।" তখনই আমি তার হাতে দুশো ডলার দিই, কিন্তু চারমাস কাটতে না কাটতেই তিনি চলে (মৃত্যু) গেলেন।' (জোসেফিন ম্যাকলাউড—প্রব্রাজিকা প্রবুদ্ধপ্রাণা, প্রথম সং-২০০৮, দক্ষিণেশ্বর সারদা মঠ, পৃ. ১৯৫)।

দশম প্রেসিডেন্ট মহারাজ—"আমার কাছে যা হরলিক্স আসছে তা দিয়ে আমি একটা হরলিক্সের দোকান খুলতে পারি।" (উদ্বোধন, বৈশাখ, ১৪১৫, ৪র্থ সংখ্যা, ১১০তম বর্ষ, পৃ - ২৫৩)। তবে আর কি। ওজন কমার সুযোগই নেই। পোড়া লঙ্কা আর পান্তাভাত খেয়ে যাদের জীবন কাটে তাদের সকলেরই একবার সন্ন্যাসী হবার চান্স নিয়ে দেখা উচিত।

স্বামী তুরিয়ানন্দও নিজেকে বেশ কিছু একটা ভাবতেন। তবে নিজেকে যে যাই ভাবুক না কেন, একটাই রক্ষে, সবাই নিজেকে অবতার বলে ভাবতেন না। সবাই যদি এরকম

ভেবে বসত শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারত্ব নিয়েই না টানাটানি দেখা দিত। এ রকম কথা যে বললাম তার একটা কারণ আছে। দেখতে পাচ্ছি শ্রীরামকৃষ্ণের অনেক শিষ্যই বলছেন ঠাকুরের মুখের কথাই তাদের কাছে ধ্রুব সত্য। যেমন শ্রীম এক ভক্তকে বলছেন—'তিনি নিজ মুখে বলেছেন "আমি অবতার" তাই তার কথা আমরা বিশ্বাস করি।' এখন শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ পার্ষদদের শিষ্য সংখ্যাও নেহাত কম নয়। তারাও যদি তাদের নিজেদের শিষ্যদের কাছে, 'আমি অবতার' দাবী করে বসতেন, অনেকে হয়তো মেনে নিতেও পারত। মাত্র একটি অবতার না হয়ে হয়ত পুরো দশাবতারই আমরা পেতে পারতাম। মন্দ ভাগ্য আমাদের, দশের জায়গায় পেলাম মাত্র এক।

নারীর প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণ

"স্ত্রী লোক নিয়ে মায়ার সংসার করা। তাতে ঈশ্বর ভুল হয়ে যায়। যিনি জগতের মা, তিনিই এই মায়ার রূপ—স্ত্রী লোকের রূপ ধরেছেন। এটি ঠিক জানলে আর মায়ার সংসার করতে ইচ্ছে হয় না। সব স্ত্রী লোককে ঠিক মা বোধ হলে, তবে বিদ্যার সংসার করতে পারে। ঈশ্বর দর্শন না হলে স্ত্রী লোক কি বোঝা যায় না।" নারী সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণের মতামত ঠিক এই রকমই। নারীর সাথে সংসার করছ, কি নারীর সাথে মেলামেশা করছ, তো তোমার ঈশ্বর ভুল হয়ে যাবে। নারীকে তিনি শুধুই 'মা' বলে ভাবতে পারেন। 'নারী' বলে নয়। এটাই আপত্তিকর। নারীকে শুধুই একজন নারী বলে ভাবা হবে না কেন? 'মায়ের জাত' তকমা লাগিয়ে কেন তাকে হেঁসেল, পতিসেবা, আর বাচ্চা পালার যন্ত্র বানিয়ে দেওয়া হবে?

আচার্য শঙ্করাচার্য বলেছেন 'নারী নরকের দ্বার'। এই মতটিকেই সমাজ সোজা পথে না মেনে বাঁকা পথে মেনে নিয়েছে।

সেই বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, শাস্ত্র, থেকে একই ধারা বয়ে চলেছে। সর্বত্রই পুরুষের জয়গান, আর নারীর অবমাননা। (এই অংশটুকু নির্মল রায়ের 'রাণী রাসমণির জীবন বৃত্তান্ত' গ্রন্থের কিছু অংশের অনুকরণে লেখা)। নারীকে সর্বত্র এতই হীন চোখে দেখা হয় যে হিন্দু শাস্ত্রের নির্দেশানুযায়ী পুত্র সন্তান ছাড়া কন্যা সন্তানকে বংশধর রূপে স্বীকৃতি দেওয়াই হয় না। এমন কি যাদের কেবল মাত্র কন্যা সন্তান আছে, তাদের মৃত্যুর পর, কন্যা সন্তান থাকা সত্ত্বেও শাস্ত্রানুযায়ী তাদের বংশ লোপ হয়ে যায়। অতএব শুধুমাত্র কন্যার পিতামাতা জেনে রাখুন আপনারা কিন্তু নির্বংশ হয়েছেন। অবশ্য যদি হিন্দু শাস্ত্র মানেন তো। ব্রাহ্মণকে মূল্য ধরে দিয়ে রেহাই নেই। কিছু কিছু বিধান তারা সুবিধামতো পাল্টে দিতে পারেন বটে, তবে সব বিধান পাল্টে দেওয়া ব্রাহ্মণের কম্মো নয়।

আমাদের বর্তমান হিন্দু সমাজ মনুসংহিতার অনুশাসনে পরিচালিত। চোদ্দ জন মনুর নির্দেশ সমৃদ্ধ সংহিতা দ্বাদশ অধ্যায় বিভক্ত। সংহিতার নবম অধ্যায়ে দায়ভাগ নিয়ম অনুযায়ী কন্যা সন্তান বংশধর হয় না। এই নিয়মটিই বর্তমানে শাস্ত্র নিয়ম রূপে স্বীকৃত এবং এখনো অপরিবর্তনীয়।

ঋষি ঋণ, দেব ঋণ, পিতৃ ঋণ, নৃ ঋণ এবং ভূত ঋণ—এই পাঁচ ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে হিন্দুরা পৃথিবীতে আসে। পরবর্তী কালে পুত্র সন্তান লাভ হলে পিতৃ তর্পণে পিতৃ

ঋণ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। অন্য ঋণ গুলি এখানে বিচার্য নয়। পুত্র সন্তানের জন্ম দিতে না পারলে, অপদার্থ কন্যা সন্তানের পিতামাতা 'পুৎ' নরক প্রাপ্ত হন। সেখানে পাঁচ হাজার বছর রেপসিড তেলে ফ্রাই। তারপর যমদূতেরা .... থাক, সে বড় ভয়ঙ্কর।

তবে এখানে মহামতি মনু বিধবা নারীর প্রতি কিছুটা সদয়। তার বিধান 'পতির মৃত্যুতে সাধ্বি বিধবা পুত্রহীনা হইলেও ব্রম্মচর্য পালনের ফলে স্বর্গে গমন করেন।' বেশ ভাল বিধান। পুত্রহীনা বিধবার স্বর্গে যাবার তবু একটা রাস্তা বেরল। পুরুষ কিন্তু এ আশীর্বাদে বঞ্চিত। তবে একটু ঘুর পথে বিচার করলেই দেখা যাবে এর পেছনেও নারীকে দমিয়ে রাখার নীতিই কাজ করছে। পুরুষ চরে খাক। আসলে আমাদের সমস্ত পুরাণ শাস্ত্রই নারী বিদ্বেষী। স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণও পুত্র কন্যা হীন। সুতরাং পিতৃঋণ থেকে মুক্ত নন।

ঐতরেয় ব্রাম্মণ অনুসারে 'পুত্রলাভ করে পিতা অন্ধকার অতিক্রম করেন। পুত্র হল জ্যোতিঃ, কিন্তু কন্যা বা দুহিতা হল কৃপণ বা দুঃখের কারণ।' 'ঋগ্বেদে' জননী দশটি পুত্র কামনা করছেন। পক্ষান্তরে কন্যাকে 'বন্ধকী' দ্রব্যের সাথে তুলনা করা হয়েছে। যেখানে পুত্র সম্পদ স্বরূপ। 'অথর্ব বেদে'ও শুধুই পুত্রের জন্য যজ্ঞ। মনু বলছেন—'পুত্র' পিতাকে 'পুৎ' নরক থেকে পরিত্রাণ করে, এজন্য ব্রম্মা স্বয়ং 'পুত্র' এই নাম রেখেছেন। আরও বলছেন 'পুত্রের দ্বারাই মানুষ স্বর্গাদি লাভ করে।' 'ভাগবৎ গীতা' বৈশ্য, শূদ্র এবং নারী তিনজনকেই 'পাপ যোনি' বলে অভিহিত করেছেন।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—"হে পার্থ, যাহারা নিকৃষ্ট কুল জাত বা নিতান্ত পাপাত্মা, যাহারা কৃষ্যাদি নিরত বৈশ্য ও যাহারা অধ্যয়ন বিরহিত শূদ্র এবং স্ত্রী লোক—ইহারাও আমাকে আশ্রয় করিলে অতুৎকৃষ্ট গতি লাভ করবে।" লক্ষ্য করে দেখুন নারীকে সোজা কথায় 'এই তোরা একদম ফালতু' এই ভাবে নিচে নামানো হয় নি, নামানো হয়েছে একটু অন্যভাবে। ঘুষখোর, জুয়াচোর, বেবীফুডে ভেজালদার, স্ত্রীলোক, এরা সবাই মুক্তি পাবে যদি তাকে ডাকে। স্ত্রীলোকের স্থান কোথায় নির্দিষ্ট হয়েছে একবার ভেবে দেখুন। (গীতা, রাজবিদ্যারাজগুহ্যযোগ, ৯ম অধ্যায়, ৩২ নং শ্লোক)।

এ ছাড়াও নানান সংহিতা, বিভিন্ন উপনিষদ, মায় আমাদের সমস্ত শাস্ত্র পুরাণেই কেবল মাত্র পুত্রের জয়গান। লম্পট, মাতাল হলেও সে গুণবতী কন্যা অপেক্ষা সব সময় শ্রেষ্ঠ। কোন কারণ ছাড়াই নারী অবমাননা শাস্ত্রের যত্রতত্র ছড়িয়ে রয়েছে। স্রেফ কথাচ্ছলে, হয়তো দুজনে কোন বিষয়ে কথা বলছে, দেখা গেল তার মধ্যেই মেয়েদের নিয়ে কিছু হীন মন্তব্য ঢুকে গেল। যার কোন প্রয়োজনীয়তাই হয়তো ছিল না। তেমনই একটি ঘটনার কথা বলছি—

'শিব শর্ম্মা নামে এক ব্রাম্মণ মৃত্যুর পরে স্বর্গলোকের দিকে চলেছেন। সঙ্গে আছে দুই দেবদূত। তাদের মধ্যে গল্প গুজব চলছে। দেবদূতেরা শিব শর্ম্মাকে বলছেন—তোমার

কিছু পুণ্যি জমা আছে। সেই পুণ্যি বলে তুমি একস্থানে রাজা হয়ে জন্মাবে। সেই রাজ্যটি কেমন হবে তার বর্ণনা এই রকম—'সেখানকার গাছপালা ফুলে ফলে পরিপূর্ণ, বন্ধ্যা একটিও নহে। নদী সকল জলে পরিপূর্ণ, কুটিল গামিনী, কিন্তু প্রজা নিচয় সেরূপ নহে। কৃষ্ণ পক্ষের রাত্রিই তমোযুক্ত, মানবগণ তমোযুক্ত নহে।' এই রকম সব বর্ণনার মধ্যেই চলে আসছে 'যেখানে বিভ্রম নারীতেই, পন্ডিতে নাই।' 'স্ত্রীগণই রজোযুক্ত, ধর্ম প্রধান মানবগণ সেরূপ নহে।' 'যে স্থানে জলেই জাড্য, স্ত্রী মধ্যই কৃশ।' 'রমণী হৃদয়ই কঠোর, কিন্তু মানবগণ কঠোর নহে।' শাস্ত্রকার এই ভাবেই অকারণে মেয়েদের ছোট করে গেছেন। তারা মেয়েদের সম্পূর্ণ মানুষ বলেই কোনদিন ভাবেননি।

অতএব হে নারী, যতই তুমি 'নারী মুক্তি' আন্দোলন কর না কেন, তোমার প্রাপ্ত স্বাধীনতাটুকু পুরুষের দয়ার দান বলেই যেন। অধিকার করে নিতে গেলে এখনো তোমাকে বহু পথ পাড়ি দিতে হবে। গার্গী, মৈত্রেয়ী, ভাবা, সীতা, সাবিত্রীর স্বাধীনতা সম্মানের গল্প শুনিয়ে, আয় ঘুম যায় ঘুম দত্ত পাড়া দিয়ে, বলে তোমাকে শীত ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে, আগে সে ঘুম কাটুক, তবে তো স্বাধীনতা। দু চারটি ক্রীতদাস শ্রেণীর পুরুষ দিয়ে যেমন পুরুষ জাতির স্বাধীনতা বিচার হয় না, তেমনই দু চারটি ইন্দিরা গান্ধী, হেমামালিনী, পি টি উষা অথবা পার্কস্ট্রীটের জীনস্ পরা, মোবাইল হাতে ইংরাজী বলা সুন্দরী দিয়েও সমগ্র নারী জাতির স্বাধীনতা বিচার হয় না। যতক্ষণ তোমার ওপর শাস্ত্রীয় বিধান বলবৎ, ততক্ষণ তোমার পরাধীনতাও বলবৎ।

কথা হতে পারে শাস্ত্রের সেই দূষিত অংশ গুলির পরিমার্জনা করা যায় কিনা, অথবা সেগুলি বর্জন করা যায় কিনা। আমি বলি কি, তা যায় না। কারণ যে নারী বিদ্বেষমূলক ভাবটি সমগ্র ধর্ম সাহিত্যের মধ্যে একাত্ম হয়ে মিশে রয়েছে, দুটো লাইন কেটে দিয়ে সেই ভাব থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না। 'পুরুষ আপাদমস্তক পবিত্র'। 'ব্রহ্মার মুখ থেকে জন্মেছে তাই — ব্রাহ্মণ।' 'ব্রাহ্মণই একমাত্র শিক্ষা লাভ ও দানের অধিকারি।' 'শূদ্র অভিবাদনের যোগ্য নহে।' 'নারী নরকের দ্বার।' 'শুধু কামনা মেটাতে যুবতী শূদ্রা গ্রহণ করা যায়।' 'ব্রাহ্মণের গৃহে শূদ্র অতিথি হলে তাকে চাকরদের সাথে খেতে দিতে হবে।' 'বিধাতা দাসত্বের জন্যই শূদ্রের জন্ম দিয়েছেন।' 'নারী, শূদ্র, সম্পত্তির অধিকারী নহে'। 'নারী স্বাধীনতার যোগ্যই নহে'। 'স্মৃতি ও বেদে নারীর অধিকার নাই তাই — অপদার্থ'। এ সবই আমাদের পুরাণ শাস্ত্রের কথা। এর কটাকে কেটে বাদ দেবেন। কাটতে কাটতে হাত ব্যথা হয়ে যাবে। এমন হাজার হাজার ধ্যান ধারণা আমাদের পুরাণ শাস্ত্রের রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিশে রয়েছে।

সম্পূর্ণ বিষবৃক্ষটিকে উপড়ে ফেলতে পারলে তবেই এই দূষণের হাত থেকে মুক্তি আসতে পারে, নতুবা নয়। ধরুন থালা ভরা খাবার দেওয়া হয়েছে আপনাকে। ভাত, ডাল,

তরকারি, মাছ, মাংস অনেক কিছু। এক চামচ কপার সালফেটও তাতে মেশানো আছে। খাওয়ার ফল কি বুঝতে পারছেন তো? বল হরি হরি বোল। তর্ক করা যেতে পারে ওই বিষটুকু বাদ দিয়ে খেলেই তো হয়। কিন্তু বাদ দেবেন কি করে, এক চামচ হলেও সে তো সমস্ত খাবারের মধ্যেই মিশে রয়েছে। উপায় একটাই, থালা সমেত ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়া।

ধর্মশাস্ত্র নামক বিষবৃক্ষ শাখা প্রশাখা বিস্তার করে সমাজের প্রতিটি সম্ভাবনাময় দিক্‌কেই অজগর সাপের মত আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছে। প্রয়োজন মত দুচারটি শাখা কেটে দিয়ে ভাবলেন 'আপদ গেল', তা কিন্তু মোটেও নয়। অজস্র শাখা তার। দুটো কাটবেন, দুশোটা এসে জাপটে ধরবে। বিষবৃক্ষে ফলেও বিষফলই। তাকে উপড়ে ফেলা যায় না?

হয়তো যায়। তার জন্য চাই শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মত সমালোচক। যিনি দিব্য চক্ষে দেখেছিলেন আমাদের পুরাণ শাস্ত্রের অপকারিতার লম্বা হাত। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে তিনি বলেছেন 'এ সংসারে যাহা কিছু ভাবিবার বস্তু ছিল, সমস্তই ত্রিকালজ্ঞ ঋষিরা অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ এই তিন কালের জন্য বহু পূর্বেই ভাবিয়া স্থির করিয়া দিয়া গিয়েছেন, দুনিয়ায় নতুন করিয়া চিন্তা করিবার কোথাও কিছু বাকী নাই। তাহারা দয়া করিয়া যদি শুধু কেবল আমাদের এই ইংরাজী আমলটার জন্য ভাবিয়া যাইতেন, তাহা হইলে তাহারাও অনেক দুরূহ চিন্তার দায় হইতে অব্যাহতি পাইতেন, আমরাও হয়তো সত্যসত্যই আজ বাঁচিতে পারিতাম।'

মুনি ঋষিদের আশ্রম আদর্শের সমালোচনা করে 'শেষপ্রশ্ন' উপন্যাসে বলছেন 'আশ্রমের ফিলোজফি আমি বুঝিনে, কিন্তু এটা বুঝি, দৈন্য ভোগের বিড়ম্বনা দিয়ে কখনো বৃহৎকে পাওয়া যায় না। পাওয়া যায় শুধু খানিকটা দম্ভ আর অহংকার।'

বেদ পুরাণ বিদ্যাসাগর অনেক পড়েছেন। তার ধারণায় সবটাই 'দর্শনের ভ্রান্ত পদ্ধতি।' 'যার মূলটাই অমূলক'। এই মূল বলতে সেই মহাশক্তি যা বিশ্বচরাচর নিয়ন্ত্রণ করছে। এই মহাশক্তি এল কীভাবে? আমরা কেউ জানিনা। জানতে চাইও না। এই রকম সমালোচকই আমাদের দরকার। কিন্তু তার জন্য চাই নতুন চেতনা। যে নব চেতনা রোধ করতেই উঠিয়ে আনা হয় নানা যুগে নানা অবতারপুরুষ।

অনেকে উপস্থিত। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, ডাক্তার রাজেন্দ্রনাথ দত্ত, নরেন্দ্রনাথ, মহেন্দ্র মাস্টার, আরও অনেকে। ডাক্তার সরকার রামকৃষ্ণকে বলছেন—"কাঞ্চন চাই। আবার কামিনীও চাই।" রাজেন্দ্র ডাক্তার—"এর পরিবার রেঁধে বেড়ে দিচ্ছেন।" ডাক্তার সরকার—"দেখলে?" রামকৃষ্ণ (ঈষৎ হাস্য করিয়া)—"বড় জঞ্জাল।" ডাক্তার সরকার—"জঞ্জাল না থাকলে তো সবই পরমহংস।" রামকৃষ্ণ—"স্ত্রীলোক গায়ে ঠেকলে অসুখ

হয় ; যেখানে ঠেকে সেখানটা ঝনঝন করে, যেন শিঙি মাছের কাঁটা বিঁধল।" (কথামৃত, দ্বিতীয়ভাগ, পৃষ্ঠা-২৩১)। অথবা (শ্রীম কথা, স্বামী জগন্নাথানন্দ, পৃ - ৭)।

এখানে লক্ষ্য করে দেখুন রামকৃষ্ণদেব নিজের স্ত্রীকে একজন স্ত্রীলোক রূপে উল্লেখ করে বলছেন, এরা বড়ই জঞ্জাল। গায়ে ঠেকলে যেন শিঙি মাছের কাঁটা ফোটার মত যন্ত্রণা হয়। এরপরে আবার বলছেন, (২৩২ পাতা) রামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি)—"এরা কামিনী কাঞ্চন না হলে চলবে না বলছে। আমার যে কি অবস্থা জানে না। মেয়েদের গায়ে হাত লাগলে হাত আড়ষ্ট, ঝনঝন করে। যদি আত্মীয়তা করে কাছে গিয়ে কথা কইতে যাই, মাঝে যেন কি একটা আড়াল থাকে, সে আড়ালের ওদিকে যাবার যো নেই। ঘরে একলা বসে আছি, এমন সময় যদি কোন মেয়ে এসে পড়ে তাহলে একেবারে বালকের অবস্থা হয়ে যাবে, আর সেই মেয়েকে 'মা' বলে জ্ঞান হবে।"

তা মা হও বা প্রতিমা, নারী বিদ্বেষের মার্জিত রূপ এমনই কোমল। কথামৃত ২৩৩ পাতার প্রথম পংক্তি—ভবনাথ, ঠাকুরের অতি প্রিয় পাত্র। বেকার ছেলে হঠাৎ বিয়ে করে বসেছে। রামকৃষ্ণ তাকে সাহস জোগাচ্ছেন—"খুব বীর পুরুষ হবি। ঘোমটা দিয়ে কান্নাতে ভুলিস নি। শিকনি ফেলতে ফেলতে কান্না।" (সকলের হাস্য)। কোন মহিলার অবর্তমানে, মেয়েদের সম্বন্ধে রামকৃষ্ণদেবের কথাবার্তা এই রকমই ছিল। অবশ্য এতে সকলে খুশীই হতেন। তাই 'সকলের হাস্য'।

ঠিক যেমন আমরা দু চারজন নাস্তিক এক জায়গায় হলেই ভগবানের মানহানি শুরু করে দিই। আবার সেখানে কোন ভক্ত বন্ধু এসে পড়লে তার সম্মানে অথবা তর্কবিতর্ক শুরু হবে এই ভয়ে আলোচনা বন্ধ। আমাদের আসল উদ্দেশ্য কিন্তু ঈশ্বরের মানহানি ঘটানোই। ভক্ত বন্ধু সরে গেলেই আবার আমরা যা শুরু করে দিই। শ্রীরামকৃষ্ণের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা একই রকম। কোন ভক্ত মহিলা উপস্থিত থাকলে 'মা-মাসী' বলে খাতির দেখানো। চলে গেলেই টিকাটিপ্পনী।

'শ্রীরামকৃষ্ণ—"সন্ন্যাসীকে দেখে তবে সবাই শিখবে—তাই অত কঠিন নিয়ম! নারীর চিত্রপট পর্যন্ত সন্ন্যাসী দেখবে না!—এমনি কঠিন নিয়ম। কালো পাঁঠা মার সেবার জন্য বলি দিতে হয়—কিন্তু একটু ঘা থাকলে হয় না। রমণী সঙ্গ তো করবে না—মেয়েদের সঙ্গে আলাপ পর্যন্ত করবে না।" (কথামৃত, চতুর্থ ভাগ, পৃ - ৯৬)।

তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি—সন্ন্যাসীরা মেয়েদের ছবি পর্যন্ত দেখবে না। সারদাদেবী আবার একেই অন্য ভাবে বলে গেছেন "রাস্তায় উল্টো হয়ে মেয়ে পুতুল পড়ে থাকলে সন্ন্যাসী পা দিয়ে উল্টেও তা দেখবে না।" সন্ন্যাসীর দেখেই সংসারী শিখবে। সংসারীর পক্ষে তো এতটা কঠোর হওয়া সম্ভব হবে না। তবে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করার শিক্ষাটুকু নিশ্চয়ই এর মধ্যে থেকে পেতে পারে।

শ্রীম ভক্তের প্রতি—'যদি কর্ম করতে হয় তাও করতে হয় গুরুর আদেশ নিয়ে। আর একটি বিষয় থেকে সাবধান করেছিলেন ঠাকুর— মেয়েমানুষ। বলেছিলেন, সাধকের অবস্থায় মেয়েমানুষ—কালসাপ, রাক্ষসী, দাবানল, বাঘিনী। এগুলি সবই মানুষের প্রাণ হরণ করে।'...(শ্রীম দর্শন, চতুর্দশ খণ্ড, পৃ - ২২৫)। 'সন্ন্যাসী নাই বা হলেন, এই খল, কপট, প্রাণঘাতী প্রাণীটিকে কেউ ভুল করেও নিজের পাশে বসাবে? পরের পাতাতেই দেখছি ঠাকুর বলছেন, 'ঈশ্বর দর্শন হলে তখন সেই মেয়েমানুষই হয় জগদম্বা, আনন্দময়ী মা, ব্রহ্মশক্তি।' এই যে কথাটি বলছেন 'ঈশ্বর দর্শন হলে নারী ব্রহ্মশক্তি।' তার মানে ঈশ্বর দর্শনের আগে পর্যন্ত কালসাপ। আমার পাড়া শ্যামপুকুরের দেড়শ বছরের ঈশ্বর দ্রষ্টার ইতিহাস অনুসন্ধান করে দেখেছি মাত্র দুজনের ঈশ্বর দর্শন হয়েছিল। তাদের বাড়ির লোকেরাই একথা জানিয়েছে। অবশ্য পাশের বাড়ির লোক বলে, ধুর, ব্যাটারা আফিংখোর ছিল। আপনার পাড়াতে মোট কটি ঈশ্বর দ্রষ্টা আছে একটু খবর নিয়ে দেখবেন তো। ঐ কটি দ্রষ্টাকে বাদ দিয়ে বাকিদের কাছে নারী কিন্তু 'কালসাপ'। এ সব সন্ন্যাসীর পক্ষে, সংসারীর জন্য নয়, এই তো কথা! কিন্তু পদে পদে যে দেখছি সন্ন্যাসীর থেকেই সংসারী শিখবে, তার কি হবে! সে শেখাচ্ছে কেউটে আমি কি শিখব 'ঢ্যামনা'!

শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবকে বলিতেছেন "বাড়ির ভিতর অত থেকো না। মেয়েছেলেদের মধ্যে থাকলে আরও ডুববে.......।" (কথামৃত, দ্বিতীয় ভাগ, পৃ - ৭৮)। একবার কথা প্রসঙ্গে—"আমি মেয়ে বড় ভয় করি। দেখি যেন বাঘিনী খেতে আসছে। আর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, ছিদ্র সব খুব বড় বড় দেখি। সব রাক্ষসীর মত দেখি। আগে ভারী ভয় ছিল। কারুকে কাছে আসতে দিতাম না। এখন তবু মনকে অনেক করে বুঝিয়ে মা আনন্দময়ীর এক একটি রূপ বলে দেখি। ভগবতীর অংশ। কিন্তু পুরুষের পক্ষে—সাধুর পক্ষে—ভক্তের পক্ষে ত্যাজ্য। হাজার ভক্ত হলেও মেয়ে মানুষকে কাছে বেশিক্ষণ বসতে দিই না। একটু পরে, হয় বলি, ঠাকুর দেখগে যাও। তাতেও যদি না ওঠে তামাক খাবার নাম করে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ি।" (কথামৃত, চতুর্থ ভাগ, পৃ - ২০১-২)।

একবার কথামৃতকার শ্রীম মহাপুরুষদের মহত্ত্বের একটি লক্ষণ ভক্তদের কাছে বর্ণনা করছেন—শ্রীম (সকলের প্রতি)—"কি Quick decision. একদিন কীর্ত্তন হচ্ছে বারান্দায়। ঠাকুর বারান্দায় বসে শুনছেন। উত্তরপাড়ার প্যারী মুখুজ্যের বাড়ির মেয়েরা এসে বললে, আমরা ঘরে বসতে পারি? ঠাকুর তক্ষুনি উত্তর করলেন, না না, এখানে কোথায় বসবে? এখানে হবে না।"........"দেখুন কি Quick decision! Quick decision great-ness-এর একটি চিহ্ন।" (শ্রীম দর্শন, নবম ভাগ, প্রথম সংস্করণ, পৃষ্ঠা-৬৯-৭০) । ডিসিশানটা কুইক হয়েছে ঠিকই। আপনিও একটা ডিসিশান নিন ঘটনাটিকে কোন্ পর্যায়ে ফেলবেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণের কথায় 'মেয়ে, সব দিলে খেয়ে'।

সাধনা নিয়ে থাকবে এমন এক শিষ্যকে রামকৃষ্ণদেব নারী সম্বন্ধে সাবধান করে বলছেন—"মেয়ে মানুষের গায়ের হাওয়া লাগাবে না, মোটা কাপড় গায়ে দিয়ে থাকবে, পাছে তাদের হাওয়া গায়ে লাগে ; —আর মা ছাড়া সকলের সঙ্গে আট হাত, নয় দু হাত, নয় অন্তত এক হাত সর্বদা তফাৎ থাকবে।" (কথামৃত, চতুর্থ ভাগ, পৃ-২০৩)।

মাস্টারমশাই শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগ নিয়ে শিষ্যদের সাথে আলোচনা করছেন, "আর মেয়েমানুষ! তাদের সম্বন্ধেও ঐ। একেবারে নির্জলা একাদশী। একবার রথযাত্রায় বলরাম বসুর বাড়ি এসেছিলেন। যাবার সময় অনেকগুলি ভক্ত মহিলা নৌকো করে পেছু পেছু দক্ষিণেশ্বর গেল। মা-ঠাকুরণ তখন ওখানে। ভক্ত মেয়েরা সব ন'বতে মায়ের কাছে গিয়ে উঠল, তারপর ঠাকুরের ঘরে গিয়ে এক এক করে প্রণাম করছে। ঠাকুরের এসব মোটেই ভাল লাগছিল না। তাই একটি ভক্ত প্রণাম করতেই তাকে বললেন, এরা সব কিলবিল করে আসছে আর টিপ টিপ করে প্রণাম করছে, এসব আমার ভাল লাগছে না। এই ভক্ত মহিলাটি গিয়ে বলতেই ওরা সব দৌড়ে পালাল। ওরা তো খুব ভক্ত মেয়ে ছিল। তবুও বললেন 'আমার ভাল লাগছে না।' তাই বলতেন, ভক্তিতে গড়াগড়ি গেলেও মেয়েদের সাথে কথা কইতে নাই, মেশামেশি করতে নাই।" (শ্রীম দর্শন—ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ-১৭৬)।

স্বামী অভেদানন্দ ভক্তদের বলছেন—"আমি ছেলেবেলায়ও মেয়েদের মুখের পানে কখনও দৃষ্টিপাত করতাম না, মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করতে প্রবৃত্তিই হয় না। সাধু-সন্ন্যাসীদের মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা ঠিক নয়। বলা তো যায় না, কখন কি হয়। আমেরিকাতেও মেয়েদের সাথে মিশতাম না। মেয়েমানুষ, মেয়েমানুষ তো সবই সমান।" (যেমন শুনিয়াছি—স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ, তৃতীয় ভাগ, ১৩৮২ পৃষ্ঠা—৫৮)।

মায়ের ধরম কর্ম লিপ্ত অনুক্ষণ।
প্রসবাদি সযতনে লালন পালন।। (রামকৃষ্ণ পুঁথি, পৃষ্ঠা ৪৫২)।

কবি অক্ষয় সেন বলে দিয়েছেন। বছর বছর ছানা পাড়বে আর তাকে লালন পালন। মায়েদের জন্য এই কাজই নির্দিষ্ট। ভারতবর্ষে কোটি কোটি দেব-দেবীর মধ্যে মাত্র একটিই দেবী আছেন যিনি বড়লোক, গরীব, সকলের ডাক সমান ভাবে শোনেন। বলতে কি গরীবের ডাকই তার কানে আগে গিয়ে পৌছয়। তিনি মা ষষ্ঠী। তৃতীয় বিশ্বের একমাত্র জাগ্রতা দেবী। মা ষষ্ঠীর দয়ায় গরীবের ঘরে বছর বছর সন্তানের কোন ঘাটতি নেই। রুগ্ন হোক, পঙ্গু হোক, সে যাই হোক। খেতে পাও না পাও তো নাই খাও। ডাস্টবিন আছে, অপর্যাপ্ত খাদ্যের মজুত ভাণ্ডার। 'মুখ দিয়েছেন যিনি, অন্ন যোগান তিনি।' কোন চিন্তা নেই। আসছে বছর আবার হবে বলে লেগে পড় 'মায়েরা'। পতি সেবা আর বাচ্চা পালা এই তোমার শাস্ত্র নির্দেশ।

'প্রসঙ্গক্রমে স্ত্রীলোক দিগের ধর্মকর্মের কথা উঠিল। পরমহংসদেব বলিয়াছিলেন, "স্ত্রী জাতি দিগের পতিই একমাত্র ধর্ম, ইহা শাস্ত্রের অভিপ্রায়"।' শ্রীরামকৃষ্ণের মতে পতিই নারীর শেষ কথা। পুরুষের ক্ষেত্রে কিন্তু এমন কোন বিধান তিনি দেননি যে 'স্ত্রীই পুরুষের একমাত্র ধর্ম।' পতি সেবাই যে নারীর একমাত্র ধর্ম এবং তা শাস্ত্রসম্মতও বটে একথা বলে তিনি খেয়াল করিয়ে দিচ্ছেন তাকে মান আর না মান, শাস্ত্র বাক্য লঙ্ঘন কর না।

গুরুদেবের এক শিষ্য লাটু মহারাজ-স্বামী অদ্ভুতানন্দ। নারীর ধর্ম প্রসঙ্গে তিনিও তার গুরুদেবের সাথে এক মত। তার উপদেশ—"সধবা স্ত্রীলোকের আর অন্য কর্ম কি? তার কল্যাণের জন্য স্বামীর সেবা করবে। স্বামীকে না মানলে দুঃখ পাবে। —স্বামীই স্ত্রীলোকের দেবতা। তাকে ভগবান জ্ঞানে সেবা কল্লে কল্যাণ হবেই হবে। এমন কি জ্ঞান পর্যন্ত হয়ে যায়। মহাভারতে আছে—কোন ব্রাম্নণী একান্ত মনে স্বামী সেবা করেই জ্ঞান লাভ করেছিল। সে তার স্বামীকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করত, —স্বামী ছাড়া আর কাউকে জানত না। স্বামী জ্ঞান, স্বামী ধ্যান—স্বামী সেবাতে দিনরাত বিভোর থাকত। আর একনিষ্ঠ হয়ে স্বামী সেবা করতে করতে তার জ্ঞান হয়েছিল।" (সৎকথা—স্বামী সিদ্ধানন্দ, দ্বিতীয় ভাগ, উপদেশ নং-৬, পৃষ্ঠা-৬৩-৬৪)।

দেখতে পাচ্ছি স্বামী সব সময় স্ত্রীলোকের দেবতা হয়ে যাচ্ছে। এর বিপরীত কখনো হয় না। আবার এমনি ওমনি হলে চলবে না 'সেবা' করতে হবে। শাস্ত্রের এক মহিলার উপমা টেনে স্বামীজী বলছেন এই সেবা করেই একজনের ভগবানের সাথে দেখা হয়ে গেছিল। তোমারও দেখা হয়ে যেতে পারে। অতএব হে নারী, তুমি নিজেকে পুরুষের সেবিকা ও ভোগ্যা এই দুই পদ থেকে কখনো সরিয়ে নিও না। শাস্ত্র হানি ঘটবে।

নারীর শিক্ষা-দীক্ষার প্রতিও অনেকের ছিল তীব্র অনীহা। স্বামী বিশুদ্ধানন্দ-স্বামী ভাস্বরানন্দ প্রমুখ কয়েকজন সন্ন্যাসীকে খেতে খেতে বর্তমান শিক্ষা প্রসঙ্গে বলছেন—"এখনকার শিক্ষায় সে সব আদর্শ আর নেই। মেয়েরা সব ফাইল ঘাড়ে করে সেক্রেটারিয়েটে চলেছে। তারা সব বি-এ, এম-এ পাশ করে উকিল, ব্যারিষ্টার হতে চায়। মিনিষ্টার হতে চায়, ইংলিশ চ্যানেল পার হওয়াই যেন তাদের জীবনের আদর্শ হয়েছে। স্কুল কলেজের শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবল ব্রেইন আর ব্রেইন, আর হার্টের দিকে শূন্য।" (সৎপ্রসঙ্গ—স্বামী বিশুদ্ধানন্দ, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা-২১৬)।

যতই নারী শিক্ষার মুখোশ সামনে থাকুক না কেন, আদর্শগত ভাবে অনেকেই নারী শিক্ষার পক্ষে নয়। 'যে জাতের নারী পিছিয়ে পড়েছে তাদের উন্নতি অসম্ভব।' 'এক ডানায় পাখী উড়তে পারে না।' 'মেয়েদের শিক্ষা জগতে এগিয়ে আনতে হবে।' 'শিক্ষিতা মা-ই শিক্ষিত সন্তানের জন্ম দিতে পারে।' মুখে মুখে এসব সবাই বলে বটে, আবার মেয়েরা বি-এ, এম-এ পাশ করলেই চক্ষু চড়ক গাছ। 'হৃদয়' দরকার ঠিকই, কিন্তু সে এমন হৃদয়,

যে হৃদয় নিয়ে মেয়েরা পতি সেবা করবে, বাচ্চা পালবে, আর সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালবে। এই হল নারীর প্রকৃত 'হৃদয়'।

'নটী বিনোদিনী' সহ নাটকের মহিলাদেরও রামকৃষ্ণদেব কৃপা করেছিলেন বলে একটা মিষ্টি মধুর প্রবাদ চালু আছে। কিন্তু এই কৃপা কি খুব সরল, অনাবিল পথ ধরে এসেছিল? একদমই না। অন্তত আমার কাছে যেটুকু তথ্য আছে তাতে মনে হয় না তিনি নটীদের আদৌ কাছে ঘেঁষতে দিতেন। লাটু মহারাজের স্মৃতি চারণায় ঘটনার সূত্রপাত এইভাবে—

"থিয়েটারে আর একটা ব্যেপার শুনেছি। সেদিন থিয়েটার শেষ হবার পর গিরিশ বাবু ওনাকে সাজঘরে নিয়ে গেলেন। সেখানকার যত সব মেয়েছেলে ছিল সবাইকে গিরিশ বাবু বললেন—'ওরে, বাবাকে পেন্নাম কর, তোমাদের সব পাপ ধুয়ে যাবে।' মেয়েরা সব ওনার পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে চায় দেখে উনি বলেছিলেন—'ওখান থেকে করলেও হবে গো।' তারা কি সব শোনে? কেউ কেউ পায়ে হাত দিয়েছিল। দক্ষিণেশ্বরে এসে হামাদের বললেন—'ওরে পা টা বড় জ্বালা করছে রে।' রামলাল দাদা তাই না শুনে গঙ্গা জল এনে পা ধুয়ে দিলেন, তবে সে জ্বলুনি কমে। জানো—তিনি অশুদ্ধ লোকের পরশন সইতে পারতেন না।" (শ্রীশ্রী লাটু মহারাজের স্মৃতি কথা—শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা-১৫৭-৫৮)।

এই যে বর্ণনাটুকু পেলাম একে একটু অন্য ভাবে যাচাই করে দেখা যাক। থিয়েটার শেষ হতে গিরিশ ঘোষ শ্রীরামকৃষ্ণকে নিয়ে গেছেন সাজঘরে। মেয়েদের উদ্দেশ্য করে বলছেন 'ওরে বাবাকে প্রণাম কর'। মেয়েরাও নিশ্চয়ই শ্রীরামকৃষ্ণের নাম শুনে থাকবে, স্বয়ং গিরিশ ঘোষ যার শিষ্য। মেয়েরা শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রণাম করার জন্য হুটোপুটি শুরু করে দিয়েছে। রামকৃষ্ণদেব কিন্তু সাবধান। যে সে আসবে আর ছুঁয়ে দেবে নাকি! 'দূর থেকে প্রণাম সারলেও চলবে গো', বলে একটা চেষ্টা করছেন। যদি এই ধর্ম হানি থেকে কোনক্রমে রক্ষা পাওয়া যায়। এছাড়া আর করেনই বা কি। তিনি যে নিজেই এদের মধ্যে এসেছেন। 'আমাকে কেউ ছোঁবে না' এমন রূঢ় কথাও তো বলা যায় না। তাই সংযত ভাবেই আকুতি জানাচ্ছেন 'দূর থেকেই প্রণামটা সেরে নাও না মা।' এতে ফল কিছুটা পাওয়া যাচ্ছে। সব মেয়েরা নয় 'কেউ কেউ পায়ে হাত দিয়েছিল।' (এই দলে বিনোদিনীও ছিল)। বাকীরা এগিয়ে এসেও পিছিয়ে গেল, কেন? নিশ্চয়ই তারা বুঝেছিল রামকৃষ্ণদেব তাদের মত হীন মেয়েদের স্পর্শ এড়িয়ে চলতে চান।

যারা প্রণাম করেছিল তাদের তিনি 'সুমতি হোক' 'ঈশ্বর লাভ হোক' এরকম কিছু নিশ্চয়ই বলে থাকবেন। কারণ কেউ প্রণাম করলে এরকমই সবাই বলে থাকেন। এই শেষ অংশটুকুই সকলের জানা। 'দেখলে, অমন যে নটীর দল, তারাও ঠাকুরের কৃপা

থেকে বঞ্চিত নয়।' কিন্তু এই কৃপা যে কিভাবে এল সে আর কে খুঁটিয়ে দেখে। কৃপার জ্বালা মেটাতে শেষ পর্যন্ত পায়ে গঙ্গা জল ঢালতে হয়। তবে শান্তি।

আমার যেটুকু জানা আছে নটী বিনোদিনী আরও একবার পুরুষের ছদ্মবেশে এক সঙ্গিনীকে নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে এসেছিলেন। এবং তার আশীর্বাদ নিয়ে ফিরে গিয়েছিলেন। সম্পূর্ণ ঘটনাটি ঠিক মনে আসছে না। তবে এটুকু বিচার করাই যায় কেন তাকে ছদ্মবেশ ধরতে হয়েছিল। হয় নারী বলে ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হবে না, অথবা হীন নারী, অতএব ঢোকার অনুমতি নেই। এই দুটোর একটা কারণ নিশ্চয়ই হবে। অন্য কোন কারণ থাকলেও থাকতে পারে। আমার আর জানা নেই।

বিজ্ঞান মহারাজের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের আদেশ ছিল—"সোনার মেয়েমানুষ যদি ভক্তিতে গড়াগড়িও দেয়, তবুও তুমি তার দিকে কখনো ফিরেও চেয়ো না।" (পুণ্য স্মৃতি—স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ, পৃষ্ঠা-৯১)। ওই পাতাতেই শ্রীরামকৃষ্ণের এই আদেশের ব্যবহারিক প্রয়োগও দেখতে পাই। "তিনি যখন স্বামীজীর মন্দিরের নির্মাণ কার্য পরিচালনা করিতেছিলেন সেই সময় আমরা জনৈকা ভক্তিমতি মহিলাকে লইয়া তাহাকে প্রণাম করাইতে গিয়াছিলাম। শ্রী শ্রী মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) মহিলাটিকে খুবই স্নেহ করিতেন। মহিলাটি বিজ্ঞান মহারাজকে প্রণাম করিতেই তিনি তৎক্ষণাৎ পিছন ফিরিয়া অন্যদিকে চলিয়া গেলেন। প্রণামান্তে মাথা উঠাইয়া মহিলাটি তাহার ঐ অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিতা হইয়াছিলেন। আমরাও তখন উহার কারণ বুঝিতে পারি নাই। পরে, শ্রীশ্রী ঠাকুরের আদেশেই যে তিনি ঐরূপ ব্যবহার করিতেছেন তাহা জানিতে পারিয়াছিলাম।"

আর একটি ঘটনা, 'কেউ কেউ বা কাছাকাছি দাঁড়িয়ে, বা বসে তার (স্বামী বিজ্ঞানানন্দের) কথা শুনছিলেন। যতদূর মনে পড়ে, ঐ সময়ে মহারাজজীর কাছে মার্কিন ভক্তমহিলাদ্বয় ভক্তি ও অন্নপূর্ণা উপস্থিত ছিলেন। এই পরিবেশের মধ্যে হঠাৎ একটি অজানা মহিলা, সম্ভবতঃ পাঞ্জাবী, এমন একজন সাধু মহাত্মাকে দেখে উৎসুক হয়ে প্রণাম করতে এগিয়ে এলেন। প্রণামটা তিনি কোনরকমে সেরে ফেলেছিলেন, তারপরে আর কাছে দাঁড়াতে দেন নি মহারাজজী, ভক্তি ও অন্নপূর্ণাকে যেন নেহাৎ ভদ্রতার খাতিরেই তার কাছে অপেক্ষা করতে দিয়েছিলেন। স্ত্রী জাতির সান্নিধ্য সম্বন্ধে তিনি সর্বদাই বড় হুঁশিয়ার ছিলেন। মহান গুরুর আদেশ পেয়েছিলেন, সোনার মেয়েমানুষ যদি ভক্তিতে গড়াগড়িও যায় তাকে বিশ্বাস করো না, তার দিকে ফিরেও দেখো না।' (প্রত্যক্ষদর্শীর স্মৃতিপটে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ, পৃষ্ঠা-৪৯-৫০)।

একবার মহারাজ রামকৃষ্ণ মঠের ঢাকা কেন্দ্রে গিয়েছেন। সেখানে কিছু ভক্তমহিলা তাকে প্রণাম না করে ছাড়বেন না। 'অতঃপর মহিলারা যেই ঘরে ঢুকেছেন, মহারাজজী পিছন ফিরে বসলেন। বললেন বেশ, আপনারা প্রণাম করুন, আর কী প্রশ্ন করবেন, করুন। মহিলাদের মুখদর্শন করবার ভয় আর রইল না। এতটা করার কারণ

কী? কারণ- লোকশিক্ষা।' (ঐ-পৃ- ৩১৯-২০)। এই লোকশিক্ষা গুনেই তিনি 'লোকশিক্ষক' পদে আসীন। এই লোকশিক্ষা গুণেই নারী আজও দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। আর এসব যখনকার ঘটনা মহারাজ কিন্তু তখন কচি-কাঁচা সন্ন্যাসী নন। পুরোপুরি সিদ্ধ।

স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ প্রকাশিত 'স্বামী প্রেমানন্দ' ১২৮ পাতা—হরমোহন মিত্র নামে এক শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তের মা এসেছেন অসুস্থ বাবুরাম মহারাজকে দেখতে। মহিলা বাবুরামের মায়ের বন্ধুও বটে। মহিলাকে আসতে দেখেই বাবুরাম মহারাজ লেপকম্বল মুড়ি দিয়ে বসে গেছেন। তিনি চলে যাবার পর সেবক তাকে জিজ্ঞেস করছেন— "এতো আপনার মায়েরও পাঁচ বছরের বড়, এর কাছে সব গা ঢাকা দিয়ে বসার কি দরকার ছিল?" মহারাজ বললেন, "বলিস কি! ঠাকুর আমাদের শিখিয়েছেন— কোন মেয়েছেলের কাছে আলগা গায়ে অলস ভাবে কথাবার্তা কখনোও বলতে নেই।" মেয়েরা এলে তিনি বলতেন, "এরা হলেন মা মনসার জাত, এদের বলতে হয় মা, লেজটি দেখিও, মুখটি দেখিও না। এরা ছোবল মারলেই সর্বনাশ। এই সব আমরা ঠাকুরের কাছে শিখেছি। তোদেরও বলছি—তোরাও সতর্ক থাকবি।"

তা, এনারা সতর্ক থাকুন। আমাদেরও উচিৎ যা শিখছি তা একটু বিচার বিশ্লেষণ করেই গ্রহণ করা। 'এসব সন্ন্যাসীর পক্ষে পালনীয়, সংসারীর জন্য নয়'। এ কথা বললে তো হবে না। এই তো পদে পদে দেখতে পাচ্ছি 'সন্ন্যাসীই মানব জাতির আদর্শ, সন্ন্যাসীর থেকেই সংসারী শিক্ষা গ্রহণ করবে।' সব শিক্ষা গ্রহণ করবে, শুধু নারীর সম্মান হানিটুকু বাদ দিয়ে, বললে তো চলবে না। সমালোচনার যোগ্য হলে তাকে সমালোচনাই করতে হবে।

গিরিশচন্দ্রের চোখে 'ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ'র ভূমিকায় গিরিশচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত বহির্গত ও অন্তর্গত জীবনী লিখতে গিয়ে গবেষক শঙ্করীপ্রসাদ বসু মহাশয় ১২ পাতায় লিখেছেন—"গিরিশের সংসারে দিদির অভিভাবকত্ব ছিল—এবং নারীর অভিভাবকত্বকে অগ্রাহ্য করার মত পুরুষাভিমানও গিরিশের ছিল।" ঠিক কথাই। যে নারীকে পুরাণ শাস্ত্র মানুষের মর্যাদা দিতেই নারাজ, সেই নারীকেই অভিভাবক রূপে মানা যায় কখনো!

কোন এক রমণী হরিপদকে গোপালের মত আদর করে শুনিয়া প্রভু কহেন—"সাবধান, গোপাল ভাবের পর যেন মদনগোপাল না করে।" (লীলামৃত, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা-৩৩৫)। 'নিচে একটি ছোট মেয়ে আঁচলে বাঁধা একটি চাবির থলো আঁচলের খুঁট ধরে বন বন করে ঘোরাচ্ছিল। ঠাকুর উহা দেখাইয়া আমাকে (স্বামী প্রেমানন্দ) বললেন, "দ্যাখ, মাগীগুলো, পুরুষদের এই রকম করে বেঁধে বন বন করে ঘোরায়। তুইও কি মাগীদের হাতে ঐ রকম ঘুরতে চাস"?' (স্বামী প্রেমানন্দের জীবন ও স্মৃতিকথা—সম্পাদক স্বামী চেতনানন্দ, পৃষ্ঠা-৩৪৬)। ভক্তির মোড়কে গুরুদেব নারী-বিদ্বেষী নন মানতে হবে আমাদের!

শ্রীরামকৃষ্ণ—"মেয়েরা সন্ন্যাসী হলে পুরুষের সমকক্ষ হয়।" (গৌরী মা—দুর্গাপুরী দেবী, পৃষ্ঠা-১৯২)। শাস্ত্র বলে থাকে সন্ন্যাস মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ বিকাশ। তবে এ সব পুরুষের পক্ষে। নারী সন্ন্যাসী হলে সবে মাত্র পুরুষের সমকক্ষ হল। তার থেকে বাড়ার জায়গা নারীর আর নেই। স্বামীজীর ভাই ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণকে ঠিক ঠিক বুঝেছিলেন। তিনি বলে গেছেন—"নারীর প্রতি অবজ্ঞা রামকৃষ্ণের মজ্জাগত ছিল।" (স্বামী বিবেকানন্দ, প্রথম সংস্করণ, পৃষ্ঠা-১৮০)।

আর একটি ঘটনার বর্ণনা এই রকম—'এই বৎসর ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের উৎসবে আর একটা বড় মজার ব্যাপার ঘটিয়াছিল। কলিকাতা শহরের অনেকেই প্রতি বৎসর মহোৎসবের দিন দক্ষিণেশ্বরে যান। সকল শ্রেণীর স্ত্রীলোকদিগকে দলবদ্ধ হইয়া ঠাকুরের উৎসবে আসিতে দেখিয়া সাধারণে বলিতে লাগিল যে, এ মহোৎসবও আর একটি 'দ্বাদশ গোপাল' হইয়া উঠিল। তাহা শুনিয়া স্বামী ত্রিগুণাতীত কয়েকজন ভক্ত ছেলের সাহায্যে ইহা নিবারণ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। মেসার্স হোর্ মিলার কোম্পানীর কয়েকখানি স্টীমার বেলা আটটা হইতে রাত্রি দশটা পর্যন্ত হাটখোলা ঘাট হইতে যাত্রীগণকে লইয়া দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিত। গৃহী ভক্ত রামদয়াল চক্রবর্তী ওই কোম্পানীর একজন ঠিকাদার ছিলেন। উহার তত্ত্বাবধানের ভার তাহার উপর থাকিত। ত্রিগুণাতীত তাহাকে বলিয়া দিলেন যে, স্ত্রীলোকদিগকে যেন টিকিট দেওয়া না হয়। পরে চিৎপুর রোডের জোড়াসাঁকো পর্যন্ত কিছুদূর অন্তর অন্তর রাস্তার এপার ওপার লাল সালুর উপর সাদা কাপড়ে বড় বড় অক্ষরে "দক্ষিণেশ্বরের মহোৎসবে স্ত্রীলোক মাত্রেই কেহ যাইবে না"—এই রূপ তৈয়ার করাইয়া বড় দিনে যেমন বড় বড় গাঁদার মালায় কমলা লেবু, লুচি, জিলিপি প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য ও শাকসজির সহিত মুড়ো খ্যাংরা, ছেঁড়া জুতো, ফুটা হুঁকা প্রভৃতি রাস্তার এধার ওধার পর্যন্ত টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইত, ঠিক তেমনি করিয়াই স্বামী ত্রিগুণাতীত টাঙ্গাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি ও তাহার সহকর্মীগণ শহরের স্থানে স্থানে স্ত্রীলোকদের উৎসবে আসিতে নিষেধ করিয়া বড় বড় প্লাকার্ডও দেওয়ালে আঁটিয়া দিয়াছিলেন। তাহারা এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন যে, এইবার স্ত্রীলোকদের দক্ষিণেশ্বরে যাওয়ার পথ বন্ধ হইল।' (স্মৃতিকথা—স্বামী অখণ্ডানন্দ, তৃতীয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা-১৫০-৫১)।

যদিও রামকৃষ্ণ মিশন সে বার মেয়েদের দক্ষিণেশ্বর আসা আটকাতে পারে নি। 'যেতে বারণ করেছে অতএব যাবই' এই গোঁ ধরে আরও বেশী সংখ্যক মহিলা সে বার দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু আমি বলি কি, তারা চায় না তুমি সেখানে যাও, তুমি যাবে কেন সেখানে? মেয়েরা যদি দক্ষিণেশ্বর যাওয়া বন্ধ করে মিশনের বিভেদ নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে তুলত তবে সেটাই হতো সঠিক প্রতিবাদ।

স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, "স্ত্রী ভক্তের হাতের রান্নাও খেতে নেই। তাতে মন নিম্নমুখী ও স্বাস্থ্যের হানি হয়।" (নবযুগের মহাপুরুষ, পৃ - ১৫৬)।

নরেন্দ্র তামাক খাইতেছেন ও মাস্টার প্রভৃতির সহিত কথা কহিতেছেন—"কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ না করলে হবে না। কামিনী নরকস্য দ্বারম্। যত লোক স্ত্রীলোকের বশ। শিব আর কৃষ্ণ এদের আলাদা কথা। শক্তিকে শিব দাসী করে রেখেছিলেন।......." (কথামৃত, চতুর্থ ভাগ, পৃষ্ঠা-২৯৬)। পনের বছরের বালকের প্রতি খোকা মহারাজ, স্বামী সুবোধানন্দের উপদেশ—"মেয়েদের মুখের দিকে কখনো তাকাবি না।" জানিনা এর পরেও নারীর অধিকার কি করে রক্ষিত হয়। এও জানিনা কেন এই ধরনের উক্তির প্রতিবাদ হয় না।

স্বামী সিদ্ধানন্দ কর্তৃক সংগৃহীত লাটু মহারাজের উপদেশামৃত 'সৎকথা' ৩৩ পাতায় ১৩নং উপদেশে বলছেন—"দেখ, স্ত্রীলোক থেকে সাবধান। দেখেছি অনেক বড় বড় সাধুর স্ত্রীলোকের পাল্লায় পতন হয়েছে। ওরা প্রথমে নানা রকম ধর্ম ভাব দেখিয়ে শেষে সাধুর সর্বনাশ করে। ঠাকুর তাই বলতেন—'ভক্তিমতি সৎ স্ত্রীলোক হলেও তাদের সঙ্গে বেশি মেশামেশি করবে না।' তোমার অল্প বয়স ও ভালো চেহারা, তাই বলছি স্ত্রীলোক—সাবধান।"

এই উপদেশ শ্রী লাটু মহারাজের, জনৈক ভক্তের প্রতি। সেই ভক্ত যদি তার গুরুদেবের প্রতি শ্রদ্ধাবান হয় তবে তার পক্ষে নারীকে আর কখনোই মর্যাদার আসনে বসানো সম্ভব নয়। তার মধ্যে নারী বর্জনের বীজ বপন করা হয়ে গেছে।

একই পাতায় ১৬নং উপদেশ—"মেয়েদের মধ্যে ছটি রিপু কিলবিল করছে। জীব তাই দেখে মুগ্ধ হয়। সাবধান, একবার মায়া ফেল্লে আর উপায় নেই। ওরা মায়া ঢেলে দেয়। এইজন্য খুব সাবধানে থাকতে হয়।"

১০৩ পাতায় ৩৩নং উপদেশামৃত —"স্ত্রীলোকের জ্ঞান খুব কমেরই হয়। আমাদের স্ত্রীলোকদের দয়া করে উপদেশ দিতে গিয়ে শেষে মায়ায় জড়িয়ে পড়তে হয়। সাবধান, স্ত্রীলোকের অন্তরে এক আনা বৈরাগ্য থাকলে বাহিরে দেখাবে ঢের। অনেক সাবিত্রীও আছেন বটে। স্ত্রীলোকদের স্বামীই গুরু—অন্যত্র যাওয়ার কি দরকার।" তবে, দয়া করে জ্ঞান দিতে গিয়ে সন্ন্যাসীও বিপদে পড়ে যায়, সাধারণ লোকের আর কা কথা। পতি দেবতার পদতলই মেয়েদের সঠিক জায়গা।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত শিষ্যদের বলছেন—"পাশ্চাত্যের আদর্শের দিক দিয়ে দেবার কিই বা আছে। ওদের জীবনের আকাঙ্ক্ষা সমাজতন্ত্রবোধ, নয়তো রাজনীতি। বায়স্কোপ, থিয়েটার, নভেল, ডিনার, ড্রেস, টয়লেট—এইসব নিয়ে আছে। আর মেয়েদের সঙ্গে বসে গানবাজনা—যে মেয়েদের সংস্পর্শে লোক সংসারী হয় তাদের সঙ্গে বসে কথাবার্তা, গানবাজনা। এইতো এদের আদর্শ ; আমাদের দেশের ছোকরারাও তাই করতে শুরু করে

দিয়েছে।" (শ্রীম দর্শন, দ্বিতীয় ভাগ, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা-৩০৬)। সকলের মতামতই কমবেশি একই রকম।

দয়ার ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের আর একটি দয়ার ঝরনা দিয়ে এই অধ্যায়ের উপর ইতি টানব। কথামৃতে অনুচ্ছেদটির নামকরণ করা হয়েছে 'ভগবতী দাসীর প্রতি দয়া—শ্রীরামকৃষ্ণ ও সতীত্ব ধর্ম' দ্বিতীয় ভাগ, পৃ - ৫৩। বিবরণ এই রকম—দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে জমিদার বাবুদের এক পুরাতন দাসী ভগবতী। প্রথম জীবনে কিছু স্বভাব দোষ ছিল। রামকৃষ্ণদেব তাকে বহুদিন ধরেই মন্দিরে দেখছেন। সেদিন সন্ধ্যায় আলো জ্বালাতে এসে দূর থেকে রামকৃষ্ণদেবকে প্রণাম করায় রামকৃষ্ণদেব তাকে বসতে বলেন। কথায় কথায় তার ইচ্ছে জাগে ঠাকুরের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করার। পরের অংশ কথামৃত থেকে তুলে দিচ্ছি।

'এই সময় ভগবতী সাহস পাইয়া ঠাকুরকে পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিল। বৃশ্চিক দংশন করিলে যেমন লোক চমকিয়া উঠে ও অস্থির হইয়া দাঁড়াইয়া পড়ে শ্রীরামকৃষ্ণ সেইরূপ অস্থির হইয়া 'গোবিন্দ গোবিন্দ' এই নাম উচ্চারণ করিতে করিতে দাঁড়াইয়া পড়িলেন। ঘরের কোণে গঙ্গা জলের একটি জালা ছিল—এখনো আছে। হাঁপাইতে হাঁপাইতে যেন ত্রস্ত হইয়া সেই জালার কাছে গেলেন। পায়ের যেখানে দাসী স্পর্শ করিয়াছিল গঙ্গা জল লইয়া সেই স্থান ধুইতে লাগিলেন। দু একটি ভক্ত যাহারা ঘরে ছিলেন তাহারা অবাক ও স্তব্ধ হইয়া এক দৃষ্টে এই ব্যাপার দেখিতেছেন। দাসী জীবনমৃতা হইয়া বসিয়া আছে। দয়াসিন্ধু পতিত পাবন ঠাকুর রামকৃষ্ণ দাসীকে সম্বোধন করিয়া করুণা মাখা স্বরে বলিতেছেন—"তোরা অমনি প্রণাম করবি।" এই বলিয়া আবার আসন গ্রহণ করিয়া দাসীকে ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছেন। বলিলেন "একটু গান শোন"।' যদিও দাসীর কানে গান আর ঢুকেছিল কিনা কথামৃতে লেখা নেই।

এতক্ষণ শুধুই সমালোচনা করে কাটালাম। তার মানে পক্ষে বলার মত কিছু নেই তা কিন্তু বলছি না। গুণ গাইবার মত নমুনা অনেক দেখেছি। কিন্তু সে দায়িত্বে বহু লোক ব্যস্ত। নিন্দুক ওইটুকু না করলেও কারও কিছু এসে যাবে না। আমি ক্ষমাপ্রার্থী। কিন্তু 'হে আকাঙ্ক্ষা বা বাসনা, তুই সর্বাপেক্ষা নীচ, তুই চামারনি মেথরানি সদৃশ........'। স্বামী তুরীয়ানন্দের প্রিয় দোঁহা। শিষ্যদের যা তিনি উপদেশাকারে গান গেয়ে শোনাতেন। একে নীচু জাত, তায় স্ত্রীলোক, এর থেকে কদর্য সৃষ্টি আর কি হতে পারে! এই শিক্ষা যারা দেয় তারা কার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হবে?

রামকৃষ্ণ মণ্ডলীর মধ্যে মাত্র তিনজন আমার নজরে এসেছে যারা সমাজের নীচু স্তরের মহিলাদেরও কাছে টেনে নিয়েছেন। এক, শ্রীশ্রী সারদামণি। তার প্রসঙ্গে অন্যত্র আলোচনা করা হবে। দুই, স্বামী ব্রহ্মানন্দ এবং স্বামী বিবেকানন্দ। এছাড়া চতুর্থ কোন নাম অন্তত

আমার চোখে পড়েনি। স্বামী ব্রহ্মানন্দ বিধবা বিবাহের মতো স্পর্শকাতর বিষয়ও সমর্থন করেছন। স্বামী অভেদানন্দের কিছু কথা থেকে মনে হয়েছে তিনিও বিধবা বিবাহের সমর্থকই ছিলেন। নারী স্বাধীনতায় বিশ্বাসীও ছিলেন পূর্ণ মাত্রায়।

রামকৃষ্ণদেব মৃত্যু শয্যায় শুয়েও বলে গেছেন—"মেয়েমানুষ দেখতে পারছি না—দেখলে গা কেমন করে।" (শ্রীরামকৃষ্ণের অন্ত্যলীলা—স্বামী প্রভানন্দ, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা-১১১)। হঠাৎ মৃত্যুর একশো বছর পরে তার নারী জাতির প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা এতো বেড়ে গেলো কি করে? ভক্তের কেরামতি।

এই অধ্যায়ের শুরুতে রামকৃষ্ণদেবের কিছু উক্তি তুলে দেওয়া হয়েছিল। যেখানে ঠাকুর বলছেন ঈশ্বর দর্শন না হলে নারী কি তা বোঝা যায় না। ঠাকুরের তো দেখছি মৃত্যুশয্যায় শুয়েও নারী সম্বন্ধে হীনমন্যতা কাটে নি। সত্যিই তার ঈশ্বর দর্শন হয়েছিল তো। অবশ্য নিজেই যখন ঈশ্বর আবার আর একটা ঈশ্বর দেখার আছেটা কী।

লোক শিক্ষক শ্রীরামকৃষ্ণ

'লোক শিক্ষক শ্রীরামকৃষ্ণ', এটি এমনই একটি প্রচলিত কথা যা শুনতে শুনতে আমরা প্রায় সকলেই বড় হয়েছি। তার এই লোক শিক্ষা সত্যিই জনগণকে কতটা এগিয়ে দিয়েছে এবং তার লোক শিক্ষার মধ্যে বস্তু কতটা, নতুন আলোকে আমরা তা আর একবার যাচাই করে দেখতে চাই।

সুকুমার রায়ের কবিতা আছে না 'হাসতে হাসতে আসছে দাদা, আসছি আমি, আসছে ভাই, হাসছি কেন কেউ জানে না পাচ্ছে হাসি হাসছি তাই।' হাসির কারণটা কেউই জানে না। শুধু এর দেখে ও হাসে, ওর দেখে সে হাসে। অতএব আমাকেও হাসতে হবে। না, সেটি হচ্ছে না। হাসির কারণটি না জানা পর্যন্ত রাম গরুড়ের ছানা হয়েই থাকব।

রামকৃষ্ণদেবের শিক্ষা বলতে মূলতঃ ধর্ম শিক্ষাই, অন্য কিছু নয়। যে প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'পথের দাবীতে' বলেছিলেন—'সমস্ত ধর্মই মিথ্যা, আদিম যুগের কুসংস্কার, বিশ্ব মানবতার এত বড় শত্রু আর নেই।' ঈশ্বর নামক অলীক বস্তুকে লাভ করার পথই ধর্ম। যোগ এবং তপস্যা এই পথের দুই সহায়ক দোসর। ঈশ্বর প্রাপ্তির এই মহান পথদ্বয়কে বিদ্রূপ করে শরৎচন্দ্র বলেছেন—'যোগ কাকে বলে আমি জানিনে, কিন্তু এ যদি নির্জনে বসে কেবল আত্ম বিশ্লেষণ এবং আত্ম চিন্তাই হয় তো এই কথাই জোর করে বলব যে, এই দুটো সিংহদ্বার দিয়ে সংসারে যত ভ্রম, যত মোহ ভেতরে প্রবেশ করেছে, এমন আর কোথাও দিয়ে না। ওরা অজ্ঞানের সহচর।'

চন্দননগরের আলাপ সভায় মতি বাবুর প্রস্তাব ছিল 'ধর্মের মেরামত এবং সংস্কার।' শরৎচন্দ্র বিরোধিতা করে বলেন, "মেরামত নয়—ওটিকেই বাদ দাও। আবার তাকে মেরামত করে খাড়া করার দরকার কি?" তিনি প্রশ্ন তুলেছেন—"শাস্ত্র সাধনা যা ছিল, সবই যদি এত বড় ছিল, আমরা এত ছোট হলুম কেন?"

এই কয়েক দিন আগে আনন্দবাজার পত্রিকায় সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি অপূর্ব লেখা পড়লাম। এক জায়গায় তিনি বলেছেন—'সভ্যতার যা সব শ্রেষ্ঠ ফসল, যেমন সঙ্গীত, শিল্প, কাব্য, বিজ্ঞান, সেগুলি উপভোগের কত সময় কমিয়ে দিচ্ছে ধর্ম নামে এমন একটা বিষয়, যার মধ্যে উপভোগ্য কিছু নেই, আছে ভীতি, লোভ, ক্ষমতার

লালসা, হিংসার প্রশ্রয়।' ঠিক কথাই বলেছেন তিনি। কিন্তু আমরা পড়ে আছি সেই গুহামানবের যুগে।

রামকৃষ্ণদেব ভয় পেতেন অঙ্ক, মানে বিজ্ঞান। স্ত্রী সারদামণি ভয় পান কলকব্জা, মানে বিজ্ঞানের অবদান। আর আমরা মনে করি এ যুগে সব মানুষের বিজ্ঞান মনস্ক হওয়াই কাম্য। শেষ দৌড়ে কিন্তু বিজ্ঞানই টিকবে, ধর্ম বিজ্ঞান নয়। জিতবে যুক্তিবাদ, কুসংস্কারবাদ নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন—"হৃদে বলত, মামা তোমার বুলিগুলি সব এক সময়ে বলে ফেল না! ফি বার এক বুলি কেন বলবে?" উত্তরে রামকৃষ্ণদেব বলেন তার বুলি তিনি লক্ষ বার বলবেন তাতে কার কি। (কথামৃত,প্রথম ভাগ, পৃ - ৩২৮)। সেবক, ভাগ্নে হৃদয়রাম এই জায়গায় মামাকে নিখুঁত ভাবে বুঝেছিলেন। সারা জীবন ধরে রামকৃষ্ণদেব মোটামুটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একই কথা বলে গেছেন। একই রান্না যদি রোজ রাঁধা হয়, তার টক, ঝাল, নুন, মিষ্টি, কি রোজ একই পরিমাণে নিশ্চিত ভাবে হয়? আমাদের বাড়িতে হয় না। একই কথা যদি প্রায়ই বলা হয় তারও অক্ষর বিন্যাস কি সব সময় একই থাকে? তাও থাকে না। কথার ভাবটা একই রইল, কিন্তু অক্ষর বিন্যাস আজ এক রকম তো কাল অন্য রকম হতেই পারে। এই অক্ষর বিন্যাসের রকমফেরকেই আমরা বানিয়েছি 'যার যেমন রুচি ঠাকুর তাকে তেমনই উপদেশ দিয়ে গেছেন।' কিন্তু আমি তো তেমন কিছু দেখতে পাই না। ওই একই ভগবান লাভের উপদেশাবলি। আজ এই ভাবে বলেন তো কাল অন্য ভাবে। তবে তার কথা এবং কথা বলার ভঙ্গির মধ্যে একটা আকর্ষণ শক্তি আছে। সেটা উপেক্ষা করা যায় না। 'ভগবানকে ধরে থাক, তাহলেই সব হয়ে যাবে' এই তার মূল বক্তব্য। বারে বারে একই কথা নানাভাবে বলে চলা।

উদ্বোধন ৫০শ বর্ষ। ১৩৫৪ মাঘ হইতে ১৩৫৫ পৌষ-এর ৭২ পাতায় এক ভক্তের স্মৃতিচারণা আছে, ভদ্রলোক দক্ষিণেশ্বর গ্রামেই বসবাস করতেন। কাছাকাছি থাকার সুবাদে বেশ কয়েকবার রামকৃষ্ণ সঙ্গ করার অভিজ্ঞতা তার হয়েছিল। পরবর্তীকালে তিনি বলেছেন "সকলের প্রতি ঠাকুরের উপদেশ ছিল মাত্র একটিই।" এই ভদ্রলোক একদম ঠিক কথাই বলেছেন। তিনি কিন্তু আমার মত নিন্দুক নন। যা শুনেছেন ঠিক তাই বলেছেন। আপনিও শ্রীরামকৃষ্ণের কথাগুলি একটু তলিয়ে দেখুন, একটাই তল পাবেন। তার আর দ্বিতল, তৃতল বলে কিছু নেই।

আমি যদি টাইম মেশিনে চড়ে একবার সেই যুগে পৌছতে পারতাম, রামকৃষ্ণদেবের কাছে একটা প্রশ্ন তুলতাম। সেই অমোঘ প্রশ্নটি—ঈশ্বর এলেন কীভাবে, কোন্ সময়ই বা এলেন। যার উত্তর সম্ভবতঃ সকলেরই অজানা। সাক্ষাৎ ভগবান হবার সূত্রে ঠিক ঠিক উত্তরটা তিনিই দিতে পারতেন। তার কাছে প্রশ্ন তোলা হত তিনি ভগবান দেখেছেন

কিনা। কিন্তু ভগবান এল কীভাবে এ প্রশ্ন তাকে কেউ করেনি। তাই গোড়াটাই অজানা রয়ে গেল।

স্বামী অখণ্ডানন্দ তার 'স্মৃতিকথা'য় বলছেন—'আমি কোলে তার পা দুখানি তুলে নিয়ে হাত বুলাচ্ছি, সেই সময় হাসতে হাসতে তিনি যেসব কথা আমাকে বলেছিলেন, পরে স্বামী ব্রমানন্দকে আমি তা বলি। তাতে তিনি আমাকে বলেন যে, তাকেও ঠাকুর সেই সব কথা আগেই বলেছিলেন'। (স্মৃতিকথা, পৃষ্ঠা-৪৬)। একই কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সকলকে বলে গেছেন।

বলতেন 'বাড়িতে মাছ এলে যার যেমন রোচে, কারও জন্য ঝোল, কারও জন্য টক, আবার কারও জন্য বা ডালনা মা রেঁধে দেন।' তিনি বোঝাতে চান এক এক থাকের লোকের জন্য এক এক রকম উপদেশ। কিন্তু আমি দেখেছি রামকৃষ্ণদেব শুধু ঝোল রাঁধতেই জানতেন। রান্নাটা ভালই করতেন। খেতে সকলেরই ভালো লাগত। ব্যস, এই পর্যন্তই। মাছের টক তিনি কোনোদিনই রাঁধেন নি।

তার শিক্ষা প্রণালীও কতটা কুসংস্কার মুক্ত বলা কঠিন। বলতেন—"কলিতে নারদীয় ভক্তি—সর্বদা তার নাম গুণ কীর্ত্তন করা। যাদের সময় নাই, তারা যেন সন্ধ্যা সকালে হাততালি দিয়ে এক মনে হরিবোল হরিবোল বলে তার ভজনা করে।" জানিনা এই 'হরিবোল হরিবোল' বলে হাত পা ছুঁড়ে কার কি উপকার হয়। আমি একজনকে জানতাম সারা জীবন হরিকীর্ত্তন নিয়ে কাটিয়ে অতি অল্প বয়সে পঙ্গুগ্রস্ত হয়ে শয্যাশায়ী অবস্থায় মারা যান। হরি তার কি উপকারটি করলেন হরিই জানেন। আর জানে হরিকীর্ত্তন প্রচারকেরা।

এক ভক্ত—"ব্রাম্ম সমাজের লোকেরা বলেন, সংসারের কর্ম করা কর্ত্তব্য। এ কর্ম ত্যাগ করলে হবে না।" গিরিশ—"সুলভ সমাচারে ওই রকম লিখেছে, দেখলাম। কিন্তু ঈশ্বরকে জানবার জন্য যে সব কর্ম—তাই করে উঠতে পারা যায় না আবার অন্য কর্ম।" শ্রীরামকৃষ্ণ ঈষৎ হাসিয়া মাস্টারের দিকে তাকাইয়া নয়নের দ্বারা ইঙ্গিত করিলেন ' ও যা বলছে তাই ঠিক।' (কথামৃত, তৃতীয় ভাগ, পৃষ্ঠা-২০৪)। কর্ম বলতে শুধু ঈশ্বর লাভ হয় কিভাবে এইটুকুই।

জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ, শুনতে বেশ ভারী ভারী লাগে। আসলে মোক্ষ লাভের জন্য যা যা করণীয়, মানে কতটা জপ করতে হবে, কতটা ধ্যান করতে হবে। সোজা বসে তপস্যা না হাত তুলে তপস্যা, খেতে, শুতে, উঠতে, বসতে কতবার নাম নিতে হবে, কিভাবে নাম নিলে তাড়াতাড়ি ভগবানের দেখা পাওয়া যাবে, কতটা হোমযজ্ঞ, এই সবই কর্মযোগ। একবারও ভেবে নেবেন না যেন দেশের ও দশের উপকারের জন্য কাজের বন্যা বইয়ে দেবার নাম কর্মযোগ। কেবল ভগবান লাভ করার জন্য যা যা করণীয় তাই

কর্মযোগ। স্বামী অভেদানন্দ বলেন—ঈশ্বরের প্রীতির জন্য সমস্ত কাজ করা ও সেই কর্মের ফল তাকে দান করাই কর্মযোগ।

স্বামীজীর প্রবল কর্মযোগ—'প্রথমেই একটা মন্দির চাই, সেখানে শুধু ওঁ-কারের উপাসনা হবে।' মন্দির তৈরি করাটি কর্মযোগ। ওঁ-কারের উপাসনা ভক্তিযোগ। আর জ্ঞানযোগ হল 'অজ্ঞান ব্যক্তিরাই মনে করে কর্মদ্বারা আত্মা লাভ হতে পারে।' এই বোধ।

শ্রীম—"কর্মকান্ডের উদ্দেশ্য স্বর্গাদি লাভ।" নরেন্দ্র বলেন "গীতায় ভগবান যে নিষ্কাম কর্ম করতে বলেন—সে পূজা, জপ, ধ্যান, এই সব কর্ম—অন্য কর্ম নহে।"

জ্ঞানযোগ হল ঈশ্বর সম্বন্ধীয় জ্ঞান। তিনিই সব করাচ্ছেন, তিনিই সব হয়েছেন, তার ইচ্ছাতেই সব হচ্ছে, আমরা নিমিত্ত মাত্র, তিনি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র, এই সব চিন্তা ভাবনা ও তার অনুশীলনই জ্ঞানযোগ। আবার ভাববেন না যেন আপেক্ষিকতাবাদ নিয়ে আলোচনার নাম জ্ঞানযোগ। কালী মহারাজ বলেন—'ব্রহ্মের সঙ্গে নিজের স্বরূপগত ঐক্য ও অভিন্নতা উপলব্ধিই জ্ঞানযোগ' বিজ্ঞান, সাহিত্যের সাথে জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্মযোগের কোন সম্পর্ক নেই। ওসব ধর্ম মার্গের ব্যাপার। 'ঈশ্বরকে সমস্ত হৃদয়-মন দিয়ে ভালবাসা ও সর্বদা তার চিন্তা, স্মরন, মনন ও ভজনা করাই ভক্তিযোগ।' 'মনকে সমস্ত ভোগের বিষয় থেকে ফিরিয়ে এনে ঈশ্বরের চিন্তায় একাগ্র ও স্থির করার যে পদ্ধতি, তার নাম রাজযোগ।' যম, নিয়ম, প্রাণায়াম, ধ্যান, সমাধি, এসব পদ্ধতি। স্বামী অভেদানন্দের ব্যাখ্যা এগুলি। এই প্রতিটি যোগ-বিয়োগের সাথে ওতোপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছেন ঈশ্বর। ঈশ্বর যদি সত্য হন এই সম্পূর্ণ দর্শনের সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলাই বাতুলতা। কিন্তু ঈশ্বর নিজেই যে 'সত্য' এমন নিশ্চয়তা দিল কে! প্রশ্ন তো উঠতেই পারে সেই মহাশক্তির উৎস কি! নানা রকম মায়াবাদ শুনে শুনেই আমরা মোহমুগ্ধ হয়ে রয়ে গেছি। কখনও তলিয়ে দেখার চেষ্টাই করিনা জগৎ সংসারের কারণ স্বরূপ যে ঈশ্বর, সেই ঈশ্বরের কারণস্বরূপ কে! বিদ্যাসাগরের কথায় 'সাংখ্য-বেদান্তের মূলটাই অমূলক' নয়তো! তিনি সব সময় ছিলেন, সব সময় আছেন। তার জন্মও নেই মৃত্যুও নেই। তিনি অনাদি অনন্ত। এসব ভাবতে বেশ লাগে। আসলে কথার মারপ্যাচ ছাড়া কিছুই নয়। তৈরীই হলেন না, অথচ আছেন। এ একটা সোনার পাথর বাটি গোছের কথা। যা আছে, তা কখনো না কখনো তৈরি হয়েছে, এটাই সত্যজ্ঞান, সব যোগের সেরা যোগ 'সত্যজ্ঞানযোগ'।

এ সবের সাথে যে জাত যত বেশি মাখামাখি করে চলে তাদের অবনতিও তত বেশি। উন্নত দেশের কাছে জুতো পেটা খেয়ে চেঁচাই 'ধর্ম রাজ্যে আমরাই মহারথী।' তারা ভাবে, তোরা মহারথী কেন, আর যা যা রথী আছে সব হ। শুধু আমাদের জুতোর নীচে থাকিস, তাহলেই চলবে। মাঝে মাঝে দু'চারটে সাদা চামড়ার কুসংস্কার তোদের দেশে পাঠিয়ে দেবো, তোদের অবনতি আরও ফুলেফেঁপে উঠবে। (উত্তরে স্বামীজী বলবেন) —

'তোমাদের (আমেরিকানদের) জাত যখন প্রাচীন হবে তোমাদের (ধর্ম) জ্ঞানও পাকা হবে।' (বাণী ও রচনা—দশম খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, পৃ - ২৭৫)। 'ভগবানকে মাতৃরূপে উপাসনা করলে আমেরিকার মহাশক্তির বিকাশ হবে।' (বাণী ও রচনা—চতুর্থ খণ্ড, পৃ - ৩১৬)। ভাগ্যিস মার্কিনীরা জেনে নিল কথাটা। তবেই না তারা মহাশক্তির বিকাশ ঘটাতে পেরেছে।

'আসন গ্রহণ করিতে গিয়া ঠাকুর দেখিলেন একখানা খবরের কাগজ রহিয়াছে। খবর কাগজে বিষয়ীদের কথা। বিষয় কথা, পরচর্চা, পরনিন্দা তাই অপবিত্র—তাহার চক্ষে। তিনি ইশারা করিলেন, ওখানা যাতে স্থানান্তরিত করা হয়। কাগজখানা সরানো হলে আসন গ্রহণ করিলেন।' (কথামৃত, প্রথম ভাগ, পৃষ্ঠা-২৪৯)।

কি আশ্চর্য কথা। যে খবরের কাগজ একদিন বন্ধ থাকলে সব কাজের পরেও মনে হয় যেন কি একটা বাকী রয়ে গেল। সেই কাগজ শ্রীরামকৃষ্ণের চোখে এমনই নিন্দনীয় যে ঘরে একটা খবর কাগজ থাকলে সে ঘরে তিনি বসতেই পারেন না। লোক শিক্ষক শ্রীরামকৃষ্ণের এটাও একটা শিক্ষা। ঘরের মধ্যে ভগবানকে ঢুকিয়ে নিয়ে দরজা জানালা বন্ধ করে দাও। জ্ঞানের আলো যেন কোন রন্ধ্র দিয়ে প্রবেশ না করে।

এক ভক্ত, নাম ঠাকুরদাদা, প্রশ্ন করছেন—"আজ্ঞা, এখন কি করব বলে দিন।" শ্রীরামকৃষ্ণ—"হাততালি দিয়ে সকালে বিকালে হরিনাম করবে—হরিবোল হরিবোল হরিবোল বলে।" রামকৃষ্ণদেব শুধু এইটুকুই সকলকে শেখাতেন।

'ঠাকুর আবার উঠিয়াছেন ও আখর দিয়া নাচিতেছেন (প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে রে..........)। সেই অপূর্ব নৃত্য দেখিয়া নরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তেরা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, সকলেই ঠাকুরের সঙ্গে নাচিতে লাগিলেন। নাচিতে নাচিতে ঠাকুর এক এক বার সমাধিস্থ হইতেছেন। তখন অন্তর্দশা। মুখে একটি কথা নাই। শরীর সমস্ত স্থির। ভক্তেরা তখন তাহাকে বেড়িয়া বেড়িয়া নাচিতেছেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই অর্ধ বাহ্য দশা—চৈতন্যদেবের যেরূপ হত—অমনি ঠাকুর সিংহ বিক্রমে নৃত্য করিতেছেন। তখনও মুখে কথা নাই—প্রেমে উন্মত্ত প্রায়।' (কথামৃত, চতুর্থ ভাগ পৃ - ১২৭-১২৮)।

'প্রেমের বন্যে ভেসে যায়'—এই ধুয়া ধরিয়া ঠাকুর নীলকণ্ঠাদি ভক্ত সঙ্গে আবার নাচিতেছেন। সে অপূর্ব নৃত্য যাহারা দেখিয়াছিলেন তাহারা কখনোও ভুলিবেন না। ঘর লোকে পরিপূর্ণ সকলেই উন্মত্ত প্রায়। ঘরটি যেন শ্রীবাসের আঙ্গিনা হইয়াছে। (কথামৃত, চতুর্থ ভাগ, পৃষ্ঠা-২১০)।

'ঠাকুর যে ঘরে আছেন, তাহার পশ্চিমে একটি পুষ্করিণী আছে। এই পুষ্করিণীর ঘাটের চাতালে কয়েকটি ভক্ত খোল কর্তাল লইয়া গান গাহিতেছেন। ঠাকুর লাটুকে দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন—"তোমরা একটু হরিনাম কর।" মাস্টার, বাবুরাম প্রভৃতি এখনো ঠাকুরের কাছে বসিয়া আছেন। তাহারা শুনিতেছেন, ভক্তেরা গাইতেছেন—'হরি বলে আমার গৌর

নাচে।' ঠাকুর গান শুনিতে শুনিতে বাবুরাম, মাস্টার প্রভৃতিকে ইঙ্গিত করিয়া বলিতেছেন—"তোমরা নীচে যাও। ওদের সঙ্গে গান কর,—আর নাচবে।" তাহারা নীচে আসিয়া কীর্তনে যোগদান করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর আবার লোক পাঠাইয়াছেন। বলছেন "এই আখরগুলি দেবে—গৌর নাচতেও জানে রে। গৌরের ভাবের বালাই যাই রে। গৌর আমার নাচে দুই বাহু তুলে"।' (কথামৃত, চতুর্থ ভাগ, পৃষ্ঠা-২৯১-৯২)।

দুই বাহু তুলে সিংহ বিক্রমে কীর্ত্তনানন্দে নৃত্য। সঙ্গে আছে 'অগ্নি মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে দুর্গানাম।' (কথামৃত, প্রথম ভাগ, পৃষ্ঠা-৫৮)। এই জীবন দর্শন কোনো জাতের উন্নতির সহায়ক হতে পারে কিনা নতুন করে ভেবে দেখা দরকার।

'মহিমাচরণের সংসারে অনেক কাজ। আর তিনি একটি নতুন স্কুল করিয়াছেন—পরোপকারের জন্য। ঠাকুর রামকৃষ্ণ আবার কথা কহিতেছেন—রামকৃষ্ণ (মহিমার প্রতি) —"শম্ভু বললে—আমার ইচ্ছে যে এই টাকাগুলো সৎকর্মে ব্যয় করি, স্কুল ডিস্পেন্সারী করে দিই, রাস্তাঘাট করে দিই। আমি বললাম নিষ্কাম ভাবে করতে পারো সে ভালো, কিন্তু নিষ্কাম কর্ম করা বড়ো কঠিন,—কোন দিক দিয়ে কামনা এসে পড়ে! আর একটি কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করি, যদি ঈশ্বর সাক্ষাৎকার হন, তাহলে তার কাছে তুমি কি কতকগুলি স্কুল, ডিস্পেন্সারী, হাসপাতাল এই সব চাইবে?" (কথামৃত, তৃতীয় ভাগ, পৃষ্ঠা-২১৫)।

এই যে শেষ কথাটুকু 'ভগবান সামনে এলে তুমি কি জন-হিতাকাঙ্ক্ষী হবার আশীর্বাদ চাইবে?' না, কখনোই না। ভগবান সামনে এসে দাঁড়ালে তার কাছে, শ্রদ্ধা, ভক্তি, জ্ঞান, মুক্তি এই সব চাওয়া যায়, আমি 'জনদরদী' হতে চাই এমন আশীর্বাদ পাগলাভোলা ছাড়া কেউ কখনো চায়নি, কেউ কখনো চাইবেও না। তবে আমি হলে জানতে চাইতাম 'প্রভু, আপনার উৎপত্তি কীভাবে একটি বার জানিয়ে দিন।'

সেবা প্রতিষ্ঠানের সেবার বহর দেখে চোখ কপালে তোলারও কোন কারণ নেই। শিষ্য গুরুদেবকে জিজ্ঞেস করছেন "মহাশয়, পরহিত কেন?' স্বামী বিবেকানন্দ—"নিজ হিতের জন্য।" (স্বামী শিষ্য সংবাদ, পৃ - ১১২)। এই নিজের হিতটি লুকিয়ে আছে বলেই এত সেবা। আত্মনো মোক্ষর্থং জগদ্ধিতায় চঃ। নিজের মুক্তির জন্য জগতের কল্যাণসাধন।

স্বামী ব্রহ্মানন্দের একান্ত সেবক-সন্তান সুধি মহারাজ, স্বামী নির্বাণানন্দ, নিজের অজান্তেই এই নিজ হিতের কথাটি একটু খোলাখুলি ভাবেই বলে ফেলেছেন—'একটা কথা তিনি (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) সাধু ব্রহ্মচারীদের খুব বলতেন—"রামকৃষ্ণ মঠ-মিশন একটা নিছক সমাজ সেবামূলক প্রতিষ্ঠান নয়। এটা মূলত একটা আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠান। আমরা প্রথমে সাধু, পরে আমরা সমাজসেবী বা অন্য কিছু। প্রথমে আমাদের লক্ষ্য ঈশ্বর লাভ

বা আত্ম মুক্তি, পরে জগতের কল্যাণ। আবার সেই কল্যাণটিও কল্যাণ হিসাবে নয়, তার মাধ্যমে আমার ঈশ্বর লাভ বা মুক্তি হবে, তাই জগতের কল্যাণের জন্য চেষ্টা।" (দেবলোকের কথা—স্বামী নির্বানানন্দ, প্রথম প্রকাশ, পৃষ্ঠা-১৬৩)। নিঃস্বার্থ ভাবে সেবা করে পুণ্যি কামিয়ে নেওয়া। স্বামী প্রেমানন্দ বলেন—'আমাদের তো কেবল নারায়ণ সেবা দ্বারা নিজের কল্যাণ সাধনই উদ্দেশ্য।' (প্রেমানন্দের পত্রাবলী, উদ্বোধন, পৃষ্ঠা-৭১)।

শ্রীম ভক্ত সঙ্গে বসে ধর্ম প্রসঙ্গ করছেন। দুই বন্ধুর (পরবর্তীকালে মঠের সন্ন্যাসী) স্টীমার যাত্রা এবং কথাবার্তা তুলে বলছেন "স্টীমারে যাচ্ছেন আর সঙ্গের বন্ধুকে বললেন, 'কর্তব্য ভাবতে গেলে ধর্ম জীবন হয় না।' তার অসহায় মা, ভাই এই সব ছিল। কিন্তু বের হয়ে এলো। বন্ধুটিকেও বলছেন 'বের হয়ে এসো।' কর্তব্য অত ভাবতে গেলে হয়ে উঠে না। একটা যায় আর একটা আসে। এর শেষ নাই। ঠাকুর আসায় এ সব কথা শোনা যাচ্ছে, আর এ সব লোক দেখা যাচ্ছে। কি আদর্শ! আগে ঈশ্বর, পরে অন্য সব।" (শ্রীম দর্শন, দ্বিতীয় ভাগ, দ্বিতীয় প্রকাশ, পৃষ্ঠা-৯৯)।

শিক্ষার আদর্শ পুরুষ অর্থাৎ যাদের দেখে লোক শিখবে, এমনই একজনের বর্ণনা দিতে গিয়ে মাস্টারমশাই বলছেন, "জগদানন্দ বলে একজন আছেন। কাশীতে থাকেন। সন্ন্যাস হয়েছে। বিয়ে করেছিলেন। ছেলেপুলেও হয়েছিল। তারপর সব ছেড়ে এলেন। কত বাধার ভিতর দিয়ে যেতে হয়েছে।" (শ্রীম দর্শন - ষষ্ঠ ভাগ, - পৃষ্ঠা - ১১)। এই আদর্শ লোকশিক্ষকটিকে জেলে ঢোকানোর আইন থাকলে ভাল হতো। ধর্মীয় উন্মাদনাই পারে মানুষকে এমন নৃশংস বানিয়ে তুলতে। প্রতিদিনের খবরের কাগজটি খুললেই এমন নৃশংসতার ছবি রোজ কিছু না কিছু চোখে পড়ে।

আর এক জায়গায় শ্রীম স্বামী সম্ভবানন্দকে বলছেন—"দেখো, নতুন ভাবের কি বন্যা এসেছে। এ সবই ঠাকুরের আসার অমৃত ফল। কত সব সোনার চাঁদ ছেলে বাড়িঘর, পিতামাতা সর্বস্ব ছেড়ে ঈশ্বর লাভের জন্য মঠে এসেছে। এদেশে সন্ন্যাসী প্রায় দেখা যেত না। এখন সব হচ্ছে।" (শ্রীম দর্শন, নবম ভাগ, প্রথম সংস্করণ, পৃষ্ঠা-১৪০)।

এই সব ছেলেরা কতটা 'সোনার চাঁদ' পাঠক বিচার করবেন। যাদের নিজের ঈশ্বর লাভের জন্য কর্তব্যবোধ এবং আশ্রিতকে জলে ভাসিয়ে দিতে একটুও আটকায় না। আবার শ্রীরামকৃষ্ণের একান্ত পার্ষদ, কথামৃতকার শ্রীম, একজন তার মাকে ফেলে দিয়ে সাধু বনেছে, বলতে গিয়ে আনন্দে উচ্ছ্বসিত।

কথা প্রসঙ্গে একটা কথা উঠতে পারে, 'কেন, স্বামীজী কি তার মাকে দেখেন নি, ঠাকুর কি তার মাকে ফেলে দিয়েছিলেন?' আরে মশাই, শ্রীরামকৃষ্ণের ছিল জমিদারবাবু। আর স্বামীজীর ছিল রাজা অজিত সিং। তারা তো মাকে দেখবেই। খবর নিয়ে দেখবেন তো রাজা-উজীর জোটার আগে মা ভক্তি কোথায় ছিল? ঘরে হাঁড়ি চড়ে না, অথচ ছোট

ছোট ভাই বোন মাকে ফেলে রেখে তীর্থ করে বেড়াতেন। রাজা-জমিদার না জুটলে কে দেখত মাকে?

আমেরিকা থেকে মাকে এককালীন হাজার ডলারও পাঠিয়েছিলেন। (উদ্বোধন, বৈশাখ, চতুর্থ সংখ্যা, ১৪১৫, ১১০তম বর্ষ, পৃ - ২৪৯-৫০)। যুগের বিচারে টাকার অঙ্কটা বেশ বড়ই। সন্ন্যাসীর তো সন্ন্যাসপূর্ব জীবনের সাথে কোনো সম্পর্ক থাকে না, এমনই শুনেছি। তাহলে দেশে লক্ষ লক্ষ অভাবগ্রস্ত বিধবা পড়ে থাকতে নিজের মাকেই হাজার ডলার পাঠানো কেন?

'রামকৃষ্ণানন্দ এসেছিলেন, স্বামীজীর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে তার হাতে একটা টাকার বাক্স তুলে দিয়েছিলেন। ঐ টাকা মাদ্রাজে থাকতে পাঁচ বছর ধরে তিনি তিল তিল করে জমিয়েছিলেন। স্বামীজী তার মাথায় হাত রেখে আশীর্ব্বাদ করেছিলেন। ধন্যবাদ দিয়ে তাকে বলেছিলেন, "টাকাটা তুই নিয়ে তোর বাড়িতে পাঠিয়ে দে।" (জেসোফিন ম্যাকলাউড, পৃ-৪৫০)। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের বাড়িতে সে সময় দারুণ অর্থকষ্ট চলছিল এমন কোন খবর নেই। আর তা থাকলেও ভক্তের দান, 'তোর বাড়িতে পাঠিয়ে দে' এ রকম হয় নাকি? যদিও অন্যত্র দেখেছি ঐ টাকা শশী মহারাজ তার বাড়ির জন্য গ্রহন করেন নি।

মাদ্রাজ মঠের জন্য 'রামনাদের মহারাজা শশী মহারাজের খরচের জন্য টাকা দিতেন। কিন্তু সেই টাকা যাহারা শশী মহারাজকে লইয়া গিয়াছিল (অলাসিঙ্গা, জি.জি. প্রভৃতি) তাহারা কিছু অংশ খরচ করিয়া ফেলিত; বাকিটা তাহাকে দিত।' (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের স্মৃতিমালা, তার পত্র ও রচনা সংগ্রহ, পৃষ্ঠা-৯০)। মহারাজার দান সাধারণত ছোটখাট হয় না। 'তার কিছু অংশ' সেও বেশ ভালই হবে। 'অলাসিঙ্গা, জি.জি. খরচ করিয়া ফেলিত।' রোমাঞ্চকর কথাই বটে। আসলে উপরি কিছু ইনকাম। হাতছাড়া করে কে।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের পিতাকে লেখা একটি চিঠি—'বাবা, আপনার পত্রে সকল সমাচার জ্ঞাত হইলাম। আপনি ৩০০ টাকার জন্য নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি যেখান হইতে পারি আপনাকে জোগাড় করিয়া দিতে চেষ্টা করিব।' (ঐ-পৃষ্ঠা-৪৮৯)। ধরলাম আজকের বিচারে কেউ একজন কুড়ি হাজার টাকা ধার করেছে। ছেলে এক পয়সাও রোজগার করে না এবং করবেও না। তবুও পিতাকে আশ্বস্ত করছে সে টাকাটা মিটিয়ে দেবে। কি ভাবে? শেষ পর্যন্ত মঠ থেকেই টাকাটা মিটিয়ে দেওয়া হয়।

১৬ই অক্টোবর ১৯০২, নিবেদিতা কোনও একজনকে চিঠিতে লিখছেন, 'আমার লক্ষ হল ভারতের মঙ্গল। মনে হয় এখন আমার মমতাও নাই, ধর্মও নাই।......নিজেও যেন সমস্ত কৃচ্ছ্রতা একেবারে ছেড়ে দিয়েছি। এখন স্বামীজীর ইউরোপীয়ান ধরণে

সাজানো তিনখানা ঘর, তার খাওয়া-দাওয়া আর আরও অনেক কিছুর মানে বুঝতে পারি।' (নিবেদিতা—লিজেল রেমঁ, অনুবাদ নারায়ণী দেবী, পৃ—৪২৫)।

'ইউরোপীয় ধাঁচে সাজানো তিনখানা ঘর', মানেটা ঠিক ঠিক বোঝা গেল তো! ত্যাগী ছিলেন ঠিকই। যদিও 'ত্যাগটা' ঠিক কিসের বোঝা দায়। এই ত্যাগের বাড়াবাড়ির জন্য অনেক বিদেশি ভক্ত শেষ দান্তে বেশ বুষ্ঠ হয়েই উঠেছিলেন এবং ভারত ছেড়ে নিজের দেশে ফেরত চলে গেছিলেন। যদিও তাদের খবর অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে চলে গেছে। শত খুঁজেও আর পাবেন না। দামী আসবাবপত্র কেনা, বাস্তুভিটের মামলা মোকদ্দমা চালানো, ভালো খাওয়া, পরা, নির্মোহ ত্যাগ সহযোগে সবই বজায় ছিল। তবে এ কথাও ঠিক তার নিজের যোগ্যতায় অর্জিত সম্পত্তি তিনি ভোগ করবেন না তো কি অন্য কেউ ভোগ করবে! মহামারি প্রতিকারে টাকা দরকার। প্রয়োজনে মঠ বিক্রি করে গাছ তলায় ঠাঁই নেব। এসব কথার কথা।

একবার পূর্ববঙ্গে স্টিমার ভ্রমণে বেড়িয়ে ইলিশমাছ ধরা দেখে উত্তেজিত হয়ে পড়েন। কানাইকে বলেন মাছ কিনতে। তারা ছিলেন সাতজন। কানাই বেশ বড় ইলিশ গোটা চারেক কিনতে চান। স্বামীজী বলেন মাঝি-মল্লাদের কথাটাও ভাব্। একে একে ষোলোটা ইলিশ কেনা হয়ে গেল। দশ-বারোজন লোকের জন্য কুড়ি বাইশ কিলো মাছ! সঙ্গে নির্মোহ ত্যাগের পাঁচন ছিল বলে রক্ষে, না হলে পেটের গন্ডগোল অবধারিত ছিল। অর্থাগমের পথটি বেশ মসৃণ ছিল নিশ্চয়, না হলে এমন রাজসিকতা সম্ভব হত না।

এক দুঃস্থ ভক্ত একটি কাজের আশায় শ্রী ম-এর কাছে এসেছেন। কিন্তু শ্রীম ওসব কথা শুনতে চান না, ভক্ত যোগেন (অপ্রস্তুত ভাবে)—"আপনি ঈশ্বরের কথা ছাড়া অন্য কথা বলেন না। অন্যখানে অন্য কথাও হয়। আমার ধৃষ্টতা হয়েছে, ক্ষমা করুন। শ্রীম (সকরুণ ভাবে)—'ঈশ্বরের কথা কইলে যে আমার নিজের কল্যাণ। গীতায় আছে..........।" (শ্রীম দর্শন, দ্বিতীয় ভাগ, পৃষ্ঠা-১৩২)।

এই যে শ্রীম ভক্তদের কাছে দিবারাত্র ধর্ম কথা শোনাচ্ছেন, কারণটা আর কিছু নয়, পরকালের পথ পরিষ্কার করা। এই নিজের কল্যাণটি আছে বলেই এত না ধর্ম সেবা। আবার বলছেন—"শিবজ্ঞানে জীব সেবা, উহা পরোপকার নহে, নিজেরই উপকার।" (শ্রীম সমীপে—স্বামী চেতনানন্দ, পৃষ্ঠা-৭৯)। স্বামী শিবানন্দ বলেছেন "তোমার নিজের কল্যাণের জন্য তার সেবা করা, নরনারায়ণের সেবা করা।" আসলে সেবার কারণ নিজের মুক্তি। আত্মনো মোক্ষর্থং ....।

'ঠাকুর অতি করুণ স্বরে সুর করিয়া, কিরূপে তাহাকে ডাকিতে হয়, শিখাইতেছেন। সেই করুণ স্বর শুনিয়া ভক্তদের হৃদয় দ্রবীভূত হইতেছে—মহিমাচরণ চোখের জলে ভাসিয়া

যাইতেছেন।' 'ঠাকুর বলিতেছেন—'টাকার জন্য যেমন ঘাম বার কর, তেমনি হরিনাম করে নেচেগেয়ে ঘাম বার করতে হয়।"

এই হরিনাম করে, নেচেগেয়ে, কান্নাকাটি করে, এরা দিব্যি জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন। আমাদের জন্যেও উপদেশামৃত রেখে গেছেন যাতে তাদের অনুসরণ করেই জীবন কাটিয়ে দিই।

'রামকৃষ্ণদেব ভক্তের বাড়ি এসেছেন। ভক্ত শিষ্যরা নানা বিষয়ে আলোচনায় রত। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের কথা উঠেছে। যন্ত্রের গুণপনার কথা শুনে রামকৃষ্ণদেব শিশুর মত উচ্ছ্বসিত। তিনি ওই যন্ত্র দেখবেন। ভাল কথা, খোঁজাখুঁজি চলতে লাগল যদি রামকৃষ্ণদেবের জন্য যন্ত্রটি এনে তাকে একবার দেখানো যায়।

খোঁজ পাওয়া গেল স্বামী প্রেমানন্দের ভাই বিপিনবিহারী ঘোষ সদ্য ডাক্তারী পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে মেডিকেল কলেজ থেকে একটি অণুবীক্ষণ যন্ত্র উপহার স্বরূপ পেয়েছেন। তাকে খবর দিতে তিনি সেই দিনই বিকাল চারটা নাগাদ যন্ত্র নিয়ে উপস্থিত হলেন। যন্ত্রটি ঠিকঠাক করে খাটিয়ে রামকৃষ্ণদেবকে দেখবার জন্য আহ্বান করলেন।'

এবার আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের অভিব্যক্তি লক্ষ্য করব। তিনি কি পারবেন বিজ্ঞানের জয় পতাকা যেখানে উড়ছে, তার সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে!

'ঠাকুর উঠিলেন, দেখিতে যাইলেন, কিন্তু না দেখিয়াই আবার ফিরিয়া আসিলেন। সকলে কারণ জিজ্ঞাসা করলে বললেন "মন এখন এত উঁচুতে উঠে রয়েছে যে, কিছুতেই এখন তাকে নামিয়ে নীচের দিকে দেখতে পারছি না।" আমরা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিলাম—ঠাকুরের মন যদি নামিয়া আসে তজ্জন্য। কিন্তু কিছুতেই সেদিন আর ঠাকুরের মন ওই উচ্চ ভাব ভূমি হইতে নামিল না—কাজেই তাহার আর সেদিন অণুবীক্ষণ সহায়ে কোন পদার্থই দেখা হইল না।' (লীলাপ্রসঙ্গ, পৃষ্ঠা-৫৮৪)।

নাঃ, তিনি পারলেন না বিজ্ঞানের জয়যাত্রায় নিজেকে মানিয়ে নিতে। আমার মনে হয় অণুবীক্ষণ যন্ত্র যদি কোষাকুষি, মালা চন্দনের মত কোন দৈব উপকরণ হত, আর গ্যালিলিও যদি রামপ্রসাদী সুরে শ্যামাসঙ্গীত গাহিতে পারতেন, তাহলে তিনি মন নিম্নভূমিতে নামিয়ে একটি বার যন্ত্র দেখে নিতে পারতেন।

আর একটি ঘটনার উল্লেখ করছি। ইলেকট্রিসিটি নিয়ে আলোচনা চলছে। শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন "ইলেকটিকটিক মানে কি ?" একটু হাসাহাসির পর 'তড়িৎ শক্তি সম্বন্ধীয় সাধারণ নিয়মগুলি তাহাকে বলিয়া বজ্রনিবারক দণ্ডের উপকারিতা, সর্বাপেক্ষা উচ্চ পদার্থের উপরেই বজ্রপতন হয়। এ জন্য ওই দণ্ডের উচ্চতা বাটীর উচ্চতা অপেক্ষা কিঞ্চিত অধিক হওয়া উচিত—ইত্যাদি নানারকম তাহাকে শুনাইতে লাগিলাম। ঠাকুর আমাদের সকল কথাগুলি মন দিয়া শুনিয়া বলিলেন, "কিন্তু আমি যে দেখেছি, তেতলা বাড়ির পাশে ছোট

চালাঘর—শালার বাজ তেতলায় না পড়ে তাইতে এসে ঢুকল। তার কি করলি বল। ওসব কি একেবারে ঠিক ঠাক বলা যায় রে! তার (ঈশ্বরের) ইচ্ছাতেই আইন। আবার তার ইচ্ছাতেই উল্টে পাল্টে যায়।" তাকে বোঝানোর বহু চেষ্টা হল। বলা হল কোন কারণবশতঃ এক আধটা ব্যতিক্রম ঘটে যেতেও পারে। কিন্তু তিনি কিছুতেই এসব কথা মানতে রাজি হলেন না। বললেন "হাজার জায়গায় তোরা যেমনি বলছিস তেমনি না হয় হল, কিন্তু দু চার জায়গায় ওই রকম না হওয়াতেই ওই আইন যে পাল্টে যায় এটা বোঝা যাচ্ছে"।' (লীলাপ্রসঙ্গ, পৃষ্ঠা-৫৮৯)। ঈশ্বরহীন বিজ্ঞানের অপব্যাখ্যা তিনি কিছুতেই মানবেন না। হয়তো আপনি বললেন 'বৈদ্যুতিক বাল্বের মহিমা দেখেছেন, অন্ধকার ঘর আলোয় আলো করে রেখেছে।' চোখের সামনে জ্বল জ্বল করে আলো জ্বলছে, তাকে তো আর অস্বীকার করা যায় না! এরকম ক্ষেত্রেও কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকে সোজা কথায় প্রশংসা পাওয়া যাবে না। তিনি বলবেন 'তা আলো জ্বলছে ঠিকই, লোডশেডিং হলেই বিজ্ঞানের কেরামতি শেষ।'

ঠিক এই আলোচনাটিই কখনও হয়নি, আমি জানি। কিন্তু এইরকম কথা উঠলে উত্তর যে এরকমই কিছু হতো তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি।

যে বুদ্ধি বিশেষ রূপে ভগবানে জানে।
সেই বুদ্ধি সুবিদিত বিজ্ঞানের নামে।। —(রামকৃষ্ণ পুঁথি)

বিজ্ঞান মানে ভগবান সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান। ধর্ম বিজ্ঞান। অন্য কোনো জ্ঞান হলে চলবে না।

সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্রকে রামকৃষ্ণদেব জিজ্ঞেস করছেন—"তুমি কি বল? আগে সায়েন্স না আগে ঈশ্বর?" বঙ্কিম—"হাঁ, আগে পাঁচটা জানতে হয়, জগতের বিষয়। একটু ওদিকটায় জ্ঞান না হলে, ঈশ্বর জানবো কেমন করে? আগে পড়াশুনা করে জানতে হয়।" শ্রীরামকৃষ্ণ—"ওই তোমাদের এক। আগে ঈশ্বর, তারপর সৃষ্টি। তাকে লাভ করলে, দরকার হয় তো সবই জানতে পারবে।" ঈশ্বর লাভের পথে সবচেয়ে বড় বাধা এই হতচ্ছাড়া বিজ্ঞান। আর ঠিক এই কারণেই ধর্ম নেতাদের সবচেয়ে প্রিয় বিষয়ও বিজ্ঞান। তারা কথায় কথায় বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেন, অপবিজ্ঞান গুলোকে বিজ্ঞানসম্মত করে তোলেন। জ্যোতিষ বিজ্ঞান, পাঁচালি বিজ্ঞান, শাস্ত্র বিজ্ঞান, সব বিজ্ঞান সম্মত করে তোলেন। আর এ সমস্ত করার মধ্যেই তারা প্রমাণ করেন 'বিজ্ঞান' আসলে দ্বিতীয় সারির নাগরিক। এ শুধু রামকৃষ্ণদেবই নন, পৃথিবীর তাবদ ধর্মনেতা, সবাই। এমনকি তিনি বিজ্ঞান শিক্ষায় যথেষ্ট পণ্ডিত হয়েও বিজ্ঞানকে নিচে নামাতে কুণ্ঠিত হন না। উদাহরণ স্বরূপ শ্রী অরবিন্দের কিছু কথা এখানে তুলে দিচ্ছি। প্রশ্ন ছিল — আত্মোপলব্ধির পথে দেহে সামান্য চেতনাই অবশিষ্ট থাকে, এবং দেহের অন্য বোধগুলি প্রায় নিঃসাড় হয়ে

পড়ে। উত্তরে শ্রী অরবিন্দ বলছেন— 'আলোর ফুলকি-টুলকি এ অবস্থায় খুব দেখা যায়। যোগ সাহিত্যে এসবের অনেক উল্লেখও আছে। তবে, বিজ্ঞানের তরফ থেকে আপত্তি করলেও তাকে গ্রাহ্য করবে না।' ১৯৩১ সালে একথা বলেছেন তিনি। এই একই প্রসঙ্গে পরের বছর তার মতামত আরো মসৃণ। এক বৈজ্ঞানিক বন্ধুকে তিনি জানাচ্ছেন খোলা চোখে, মনের চোখে নানা ছায়া তিনি দেখে চলছেন। যা কিনা দু মিনিটের বেশি স্থায়ী হচ্ছে এবং সম্ভবতঃ পৃথিবীতে যার অস্তিত্বই নেই। বৈজ্ঞানিক বন্ধু মেনে নেন এসব ভব-দর্শনেরই ইঙ্গিত বটে। তখন ঋষি জানিয়ে দেন, প্রকৃত ঘটনা নিয়ে বিজ্ঞানের ব্যাখ্যাকে যদি তার থিওরির ভিতর থেকে টেনে বের করা যায় তখন তা এমনি করেই ভেঙে পড়ে। (নিজের কথা-ঋষি অরবিন্দ, পৃষ্ঠা-৮৮-৮৯)। এই আলোচনার বন্ধুটি বৈজ্ঞানিক হওয়া জরুরি। কবি বা পুরুত হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

প্রশ্ন ধর্ম জগতে গুরুতর পাপ। 'ঈশ্বর সত্য' এই কথা মেনে নিয়ে তবেই প্রশ্ন হতে পারে। যেমন তিনি সাকার না নিরাকার, গরীবের নকুল দানায় তুষ্ট না ধনীর রাজভোগে, পাঁচীর মার বেলপাতায় না বেবিফুডে ময়দা মেশানো কোটিপতির সোনার হারে। এইসব গুরুতর প্রশ্ন চলতে পারে ঈশ্বরকে মেনে নিয়েই। কিন্তু ঈশ্বর নিজেই সত্য কিনা এ প্রশ্ন করা একদম চলবে না। পড়াশুনা শিখলে মানুষের মনে এ প্রশ্ন আসতেও পারে। তাই ধর্ম নেতারা বলে থাকেন, আগে ঈশ্বর লাভ, পরে অন্য কিছু। এই ঈশ্বর লাভের আশাতেই আমার বাপ-ঠাকুরদা মায় চোদ্দ পুরুষের জীবন শেষ হয়েছে। আমাদেরও হবে। আমাদের দেখাদেখি ভবিষ্যৎ প্রজন্ম পতাকা তুলে নেবে। এর কোনো শেষ নেই।

মাস্টারমশাই শ্রীম বলছেন, "ঈশ্বরকে জানার নাম জ্ঞান। নানান খানা জানার নাম অজ্ঞান। ঈশ্বরকে জানার পর দরকার হয় অন্য সব জানা যায়। ঈশ্বরের জ্ঞান ছেড়ে অন্য সব জানা দুঃখ ও অশান্তির কারণ।" কেন মিছিমিছি বই পড়ে খেটে মরব। যা জানার সব তো তিনিই জানাবেন। আর তাকে জানতে গেলে অধ্যয়ন নয়, চাই সাধন। 'অধ্যয়নে তিনি এত মগ্ন ছিলেন যে ঠাকুর তিন বার ডাকা সত্ত্বেও তিনি সাড়া দেন নাই। ঠাকুরের কাছে যাইতেই তিনি শশীকে (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই কি করছিলি?" পাঠে শশীর তন্ময়তার কথা শুনিয়া ঠাকুর বলিলেন, "অপরা বিদ্যা লাভের জন্য যদি তুই ধর্মবিষয়ক কর্তব্য অবহেলা করিস, তোর ভক্তিলাভ হইবে না।" শশী ঠাকুরের উপদেশের গূঢ়ার্থ হৃদগত করিয়া গ্রন্থগুলি গঙ্গাজলে ফেলিয়া দিলেন। তখন হইতে গ্রন্থ পাঠের প্রতি তাহার অনুরাগ কমিয়া গেল এবং তিনি গুরু সেবায় এবং ধর্ম সাধনায় অধিকতর মনোযোগ দিতে লাগিলেন।' (নবযুগের মহাপুরুষ, পৃ-১৩৫)। মাষ্টারমশাই শ্রীম ছাত্রদের উপদেশ দিচ্ছেন, 'একজন ছোকরা ভক্ত বইটই পড়ত। ঠাকুর তাকে বলেছিলেন, আর বইতে কি আছে? যদি পনেরো মিনিট তাকে ডাকিস তাহলে যা হবে তোর, একবছর

বই পড়ে কী তা হবে?' (শ্রীম দর্শন, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ-২৩২)। আবার বলছেন, শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—বিদ্যালাভ এই জন্য করা, এতে প্রকৃত শান্তিলাভ হয় না, এই কথাটা জানতে। তর্কপ্রধান লোকেদের এসব জানা দরকার। তাদের সংশয় যেতে চায় না কিছুতেই। এইটা জেনে, সব বই-টই ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে 'মা-মা' বলে কাঁদা। ঠাকুর কেঁদে কেঁদে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছিলেন। এটা সোজা পথ এ যুগের পক্ষে। তাই ঠাকুর এ পথটা নিয়েছিলেন লোকশিক্ষার জন্য। (শ্রীম দর্শন — দশম ভাগ পৃ-৮০)। এই লোকশিক্ষা আমাদের দেশে অতি প্রবল বলেই শিক্ষা এবং শিক্ষিতের হার'এ আমরা ভীষণ ভীষণ পিছিয়ে। 'অশিক্ষিতের দেশ' এই তকমা আমাদের পিঠে দগদগে ঘায়ের মত শোভা পায়। যদিও ধর্ম শিক্ষায় শিক্ষিতের হার আমাদের প্রায় একশ শতাংশ। গোটা পৃথিবীতে ইসলাম অধ্যুষিত কিছু দেশ ছাড়ি, এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি। স্বামী বিবেকানন্দও বলে গেছেন এ মহামানবের জাত, দেবতার জাত, অমৃতস্য পুত্রাঃ, সব্বাই, ওফ, কি মধুর বচন।

স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ, নরেন্দ্রনাথ এরা প্রত্যেকেই যখন রামকৃষ্ণের কাছে এসেছেন প্রত্যেকেরই অল্প বয়স এবং স্কুল কলেজের ছাত্র। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবে এরা প্রত্যেক্যেই ছাত্রজীবনের উপর দাঁড়ি টেনে দিয়েছেন। '১৮৮৩ বা ৮৪ খৃষ্টাব্দে বাবুরাম (স্বামী প্রেমানন্দ) প্রবেশিকা পরীক্ষা দিলেন। কিন্তু উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না। একথা শুনে ঠাকুর বলিলেন—''ভালই হল। তার বন্ধন ছিন্ন হল। পাস তো নয়, পাশ (বন্ধন)''।' (নবযুগের মহাপুরুষ, পৃ - ৬১)।

ছোট ছোট ছেলেদের দিকেই তার টান বেশি ছিল। বলতেন ''ইহাদিগের মন এখনও স্ত্রী-পুত্র, মান-যশাদির ভিতর ছড়াইয়া পড়ে নাই, উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে ইহারা সহজেই ষোলআনা মন ঈশ্বরে দিতে পারবে।'' গোয়েবেল্‌স থিওরি ব্যবহার করে ঈশ্বরকে মগজে গেঁথে দেবার নামই উপযুক্ত শিক্ষা। সারা পৃথিবী জুড়ে, ঘরে ঘরে এই শিক্ষা যুগ যুগ ধরে চলে আসছে।

এখানে একটা কথা বলার আছে। শুধু রামকৃষ্ণদেবই নন প্রায় সব ধর্মগুরুরই কম বয়সী ছেলেদের প্রতি একটা টান থাকে। কি করে তাদের ঈশ্বর লাভ হয় সে নিয়ে তাদের খুব চিন্তা। কিন্তু ছোট ছোট মেয়েদের কথা তো তারা কখনই বলেন না। মেয়েদের কি ঈশ্বর লাভ করতে নেই?

অক্ষয় সেন খাঁটি সত্যি কথাটি বলে গেছেন—

নিরক্ষর বেশে আসা তাহার কারণ।
বিদ্যার করিতে গর্ব খর্ব বিলক্ষণ।। (রামকৃষ্ণ পুঁথি, পৃষ্ঠা-৩৩৮।

শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে নিরক্ষর ছিলেন। দেশবাসীকেও নিরক্ষর থাকার রাস্তা দেখিয়ে গেছেন। সব সময় বলতেন 'বই পড়ে কি কখনো কেউ ঈশ্বর লাভ করেছে রে। ঈশ্বর

লাভ হয় স্মরণাগতি দ্বারা। তার কাছে আকুল হয়ে কাঁদতে হয়। বলতে হয় আমি শক্তিহীন, ভক্তিহীন, কি করে তোমায় ডাকব জানি না, তুমি নিজে প্রকট হয়ে আমাকে সব জানিয়ে দাও মা।' এই প্রার্থনার কথা তিনি আমাদের শিখিয়েছেন। আর শিখিয়েছেন পড়াশুনা করে কেউ কখনো ভগবান লাভ করে নি। তবে আর কি। ধৈর্য সাপেক্ষ অধ্যবসায় থেকে হরিকীর্ত্তন অনেক সোজা। তাই নিয়েই মেতে থাকি আমরা। জ্ঞানচর্চা করে বড়জোর শুষ্ক তার্কিক হওয়া যায়, তার বেশি নয়। একে বলে চাল কলা বাঁধা বিদ্যা। কেন বই নিয়ে বসতে যাব! স্বয়ং গুরুদেব যেখানে বলে দিয়েছেন ওতে ভগবান নেই। গুরুবাক্য আগে মান্য করতে হবে, পরে বিদ্যাসাগর, তার বর্ণপরিচয়। বলতেন, 'যার যটা পাস, তার তটা পাশ।'

এখানে প্রশ্ন হতে পারে মিশনের দর্শন যদি শিক্ষা বিরোধীই হয় এত এত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সেখানে হলো কেন! বেশ জটিল প্রশ্নই বটে। দেখুন, ভাববাদ দর্শনে কোথাও সেবা বা শিক্ষাকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। তবুও বর্তমান যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে গেলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জরুরি। যদিও আঠারো নম্বর বস্তির প্রায় অনাথ ছেলে মেয়ে গুলিকে শিক্ষিত করে তোলা এর উদ্দেশ্য নয়। সমাজের সেরা ছাত্রকটিকে টেনে নিয়ে তাদের ফার্স্ট সেকেন্ড করানোই উদ্দেশ্য। এতেই লোকের চোখ টানে বেশি। এবার মাধ্যমিকে ফার্স্ট হলে কে, না রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন। ব্যস, সবার ওপরে মিশন সত্য, তাহার উপরে নাই।

রামকৃষ্ণদেবের এক প্রধান শিষ্য স্বামী অভেদানন্দ। ঠাকুর বলতেন বুদ্ধি বিচারে নরেনের পরেই কালীর স্থান। শ্রেফ পড়াশুনা করার অপরাধে এনাকে বরানগর বাগান বাড়ি থেকে মেরে তাড়াবার পরিকল্পনা করেছিলেন ঠাকুরেরই কিছু প্রধান শিষ্য। স্বামী শিবানন্দ, স্বামী নিরঞ্জনানন্দ, শ্রী ম, প্রভৃতি। হয়তো ভেতরে ভেতরে আরও কিছু গন্ডগোল ছিল যা আমরা জানি না। এক বৃষ্টিভেজা রাতে কাঁদতে কাঁদতে কালী মহারাজ মঠ ছেড়ে চলে আসতে বাধ্য হন। স্বামীজী উপায়ান্তর না দেখে তাকে আমেরিকা পাঠিয়ে দেন। দেশে ফিরে মঠে তিনি টিকতে পারবেন না বুঝতে পেরেই দীর্ঘ পঁচিশ বছর তিনি আমেরিকাতেই কাটিয়ে দেন। কিছু টাকা পয়সা নিয়ে দেশে ফিরে বটতলা থানার বিপরীতে শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ গড়ে তোলেন। সেখানেই তার বাকি জীবন কাটে। কখনও বেলুড় মঠে গেলে সেখানকার খাবার খেতে চাইতেন না। ভয় ছিল তাকে 'স্লো-পয়জন' করা হবে। মঠে তার ঘরটিও মিস ম্যাকলাউডকে দিয়ে দেওয়া হয়। শুধুমাত্র অধ্যয়নের প্রতি নিষ্ঠার কারনে স্বামী অভেদানন্দকে একঘরে হতে হয়েছিল। এ দুঃখ তাকে কোন দিন শান্তি দেয়নি। (সম্পূর্ণ বর্ণনাটি একই জায়গা থেকে পাওয়া যাবে না। ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে, একটু খুঁজে নিতে হবে। 'স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের কথা—স্বামী চিৎস্বরূপানন্দ, দ্বিতীয় ভাগ, প্রথম সং-১৩৯৩, পৃষ্ঠা-২৮, ২৯, ৬২, ৭২, ৭৯, ১০৩, ৩০৩, ৩০৯)।

এত এত ধর্ম নেতার মিলিত প্রয়াসের ফল আজকের ভারতবর্ষ। যেখানে কোটি কোটি মানুষ আজকের দিনেও অশিক্ষার অন্ধকারে ডুবে রয়েছে। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি টি.বি. রুগীর সংখ্যা আমাদের দেশে। সবচেয়ে বেশি পঙ্গুর বাস আমাদের দেশে। সবচেয়ে বেশি অন্ধ মানুষ আমাদের দেশে। অসৎ লোকের আনুপাতিক হার সবচেয়ে বেশি কোন দেশে জানেন? এক্ষেত্রেও আমরা আর কয়েকটি দেশের সাথে প্রথম সারিতেই আছি। এদেরও ধার্মিক মানুষের অনুপাত আমাদেরই মত—শতকরা নিরানব্বই থেকে একটু বেশি।

খোল করতাল লয়ে, ভক্তেরা একত্র হয়ে,
প্রাঙ্গণে জুড়িল সংকীর্তন।।
যেমন বাজিল খোল, উচ্চ রোলে হরিবোল,
গোলযোগ প্রভুর অন্তরে।
মত্ত মাতঙ্গের পারা, প্রায় প্রভু বাহ্য হারা,
জুটিলেন দলের ভিতর।। —(রামকৃষ্ণ পুঁথি)

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ শশী মহারাজ, একজনের বাড়ি ঘুরতে গিয়ে বাড়িতে একটাও খোল নেই শুনে বলেন—"যে বাড়িতে খোল থাকে না তা হলো শ্মশানের মতো।" এই খোল কর্তাল নিয়ে নাচন-কোঁদন, কীর্ত্তন যে দেশে যত বেশি, জালিয়াতের সংখ্যাও সেখানে তত বেশি। তুলনাটা হয়তো যুক্তিহীন হলো, কিন্তু ঘটনা যে সত্য, সবাই তা জানেন। হয়তো স্বীকার করে নিতে একটু কষ্ট হবে। কিন্তু সত্য এমনই। প্রথম প্রথম মেনে নিতে কষ্ট হয়, পরে ঠিকও হয়ে যায়। 'পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে' প্রথম প্রথম মানতে অনেকের কষ্ট হয়েছিল। এখন আর কারও কষ্ট হয় না। ওটাই সত্য হয়ে গেছে। ধার্মিকতা যেখানে যত বেশি জালিয়াতিও সেখানে তত বেশি। আজ মানতে পারছি না, পরে মেনে নেব। সম্পর্কটা কাকতালীয় হলেও বাস্তব বলছে 'এটা হলে ওটা হয়।' পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক অধার্মিকের দেশ ডেনমার্ক, নরওয়ে। জালিয়াতিও সেখানেই সবচেয়ে কম। এও এক কাকতালীয় সম্পর্ক।

আমার এক বন্ধু কিছুদিন আগে কর্মসূত্রে ইউরোপের কয়েকটি দেশে গেছিল। ধর্ম বিশ্বাসে সে ঠিক আমার বিপরীত। তার মুখে শুনেছি, সেখানে অনেকের সাথেই পরিচয় হয়েছে যারা কোন্ ধর্মের মানুষ জিজ্ঞাসা করলেই বলে ' নো রিলিজিয়ন'।

করতালি দিলে যেন গাছের তলায়।
উপবিষ্ট শাখিচূড় পাখি উড়ে যায়।।
সেই মত হরিনাম তালি সহকারে।
করিলে পালায় মায়া দেহ বৃক্ষ ছেড়ে।। (রামকৃষ্ণ পুঁথি)।

হরিনাম শুনে তো মায়ার দল দেহ বৃক্ষ ছেড়ে পালাল। তা এই শূন্যস্থান ভরাট করবে কে? মহাবিশ্বে প্রকৃত শূন্যস্থান বলে তো কিছু নেই। সার কেলেঙ্কারী, বফর্স কেলেঙ্কারী, হাওলা, গাওলা, কয়লা আরও কতসব এইরকম আছে, খবর কাগজ খুললে যা রোজই চোখে পড়ে, তারা ওই ফাঁক ভরাট করবে। করেও তাই। ব্রিটেনে মন্ত্রী মহলে একটা কথা উঠেছে, ভারতীয়দের মতো নোংরা ও অসৎ একটা জাতকে ওদেশে থাকতে দেওয়া উচিত কিনা? (এক জাঁদরেল উকিলের কথপোকথন থেকে শোনা)।

তালে তালে বাদ্যরোল উঠে অনিবার।
প্রভুর নৃত্যন তাহে করিয়া হুংকার।।
মদমত্ত করী যেন গায়ে মহা বল।
সঙ্গে সঙ্গে নাচে যত ভকতের দল।। (পুঁথি)

না ঘরের চিন্তা, না দেশের চিন্তা, না পেটের চিন্তা। ভক্তদের নিয়ে বেশ কাটিয়েছেন জীবনটা। আর খোল-কীর্ত্তন, নাচন-কোঁদন, জপ-তপের যে শিক্ষা দেশময় ছড়িয়ে গেছেন তাতে দেশবাসীর পেট ফুলে জয়ঢাক। কাঠি পড়লেই ঢোল হয়ে বাজবে।

ভাব বিভোর কণ্ঠে কথামৃতকার বলছেন, "ভাগ্যিস তিনি এসেছিলেন, তাই এত সাধু, আর এমন সব সাধু দেখা যাচ্ছে। এদেশে সাধু কোথায় ছিল? ঠাকুর এলেন, তাই সব তৈরি হচ্ছে।" শ্রীরামকৃষ্ণ আগমনের সুফল এইটুকুই। বাগান পরিষ্কার আর জনহিত করার মতো কঠিন কাজ করা সন্ন্যাসীর নবোদয়। 'জনহিত' সে ও নিজ হিতেরই জন্য। উদ্দেশ্য গোপন রেখে সেবা, তা কখনও শুভ ফল দেয় না। জনহিতের প্রধান অঙ্গ ধর্মপ্রচার। অনিলা দেবী বলেন, ধর্মপথই সমাজে সবচেয়ে বড় বড় ভুল-ভ্রান্তি প্রবেশের সিংহদুয়ার।

সংসারীজনকে শ্রীরামকৃষ্ণ 'এই এই' আদর্শ শিখিয়ে গেছেন বলে শুনতে পাই। আমি কিন্তু দেখি শুধু 'এ-কুল রাখতে হয়, ও-কুলও রাখতে হয়' গোছের একটা জড়িবুটি মেশানো টনিক তিনি সংসারীর জন্য তৈরি করে রেখেছিলেন। সংসারী লোক তার কাছে গেলেই ছিপি খুলে এক ঢোক মুখে ঢেলে দিতেন। ভক্ত সংসারী জড়িবুটির পাঁচন খেয়ে ঢেকুর তুলতে তুলতে সংসারের কাজে লেগে যেত।

আসলে শ্রীরামকৃষ্ণ ও তার শিষ্যরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন, যে সংসার সাগরে নেমেছে সে ডুবেছে। ভগবান লাভ তার কাছে দূরঅস্ত। মুখে যদিও ভাল ভাল কথাই বলতেন কিন্তু মনেপ্রাণে জানতেন সংসারীর জন্য ভগবানের দরজা বন্ধ। স্বামী সারদানন্দ বলেন —'ঠাকুরকে আমরা ওই কথা প্রসঙ্গে সময় সময় বলিতে শুনিয়াছি যে, "একটা ভেকধারী সাধারণ পেট বৈরাগী ও একজন চরিত্রবান গৃহীর ভিতর তুলনা করিলে পূর্বোক্তকেই বড় বলিতে হয়"।' (লীলাপ্রসঙ্গ, পৃষ্ঠা-৫৯৯)। ভেবে দেখুন একবার, ঘরবাড়ী

ছেড়ে আসা যে গেরুয়াধারীকে তিনি 'ভেকধারী পেট বৈরাগীর' বেশী কিছু ভাবেন না, তাকেও তিনি 'চরিত্রবান গৃহীর' উপরে রাখছেন। গৃহী তবুও বলে ঠাকুর তাদের জন্য অনেক রেখে গেছেন।

স্বামী বিবেকানন্দও বলেছেন 'পর্বত এবং সরষে দানায় যে প্রভেদ, সমুদ্র ও গোষ্পদে যে প্রভেদ, সন্ন্যাসী ও গৃহীতেও সেই প্রভেদ।' এমনকি কোন ভণ্ড সাধুকে গৃহীর থেকে তিনিও এগিয়ে রাখেন। (স্বামীজির সহিত হিমালয়ে — নিবেদিতা, দ্বাদশ সংস্করণ, পৃ - ৮০)। অথবা, 'আদর্শটি খাঁটি হলে একজন ভ্রষ্ট সন্ন্যাসীও গৃহস্থ অপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠ।' (বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, পৃ - ৪০০)। ভ্রষ্ট যে, তার আবার আদর্শ কী! তবুও সে গৃহীর তুলনায় মহৎ। বাবা, মায়ের উদ্দেশ্যে বলছেন—'শিশুদের শেখাও জোনাকি পোকা ও সূর্যের মধ্যে যে তফাৎ, গৃহী ও সন্ন্যাসীর মধ্যেও সেই তফাৎ।' (বাণী ও রচনা, দশম খণ্ড, পৃ - ৩০৫)। তার ধারণায় — সংসারে থেকে ব্রম্মজ্ঞান কথার কথা মাত্র। (স্বামী শিষ্য সংবাদ, পৃ - ৮৯, ৯১)।

শ্রীরামকৃষ্ণ তার সন্ন্যাসী শিষ্যদের গৃহীদের সাথে মেলামেশা আদপেই পছন্দ করতেন না। তা বলে কি তিনি গৃহীদের ঘাড় ধরে তাড়াবেন? তাতো হয় না। একশ জন তার কাছে গেলে সাতানব্বই জনই গৃহী। এদের বিদায় করলে থাকে তিন জন। এই নিয়ে কি সাধুজীবন চলে! তবুও এর মধ্যেই তিনি একটা গোপন ভেদরেখা টেনে চলতেন। অন্য গৃহী ভক্তদের কথা তো ছেড়েই দিলাম, তার বীর ভক্ত গিরিশ ঘোষ, যাকে তিনি সারা জীবনই বিরাট ভক্তের মর্যাদা দিয়েছেন। গোপনে তার কাছ থেকেও তার সন্ন্যাসী শিষ্যদের তফাৎ করিয়ে দিতেন। কারণ গিরিশ সংসারী। 'শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে। নরেন্দ্রকে বারণ করিতেছেন গিরিশ ঘোষের সঙ্গে বেশি মিশিতে। গিরিশ অনন্য স্মরণ ভক্ত হইলেও গৃহস্থ আশ্রমে রহিয়াছেন।' (শ্রীম দর্শন, পঞ্চম ভাগ, প্রথম সংস্করণ, পৃষ্ঠা-১৭৬)। কথামৃতেরই অংশ এটি। আমি শ্রীম দর্শন এখানে ব্যবহার করলাম। তার একটু অন্য কারণও আছে। মাস্টারমশাই এক ভক্তকে দিয়ে কথামৃতের এই অংশটি পড়াচ্ছেন। সংসারী কীট যে কতদূর জঘন্য তার বর্ণনা আছে এখানে। উদ্দেশ্য শান্তি নামে এক যুবক। ডাক্তারি ক্লাসের ছাত্র। বাড়ি থেকে বিয়ের চেষ্টা চলছে। পড়া হলে শ্রীম (শান্তির প্রতি) —"তোমার জন্য পড়া হল। তুমি কি করবে—ফার্স্ট ক্লাস, না সেকেণ্ড ক্লাস?" শান্তি— "মন যে মানেনা।" শ্রীম—"সে কি তোমার ইচ্ছা? গুরু যখন হয়েছে তখন তোমার ইচ্ছা আর নাই।"

শ্রীম একজন স্কুলের হেডমাস্টার, তিনিই একজন ডাক্তারির ছাত্রকে পড়াশুনা করা থেকে কিভাবে নিরুৎসাহিত করছেন। যেখানে চিরকালই আমাদের দেশে ডাক্তারের অভাব, সেখানে শিক্ষাবিদ হয়েও একজন হবু ডাক্তারকে সাধু বানাচ্ছেন। তবে এই যে ডাক্তারী পড়তে বাধা দিচ্ছেন, এ কিন্তু অকারণে নয়। এর পিছনেও গুরুদেবের আদর্শ কাজ

করছে। 'ঠাকুর বলতেন, "উকিল, দালাল ও ডাক্তারের ধর্ম নেই।"—ই ক্ষেতড়ির মহারাজের কাছ থেকে খরচ নিয়ে ব্যারিস্টারী পড়ার জন্য বিলেত গেছেন। স্বামীজী তখন সেখানে। ওকে কিছুতেই উকিল হতে দিলেন না—চিঠি দিয়ে খরচ পাঠান বন্ধ করলেন।' (জীবন্মুক্তি সুখপ্রাপ্তি-প্রকাশক স্বামী সত্যব্রতানন্দ, উদ্বোধন, দ্বিতীয় সং ১৯৮৯ পৃষ্ঠা — ৩২)। এই ছেলেটি অত্যন্ত অভাবী ও মেধাবী। সংসারে মা ভাই ইত্যাদি আছে। ভেবেছিল উকিল হয়ে একটু সুখের মুখ দেখবে। কিন্তু স্বামীজী 'আমাদের (স্বামী তুরীয়ানন্দ) বললেন, "মা ভাই না খেয়ে মরে, সেও স্বীকার। দেখি ঠাকুরের পথে চলতে পারি কিনা।" ঠাকুর বিধান দিয়ে গেছেন উকিল-ডাক্তার ধর্মহীন। অতএব ডাক্তারী পড়ুয়াকে নিরাশ করে সাধু বানিয়ে দাও, অভাবী হবু উকিলের অনুদান বন্ধ করিয়ে, দেখি হতচ্ছাড়া কেমন করে হাইকোর্টের চৌকাঠ মাড়ায়। কু-সংস্কার, অন্ধবিশ্বাস। এই বিশ্বাস নিয়ে ভারত জাগলে জগৎ অন্ধকারে তলিয়ে যাবে। এমন কি স্বামীজী নিজের ভাই মহেন্দ্রনাথকেও ওকালতি পড়তে দেননি।

স্বয়ং মাস্টারমশাইও একবার এই 'গৃহী সন্ন্যাসীর' ফাঁদে পড়েছিলেন। অসুস্থ রামকৃষ্ণদেবের সাথে তখন গৃহী ভক্তদের সাক্ষাৎ প্রায় বন্ধই করে দিয়েছিলেন তার ত্যাগী শিষ্যরা। শ্রীম এসেছিলেন রামকৃষ্ণদেবের সাথে দেখা করতে। (সম্ভবত কাশীপুর উদ্যানে)। কিন্তু তাকে প্রথম দফায় ফিরিয়ে দেওয়া হয়। কারণ তিনি গৃহী। পরে অবশ্য দেখা করতে দেওয়া হয়।

কথামৃতকার শ্রীমকে ভক্তরা গৃহস্থ ঋষি রূপেই দেখেন। স্বয়ং রামকৃষ্ণদেব তেমনই ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ বলেন, 'গৃহস্থ ঋষি-কতকগুলি অর্থহীন কিম্ভূত কিমাকার কথা মাত্র।' (বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, পৃ-৩৯৮)।

আসল কথা হল রামকৃষ্ণদেব এবং তার শিষ্যরা যতটা সম্ভব গৃহীদের এড়িয়ে চলার চেষ্টাই করতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের মৃত্যুর পর দেখতে পাই কাশীপুর বাগানে তার শিষ্যরা নিজেদের মধ্যে নিয়ম করে রেখেছেন গৃহী ভক্তরা মঠে এলে তাদের সাথে বেশীক্ষণ কথা বলা চলবে না, তারা সন্ন্যাসীদের বিছানায় বসবে না। এই রকম অনেক অলিখিত নিয়ম।

শ্রীম তার ভক্তদের উপদেশ দিতে গিয়ে বলছেন 'এরা, মানে সন্ন্যাসীরা, মা-বাবাকে চোখের জলে ভাসিয়ে দিয়েও সিদ্ধ যোগী হবার জন্য মঠে যোগ দিয়েছেন। সংসারীর সাথে এদের তুলনা!' প্রসঙ্গ ধরে একটি কাহিনী বলছি। ভাল লাগতেও পারে—শুকুল মহারাজ, স্বামী আত্মানন্দ, স্বামীজীর এক প্রধান মন্ত্র শিষ্য। দীক্ষার আগে এক জমিদারের সেরেস্তায় হিসাব রক্ষকের কাজ করতেন। বৌকে ফেলে রেখে চলে এলেন রামকৃষ্ণ মিশনে, সন্ন্যাসী হবেন। বৌ জমিদার বাড়ি এসে কান্না-কাটি শুরু করেছে। 'হুজুর আমার

স্বামীকে আনিয়ে দিন।' জমিদারবাবু আর করেন কি, বৌকে সেখানেই থাকতে বলে মঠের ঠিকানায় চিঠি লিখলেন, বিষয় সম্পত্তির প্রসঙ্গ তুলে। পরের অংশ—'পত্র পাইয়া গোবিন্দচন্দ্র (শুকুল মহারাজ) অবিলম্বে জমিদারের বাড়ি গেলেন। কিন্তু জমিদার আর বিষয় সম্পত্তির কথাই উল্লেখ করিলেন না। তিনি যে ঘরে গোবিন্দচন্দ্রের সহিত কথা বলিতেছেন সেই ঘরে ব্রাহ্মণী আসিয়া পতিকে দর্শন ও প্রণাম করিবামাত্র ঊর্ধ্বশ্বাসে সাধু দৌড়িয়া পলাইয়া গেলেন, আর জমিদার বাড়ি ফিরিলেন না। সাধুর নিকট পত্নি ও সংসার অন্ধকার অতল কূপতুল্য বোধ হইল।' (নবযুগের মহাপুরুষ, পৃ - ১৫০)। উনি সাধু হলেন, বৌ-টার কি হল কে জানে।

একবার জ্ঞান মহারাজের ঘরে সংসারী বড় অমূল্য (যাকে শ্রীম অতি সত্ত্ব গুণের ভক্ত বলে চিহ্নিত করেছেন) গায়ের জামা খুলে রাখে। অন্য এক সন্ন্যাসী জামাটি দেখে সেটি বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। ঠাকুরের আদেশ "মুড়ি-মিছরির এক দর যেন না হয়।" শ্রীম বলতে থাকেন "বিবেকানন্দ আমাকে বলেছিলেন, 'অমুক' মশাইয়ের কথা। বলেছিলেন— "এই দেখুন, ইনি এসে আমার বিছানায় শুয়ে পড়েন। শেষে আমি সব ছাড়লুম এই জন্যে।" (শ্রীম দর্শন, দ্বাদশ ভাগ, প্রথম সংস্করণ, পৃষ্ঠা-১৪২-৪৩)। পুরোনো দিনের ভক্ত। সে ভাবছে সব ভাই ভাই বুঝি। বিবেকানন্দ মহারাজ কিন্তু হুঁশিয়ার, সংসারী লোক, এ কি তার বেলেল্লাপনা। মুড়ি-মিছরি এক করে দেবে নাকি? তাই তার অভিযোগ 'শেষে ঘর ছাড়লুম কি এই জন্য নাকি?'

লাটু মহারাজের 'সৎকথা'র ছয় নম্বর উপদেশ—তিনি (রামকৃষ্ণ) জোর করে বলতেন—"বিয়ে করিস নে, বিয়ে না কল্লে একদিন না একদিন ধর্ম বুঝতে পারবি।" (সৎকথা—স্বামী সিদ্ধানন্দ, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫)। বিয়ে মানেই সংসার, সংসার মানেই ধর্ম হানি। ৭৩ পাতায় ১৫নং উপদেশে বলছেন "ব্রহ্মচর্য না থাকলে ভগবান লাভ হয় না।" গৃহী যাই ভাবুন না কেন তাদের পথ ভগবান মুখী নয়। স্বামী বিবেকানন্দ গুরুর পথ ধরেই বলে গেছেন "সংসারীর ব্রহ্মজ্ঞান—বাতুলের চিন্তা মাত্র।" ('স্বামী বিবেকানন্দ'— প্রমথনাথ বসু, দ্বিতীয়ভাগ, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ - ৬৪৯)।

একবার এক ভক্ত সারদামণিকে বলে বসেন, 'এখানে যারা আসছেন কি সন্ন্যাসী, কি গৃহী, সবই তো সমান—কারণ সকলেই মুক্ত হবে?' শুনে সারদামণি আঁতকে ওঠেন, "সে কি! ত্যাগী আর গৃহস্থ কি সমান? ওদের কামনা বাসনা কত কি রয়েছে, আর এরা তার জন্য সব ছেড়ে চলে এসেছে। এদের আর তিনি ভিন্ন কি আছে? সাধুদের সাথে কি ওদের তুলনা হয়?" (শ্রীশ্রী মায়ের কথা, দ্বিতীয় ভাগ, চতুর্থ সংস্করণ, পৃষ্ঠা-২৮-২৯)। সংসারী যাই ভাবুন না কেন, ঈশ্বর লাভ তাদের জন্য নয়। 'এখানে যারা আসে সবাই মুক্ত হবে' ধারণাটাও ঠিক নয়।

এ সবের সাথে ছিল হাঁচি, কাশী, টিকটিকি, বার, তিথি, পাঁজির উপর গভীর বিশ্বাস।

বার তিথি বারবেলা সকল পালন।
কথায় কথায় হয় পাঁজি প্রয়োজন।।
শাস্ত্রের বিরুদ্ধ কর্মে অতিশয় ঘৃণা।
দিবস বিশেষে দ্রব্য খাইবার মানা।। (রামকৃষ্ণ পুঁথি, পৃষ্ঠা-৪৮৮)

কোনদিন কি খাওয়া যাবে, কবে কি খাওয়া নিষেধ, বারবেলা যাত্রা করলে কি তার ফল, এইসব প্রশ্নে আমাদের সমাজ বরাবরই সুশিক্ষিত। রামকৃষ্ণদেব তাকেই আবার মনে করিয়ে দিয়েছেন। যাতে না ভুলে বসি।

একবার সারদাদেবী সেই জয়রামবাটী কামারপুকুর থেকে দক্ষিণেশ্বর এসেছেন। সে যুগে কামারপুকুর থেকে দক্ষিণেশ্বরে আসা ছিল এক ভীষণ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। পায়ে হেঁটে, গরুর গাড়ী চড়ে, কখনো নৌকা করে, ট্রেনে চেপে, এত কাণ্ড করে তবে দক্ষিণেশ্বরে আসতে হত। সারদাদেবী আসার দিন কয়েক আগে জগন্নাথদেবকে ভাবাবেশে জড়িয়ে ধরতে গিয়ে পড়ে গিয়ে রামকৃষ্ণদেবের হাত ভেঙ্গে গেছিল। পরের অংশ 'শ্রীমা সারদাদেবী' থেকে হুবহু তুলে দিলাম—

'কাপড়ের পুঁটুলিটি রাখিয়া প্রণাম করিবা মাত্র ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কবে রওনা হয়েছ?" শ্রীমায়ের উত্তরে ঠাকুর যেই জানিলেন যে, তিনি বৃহস্পতিবারের বারবেলায় বাহির হইয়াছিলেন, অমনি বলিলেন, "এই তুমি বৃহস্পতিবারের বারবেলা রওনা হয়েছ বলে আমার হাত ভেঙেছে। যাও, যাও, যাত্রা বদলে এসো গে।" শ্রীমা সেই দিনই ফিরিতে চাহিলে ঠাকুর বলিলেন "আজ থাক, কাল যেও।" পরদিনই শ্রীমা যাত্রা বদলাইতে দেশে গেলেন।' (স্বামী গম্ভীরানন্দ, সপ্তম সংস্করণ, পৃষ্ঠা-৭৫)।

রামকৃষ্ণদেব এই সব কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে লোক শিক্ষা কিছু দিয়ে যান নি। বরং সেই সব আবর্জনাকেই মানুষের মনে আমূল গেঁথে দিয়ে গেছেন।

কেশব সেনের অসুখ করেছে। রামকৃষ্ণদেব মা কালীর কাছে মানসিক করছেন—

মা কালীরে মানসিক হয় ডাব চিনি।
যদবধি নহে সুস্থ আকুল পরানী।। (পুঁথি, পৃষ্ঠা-৪৩৭)

কোথায় খবর নেবেন কোন্ ডাক্তার দেখাচ্ছ। তার হাতে সুস্থ বোধ করছ না তো অন্য ডাক্তারের কাছে যাও। ওষুধ পত্র ঠিক মতো খাওয়া হচ্ছে কি না। এইসব খবর না নিয়ে আরোগ্য কামনা হচ্ছে কিভাবে না 'ডাব চিনি মানসিক' করে। সহায় সম্বলহীন লোকেরা এসব মানসিক টানসিক করে বটে, সহায় সম্বলযুক্ত হলেই বোঝে ওতে লাভ কিছু হয় না। ভরসা ডাক্তার।

অসুখের সময় শ্যামপুকুরে চলে আসার আগে রামকৃষ্ণদেব সাতদিন বলরাম বাটিতে ছিলেন। একদিন রামলাল দাদা দক্ষিণেশ্বর থেকে তার খাটখানি নিয়ে সেখানে হাজির হলেন। 'তাকে খাট আনতে দেখে ঠাকুর ভারি বিরক্ত হলেন, বললেন " তোরা পাঁজি-পুঁথি দেখে বেরুতে ভুলে গেছিস? এখনই নিয়ে চলে যা। দরকার হলে খবর দিব"।' (লাটু মহারাজের স্মৃতি কথা, পৃ - ২৩৪)। বাড়িতে একটা খাট ঢোকাতে গেলে পাঁজি ঘেঁটে দেখতে হয় আজ দিনটা খাট যোগের পক্ষে শুভ না অশুভ। 'পৌষ মাসে যাত্রা নিষিদ্ধ বলিয়া ঠাকুর অগ্রহায়ণ মাস সম্পূর্ণ হইবার দুই দিন পূর্বে শ্যামপুকুর হইতে কাশীপুর চলিয়া আসিয়াছিলেন।' (লীলাপ্রসঙ্গ, পৃষ্ঠা-৮৫০)। দুই দিন আগে চলে যাব তবু ভাল, অশুভ যোগের খপ্পরে পা দিচ্ছি না।

স্বামী অচলানন্দ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের স্মৃতিকথা লিখতে গিয়ে জানাচ্ছেন 'শ্রীশ্রী ঠাকুর বৃহস্পতিবারের বারবেলা বা অশ্লেষা, মঘা এ সমস্ত খুব মানতেন। সেইজন্য তিনিও (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) এ সমস্ত বিষয় বিশেষভাবে মানিয়া চলিতেন। তিনি বৃহস্পতিবারের বারবেলা বা অশ্লেষা ও মঘা নক্ষত্রে পত্রাদি লেখা, হাট-বাজার করা অথবা কোন নতুন কাজ কিছুতেই করিতেন না বা করিতে দিতেন না।' (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের স্মৃতিমালা, তার পত্র ও রচনা সংগ্রহ, পৃ - ১১৫)।

একবার শ্রীরামকৃষ্ণের এক অদ্ভুত রোগ দেখা দেয়। অসহ্য গাত্রদাহে মাসের পর মাস তিনি ভুগতে থাকেন। এইভাবেই চলছিল। চলছিল নানা চিকিৎসাও। কিন্তু সারছিল না। একদিন ধ্যান করতে বসে তিনি দেখলেন তার শরীর থেকে ভয়ংকর দর্শন পাপ পুরুষ বেরিয়ে গেল। পিছন পিছন সৌম্য দর্শন আর এক পুরুষ বেরিয়ে এসে সেই পাপ পুরুষকে হত্যা করল। রামকৃষ্ণদেবের গাত্রদাহও কমে গেল। তবে পুরোপুরি মনে হয় কমেনি, কারণ শিবানন্দজীর পিতা শ্রী কানাইলাল ঘোষাল মহাশয়কে দেখতে পাচ্ছি রামকৃষ্ণদেবকে তাবিজ কবচ পরাচ্ছেন। এবং সেই তাবিজ কবচ ধারণ করেই শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠছেন। এই যে তাবিজ, কবচ, জল পড়া, তেল পড়ার মতো নিরেট কুসংস্কারগুলো সমাজের বুকে আজও জাঁকিয়ে বসে আছে, এর পিছনেও ধর্মীয় মহাপুরুষদের অবদান কম নয়।

'অভিজাত নব্যগণ কেবলই যে কলিকাতার ভদ্র সমাজে শিষ্টাচার শিক্ষা করিবে, এমত নহে বরং যাহাতে তাহারা অশিক্ষিত জনসাধারণ, তথা নেড়ানেড়ি, বাউল প্রভৃতি বৈষ্ণব সম্প্রদায় সহ মিলিত হইয়া তাহাদের আচরণ দর্শন এবং তাহাদিগের নিকট হইতেও ধর্মভাব শিক্ষা করিতে পারে, এই উদ্দেশ্যে ঠাকুর—তাহাদের অনেককে সঙ্গে লইয়া পাণিহাটির চিঁড়ার মহোৎসব হরিনামের হাটবাজারে গমন করেন।' (লীলামৃত, পৃষ্ঠা-১৭৩)।

যুব সম্প্রদায় যাতে শিষ্টাচার, শিক্ষাদীক্ষা, জ্ঞান বিজ্ঞানের অন্ধকারে ডুবে গিয়ে ধর্ম জগৎ থেকে পিছিয়ে না পড়ে সেদিকে গুরু শিষ্য সকলের সমান মনোযোগ ছিল। গুরু

ডাক দিয়ে গেছেন তার শিষ্যদের, শিষ্য ডাক দিয়ে গেছেন দেশের নবযুবক সম্প্রদায়কে। অগ্নি মন্ত্রে দীক্ষিত, মায়ের নামে বলি প্রদত্ত এই সব যুবকের দল যেন চিড়ের মহোৎসব, নেড়ানেড়ি, বৈষ্ণবদের সাথে মিশে গিয়ে দেশে ধর্মের বন্যা বইয়ে দিতে পারে।

মায়ের নামে বলি প্রদত্ত যুব সমাজকে স্বামী বিবেকানন্দ ডাক দিয়েছিলেন দেশে ধর্মের বন্যা বইয়ে দিতেই, অন্য কোন কারণে নয়। এই প্রসঙ্গে স্বামীজী যা বলতেন মোটামুটি সব জায়গায় তার মূল ভাবটি একই। উদাহরণ হিসাবে একটি এখানে তুলে দিচ্ছি। যার থেকে বোঝা যাবে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত যুবকেরা দেশ জোড়া কি আগুন ছড়াবে।

এক সম্বর্ধনা সভায় স্বামীজী বলেন—"যুব সমাজের উপর এ পর্যন্ত যত দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে তার মধ্যে বাঙ্গালী যুবকদের কর্তব্য ভার সবচেয়ে বড়।" এখানে প্রশ্ন হতে পারে কে বললে স্বামীজীকে যে বাঙ্গালী যুবকদের দায়িত্বই সবচেয়ে বেশী? তিনি কিন্তু অন্য সব জাতের সাথে তুলনা করেই এ কথা বলছেন। বাঙ্গালীরা কথাগুলো 'খেয়েছে' ভালই। সব জাতই মানবে তো?

তারপর বলছেন—"সারা ভারত ভ্রমণ করে আমার এই বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছে যে বাঙলা দেশের তরুণদের ভিতর থেকেই সেই শক্তি আসবে যা ভারতবর্ষকে পুণরায় তার যথাযোগ্য আধ্যাত্মিক মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করবে।" লক্ষ্য করে দেখুন স্বামীজীর জীবনের উদ্দেশ্যটা ঠিক কি। আধ্যাত্মিক মহিমার প্রসার। যুব শক্তি, অগ্নি মন্ত্র, মহাবীরের দল, সব গিয়ে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে সেই আধ্যাত্মিক মহিমা প্রসারে।

তারপর—"বাঙলার তরুণের প্রচণ্ড হৃদয়াবেগ এবং উৎসাহ রয়েছে। তাদের মধ্যে থেকেই উঠবে মহাবীররা—"। তা এই মহাবীরের দল কি করবে, "যারা পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত আমাদের পূর্বপুরুষদের আবিষ্কৃত শাশ্বত আধ্যাত্মিক সত্যরাজি প্রচার করে এবং শিক্ষা দিয়ে বেড়াবে।" (উপরের আলোচনার সূত্র 'অতীতের স্মৃতি'—স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ - ৮৮)।

এই হল মূল কথা। যা যুগ যুগ ধরে আমাদের পেছনে ঠেলছে, অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত যুবকেরা সেই প্রাচীন ধর্মবাণী সারা বিশ্বকে উপহার দেবে। স্বামীজীর যুব সমাজকে ডাকার উদ্দেশ্য এটাই। ধর্ম প্রচার বৈ অন্য কিছু নয়। বলতেন, 'শত শত যুবক চাই, যারা সমাজের উপর মহাবেগে পতিত হয়ে আধ্যাত্ম শক্তি সঞ্চার করবে।' (বাণী ও রচনা, সপ্তম খণ্ড, পৃ - ১৮)। এই আধ্যাত্ম শক্তির আধিক্য হেতুই উন্নত বিশ্ব আমাদের ঘৃণার চোখে দেখে। 'অতিজীবীত ভগবানের দেশ' বলে উপহাস করে। কেনই বা আমাদের ধর্মবাণী তারা শুনতে যাবে কে জানে। তাদের চোখে ভারতবাসি মানে হিদেন। 'হিদেন' কথার মানে মূর্তি পূজার ঘৃণ্য উপাসক। যীশু, বুদ্ধদেব অথবা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতিকৃতি পুজোকে মূর্তি পুজো বলে না। শিব, কালী, দুর্গার অলীক রূপ-পূজাকেই মূর্তি পূজা বলে। আচার্য

প্রফুল্লচন্দ্র রায় বলেছেন, ভারতীয় বিজ্ঞান চর্চার পথে সবচেয়ে বড় বাধা আমাদের হিন্দু শাস্ত্র—বেদ, উপনিষদ।

স্বামীজী চেয়েছিলেন মাত্র কুড়ি জন সিংহ হৃদয় পুরুষ। যারা রাজপথে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলতে পারবে "ঈশ্বর ছাড়া আমরা আর কিছু জানি না।" যদিও এমন পুরুষ সিংহ তিনি এদেশে খুঁজে পাননি। বিদেশে পেয়েছিলেন কিনা বলে যাননি।

আবার বলেছেন—"এমন কি দশ জন লোককেও যদি প্রকৃত আধ্যাত্মিক জীবন দান করতে পারি তবে মনে করব যে, আমার কাজ করা সার্থক হয়েছে।" স্বামীজী শিক্ষা প্রসারক নন, সমাজ সংস্কারকও নন। তিনি ধর্ম প্রচারক। নিবেদিতাকে বলেছিলেন, 'সব সময় জপ করবে শিব! শিব! শিব! ক্লান্ত হয়ে ছেড়ে দিলে চলবে না। সব মন্ত্রের সেরা এ মন্ত্র। পথের যত বাধা এ মন্ত্রের তেজে ছাই হয়ে যাবে।' (নিবেদিতা—লিজেল রেমঁ, পৃ-৪৬৯)। এই শিব মন্ত্র শেখানোই স্বামীজীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ লোকশিক্ষা।

বলতেন, 'পিতৃ পূজাকে বীরপূজায় রূপান্তরিত কর। তারপর মেয়েদের ভগবান সম্বন্ধে যার যেমন কল্পনা সেইমত মূর্তি গড়তে বা ছবি আঁকতে বল, ওদের পূজার্চনা করবার জন্য একটা না একটা কল্পমূর্তি তো তোমায় বাৎলাতেই হবে। শিক্ষার আদর্শ হবে উদার। সকলের শাস্ত্রই শ্রদ্ধেয়,—শুধু হিন্দুর নয়, খৃষ্টান মুসলিম সবারই। কিন্তু পূজানুষ্ঠানে বৈদিক আচারই মানতে হবে—বেদির নীচে থাকবে পূর্ণকুম্ভ আর ধূপ দীপের উপচার।' (নিবেদিতা-লিজেল রেমঁ, পৃ-২৫২)। এই যে শিক্ষা, এ আমাদের বড় প্রিয় শিক্ষা। যুগ যুগ ধরে এ আমরা মাথায় তুলে নিয়েছি। কিন্তু দেশের প্রকৃত অবস্থাটা জানতে গেলে প্রতিদিনের খবর কাগজটাই আয়না। সেখানে ফুটে ওঠে চুরি, চুরি আর চুরি। 'আমরা রামকৃষ্ণ—বিবেকানন্দের শিক্ষা নিতে পারলাম না তাই এই হাল,' এ কথাই বলবে অনেকে। নাঃ দাদা, জার্মান ফরাসীরা রামকষ্ণ বিবেকানন্দের পথে চলে না। ও পথ আমাদের জন্যই সংরক্ষিত। চুরি করো, সমাজে কেউ কেটা হবে। উদ্ধারের জন্য শিব ঠাকুরতো আছেনই। শিব! শিব! শিব!

মূল উদ্ধৃতি থেকে কিছু কিছু অংশ তুলে ধরে জনগণের কাছে স্বামী বিবেকানন্দকে সমাজ সংস্কারক রূপে অপপ্রচার করার একটা চেষ্টা হয়েই থাকে। স্বামীজী কিন্তু সমাজ সংস্কারক নন। ধর্মের সেবা করতেই তিনি এসেছিলেন, সারা জীবন তাই করে গেছেন। পাঁঠাবলি হবে। স্বামী ব্রমানন্দ খুশি নন দেখে স্বামীজী বলছেন, "ওরে, পাঁঠাবলি কিরে, ধর্ম লাভের জন্য নরবলি দিতে হলে তাই দেব।"

ভাঙা তরোয়াল আর ফুটো ঢাল নিয়ে জগৎ জয়ের রাস্তা বাতলেছেন স্বামী অভেদানন্দ। তার রাস্তাটা কি রকম—'ইংরেজরা তোমাদের চাইতেও এগিয়ে যাচ্ছে। সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত তোমরা আগে ছিলে। এখন ওদের নাগাল পাবে না।" মুনি ঋষির ভোজবাজী ছাড়া আর

কিসে যে আমরা ইংরেজদের থেকে এগিয়ে ছিলাম তা অভেদানন্দজীই জানেন। তবে সঙ্গীত, শিল্পকলার মতো বিভাগে আমরা বরাবর শ্রেষ্ঠ বা তার কাছাকাছি স্থান দাবী করতে পারি। অপরদিকে বিজ্ঞান চর্চায় কখনই আমরা তেমন উৎসাহ দেখাইনি। বিজ্ঞান চর্চায় যে জাত এগোয় না, তারা পেছনে হাঁটে।

এরপর তিনি দেখিয়েছেন ওরা কেমন উচ্চাকাঙ্ক্ষী, কেমন উদ্দমশীল। আর আমরা জুতো খাওয়া গোলামের দল। তিনি আমাদেরও উচ্চাকাঙ্ক্ষী হতে বলেছেন। বলেছেন নিজের প্রতি আস্থাবান হও, বিশ্বাসী হও, তবেই জগৎ জয় করতে পারবে। "ভাবতে হবে, আমরা তার অংশ। আমাদের মন তার মনের অংশ। জড়তা ছাড়, বল, আমি তার সন্তান—অনন্ত শক্তিবান। আর পুরানো শাস্ত্রাদির আলোচনা কর। এই বিশ্বাস নিয়ে জগৎ জয় করতে পারবে।" (শ্রীম দর্শন, দ্বিতীয় ভাগ, পৃষ্ঠা-২৮৮)। জগৎ জয় হবে কি ভাবে, না জড়তা ছেড়ে, আত্ম বিশ্বাসী হয়ে, উচ্চাকাঙ্ক্ষী হয়ে, ইত্যাদি। আর এই সব গুণ অর্জন হবে কিভাবে, 'প্রাচীন শাস্ত্রের আলোচনার মধ্যে দিয়ে।' বিদ্যাসাগর যে শাস্ত্রের মূলটাকেই অ-মূলক বলে গেছেন, আমাদের আজকের অবস্থাটাও বিদ্যাসাগরকেই সত্য প্রমাণ করছে।

অভেদানন্দজী দুঃখ প্রকাশ করছেন—"হিন্দুরা ছেলেবেলা থেকে এই অভ্যাস শিক্ষা দিত পূর্বে। ছোট ছেলেকে গায়ত্রী দিয়ে দিল—পাঁচ সাত বছরের শিশু। বসে রোজ তিন বার অভ্যাস করত। এসব ভুলে গেছে এখন, কে করাবে? বাপ জানে না—অভ্যাস ছেড়ে দিয়েছে। স্কুল কলেজেও নাই সেই শিক্ষা। একা বসে তাই পুনরায় অভ্যাস আরম্ভ কর।" (শ্রীম দর্শন, দ্বিতীয় ভাগ, পৃষ্ঠা-২৮৮)। কি দুঃখ অভেদানন্দজীর। বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়ে গুলির শিক্ষা দীক্ষা আর ঠিক মত হচ্ছে না। কোথায় বাবা মায়ের হাত ধরেই প্রথম 'শিক্ষা' শুরু হবে, তা নয়, কম্পিউটার ধরিয়ে দিচ্ছে। নিজেরাও গায়ত্রী মন্ত্র শিখল না, ছেলেমেয়ে গুলোকেও শেখাল না। এ দেশ আর উঠবে?

স্বামী বিবেকানন্দ দেশ জোড়া যুব সমাজকে ব্যায়াম করিয়ে, 'গীতা ছেড়ে ফুটবল' ধরিয়ে শক্তিশালী জাতে পরিণত করছেন। এবার এদের নিয়েই দেশ উদ্ধারে ঝাঁপিয়ে পড়বেন। না, না, সে সব মোটেও নয়। সাধন ভজন করতেও তো শরীরটা সুস্থই চাই। বাত, অম্লশূল, পিত্তশূল নিয়ে কি আর জপতপ জমে! তাই এত ব্যায়াম ফুটবল। এ কথা তিনি বারে বারে উল্লেখও করেছেন। সত্যের অপলাপ ঘটাচ্ছি বলে যদি মনে হয়, কোন খণ্ড অংশ না পড়ে মূল 'আকর' গ্রন্থগুলি পড়ে মিলিয়ে নিন। একটা কথাকে অন্যভাবে ব্যবহার করে তার কদর্থ তৈরি করা যায়। একেই বলে সত্যের অপলাপ। ফলাফল হাজত বাস হতে পারে এ আমার বিলক্ষণ জানা আছে।

এই খেলাধুলা প্রসঙ্গে ঋষি অরবিন্দের একটি মন্তব্য খুব অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ঋষি বলছেন ঃ— 'আর খেলার মাঠ প্রভৃতির ব্যাপারগুলি সম্বন্ধে মা প্রথম থেকেই পরিস্কার করে বলেছেন ওগুলির স্থান কোথায়। মূল কাজকে ছোট করে কিংবা বাদ দিয়ে এই

আনুষঙ্গিক জিনিসকে বড়ো করে তুলবেন, মা এতখানি নির্বোধ নন।' (নিজের কথা— ঋষি অরবিন্দ, পৃষ্ঠা-৪২২)। ঠিকই বলেছেন ঋষি অরবিন্দ। এইসব আনুষঙ্গিক বিষয়কে কোনও ধর্মগুরুই প্রাধান্য দেন না। স্বামী বিবেকানন্দও দেন নি। তবে দেশের ছেলেদের শরীরের হাল হকিকৎ তিনি ভালই জানেন। এই শরীর নিয়ে দিনে পনের ঘণ্টা ধ্যান করার ধকল নিতেই পারবে না এরা। তাই তিনি চাইতেন ছেলেরা আগে শক্তিশালী হয়ে উঠুক। ফুটবল খেলুক। গীতা আপাতত বন্ধই থাক। স্বামী তুরীয়ানন্দ আমাদের এই মতকেই সমর্থন জানিয়ে বলছেন, "স্বামীজী জেনেছিলেন যে, আমাদের দেশে ধর্মের অভাব নেই। একটু খাইয়ে দাইয়ে লোকগুলোকে বাঁচিয়ে রাখতে পারলেই সেই ধর্মভাব আবার ফুটে বেরুবে।" (জীবনমুক্তি সুখপ্রাপ্তি - পৃ - ১৬৪)।

স্বামীজী সম্বন্ধে অজস্র ভুল ধারণার এটি একটি অন্যতম যে তিনি একটি শক্তিশালী জাতের স্বার্থে ফুটবল খেলতে ডাক দিয়েছিলেন। শক্তিশালী জাত দিয়ে তিনি কি করবেন! তিনি কি তাদের দেশ উদ্ধারে নামাবেন? না, দেশ উদ্ধার তার প্রকল্পের মধ্যে পড়ে না। দেশ স্বাধীন করার চেষ্টা যারা করছে করুক। স্বামীজীর শুভেচ্ছা তাদের সাথে নিশ্চয় আছে। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে তিনি তার সাথে জড়িত নন। কেউ মঠে এসব ধারণা বয়ে নিয়ে আসে তাও তিনি চান না। তিনি চাইতেন দেশে রামকৃষ্ণ ভাব ধরাতে। এই ভাব নিয়ে দেশ মেতে উঠুক এই তার আকাঙ্ক্ষা। শত শত যুবক ব্রহ্মচর্য ব্রতে দীক্ষিত হয়ে দেশে ধর্মের প্লাবন ডেকে আনুক। চাই চরিত্র। এমন চরিত্র যারা নির্ভীক হৃদয়ে ঈশ্বর সন্ধানে নিজেদের জীবনপাত করবে। দুর্গা মন্ত্রে, শিব মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে যারা রাজপথে দাঁড়িয়ে গলা ছেড়ে বলতে পারবে 'ঈশ্বর ছাড়া আমরা আর কিছু জানি না।' এই রকম নির্ভীক পুরুষসিংহ হতে গেলে স্বাস্থ্য অতি অবশ্য। গীতা এখন আলমারিতে তোলা থাক। আগে জাতীয় স্তরে স্বাস্থ্যোদ্ধার হোক। তারপর দেরাজ থেকে গীতাটি নামিয়ো। হে ভারতবাসী, ভুলিয়ো না, এই গীতাই তোমার আদর্শ, মরবে যখন ফুটবল তোমার সাথে যাবে না। গীতাই ভরসা। গীতা বুকে নিয়েই ধরাধাম ত্যাগ করে অমৃতলোকের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। তবে এখন কিছুদিন ফুটবলই ভরসা হয়ে থাক। বলতেন "আমি এই পশুত্ব তোদের ভেতর দেখছি বলেই শিক্ষা দিচ্ছি প্রথমে জীবনসংগ্রামে একটু প্রতিযোগিতার চেষ্টা কর। শরীরটাকে শক্ত করতে শেখ্। শরীর জোরালো হলে মন জোরালো হবে। যাদের শরীরে জোর নেই তাদের আত্মসাক্ষাৎকার হওয়া অসম্ভব।" (স্বামী বিবেকানন্দ - জীবন চরিত - প্রমথনাথ বসু, চতুর্থ খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, উদ্বোধন, পৃষ্ঠা-৯০০)। আত্ম বা আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ, এটাই স্বামিজীর জীবনোদ্দেশ্য।

'কলকাতায় প্লেগ ছড়িয়েছে। অজস্র লোক মারা যাচ্ছে। কেউ বা গ্রামে পালিয়ে যাচ্ছে। সেখানেও কলেরা ডেঙ্গুর হাত থেকে নিস্তার নেই। শেষ পর্যন্ত লোক বুঝেছে শ্রীহরির

ইচ্ছা ভিন্ন এই বিপদ থেকে পরিত্রাণ নেই। "সেইজন্য রামকৃষ্ণ প্রবর্তিত নাম-ধর্মের সহজ উপায় সকলেই অবলম্বন করিলেন। পথে শত শত কীর্ত্তনের দল বাহির হইতে লাগিল। ঘর বাড়ি রাজপথ সমস্ত হরিনামে মুখরিত হইয়া উঠিল। হরিনামের শত শত পতাকা চারিদিকে পত পত করিয়া উড়িতে লাগিল। লোকে হরিনামাঙ্কিত নামাবলী ব্যবহার করিতে লাগিল। নামের তাপে কম্পিত হইয়া সেই কাল ব্যাধি অচিরে কলিকাতা নগরী পরিত্যাগ করিয়াছিল"।' (ভক্ত মনমোহন, উদ্বোধন কার্যালয়, পৃষ্ঠা-২৩৬-৩৭)।

হরি নামের তাপে যদি প্লেগ পালিয়ে গিয়ে থাকে তবে শুধু প্লেগ কেন অন্য সব রোগই পালাবে। হাসপাতাল নার্সিংহোমে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরিবর্তে বিশেষজ্ঞ হরিকীর্তনীয়া দিয়ে অষ্টপ্রহর রামকৃষ্ণ প্রবর্তিত নামগানের ব্যবস্থা করলে রুগীও চিকিৎসার খরচের হাত থেকে বাঁচে, ডাক্তারদেরও আর এত খাটাখাটুনি করে পড়াশুনা করতে হয় না। রুগীর পাওনা, নিশ্চিত আরোগ্য। আমরা সত্যিই অন্ধ। এমন সহজ উপায় হাতের সামনে পড়ে, তবু দেখতে পাচ্ছি না।

লাটু মহারাজ—"ভগবান কি সহজে পাওয়া যায়?—কর্ম চাই। লিখলে পড়লে কিছুই হয় না। কর্ম (সাধন) চাই। নিজের অন্তরে অনুভব করতে হয়—পড়াশুনার কর্ম নয়—শুদ্ধ কর্ম (সাধন) চাই।" (সৎকথা, প্রথম খণ্ড, ২৫নং উপদেশ, পৃষ্ঠা-৮৫)। ৯৬ পাতায় ৪৭নং উপদেশের কিছু অংশ —"বই মুখস্থ করে লেকচার দেব, কাগজে লিখব—এইসব পাগলামি ছেড়ে সাধন ভজনে লেগে যাও। ঘন্টার পর ঘন্টা ধ্যান করে কাটিয়ে দাও।"

সাধু সন্ন্যাসীর কাছে কর্ম বলতে শুধুই ভগবানের উদ্দেশ্যে সাধন ভজন। গুরুও বলেছেন সব ছেড়ে 'কর্মে' মেতে যাও, শিষ্যও বলেছেন 'কর্মে' মেতে যাও। এই কর্মটি যে কি কর্ম, একটু তলিয়ে দেখলেই দেখা যাবে সারা দিন সাধন আর রাতভর ভজন, এরই নাম 'করম'।

'যাহা হউক, সকলে আহারাদি করিয়া উঠিলেন, কিন্তু সারদা মহারাজ আহার করিতে আসিলেন না। তারকদা তখন মঠের কর্তা, সকল বিষয়েই তাকে খবর রাখিতে হইত। তিনি বাহিরের ছোট ঘরটির দিকে চলিলেন। আমিও পিছনে পিছনে চলিলাম। অনেক দোর ঠেলাঠেলি করে সারদা মহারাজ দরজাটা খুলিলেন। কিন্তু বল্লেন জপ ছেড়ে তিনি খাবেন না। শেষটা সারদা মহারাজ এই স্থির করলেন যে, তারকদা যদি তার গা স্পর্শ করে থাকেন তাহলে সেটা জপের কাজ হবে। এই হিসাবে তিনি দশ-পনের মিনিটের মধ্যে আহার করিয়া লইবেন। অগত্যা তারকদা সারদা মহারাজের গায়ে হাত দিয়া চলিলেন এবং আহারের সময় গায়ে হাত দিয়া বসিয়া রহিলেন।' (মহাপুরুষ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের অনুধ্যান—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত, পৃষ্ঠা-৫৪)। এমন অদ্ভুত জীবন দর্শন হলে বড়ই মুশকিল।

'একদিন মঠের উপর তলায় গিয়েছি, দেখি যে মহাপুরুষ মহারাজের ঘরে মহাপুরুষ মহারাজ, বাবুরাম মহারাজ, এবং হরি মহারাজ—তিনজন হাততালি দিয়া নৃত্য করিতেছেন।' পরে এক সন্ন্যাসী শিষ্যকে শুনিয়ে বাবুরাম মহারাজ বলছেন—"তাঁর কৃপায় এখানে এসে পড়েছিস, খাওয়া পরার ভাবনা নেই, যত ইচ্ছা ভগবানের চিন্তা করতে পারিস।" (স্বামী প্রেমানন্দ, পৃষ্ঠা-১১২-১৩)। যাদের পেটের জন্য খাটতে হয় না, পেটের জন্য ভাবতেও হয় না, তাদের পক্ষেই এমন হাততালি দিয়ে নাচা সম্ভব।

স্বামী ব্রম্মানন্দ—"এক জায়গায় বসে স্থির হয়ে কিছুকাল তাকে ডাকতে না পারলে কিছু হবার যো নেই। স্বামীজী এমন সুন্দর মঠ করে গেছেন, খাওয়ার-পরার ভাবনা নেই, দুটি দুটি খা আর সাধন ভজন নিয়ে পড়ে থাক।"

'দুটি দুটি খা' মানে ভেবে বসবেন না যেন চারটি ভাত আর ডাল। খাওয়া-দাওয়ার আয়োজনটি বেশ চব্ব-চোষ্যই ছিল। দেওঘর থেকে মিশনের এক সন্ন্যাসী শিক্ষক এসেছেন শ্রীম-র সাথে দেখা করতে। এখন স্কুলের ছুটি, সন্ন্যাসী বেলুড় মঠে থাকবেন কয়েকদিন। নানা কথার পর শ্রীম সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞেস করছেন—"আচ্ছা, খাওয়া দাওয়া কেমন—কবার হয়?" সন্ন্যাসী—"ছেলেরা থাকে কিনা, তাই চারবার। প্রায় ২৫০ জন ছেলে। সকালে জল খাওয়া, দুপুরে ভাত, বিকালে জল খাওয়া, রাতে ভাত রুটি।" শ্রীম—"সকাল বিকালে জল খাবার কি হয়? দিনে রাতে কি খায়?" সন্ন্যাসী—"জল খাওয়া ছেলেরা যেমন ঠিক করে তাই দেয়। কখনো প্রচুর হালুয়া মুড়ি, কখনো দই-চিড়া-কলা, কোনদিন লুচি তরকারি। বিকালের জলযোগও বদল হয়। প্রচুর জল খাওয়া, ফল হয়, পেঁপে প্রচুর হয় বাগানে। দুপুরে সপ্তাহে তিনদিন মাছ মাংস। মাংসই বেশী। ডাল, ভাত, তরি-তরকারি, চাটনি, দই। রাতে ভাত রুটি ডাল তরকারি দুধ। বেশির ভাগ ছেলেই আমিষ ভোজী। নিরামিশও আছে—প্রচুর ছানার ডালনা তাদের জন্য।" (শ্রীম দর্শন, ষোড়শ ভাগ, প্রথম সংস্করণ, পৃষ্ঠা-৬১)।

সারাদিন সাধন ভজনের পরিশ্রম, ঘর, বাগান পরিষ্কার রাখার পরিশ্রম, একটু ভালো মন্দ না হলে চলবে কেন। আরে বাবা, শরীরটাকে রাখতে হবে তো। এই দেখুন না লোকের বাড়ি ধান ঝেড়ে সারদামণির দিন চলত, (শ্রী শ্রী সারদাদেবী—ব্রম্মচারী অক্ষয় চৈতন্য, পৃ - ৩৪) এখন তার ঘরে সন্দেশ রসগোল্লার পাহাড়।

অনেকে এক্ষুনি তেড়ে আসবে, 'জান কি, বরাহনগর কাশীপুরে লঙ্কা সেদ্ধ আর ভাত, এই খেয়ে দিনের পর দিন কেটেছে। সে সব খবর রাখবে না, শুধু আহম্মকের মত সমালোচনা।' আমি বলি কি, যে খেটে রোজগার করবে না, সে খাবে না। তবে এই আধ পেটা খেয়ে দিনকাটানোটা খুব দীর্ঘস্থায়ীও হয়নি। 'বাছিয়া বাছিয়া ভালো জিনিস কিনিয়া আনাতে আলমবাজারের লোকেরা বলিত, "এ সাধুদের জ্বালায় বাজারে

ভালো জিনিস পাইবার উপায় নাই। পাহাড় জঙ্গল ঘুরিয়া ঘুরিয়া বোধহয় ইহারা কোথায় অনেক টাকা পাইয়াছে। তাহা দিয়া সেরা সেরা জিনিস কিনিয়া খায়।" (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের স্মৃতিমালা, তার পত্র ও রচনাসংগ্রহ—সংকলন স্বামী চেতনানন্দ, উদ্বোধন, প্রথম প্রকাশ, পৃষ্ঠা—৬৮)। স্বামী সচ্চিদানন্দের বাখান এটি।

এই যে ভক্ত গৌরী সেনরা 'দুটি দুটি খাবার' ব্যবস্থা করে দিয়েছে, এতেই সবাই খেটে খাবার মানসিকতা হারিয়ে ফেলেছে। স্বামী যোগানন্দ (তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন) ঠাট্টা করে বলতেন, "মঠে না এলে ট্রামের কন্ডাক্টর হতে হত।" (শ্রীম দর্শন, চতুর্থ ভাগ, প্রথম সংস্করণ, পৃষ্ঠা-৮৭)। ট্রামের কন্ডাক্টরও সবাই হতে পারত না। উদাহরণ স্বামী বিবেকানন্দ। পিতার মৃত্যুর পর হন্যে হয়ে অফিসের দরজায় দরজায় ঘুরেও যিনি একটি উপযুক্ত চাকরি জোটাতে পারেন নি।

মঠের এক অতি উৎসাহী সন্ন্যাসী স্বামী শুদ্ধানন্দ (সুধীর মহারাজ)। ফাঁকিবাজ নতুন ব্রহ্মচারীদের উপর চটে গিয়ে স্বামী ব্রহ্মানন্দের কাছে এদের মঠ থেকে তাড়াবার জন্য একদিন দরবার করতে যান। উত্তরে রাখাল মহারাজ উত্তেজিত ভাবে বলিয়া উঠেন—"তুমি কি বলছ সুধীর? তোমাদের কেবল কাজ আর কাজ। এইসব ছেলেরা যার জন্য ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে এসেছে, যার জন্য সর্বস্ব পরিত্যাগ করেছে, তার কতদূর কি হল—তোমরা কি কখনও ওদের তা জিজ্ঞেস কর? কখনও কি খোঁজ নাও, এরা কতটুকু ধ্যান জপ করে? আমি তো দেখেছি এরা প্রায় কেউই কিছু করে না। কেউ বা একটু আরাত্রিকে যায়, আবার কেউ বা তাও যায় না। এই জন্যই তো আমি এদের নিয়ে বসি। কোথায় তোমাদের পূর্ব সাধন ভজনের অভিজ্ঞতা দিয়ে এদের এ বিষয়ে একটু সাহায্য করবে, না, কেবল কাজ আর কাজ।"........."তোমরা কেবল কাজের কথা বল, কিন্তু আমি তো দেখছি এখন আমাদের এমন কয়েকজন সাধুর প্রয়োজন যারা শুধু ধ্যান ভজন নিয়ে থাকবে।" (পুণ্যস্মৃতি—স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ,পৃষ্ঠা-৩৩-৩৪)। নিজেরাও কাজে মাস্টার ডিগ্রী পেয়েছিলেন, শিষ্যরাও যাতে মাস্টার ডিগ্রী পায় সেদিকে তীক্ষ্ণ নজর দিতেন। আর তার দ্বারাই 'বিনা শারীরিক ক্লেশে, সুখে স্বাচ্ছন্দে দিনযাপন হইয়া যাইবে। সকলের উপর সহজে একাধিপত্য স্থাপন করিবার বৈরাগী হওয়া ভিন্ন দ্বিতীয় পন্থা নাই।' (জীবনবৃত্তান্ত, রামচন্দ্র দত্ত, পৃ-১৩৪)।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন 'লেখাপড়া শিখে কোন লাভ নেই। ও দিয়ে ঈশ্বর লাভ হয় না। ঈশ্বর আছেন কি নেই এসব কূট তর্ক একদম নয়।' ওসব থেকে শিষ্যদের সব সময় দূরে থাকার শিক্ষা দিতেন। ঈশ্বর ছাড়া অন্য কোন প্রসঙ্গ তিনি তার ত্রিসীমানায় হতে দিতেন না। একবার নরেন্দ্রনাথ, মহেন্দ্র মাস্টার এবং কয়েকজন কোন প্রসঙ্গে আলোচনা করছিলেন। রামকৃষ্ণদেব একটু খেয়াল করে বুঝলেন আলোচনায় ভগবান নেই। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাদের ধমকে দেন, যেন ঈশ্বর ছাড়া অন্য আলোচনা সেখানে না হয় বলে।

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের কাছে এক ভক্ত এসেছেন। তিনি একটু তর্ক প্রিয়। জন্মান্তরবাদ নিয়ে তিনি মহারাজের সাথে তর্কে প্রবৃত্ত হয়েছেন। তর্ক খানিক এগোনোর পর—'মহারাজ ধীর ভাবে সবই শুনছেন—তার মুখে মৃদু হাসি—বেশ কৌতূহলী দৃষ্টিতে লোকটিকে দেখছেন। পরে একটু গম্ভীর ভাবে বললেন—"এই সব তর্কমর্ক রেখে দিন। এই টুকুন তো মস্তিষ্ক। ভগবান লাভ করতে হলে এ ধরনের বিচার বুদ্ধি একেবারে ছেড়ে দিতে হবে। চাই বিশ্বাস। জ্বলন্ত বিশ্বাস। ওই বিশ্বাস হবার জন্য এক আধটু সৎ তর্ক করতে পারেন, কিন্তু বেশী নয়।" (সৎপ্রসঙ্গে স্বামীবিজ্ঞানানন্দ, পৃষ্ঠা-১৩৬)।

লক্ষ্য করে দেখুন গণ্ডগোলটা ঠিক কোথায়। ভদ্রলোক জন্মান্তর নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। দু-চার কথার পরেই স্বামীজী তাকে থামিয়ে দিচ্ছেন। কেন থামিয়ে দিচ্ছেন, না, জন্মান্তর সত্য কি মিথ্যে এই আলোচনাটাই ধর্মজগতে অবান্তর। জন্মান্তরবাদকে প্রথমে সত্য বলে মেনে নাও। পরে সেই মেনে নেওয়াটাকেই আরও দৃঢ় করার জন্য যৎকিঞ্চিত সৎ আলোচনা। ব্যস, এর বেশী নয়। মোদ্দা কথা, যুক্তি তর্ক দিয়ে কোন কিছু মানামানির মধ্যে গেলে চলবে না। প্রথমেই মেনে নিতে হবে। পরে মানার স্বপক্ষে কিছু আলোচনা। আর এখানেই বর্তমান প্রজন্মের আপত্তি হওয়া উচিৎ। না জেনে বুঝে আগে থেকেই একটা জিনিস বিশ্বাস করে নেব কেন? বিশ্বাসেরও তো একটা যৌক্তিকতা আছে।

এই জন্মান্তরবাদ এবং পূর্ব জন্মের কর্মফল নিয়ে আমার মনে কিছু প্রশ্ন জাগে। আমাদের একটি স্থূল শরীর আছে। রক্ত, মাংস, হাড়গোড় ইত্যাদি। মৃত্যুর পর বিভিন্ন ধর্মমত অনুযায়ী এই শরীরটিকে ধ্বংস করে ফেলা হয়। শাস্ত্র পুরাণ মতে আরও কতকগুলি আছে। যেমন সূক্ষ্ম শরীর, কারণ শরীর ইত্যাদি। সূক্ষ্ম শরীর আমাদের কামনা, বাসনা, শিল্প, সৌন্দর্যবোধ ইত্যাদি ধারণ করে। কারণ শরীরের খাদ্য অধ্যাত্ম।

স্থূল শরীর যখন ধ্বংস হয়েই যাচ্ছে তখন সূক্ষ্ম শরীর, কারণ শরীর কোন্ অবলম্বনের উপর নির্ভর করে থাকবে। মস্তিষ্কের মৃত্যুর সাথে এরাও ধ্বংস হয়েই যাচ্ছে। আমিই নেই তো আমার কামনা বাসনা, আমার আধ্যাত্মিক উন্নতি অবনতি এসব থাকবে কোথায়! নিশ্চয় নিরালম্ব হয়ে শূন্যে ভেসে বেড়াবে না! অতএব স্থূল দেহের সাথেই সূক্ষ্ম দেহ, কারণ দেহ ইত্যাদিরও নাশ ঘটে যাচ্ছে। পড়ে থাকছে আত্মা। পরমাত্মা যদি সমুদ্র হন জীবাত্মা সেই সমুদ্রে ডুবে থাকা ঘটের মধ্যের জল বিশেষ। ঘট ভেঙে গেলেই সব মিলে মিশে একাকার।

আত্মা অজর, অমর, আত্মা বায়ু দ্বারা শুষ্ক হন না, আগুনে দগ্ধ হন না, আত্মা কারোকে হত্যা করেন না, কারও দ্বারা নিহতও হন না, আত্মা পরিণাম শূন্য অর্থাৎ অপরিনামি। জীবের কোন দোষ গুণের দায় আত্মাকে স্পর্শ করে না। আত্মা আমিও নয়, আত্মা তুমিও

নয়। ধরে নিলাম আমার মৃত্যুর পর এই আত্মাই অবশিষ্ট রয়ে গেল। আবার এও ধরে নিলাম এই আত্মাই আরও একটি জীবন সৃষ্টি করল। কিন্তু আত্মা তো আমি নয়, তাহলে আমার পুনর্জন্ম ঘটছে কি ভাবে? আর আত্মা যদি অপরিণামি হন আমার এই জন্মে কৃত কর্মের ফল পর জন্মে কে নিয়ে যাচ্ছে? যাতে দোষ গুণ স্পর্শ করে না সে কি ভাবে আমার কর্মফল পরজন্মে বয়ে নিয়ে যাবে? ভেবে দেখার বিষয়। আবার ভাবতেই যদি বসতে হয় মাথার চুল ছেঁড়া ছাড়া দ্বিতীয় রাস্তাও নেই। ভাগবদগীতার অন্য এক জায়গায় বলা আছে, 'বাতাস যেমন ফুলের গন্ধ বহন করে অন্য ফুলে গমন করে, সেইরূপ জীবাত্মা দেহকে ছেড়ে, জ্ঞান ও মনকে বহন করে অন্য দেহে গমন করে।' একবার বলা হচ্ছে আত্মায় দোষ-গুণ স্পর্শ করে না, আবার বলা হচ্ছে 'জ্ঞান ও মন'কে বহন করে নিয়ে যায়। জ্ঞান ও মন কি দুটো আলাদা কৌটোয় রাখা দ্রব্য বিশেষ! সাঁড়াশি দিয়ে ধরে তাকে এক দেহ থেকে অন্য দেহে নিয়ে চলে গেলাম। তেমন ব্যবস্থা তো পরলোকে নেই। বয়ে নিয়ে যেতে হলে জীবাত্মাকে জ্ঞান ও মনের সাথে জড়িত হতেই হবে। কিন্তু আত্মা তো কোন কিছুতেই জড়িত বা লিপ্ত হন না। এ এক মহা সমস্যা বটে। আমাদের মতো সাধারণ লোকের পক্ষে পরলোক প্রাপ্তির আগে এ সমস্যার সমাধানও অসম্ভব।

"মাকে কায়মনোবাক্যে ডাকতে পারলে ভারী আনন্দ। এতে দাদা কোন সন্দেহ নেই। সন্দেহই তো মহা পাপ।" (সৎপ্রসঙ্গে, পৃষ্ঠা-১২৮)। সন্দেহ জাগে কখন, মনে প্রশ্ন জাগলে। কিন্তু সে তো মহাপাপ। অতএব যুক্তি তর্কের রাস্তা—একদম না।

এক ভক্তকে বিজ্ঞান মহারাজ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় কি ভাবে, উপদেশ দিতে গিয়ে একটি গল্প বলছেন—"একজন গিয়েছিল একটি সাধুর কাছে মোক্ষ লাভের আশায়। খুব শাস্ত্রাদি পড়েছে। সাধুটি তাকে বললেন—আগে চেষ্টা করে যা কিছু শিখেছ সব ভুলে যাও। তারপর এসো। দেখলেন তো? বই পড়া বিদ্যার দ্বারা সেই কাজ হয় না—বস্তু লাভ অসম্ভব। শুধু চাই বিশ্বাস।" (সৎপ্রসঙ্গে, পৃষ্ঠা-১৩৮)।

আমি যদি জেনে ফেলি পৃথিবীটা গোল না চৌকো, তাহলে আমার আর ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হচ্ছে না। আমার সে সব যদি জানাও থাকে ভগবান লাভের পথে সে সব কোনও কাজে আসবে না। অতএব শিক্ষা পথে যাবার দরকারই নেই। আমার যখন দরকার নেই নিশ্চয় আমার ছেলেমেয়েরও দরকার নেই। কারণ তাদেরও তো ব্রহ্মজ্ঞান দরকার। এই মত যদি মানতেই হয় সমাজের পরিণতি কিন্তু ভালো হয় না।

সমাজকে শিক্ষার আলো দেখাচ্ছেন যে স্বামী বিবেকানন্দ তিনি বলে গেছেন—"যে একটা ভূত দেখেছে, সে বই পড়া পন্ডিতের চেয়ে অনেক বড়।" (স্বামীজির কথা—উদ্বোধন, পৃ - ১৬৭)। অথবা "আত্মায় অবিশ্বাসী একজন বৈজ্ঞানিকের থেকে আত্মায় বিশ্বাসী একজন কৃষক কি শ্রেষ্ঠ নন?" (বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ - ২১, ২৪)। এই

সব অবান্তর এবং কুসংস্কারে পরিপূর্ণ শিক্ষা দিয়েও যে দেশের শিক্ষাবিদরা গুরত্ব পেয়ে থাকেন, তাদের শিক্ষা এবং শিক্ষিতের হার তলানিতে গিয়ে ঠেকবেই। চারটি স্কুল তৈরি করে, সেরা ছাত্রকটিকে টেনে নিয়ে, তাদের ফার্স্ট সেকেন্ড করিয়ে নাম কেনা যায় ঠিকই, সমাজকে শিক্ষার আলো দেখানো যায় না। স্বামীজী আরও বলে গেছেন "আসল ধর্মের রাজ্য যেখানে, সেখানে লেখাপড়ার প্রবেশের কোন অধিকার নেই।" (বাণী ও রচনা, দশম খণ্ড, ১ম সংস্করণ, পৃ-২৭৬)। এটিই আসল কথা, মহাপুরুষের বাণী। কে ফার্স্ট হল, আর কে সেকেন্ড হল তাতে আমার কি! ফার্স্ট বয়-রা কি ভগবান দেখে! আমার দরকার ভগবান, পড়াশুনো করে হবেটা কি? বলেছেন, 'গ্রন্থ পাঠে যা না শিখতে পারো, মন্দির তার চেয়ে বেশি শিক্ষা দেবে'। (ভারতে বিবেকানন্দ—স্বামী শুদ্ধানন্দ, পৃ-৩১৮)। 'যদি আমরা লিখতে পড়তে না জানি তো আমরা ধন্য, আমাদের ঈশ্বরের কাছ থেকে তফাৎ করার জিনিস অনেক কমে গেল।' (বাণী ও রচনা, চতুর্থ খণ্ড, পৃ-২১৬)। বলতেন—'বিজ্ঞানবাদ-আত্মা ও ভগবানের আলোকেই লিখতে হবে, নতুবা তা কলুষিত।' (স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি—নিবেদিতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ-৩৩৪)। স্বামীজী সম্পর্কে বাজার চলতি বিখ্যাত বইগুলি পড়ে কিছুই বোঝা যাবে না। আকর গ্রন্থগুলি পড়ে দেখুন, শুধু ধর্ম আর ধর্ম।

আমি যেটা বলতে চাইছি, স্বামীজী সম্পর্কে অজস্র জ্ঞানগর্ভ লেখা আমাদের চারপাশে অনেক ছড়িয়ে রয়েছে। তার মধ্যে বেশ কিছু বিখ্যাত সাহিত্যিকের বিখ্যাত বইও আছে। এই বইগুলি যতই আপনি পড়ুন না কেন, প্রকৃত স্বামীজীকে পাবেন না। লেখক স্বামীজীকে যে চোখে দেখেন সেই ছাপটিই আপনার মনে গেঁথে যাবে। উইলিয়ম সেক্সপীয়র স্বামীজী সম্বন্ধে কি লিখলেন তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ মেজভাই মহেন্দ্রনাথ দত্ত তার দাদা সম্বন্ধে যা লিখলেন সেটাই। সেটাই উৎস। আকর গ্রন্থ। এই আকর গ্রন্থগুলি পড়ে দেখুন স্বামীজী সম্পর্কে অনেক ধারণাই পাল্টে যাবে। স্বামীজীর লেখা প্রবন্ধের সংখ্যা মাত্র চারটি। পরিব্রাজক, ভাববার কথা, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য এবং মদীয় আচার্যদেব। এছাড়াও আমেরিকায় বসে বিশ্বসৃষ্টি, জীবাত্মা বা জীব এবং আত্মা মহাকাশ নামে পৃথক ভাবের তিনটি প্রবন্ধ তিনি লিখেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এগুলি ছাপা হয়েছিল কিনা অথবা বর্তমানে এগুলির কোন অস্তিত্ব আছে কিনা আমার সঠিক জানা নেই। উদ্বোধন থেকে স্বামীজীর নাম দিয়ে কিছু বই প্রকাশ হয় যেমন, আমার ভারত অমর ভারত, বর্তমান ভারত, যুবসমাজের প্রতি, ইত্যাদি। এগুলি কিন্তু স্বামীজীর নিজে হাতে লেখা বই একটিও নয়। তার বিভিন্ন ভাষণ এবং বিভিন্ন আকর গ্রন্থ থেকে টুকরো টুকরো মুখোরোচক কিছু কথা তুলে এনে এই বইগুলি সাজানো হয়। এগুলিতে 'ওঠো, জাগো', 'মায়ের নামে বলি প্রদত্ত', এসব খুব পাবেন। কিন্তু ঘুম থেকে জেগে উঠে হঠাৎ বলি প্রদত্ত হতে হবে কেন জানতে গেলে ওই আকর গ্রন্থগুলিই পড়তে হবে।

এই গ্রন্থটির শেষে এই গ্রন্থে ব্যবহৃত তথ্যাবলির একটি গ্রন্থতালিকা দেওয়া আছে। সেখানে যে বইগুলির নাম দেওয়া আছে তার প্রায় সবকটিই প্রামাণ্য এবং আকর গ্রন্থ। স্বামীজী সম্পর্কিত কয়েকটি বই সেখান থেকে বেছে নিয়ে পড়ে ফেলুন। তারপর আমি ঠিক বলছি না ভুল বলছি বিচার করার দায়িত্ব আপনার।

স্বামী তুরীয়ানন্দ—'কেন হবে না? নিশ্চয়ই হবে। না হবে তো এসেছ কেন? কেঁদে কেটে তাকে অস্থির করবে। মাথা খুঁড়ে মাথা ফাটিয়ে ফেলবে। তাকে বলবে, তুমি ভিতর দেখ, যদি কিছু থাকে। এই বলতে পারা কি কম?' আবার বলছেন—'তাকে ডাকা তো একটা কাজ। ডেকে ডেকে তাকে অস্থির করে ফেল। ছেলে যখন একটু একটু কাঁদে, তখন মা আসে না। যখন চিৎকার করে কাঁদতে থাকে, কিছুতেই থামে না তখন মা এসে কোলে নেয়।' (জীবন্মুক্তিসুখপ্রাপ্তি - পৃ ৬০, ৭২)। ধরা যাক চিৎকার করে কেঁদে, মাথা ফাটিয়ে ভগবানকে যারপরনাই অস্থির করে তুললাম। তিনি হয়তো গৃহযুদ্ধ থামাতে সোমালিয়া যাবেন ঠিক করছিলেন। হল না। প্রোগ্রাম ক্যান্সেল করে আমার পাশে এসে বসলেন। অ্যাঁ, এবার কি হবে....?

'বীজমন্ত্রের শক্তি সম্বন্ধে প্রশ্ন শুনে মহারাজ গম্ভীর ভাবে বললেন—"বীজমন্ত্রের শক্তি অমোঘ। হ্রীং, শ্রীং, ক্রীং প্রভৃতি বীজের সত্যিই বিশেষ শক্তি আছে।" (সৎপ্রসঙ্গ, পৃষ্ঠা-১৫৮)।

এই হ্রীং-ক্রীং-এর শক্তিটা ঠিক কি রকম জানবার একবার খুব ইচ্ছে হয়েছিল। বেদান্ত মঠের লাইব্রেরীয়ান মহারাজ এ ব্যাপারে উৎসাহও জুগিয়েছিলেন খুব। কিন্তু তার কাছ থেকেই জানতে পারলাম, দীক্ষার সময় গুরুকে বিশেষ কিছু নয় এই একটা ধুতি, একটা চাদর, কিঞ্চিৎ দক্ষিণা আর যৎকিঞ্চিৎ ফুল ফল মিষ্টান্ন, সব মিলিয়ে শ-পাঁচেক টাকার মধ্যেই হয়ে যাবে। কিন্তু এভাবে পয়সা খরচ করার পক্ষে আমি নেই। হ্রীং ক্রীং-র শক্তি অজানাই রয়ে গেল।

বড় জিতেন (এক ভক্ত) কথা প্রসঙ্গে বই পড়ার কথা উত্থাপন করিলেন। উত্তরে শ্রীম—"বইতে কি আছে? বই পড়ে কি হবে? কেউ কেউ গুচ্ছের বই পড়ে ভাবে খুব হয়েছে। ওতে কি আছে? কিছু নেই। তাকে চিন্তা করলে সব আসে।" (শ্রীম দর্শন, একাদশ ভাগ, প্রথম প্রকাশ, পৃষ্ঠা-১১৩)। স্বয়ং মাস্টারমশাই যখন বলছেন বই পড়ে কিচ্ছুটি হবার নয় তবে আর বৃথা বই এর ঝামেলায় জড়াই কেন! এর থেকে হরিকীর্ত্তন অনেক সহজ। তাতেই সব মিলবে।

স্বামী অভেদানন্দজী ভাষণ দিয়েছেন—'কাজ না করলে কিচ্ছু হয় না। অল্প পড়, অভ্যাস কর বেশী। যা পড়লে বা জানলে ধর্ম সম্বন্ধে, সেইটা জীবনে পালন করতে চেষ্টা কর। সরল জীবনযাত্রা আর উচ্চ চিন্তা, এই চাই। পুঁথিগত বিদ্যায় কিছু হয় না। কাজে লাগ, তোমরা খুব বড় হতে পারবে। "পুঁথিগত বিদ্যা যেন ধোপার কারখানা—নিজের কিছু নাই, সব পরের" পরমহংসদেব এই কথা বলতেন।' (শ্রীম দর্শন, দ্বিতীয় ভাগ, পৃষ্ঠা-২৮৪)। এ সব শুনেও আর বই পড়ার ধৈর্য থাকবে?

স্বামী শিবানন্দ তার এক শিষ্যকে চিঠিতে উপদেশ দিচ্ছেন। তার একটু পড়াশুনা করার ইচ্ছে ছিল। মঠে থেকেই সে একটু পড়াশুনা করবে ভেবেছিল। শিবানন্দজী তাকে

লিখছেন—"ঠাকুরের কাজের জন্য ওখানকার আশ্রমে রহিয়াছ। অধিক লেখাপড়ার কোন দরকার নাই, যা জান তাহাতেই ঠাকুরের কাজ খুব চলিয়া যাইবে।" (মহাপুরুষজীর পত্রাবলী, উদ্বোধন কার্যালয়, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা-২৬৭, পত্র সংখ্যা ১৮৩)। এর পরেও কি আর সেই ছেলেটি লেখাপড়া করেছিল? মনে হয় না।

আর এক ভক্ত মাদ্রাজ মঠে এসে রয়েছে। শরীর মন বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। শিবানন্দজী খুব খুশি। লিখছেন—'ভক্তদের অধিক বিদ্যাবুদ্ধির দরকার হয় না। ঠিক ঠিক বিবেক বৈরাগ্য থাকিলেই তাহার সবই রহিল। ঠাকুর বলতেন,—"নিজেকে মারতে হলে একটা নরুনই যথেষ্ট, অপরকে মারতে হলে ঢাল তলোয়ার দরকার।" তদ্রূপ নিজের মুক্তি সাধনের জন্য অধিক বিদ্যাবুদ্ধির প্রয়োজন হয় না। এক নামেতেই সব হইয়া যায়।' (মহাপুরুষজীর পত্রাবলী, পৃ - ১৫৭, পত্র সংখ্যা ১০৫)। তবে, এক নামেতেই যখন সর্বসিদ্ধি তখন আর ঢাল তলোয়ার নিয়ে পড়তে বসার দরকারটা কি!

একটি ছেলে মঠে যোগ দিতে চায়। স্বামী শিবানন্দের কাছে সেই আবেদন জানাতেই তিনি বললেন—"যে দিন ইচ্ছা, কালই আসতে পার।" পরে একটু মাথা নাড়িয়ে স্মিত হাস্যে বলিলেন "তবে মঘা, অশ্লেষা ও বৃহস্পতিবারের বারবেলা বেছে এসো। শ্রী শ্রী ঠাকুর এসব মানতেন, জান তো?" (পুণ্য স্মৃতি, স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ, পৃষ্ঠা-৪২)। ঘটনা এখানেই শেষ নয়। এই ছেলেটি কলেজে পড়ছে। তার ইচ্ছে পরীক্ষা দিয়ে পাশ করে মঠে পুরোদস্তুর যোগ দেয়। একদিন শিবানন্দজী তার সম্বন্ধে কিছু জানতে চাওয়ায় ছেলেটি বলে—'আমি বলিলাম—"মহারাজ, পরীক্ষা দিয়ে সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে আপনাদের সঙ্গে যোগ দেব—একথা মাঝে মাঝে মনে উঠেছে। আবার এখানে থাকতেও খুব ভালো লাগছে।" শুনিয়া তিনি বলিলেন, "দেখ, তাহলে পরীক্ষাই দাও, জান তো শ্রী শ্রী ঠাকুর বলতেন যে, গুবরে পোকা তার মুখে একটু গোবর লাগিয়ে নানা দিকে ঘুরে বেড়ায়। কত সুগন্ধি ফুলের বাগানের ভিতর দিয়ে হয়তো যাচ্ছে, কিন্তু ওই গোবরটুকুর জন্য অন্য কোন গন্ধই পায় না। তোমারও ওই রূপ বাসনা থাকলে তা আগে পূরণ করে এসো। পরে না হয় সাধু হবে।" কিন্তু আমি পরের দিনই তাহাকে বলিলাম, "না, মহারাজ, আমার সে বাসনা গিয়াছে, দয়া করিয়া আপনাদের আশ্রমেই আমাকে রাখুন।" (পুণ্যস্মৃতি, পৃষ্ঠা-৪৩)। আগের ছেলেটির ক্ষেত্রে জানা যায় নি সে আর পড়াশুনা চালিয়েছিল কি না। এখানে কিন্তু দেখা যাচ্ছে বইয়ের পাঠ উঠে গেছে।

'সকালে ও সন্ধ্যায় দীর্ঘ দু ঘন্টা তিনি মঠের পুরাতন মন্দিরের ভিতর ধ্যান করিতেন। আমরাও বাহিরের বারান্দায় বসিয়া ধ্যান করিবার চেষ্টা করিতাম, আমাদের ঐ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকেও তিনি বড় করিয়া আমাদের সামনে ধরিতেন এবং আমাদের ঐ ভাবে চেষ্টা করিতে দেখিলেই "লাগো, উঠে পড়ে লাগো" বলিয়া কখনও কখনও আমাদের উৎসাহ দিতেন।' (পুণ্যস্মৃতি, পৃষ্ঠা-৪৪)।

এই 'ওঠো, জাগো, উঠে পড়ে লাগো,' এই ধরণের উত্তেজক কথা রামকৃষ্ণদেব ও তার শিষ্যরা খুব ব্যবহার করতেন। ওইটুকখানি শুনলে মনে হয় যেন কি না কি দেশ উদ্ধারকল্পে দেশবাসীকে মন্ত্র দেওয়া হচ্ছে বুঝি! আসলে সেসব কিছু নয়। ধ্যান ভজনের তোড় বাড়ানোর জন্যই এত তোড়জোড়। শ্রীরামকৃষ্ণ এক ভক্তকে বলছেন—"তুমি এরকম করে ঢিমে তেতালা বাজালে চলবে না। তীব্র বৈরাগ্য দরকার। ১৪ মাসে বছর করলে কি হয়? তোমার ভিতরে যেন জোর নাই। চিড়ের ফলার। উঠে পড়ে লাগো। কোমর বাঁধো।" (কথামৃত)। সবই সাধন ভজনের তোড়জোড়।

"স্ট্রাগল, স্ট্রাগল, স্ট্রাগল—প্রতি মুহূর্তে স্ট্রাগল করতে হবে।" 'মহারাজ—"হতাশা প্রশ্রয় দেবেন না। নিজেকে হতাশ হতে দেবেন না।....খুব উদ্যমের সহিত লেগে যান, কিছুতেই ছাড়বেন না। মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।"

এত যে মহাকাণ্ড সব ওই মুক্তি লাভের জন্যই। ভগবান যদি সত্যিই থাকতেন তিনি আমাদের কাণ্ড দেখে নিশ্চিত হেসে ফুটিফাটা হতেন। আর আমরা ভাবি 'স্ট্রাগল, স্ট্রাগল, ওঠো জাগো, মন্ত্রের সাধন, শরীর পাতন,' ওরে বাবারে। কি না কি সমাজ সংস্কার, শিক্ষা সংস্কার, স্বাধীনতা সংগ্রাম চলছে বুঝি। আসলে সেসব কিছু নয়। উদ্দেশ্য মোক্ষ লাভ।

টাকা পয়সা, যশ খ্যাতি, এসবের দিকে কেউ নেই ঠিকই, কিন্তু এক রূপকথার পক্ষীরাজের পিছনে সবাই ছুটে চলেছে। শুধু নিজে ছুটলে কারও কিছু বলার ছিল না, ছুটিয়ে দিয়েছে গোটা দেশটাকেই। ছুটন্ত বস্তুর লাগাম না টানলে সে তো অনন্তকাল ছুটতেই থাকবে। আমাদের বোঝার সময় হয়েছে এ রূপকথার ঘোড়া। এর ডানা আছে, হাজার ছুটেও এ ঘোড়ার নাগাল পাওয়া যাবে না।

স্বামী ব্রহ্মানন্দের সখ—"ছেলেরা সব সাধন ভজন করবে, আমি দেখে আনন্দ করব।" সবাইকে সাবধান করে বলতেন—"বাজে গল্পটল্প না করে সারাদিন তার স্মরণ মনন করবি। খেতে, শুতে, বসতে সর্বক্ষণ।" বলতেন—"সময় আর কখন হবে? জীবনের বেস্ট পার্ট চলে যাচ্ছে—ষোল থেকে ত্রিশ বৎসর। এই সময়টা গোলমালে কাটিয়ে দিয়ে বুড়ো বয়সে ধর্ম করবি মনে করেছিস? নিজেকে ফাঁকি দেওয়া, নিজেকে ঠকানো একেই বলে।"

ব্রহ্মানন্দজীও ডাক দিয়েছেন যুব সম্প্রদায়কে। জীবনের বেস্ট পার্ট ষোল থেকে তিরিশ, এই সময়টা বাজে গল্পগুজব না করে, ঘন্টার পর ঘন্টা ভগবানের স্মরণ মনন নিয়ে কাটিয়ে দাও। বুড়ো বয়সে ধর্ম করা মানে নিজেকে ঠকানো। জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় যেটা, যে সময় টুকুর উপর একটা মানুষের সারাটা জীবনের উন্নতি অবনতি নির্ভর করে, সেই সময়টাই ধ্যান জপ নিয়ে কাটিয়ে দাও। ভবিষ্যৎ একদম ফর্সা। বাকি জীবনটা 'সেবাই পরম ধর্ম', পরিশেষে মোক্ষ।

"তোরা ধ্যান জপ করিস যেন ভাসা ভাসা। ও কি দু এক ঘন্টা জপ ধ্যানের কর্ম রে! দিনরাত চব্বিশ ঘন্টা তার ভাব নিয়ে পড়ে থাকতে পারলে তবে হবে। এই তোদের সময়। ওরে, ডুবে যা, ডুবে যা, আর সময় নষ্ট করিস নে।" মহাপুরুষ স্বামীজীরা না এলে আমরা এ পথের সন্ধান পেতামই না।

স্বামী ব্রহ্মানন্দের এক তরুণ শিষ্য স্বামী উমানন্দ। দীর্ঘদিন ধরে স্বামী ব্রহ্মানন্দের সেবা করে চলেছেন। কিছুদিন হলো জটিল বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। শশী মহারাজ প্রতিদিন তাকে হাসপাতালে গিয়ে দেখে আসতেন। অবস্থা ক্রমশ সঙ্গীন হতে থাকে। উমানন্দ তার শেষ ইচ্ছা শশী মহারাজকে জানান তিনি একবারটি স্বামী ব্রহ্মানন্দকে দেখতে চান। বললেন, তাকে হাসপাতালে ঢুকতে হবে না, তিনি গাড়িতে নিচেই থাকবেন উমানন্দ শুধু বারান্দা থেকে শেষ বারের মতো তাকে একটিবার দেখবেন। শশী মহারাজের কাছে শিষ্যের অনুরোধ শুনে স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলেন, "বল কি শশী? কত রকম রোগী সেখানে — আমার অসুখ হবে না!" একই অনুরোধ শিষ্য আবারও বলে পাঠান। মহারাজেরও উত্তর একই। তার যদি অসুখ হয়ে যায়! কয়েকদিন পর ছেলেটি মারা যায়। শশী মহারাজ আবেগভরে বলেন—"তুমি কি নিষ্ঠুর মহারাজ। উমানন্দ এখানকারই ছেলে। অন্তিমকালে একটিবার দেখতে চাইল, আর তুমি দেখা দিলে না?" রাজা মহারাজ বলেন—"শশী, চোখের দেখাটাই কি সব? আমি কি তার কাছে যাই নি?" (স্বামী ব্রহ্মানন্দের স্মৃতিকথা—সম্পাদক স্বামী চেতনানন্দ, উদ্বোধন, ২য় পুনর্মুদ্রন, পৃষ্ঠা—৬৯-৭০)। অর্থাৎ, মহারাজ সূক্ষ শরীরে শিষ্যকে দেখে এসেছিলেন।

বাঙ্গালোর মঠে দুর্গাপুজো হচ্ছে না। সাধুদের মন খারাপ। ব্রম্মানন্দজী সবাইকে তাতিয়ে দিচ্ছেন—"তোরা যদি এই তিনদিনে প্রত্যেকে এক লাখ করে দুর্গা নাম জপ করিস, দুর্গাপূজোর ফল পাবি।" (ব্রম্মানন্দ লীলাকথা—ব্রম্মচারী অক্ষয়চৈতন্য, পৃষ্ঠা-৬৮)। ব্যস, সাধুরাও উত্তেজিত। কাজ কর্মের ফাঁকে ফাঁকে চলতে লাগল অগ্নি মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে দুর্গানাম জপ। মাত্র এক লাখে কি আর মা দুর্গা রেহাই পাবেন! লাখ লাখ হলে মন্দ কি। জপ যত বেশি হবে, জপের ফল তত বেশি ফলপ্রদ হবে।

'মহারাজ কোথা হইতে একটি কাঁকড়ার ছবি যোগাড় করিয়াছেন, আমার হাতে দিয়া বলিলেন, "গঙ্গাধর মহারাজকে দিয়ে আয়।" কাঁকড়া ভীষণ অযাত্রা, গঙ্গাধর মহারাজ সেদিন ঘর হইতে বাহির হইলেন না।' (ব্রম্মানন্দ লীলাকথা— পৃষ্ঠা-১৮৭)। গঙ্গাধর মহারাজ, স্বামী অখন্ডানন্দ শুধুই যে একজন সন্ন্যাসী ছিলেন তা নয়। তিনি ছিলেন এক দৈব পুরুষ। স্বামী জগদ্বীশ্বরানন্দের একটি বর্ণনায় এই দৈব রূপটি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। 'মধ্য রাত্রে হাওয়া করিতে করিতে এক সেবক দেখিলেন, জানলার মধ্য দিয়া স্বামী অখন্ডানন্দের ঘরে ও বিছানায় জ্যোৎস্না পড়িয়াছে। দুটি সুকুমার শিশু আলোক স্রোতে

ভাসিয়া আসিয়া তাহার গায়ে হাসিতে হাসিতে লুটোপুটি খাইতেছে ও আনন্দ করিতেছে। তাহাদের মাথায় দেবশিশুর মতো সোনালী চুল। সেবক ভয়ে বিকট চিৎকার করিয়া উঠিলেন। চিৎকারে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল এবং সব শুনিয়া বলিলেন, "এরা বালভৈরব, এরা আমার সঙ্গে খেলা করতে আসে। তোরা ভয় করিস কেন? এরা তোদের কোনো অনিষ্ট করবে না"।' (নবযুগের মহাপুরুষ, পৃ - ৮৯)। এহেন দৈব পুরুষও কাঁকড়ার কুসংস্কারে সারাদিন ঘরবন্দি হয়ে থাকেন।

'একদিন বিকালবেলা রাখাল মহারাজ সেবাশ্রমের মাঠে বসিয়া আছেন, আর আমি তাহার গায়ে মাথায় হাত বুলাইতেছি। জিজ্ঞাসা করিলেন, "শালিক পাখীর বুলি জানিস?" আমি বলিলাম "না"। তিনি কহিলেন "বল—রি রি রি, কট কট কট, পাপিচ পাপিচ, কিষ্ট কিশোর, কিষ্ট কিশোর, ডুগ ডুগা ডুগ.....।" কিভাবে বুলি আওড়াইতে হইবে, 'প্লীং প্লাই' বলার সঙ্গে সঙ্গে কিরূপ ভঙ্গি করিয়া সরিয়া পড়িতে হইবে, কয়েকদিন ধরিয়া এইসব শিখাইলেন। তারপরে যখন তখন আবৃত্তি করিতে বলিয়া আশ্রমবাসীদের সমক্ষে অভিনয়ে অভ্যস্ত করিয়া তুলিলেন।' (ব্রহ্মানন্দ লীলাকথা— পৃষ্ঠা-১৯০)। কি সুখের লীলাবাসরেই দিন কাটিয়েছেন।

শ্রীম বলেছেন এইসব মহাপুরুষরা যেন খাপ খোলা তরোয়াল। এদের জীবনযাত্রা নিয়ে বলেছেন—"কি life এদের, যেন সৈন্য যুদ্ধ ক্ষেত্রে। চব্বিশ ঘন্টা তার চিন্তা করছেন। দেহের দিকে লক্ষ্য নাই, কিসে তাকে লাভ হয় সেই চেষ্টা। কখনও সেবা করছেন, কখনও ব্রত উপবাস, কখনও মন্দিরে যাচ্ছেন, কখনও জপ ধ্যান—যে যা বলছে তাই করছেন। সংসারের লোক অর্থের জন্য করছে। এরা তাকে পাবার জন্য এসব করছেন। তাই তো এদের দেখে এত উদ্দীপন—যেন খাপ খোলা তরোয়াল সব। উঠে পড়ে লেগেছেন—মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।" (শ্রীম দর্শন, পঞ্চম ভাগ, প্রথম সংস্করণ, পৃষ্ঠা-১০)।

এই সব খাপ খোলা তরোয়ালের যদি ঈশ্বর লাভ ঘটেই যায় তাতে আপনার কি, আমার কি, গোটা দেশের কি? যে সারা জীবন নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত তার সম্বন্ধে আমাদের জানার দরকারটা কি! আবার এইসব খাপখোলা তরোয়াল দিয়েই 'ভগবান লাভের জন্য মানুষ বলি দিতেও স্বামীজি রাজী ছিলেন।'

আর একদিন শ্রীম জনৈক ভক্তের প্রতি রামকৃষ্ণের একটি কথার ব্যাখ্যা শোনাচ্ছেন— 'একদিন একজন জিজ্ঞেস করলেন, "মশায়, আশ্চর্য কি সব চাইতে?" ঝট করে ঠাকুর উত্তর করলেন—"সাধুর জীবন।" সকলে চলেছে এক পথে—মনুষ্য, দেবতা, গন্ধর্ব, পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ, বৃক্ষলতা পর্যন্ত—কিন্তু সাধু চলেছে অন্য পথে, ঠিক উল্টো পথে—উজান পথে। সর্বত্র স্ত্রী পুরুষের মিলন—কিন্তু সাধু চলেছে একলা। একলা না হলে তাকে পাওয়া যায় না।' (শ্রীম দর্শন, পঞ্চম ভাগ, প্রথম সংস্করণ, পৃষ্ঠা-৭৪)। আসুন সবাই উজান

পথে এগিয়ে চলার ব্রত নিয়ে বেরিয়ে পরি। পাল খাটিয়ে নিলে দাঁড় টানার ঝক্কি নেই।

গাছ থেকে আপেল পড়া, সোনার মুকুট জলে ডোবার পক্ষে বিপক্ষে বেদ উপনিষদ গীতায় তেমন কিছু বলা নেই। সমালোচনার হাত থেকে বেঁচে গেছেন বহু বৈজ্ঞানিক। কিন্তু বেদ উপনিষদে উল্লেখ আছে এমন কোন বিষয়, যা কিনা আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে মিলছে না, তা কিন্তু সমালোচনার হাত থেকে রেহাই পায়নি।

মানুষের উদ্ভব সম্বন্ধে শাস্ত্রে যা বলা আছে ডারউইনিসিম এর সাথে তার কোন মিল নেই। ডারউইন কিন্তু বিশ্বজোড়া ধর্মনেতাদের হাত থেকে নিস্তার পান নি। এক প্রশ্নকারীকে স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন—"ডারউইনের কথা সঙ্গত হইলেও evolution এর কারণ সম্বন্ধে উহা যে চূড়ান্ত মীমাংসা একথা আমি স্বীকার করিতে পারি না।" "সাংখ্য দর্শনে ঐ বিষয়ে সুন্দর আলোচিত হইয়াছে। ভারতের প্রাচীন দার্শনিকদের সিদ্ধান্তই ক্রমবিকাশের কারণ সম্বন্ধে চূড়ান্ত মীমাংসা বলিয়া আমার ধারণা।" উত্তর শুনে ভক্ত প্রশ্ন কর্তা আহ্লাদে আটখানা। "আপনার ক্রমবিকাশের নতুন ব্যাখ্যা শুনিয়া আমি পরম আহ্লাদিত হইলাম।" (স্বামী শিষ্য সংবাদ—শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী, পৃষ্ঠা-১৭৩-৭৫)। অনেকে অনেক কিছুতেই আহ্লাদে ফুটিফাটা হয়। বিজ্ঞান কিন্তু হাসির খোরাক ছাড়া কিছুই পায় না। বলতেন 'বিবর্তনবাদের নিরিখে ডারউইনের তুলনায় পাতঞ্জল সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ।' (স্বামী বিবেকানন্দ—প্রমথনাথ বসু, দ্বিতীয় ভাগ, পৃ - ৭৯৯)।

স্বামী অভেদানন্দ আবার একটু ঘুর পথে ডারউইনকে আক্রমণ করেছেন। তিনি আবার ক্রমবিকাশ তত্ত্বের সাথে বংশানুক্রমিক গুণাবলীকে যোগ করে নিয়েছেন। এবং তারপরে বলেছেন—"প্রকৃত কথা বলিতে কি, ডারউইনের মতবাদের দ্বারা বংশানুক্রমিক নিয়ম বা ধারার কোন সমস্যাই সমাধান হয় না।" (পুনর্জন্মবাদ—স্বামী অভেদানন্দ, প্রথম সংস্করণ, পৃষ্ঠা-৪৭)। অধ্যাপক গলটন, রথ, ওয়াইজম্যানের মতো ভাববাদী দার্শনিকেরা ডারউইনকে উড়িয়ে দিয়েছেন, একথাও তিনি বলে রেখেছেন।

"পিতামাতার অর্জিত গুণাবলী সন্তানে বর্তায়, একথা বিশ্বাস করার ইচ্ছাও আমাদের নাই।" (ঐ, পৃষ্ঠা-৫২)। "খ্রীষ্টান বা অন্য মতাবলম্বীরা এ ব্যাপারে যা বলেন, তাহার দ্বারাও কোন সমস্যার সমাধান আজ পর্যন্ত হয় নাই।" (ঐ, পৃষ্ঠা-৫৩)। "তবে বেদান্ত দর্শন ঐ প্রাণ বীজ, জীবাণু অথবা জীবকোষে নিহিত অব্যক্ত শক্তিগুলির যথাযথ কারণ নির্ণয় করিতে সক্ষম হইয়াছে।... ঐ প্রাণ বীজকেই সূক্ষ্ম দেহ বলিতে পারি।" (ঐ, পৃষ্ঠা-৫৪-৫৫)। "সুতরাং ক্রমবিকাশবাদকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতে হইলে পুনর্জন্মবাদের প্রয়োজনীয়তা আবশ্যক হয়।" (ঐ, পৃষ্ঠা-৮৮)। এই ভাবেই অভেদানন্দজী ডারউইনবাদকে ছোট করার চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। সেই সাথে চেষ্টা করেছেন আমাদের কোন্ মুনি ঋষি এই প্রসঙ্গে কি বাণী রেখে গেছেন, সেই মত প্রতিষ্ঠা করতে। হরি মহারাজ স্বামী তুরীয়ানন্দও ডারউইনকে কচুকাটা করে বলেছেন 'আমরা অমৃতের সন্তান, বানরের সন্তান হতে যাব কেন?'

শিক্ষাবিদ মহেন্দ্র মাস্টার। তিনিও ডারডইনের সমালোচনায় সমান মুখর। বলেছেন—"western evolutionists-পাশ্চাত্য ক্রমবিকাশবাদীদের এ দৃষ্টি নাই। তারা নিম্ন দৃষ্টি দিয়ে জগৎকে দেখছে। জগতের স্রষ্টার দিকে তাদের দৃষ্টি নাই। ডারউইন এই নিম্ন দৃষ্টি দিয়ে জগৎকে দেখে বলেছেন, মানুষ সৃষ্ঠ জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। পাথর, পোকামাকড়, কীটপতঙ্গ, পশুপক্ষী হতে ক্রমে মানুষ সৃষ্টি হয়েছে। Involution, অর্থাৎ ঈশ্বরই এই সব হয়ে আছেন, এ কথা তারা মানে না। এ দৃষ্টি তাদের নেই। এই দৃষ্টি হয় আত্মদ্রষ্টাদের, ব্রম্মদ্রষ্টাদের।" (শ্রীম দর্শন, অষ্টম ভাগ, প্রথম সংস্করণ, পৃষ্ঠা-২১৭)।

আরও বলেছেন—"বর্তমান biologists-দের দৃষ্টিও নিম্ন দৃষ্টি, সীমাবন্ধ দৃষ্টি। শাস্ত্র দৃষ্টি, বেদ দৃষ্টি, অবতার দৃষ্টিতেই কেবল সকল সমস্যার সমাধান হয়। যে সরল বিশ্বাসে ঠাকুরের কথা বিশ্বাস করবে তাকে অতশত ভাবতে হবে না। জগদম্বার মুক্তার হার তার গলায় শোভা পাবে।" (ঐ, পৃষ্ঠা-২১৮)।

বিদ্যাসাগর তার স্কুল থেকে স্বামী বিবেকানন্দ, মহেন্দ্রনাথকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন কেন জানেন? এদের মত পণ্ডিত ধার্মিকেরাই ডারউইনের ছবিতে বাঁদরের শরীর বসিয়েছিল, এই কারণে।

সারদাদেবীকে একবার এক ভক্ত প্রশ্ন করেন—"আচ্ছা, এই যে অসংখ্য প্রাণী— ছোট, বড়, সব কি এক সময়ে সৃষ্টি হয়েছে নাকি?" মা—"চিত্রকর যেমন তুলি দিয়ে চোখটি, মুখটি, নাকটি—এমনি একটু একটু করে পুতুলটি তয়ের করে, ভগবান কি এমনি একটি একটি করে সৃষ্টি করেছেন? না, তার একটা শক্তি আছে। তার 'হাঁ' তে জগতের সব হচ্ছে, 'না' তে লোপ পাচ্ছে। যা হয়েছে সব এককালে হয়েছে। একটি একটি করে হয় নি।" (শ্রীশ্রী মায়ের কথা, উদ্বোধন কার্যালয়, দ্বিতীয় ভাগ, চতুর্থ সংস্করণ, পৃষ্ঠা-৩০)। সৃষ্টির পৌরাণিক ব্যাখ্যা।

আর এক পৌরাণিক ব্যাখ্যা দিয়ে গেছেন স্বামী বিবেকানন্দ। 'কর্মফল' নিয়ে আলোচনা কালে সুরেন্দ্র নাথ সেন প্রশ্ন করেন—"সবই কর্মের ফল হলেও, গোড়া তো একটা আছে! সেই গোড়াতেই বা আমাদের প্রবৃত্তির ভালো মন্দ হয় কেন?" স্বামীজী—"কে বললে গোড়া আছে? সৃষ্টি যে অনাদি, বেদের এই মত। ভগবান যত দিন আছেন, তার সৃষ্টিও ততদিন আছে।" (স্মৃতির আলোয় স্বামীজী—স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, পৃষ্ঠা-২০৯)। অর্থাৎ স্বামীজীর মতে পৃথিবীতে প্রথম প্রাণ বলে কিছু নেই। সৃষ্টি ও প্রাণ সব সময় ছিল, সব সময় আছে। ধার্মিকের বিজ্ঞান ব্যাখ্যা।

ভূতপ্রেতের কুসংস্কার প্রসারেও রামকৃষ্ণদেব এবং তার শিষ্যদের অবদান কম নয়। অঘোর মণি-গোপালের মার বাড়ি রামকৃষ্ণদেব ঘুরতে এসেছেন। সঙ্গে এনেছেন স্বামী ব্রম্মানন্দকে। অবশ্য তখন তিনি শুধুই রাখাল। খাওয়া সেরে একটু বিশ্রাম করছেন।

রাখাল ঘুমিয়ে পড়েছে। এমন সময় ঠাকুর বলেন, "একটা দুর্গন্ধ বেরুতে লাগল। তারপর দেখি ঘরের কোণে দুটি মূর্তি। বিটকেল চেহারা, পেট থেকে বেরিয়ে পড়ে নাড়িভুড়িগুলো সব ঝুলছে, আর মুখ, হাত, পা মেডিকেল কলেজে যেমন একবার মানুষের হাড়গোড় সাজানো দেখেছিলাম ঠিক সেই রকম।" (লীলাপ্রসঙ্গ, পৃষ্ঠা-৬৫০)।

এরপর ভুতেদের কাকুতি মিনতি, তাদের খাওয়া দাওয়া, এসব নানান কথা আছে। এই যে ভুতপ্রেত, এরা একটা জিনিস খুব ভয় পায়, তা হল 'আলো'। 'জ্ঞানের আলো'। ভূত ভগবান দুজনের কাছেই সমান ভয়প্রদ।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্যরাও প্রায় সকলেই নানান সময় নানা রকম ভূত দেখে বেড়িয়েছেন। স্বামী বিবেকানন্দ প্রেতাত্মার মুক্তির জন্য 'বালির পিণ্ড' দান করেছেন। (স্বামীজিকে যেরূপ দেখিয়াছি—নিবেদিতা, অনুবাদক মাধবানন্দ, পৃ - ৩৭১)। একবার শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী স্বামীজীকে ভূতপ্রেত সত্যিই আছে কিনা প্রশ্ন করায় স্বামীজী ভূতের সত্যতা নিয়ে এক লম্বা চওড়া বক্তৃতা দেন। (স্বামী শিষ্য সংবাদ, পৃষ্ঠা-১৩৬-৩৭) পাঠক যুক্তিবাদী মন নিয়ে বক্তৃতাটি মূল গ্রন্থ থেকে একবার পড়ে নিতে পারেন। ভাল লাগবে, যদিও বক্তৃতাটি অসম্পূর্ণ। আবার ঠাট্টা করে এমনও বলতেন 'ভূতগুলোকে নিয়ে আয়, ভেজে খাই।' 'একদিন গুরুভ্রাতা স্বামী প্রেমানন্দের সাথে গল্প করতে করতে হঠাৎ স্তব্ধভাব ধারন করেন। একটু পরে বলেন "তুমি কিছু দেখিলে?" তিনি বলিলেন "না"। তখন স্বামীজী বলিলেন "আমি এইমাত্র একটা প্রেতাত্মার, ছিন্নমুন্ড দেখিলাম। সে কাতরভাবে তার কষ্টকর অবস্থা থেকে উদ্ধার প্রার্থনা করছে।"......আরও অনেকবার স্বামিজী এই প্রকার দৃশ্য দেখিয়াছিলেন। আর সেই সময়ে মৃত ব্যক্তিদের আত্মার কল্যাণার্থ প্রাণ খুলিয়া আশীর্ব্বাদ ও প্রার্থনা করিতেন।' (স্বামী বিবেকানন্দ, জীবন চরিত—প্রমথনাথ বসু, চতুর্থ খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, উদ্বোধন পৃষ্ঠা - ৭০৫)। স্বামীজী সারাজীবনে এত ভূত দেখেছেন যে শুধু তা নিয়েই বেশ কয়েক পাতা লিখে ফেলা যায়।

ব্রহ্মানন্দজী ভূতের অস্তিত্ব টের পেয়ে এক বাড়ি ছেড়ে আর এক বাড়ি দৌড়ে বেড়িয়েছেন। ভূতের সাতকাহন যদি জানতে চান ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্যের ব্রহ্মানন্দ লীলাকথা, ১৭৪-১৭৭ পাতা কটি একবার পড়ে দেখতে পারেন। আর আছে 'মরণের পারে'। সে এক অদ্-ভূতুড়ে গল্প। পরে তা নিয়ে একটু আলোচনার ইচ্ছে রইল। যে দেশে আলোর প্রবেশ যত কম, সে দেশে ভূতপ্রেতের বাড়বাড়ন্ত তত বেশি। আর এই ভূত যজ্ঞে সর্বে ফোড়ন দিয়ে গেছেন বহু বহু ধর্ম নেতা। বহুদিন আগে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় একটা কথা বলেছিলেন, 'জমাট বাঁধা অন্ধকারেই ভূতেদের জন্ম।' আর আমরা তো সেই অন্ধকারের বাসিন্দাই।

দক্ষিণেশ্বর কুঠিবাড়িতে থাকার সময় রামকৃষ্ণদেব মাঝে মাঝে সাহেব ভূত দেখতেন। (দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ-৩৬)। আমি বিশিষ্ট সূত্র থেকে জেনেছি অ-হিন্দু ভূতেরা হিন্দুদের কোন ক্ষতি করে না।

আচ্ছা, গোটা পৃথিবীর মধ্যে এমন কোন রাজ্যের নাম বলতে পারেন যেখানে ভূতের উৎপাদন নেই? পারলেন না তো। আছে, তেমন জায়গাও আছে। মহাতীর্থ বিশ্বনাথধাম কাশী। যেখানে একটি অ্যামিবা পর্যন্ত মরলেই সরাসরি মুক্তি। যেখানে একটি আত্মাও হোঁচট খেয়ে প্রেতাত্মা হয়ে পড়ে থাকে না। সে আমাদের মহাতীর্থ কাশীধাম।

কাশীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে গিয়ে স্কন্দ পুরাণের 'কাশী খণ্ডে' ব্যাসদেব কিভাবে স্তুতি গাইছেন একবার দেখুন—'অন্য স্থানে নানা জন্মার্জিত নির্বিঘ্ন যোগ দ্বারা যে ফল লাভ করা যায়, কাশীতে প্রাণত্যাগ করিলে সেই ফল প্রাপ্ত হয়।' মানে, বহু জন্মের যোগ সাধনায় যে ফল যোগী লাভ করেন, যোগ বিহীন কোন ব্যক্তি (অথবা ইঁদুর, বেড়াল) শুধুমাত্র কাশীতে প্রাণ ত্যাগের গুণে সেটুকু ফল লাভ করে থাকেন। 'উগ্র পাপ করিয়া কালে কাশী প্রাপ্ত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিলে, আমার প্রসাদে আমাকে প্রাপ্ত হয়। পাপকারীগণও যদি দৈবাৎ কাশীতে মৃত হয়, তবে তাহাদের আর নরকে পতন হয় না।' দিব্যি বোঝা যাচ্ছে, যা খুশি বদমায়েসী, জালিয়াতি করে শেষ বয়সে কাশীবাস করলেই হল, পরপারের দুশ্চিন্তা থেকে একশো ভাগ মুক্তি। ' যে স্থানে পাপ হইতে, যম হইতে এবং গর্ভ বাস হইতে ভয় নাই, সেই কাশীকে কে না আশ্রয় করিবে?' পাপ করলে যে ভয় নেই, তা আমরা আগেই দেখেছি। মৃত্যুর পর যদি যমালয়ে না গিয়ে সরাসরি পরমাত্মায় লীন হয়ে যাই তবে তো যমকে থোড়াই কেয়ার। পরমাত্মায় লীন হয়েই যদি যাই, নতুন করে জন্মানোর প্রশ্নও আর উঠছে না। অতএব গর্ভবাসের ভয়ও আর থাকছে না। এমন জায়গায় কে না মরতে চাইবে। কাশী খণ্ডে এমন কাশী মাহাত্ম্য শয়ে শয়ে ছড়িয়ে আছে। স্বয়ং ব্রহ্মা বলেছেন ''কাশীতেই মুক্তি প্রতিষ্ঠিত।''

এ তো গেল পুরাণের কথা। রামকৃষ্ণদেব নিজে ভাব চোখে দেখেছেন, দশাশ্বমেধ ঘাটে প্রতি মড়ার কানে স্বয়ং শিব তারক ব্রহ্ম মন্ত্র শুনিয়ে হাত ধরে নিজের ধামে নিয়ে চলেছেন। আমরা নয় সংস্কৃত ভাষার ভালো সমঝদার, শিবের মন্ত্র শুনে ঠিক ঠিক বুঝে নিই, আর তার হাত ধরে তার ধামে চলে যাই। কিন্তু কুকুর বিড়ালের মত প্রাণীদের কিভাবে শিব মন্ত্র শোনান? এ একমাত্র শিবঠাকুর ছাড়া কেউ বলতে পারবে না।

সারদামণি তীর্থ ভ্রমণে কাশীধামে এসেছেন। এক সেবক একটি মরা মাছি দেখিয়ে সারদামণিকে প্রশ্ন করেন ''এটিরও মুক্তি হবে?'' ''হ্যাঁ''। ''অপঘাতে মরলে?'' ''তারও হবে।'' ''গরীবের ভিটেমাটি জালিয়াতি করে নেওয়া মোক্ষ প্রার্থীর?'' ''তারও হবে, বাছা তারও হবে। এখানে মরলে বাছা কেউ ফাঁকি পড়বে না।'' (শ্রীশ্রী মায়ের কথা, দ্বিতীয় ভাগ, চতুর্থ সংস্করণ, পৃষ্ঠা-১৩০, কথোপকথন একটু নিজের মত করে সাজিয়ে

দিয়েছি। সামান্য উক্তি বিকৃতি থাকলেও তা অপ্রাসঙ্গিক নয়)। এখানে শ্রীমা সারদামণি মশা মাছিরও মুক্তির আশা আছে এমন কথাই বলেছেন। আবার স্বামী ওঁকারানন্দ-অনঙ্গ মহারাজকে এক শিষ্যা প্রশ্ন করছেন, 'মনুষ্য জন্ম ছাড়া আর কোনও জন্মে বুঝি মুক্তি হয় না'? মহারাজা—'না, তাই মনুষ্যজন্ম লাভ করলে তাকে কাজে লাগাতে হয়।' (শ্রী রামকৃষ্ণ স্বামী বিবেকানন্দ ও ধর্ম প্রসঙ্গ— স্বামী ওঁকারানন্দ, দ্বিতীয় সং, পৃষ্ঠা—১৪০)। একজন বললেন 'হ্যাঁ', আর একজন বললেন 'না'। আমরা কোনটা মানব! ঠিক আছে, মানামানির অত দরকার নেই। একবার আত্মা বা প্রেতাত্মা হয়ে নিই, তারপর সব হাতে কলমে পরীক্ষা করে নেবখন।

একবার সেবক এক অজানা আগন্তুককে কাশী রামকৃষ্ণ মঠে স্বামী ব্রহ্মানন্দের ঘরে ঢুকতে দেখেন। একটু পরে ঘরে এসে তিনি কাউকে দেখতে না পেয়ে মহারাজকে জিজ্ঞেস করেন কেউ এসেছিল কি না। মহারাজ বলেন একজন এসেছিলেন, এখন চলে গেছেন। সেবক ভূতের আশঙ্কা করে বলেন, 'মহারাজ এখানে ভূত?' তার ভুল ভাঙ্গিয়ে মহারাজ বলেন ভূত নয়, এক মহাপুরুষ সূক্ষ্ম দেহে তার কাছে ধর্ম কথা শুনতে আসেন। সেবক আশ্বস্ত হন, যাক, কাশীতে অন্ততঃ ভূতের ভয় নেই।

এতক্ষণে বোঝা গেল তো, কেন বললাম কাশীতে ভূতের প্রোডাকশন নেই। সবাই যদি মরে আর মুক্তি পেয়ে যায়, ভূত হবে কে? তবে বহিরাগত ভূতের কথা জানা নেই।

এখানে ঋষি অরবিন্দের কথা একটু যোগ করে দেবার লোভ সামলাতে পারছি না। বিভিন্ন অলৌকিক বিষয়ে তার অচলা ভক্তি শ্রদ্ধা সর্বজনবিদিত। দেবতায় বিশ্বাস একটু যেন কম ছিল। একবার কোথাও যেতে গিয়ে ঘোড়ার গাড়ি সমেত খাদে গড়িয়ে পড়েন। নিশ্চিত মৃত্যু। গাড়ি ভেঙে চুরমার। কিন্তু তাজ্জব, ঋষির ভেতর থেকেই এক দেবতা বেরিয়ে এসে তাকে কোলে করে পাথরের উপর শুইয়ে দেয়। (বাংলার মহাপুরুষ - ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্য, পৃ-২৬)। একটা গোটা দেবতা তার মধ্যেই সিঁধিয়ে রয়েছে গাড়ি না উল্টোলে তিনি জানতেই পারতেন না। তবে এখন অবিশ্যি এক্স-রে মেশিনের নিচে শুইয়ে দিলে ভেতরে দেবতা টেবতা থেকে থাকলে আলবত ধরা পড়ে যাবে। এই ঘটনার পর ঋষির দেবতায় অরুচি আর ধোপে টেকেনি।

অরবিন্দ ঘোষের দুটি আলাদা সত্ত্বা। প্রথম জীবনে বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষ, পরবর্তী জীবনে 'ঋষি অরবিন্দ'। আলিপুর জেল থেকে ছাড়া পেলে বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষকে রবীন্দ্রনাথ 'অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার' বলে বরণ করে নিয়েছিলেন। 'ঋষি অরবিন্দের' প্রতি তেমন কিছু বলেছিলেন কিনা জানা নেই। তবে রবীন্দ্রনাথ যদি জানতেন ঋষি অরবিন্দ কলকাঠি নেড়েই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থামিয়ে দিয়েছিলেন, হাজার হাজার মানুষের রোগ ভোগ বিনা ওষুধেই সারিয়ে দিয়েছেন। পাঁচ লক্ষ বছর ধরে বিবর্তনের কাজ করে চলেছেন। প্রয়োজন হয়নি তাই যীশুর সাথে দেখা করেন নি,

ঐ একই কারণে গৌতম বুদ্ধের সাথেও দেখা না করে আজকের পৃথিবীতে শ্রী কৃষ্ণের অবতাররূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ কার্যান্তরে পণ্ডিচেরীতে অরবিন্দ আশ্রমে একবার গেছিলেন। যদিও এসব কথার বেশিরভাগই যখন প্রকাশ পেয়েছে রবীন্দ্রনাথ তখন ধরাধামে নেই। বেঁচে থাকলে আর নমস্কার টমস্কার নয়, আরও কি করে বসতেন কে জানে।

সে সময় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে কয়েকজন মাড়োয়ারী ভক্তের খুব আসা যাওয়া ছিল। লক্ষ্মীনারায়ণ নামে এক ভক্ত তো একবার শ্রীরামকৃষ্ণকে বেশ কিছু টাকাও দিতে চেয়েছিলেন। যদিও নির্লোভি রামকৃষ্ণ সামান্য টাকার মোহে আবন্ধ হবেন, এ ভাবা যায় না। তা তিনি হনও নি।

মাড়োয়ারী ভক্তদের প্রতি রামকৃষ্ণদেব একবারেই উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন না। একবার—'মাড়োয়ারী ভক্তগণ ঠাকুরকে দেখিতে আসিয়া মিছরি, পেস্তা, বাদাম, কিসমিস প্রভৃতি নানাপ্রকার খাদ্যদ্রব্য তাহাকে উপহার প্রদান করিয়া যাইল। ঠাকুর ওই সকলের কিছু মাত্র স্বয়ং গ্রহণ করিলেন না। সমীপাগত কোন ভক্তকেও দিলেন না। বলিলেন "উহারা (মাড়োয়ারীরা) নিষ্কাম ভাবে দান করিতে আদৌ জানে না। সাধুকে এক খিলি পান দেবার সময়ও ষোলটা কামনা তাহার সহিত জুড়িয়া দেয়। ঐ রূপ সকাম দাতার অন্ন ভোজনে ভক্তির হানি হয় (লীলাপ্রসঙ্গ, পৃষ্ঠা-৭৩৭)।" পরবর্তী অংশে দেখতে পাব ঠাকুর রামকৃষ্ণ সেই খাদ্যসামগ্রী নরেন্দ্রনাথের জন্য পাঠিয়ে দিচ্ছেন। তার বক্তব্য নরেন্দ্রনাথের ভক্তি জ্বলন্ত আগুনের মত। মাড়োয়ারীদের থালা ভরা কামনা সেই আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

তা রামকৃষ্ণদেব তার প্রধান শিষ্য সম্বন্ধে খুব বড় কিছু ভাবতেই পারেন। এতে কারও কিছু বলার নেই। কিন্তু মাড়োয়ারীদের ভক্তিকে রামকৃষ্ণদেব যে শ্রন্ধার চোখে দেখতেন না, একথা নিশ্চিত ভাবেই বলা যায়।

'স্বামী অখণ্ডানন্দের স্মৃতি কথায়' একটি ঘটনার উল্লেখ পাই—কিছু মাড়োয়ারী ভক্ত দক্ষিণেশ্বরে এসেছে। তারা পঞ্চবটী তলায় বনভোজনের আয়োজন করেছে। পেস্তা, বাদাম, কিসমিস, লাড্ডু সব নানারকম উপাদেয় খাদ্য। 'ঐ রকম লাড্ডু পরাত ভরে তারা ঠাকুরকে এনে দিলে। তিনি তা পেয়ে বড় আনন্দ করতে লাগলেন। তারা চলে গেলে তখনি ঠাকুর বললেন, "নরেনকে ডাকিয়ে এনে খাওয়াতে হবে। এ জিনিস এক নরেন ভিন্ন কেউ হজম করতে পারবে না।...." (স্মৃতিকথা, তৃতীয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা-৩৫)।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরবর্তী সময়ও দেখতে পাই তার শিষ্য বা তাদের শিষ্যরা মাড়োয়ারীদের তেমন একটা উচ্চদরে স্থান দিতে রাজী নয়। একবার কিছু ভক্ত শিষ্য রিলিফের কাজ অপছন্দ হওয়ায় হৃষীকেশে গিয়ে ধ্যান করবে এমন অনুরোধ নিয়ে স্বামী ব্রম্ানন্দের কাছে যায়। তাদের আবেদন শুনে ব্রম্ানন্দজী অনেক কিছুই বলেন, শেষে বলেন "এখানে

ঠাকুরের প্রসাদ পাও—শুদ্ধ অন্ন। ছত্রের অন্ন খেয়ে হজম করা কঠিন। খুব সাধন ভজন না থাকলে হজম করা যায় না। মাড়োয়ারিদের দানে হাজার কামনা বাসনা থাকে।" (শারদীয়া উদ্বোধন, ১৪১০ আশ্বিন, নবম সংখ্যা, পৃষ্ঠা-৬৩৩) একথা শুনে শিষ্যরা ততক্ষণাৎ দমে যায়।

'একবার আমাদের রিলিফের কাজ চলছে। অর্থের জন্য এক জায়গায় আমি গিয়েছি। মাড়োয়ারী সোসাইটির একজন লোক বলল, "আপনাদের টাকা কেন দেওয়া হবে? আমরাও তো রিলিফ করছি।" বাস্তবিক, তারাও ভালই রিলিফ করছিল। কিন্তু তাদের ভাবটি হচ্ছে দরিদ্রদের, পীড়িতদের দয়া করা। সেই সেবায় একটা সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্স থাকে। লোককে অন্নবস্ত্র তো তারাও দিচ্ছিল, কিন্তু আমাদের সেবা তো আর সেরকম নয়। আমাদের ভাব হচ্ছে—শুধু পরের টাকা পরকে দেওয়া নয়, তার সঙ্গে ঈশ্বর বুদ্ধিতে শ্রদ্ধা ভালবাসা প্রেম দেওয়া, পূজা দেওয়া। তাই স্বামীজী বলেছেন "সেবা নয়, পূজা"।' (দেবলোকের কথা—স্বামী নির্বাণানন্দ, প্রথম প্রকাশ, পৃষ্ঠা-৬৬)।

মাড়োয়ারীদের প্রতি যে রামকৃষ্ণদেব এবং তার অনুগামীদের ধারণা মোটেই উঁচু নয় সে প্রমাণ বেশ পাওয়া যাচ্ছে। স্বামী বিবেকানন্দও বলে গেছেন—"মাড়োয়ারীরা দেশটা উচ্ছন্নে দিচ্ছে। ওদের বড় হীন বুদ্ধি।...." (স্মৃতির আলোয় স্বামীজী—স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, প্রথম প্রকাশ, পৃষ্ঠা-১৪৪)।

যত মত তত পথ

'যত মত তত পথ', শ্রীরামকৃষ্ণের এক জগৎ বিখ্যাত বাণী। তার শিষ্যরাও সব সময় এই বাণীই প্রচার করে গেছেন। বিশ্বজোড়া শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তরাও এই পথেরই পথিক। কিন্তু বাণী হলেই তো হল না, তাকে মানা-মানির প্রশ্নটিও এর সাথে জড়িত। নিন্দুকের প্রশ্ন স্বয়ং রামকৃষ্ণদেব কি তার বাণী মেনে চলতেন? উত্তর, কোনদিনও না। তার একান্ত শিষ্যরা কি গুরুদেবের বাণী পালন করেছেন? কোনদিনও না। জগৎজোড়া ভক্তরা কি এই বাণী মেনে চলেন? তাও কোনদিনও না।

'যত মত তত পথ' 'সর্ব ধর্ম সমন্বয়' এসব শুনতে বেশ ভালো লাগে, খেতে আরও ভালো। কিন্তু পালন করতে গেলে পেট গন্ডগোল হয়। একটুও বাড়িয়ে বলছি না। সত্যি সত্যিই তাই হয়। স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী চলেছেন জয়রামবাটী। শ্রীমা সারদামণির সাথে দেখা করতে। বর্ধমান থেকে এক হাঁড়ি মিহিদানা কিনে গরুর গাড়ীতে চড়ে কোলে নিয়ে বসে আছেন। পাছে কোন ভাবে অশুদ্ধ হয়ে যায়। সারাদিন পথ চলে কামারপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণের বাড়ীতে এসে পৌঁছেছেন। সেখানে একটু বিশ্রাম নেবার ফাঁকে ভাবলেন গৃহদেবতা ৺রঘুবীরকে একটু মিহিদানা দেওয়া যাক। বার করতে যাচ্ছেন সেই সময় ভিতর থেকে স্বামীজীকে কেউ একজন ডেকে পাঠায়। তিনি হাঁড়ি খোলা রেখেই ভিতরে যান। ফিরে এসে দেখেন একটি কুকুর মিহিদানার সদ্ব্যবহার করে চলেছে। তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হন এবং কামারপুকুর ত্যাগ করে জয়রামবাটী চলে আসেন।

জয়রামবাটী এসে সারদামণিকে সব কথা খুলে বলেন। 'বৃত্তান্ত শুনে মা বললেন, "বাবা, কিসে এলে? গাড়োয়ান কে ছিল?" গাড়ীর চালক ভিন্ন ধর্মাবলম্বী শুনে মা বললেন, "দেখ বাবা, আমার শ্বশুরমশাই ৺রঘুবীরকে খুব আচার ও নিষ্ঠার সঙ্গে সেবা করতেন। অপরজনের ছোঁয়া লাগা মিষ্টি যে ৺রঘুবীরের ভোগে লাগবে না, তাই এমন হয়েছে।" (সৎপ্রসঙ্গ-স্বামী বিশুদ্ধানন্দ, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ-১৮৯-৯১)।

এখানে মায়ের সমাধানটি পেলেন তো। রহিমের ছোঁয়া রামের চলে না। এটাই সত্যি কথা। একই ভাবে রামের ছোঁয়াও রহিমের কাছে সমান ত্যাজ্য। আনুবিশ দেবতা মাঝখান থেকে মিহিদানা খাবে।

মুখে মুখে যতই সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের ভেক ধরি না কেন কাজের সময় কিন্তু দেখা যায় রামও আলাদা রহিমও আলাদা। তবে অনেকে বলবে ধর্মা-ধর্ম নয় সারদা মা আসলে

ঐ লোকটির শুধ্বতা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন। আমি কিন্তু এদের কথা মেনে নেবার দলে নেই। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি কে কোন ধর্মের লোক এখানে সেটাই প্রাধান্য পেয়েছে। তবু দিনকে রাত বানাবার লোকের অভাব নেই।

স্বামীজীর ভাই ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বলেছেন 'সর্ব ধর্ম সমন্বয় চিন্তাটাই ভ্রান্ত।' ঠিকই বলেছেন তিনি। ওসব মৌখিক ব্যাপার। মুখে মুখে বেশ বোলচাল হয়। কার্যক্ষেত্রে সমন্বয়ের টিকিটিও খুঁজে পাওয়া যায় না।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ক্ষেত্রেই ধরা যাক 'তিনি কারও ভাব নষ্ট করেন না,' এই রকম একটা ইমেজ রামকৃষ্ণদেবের আছে। যার যা ভাব তাকে সেই পথেই তিনি ঈশ্বরের দিকে এগিয়ে দেন, এই রকম সব কথাই শোনা যায়। কার্যক্ষেত্রে আমরা কিন্তু অন্যরকম কিছু দেখি। ধরা যাক একজন খ্রীষ্টান রামকৃষ্ণদেবের সাথে দেখা করতে এসেছেন। কিছুক্ষণ থাকবেন, কিছু কথাবার্তা হবে, তারপর চলে যাবেন। রামকৃষ্ণদেব কি তাকে বলবেন 'এই, তুমি তোমার পথ ছেড়ে আমার পথে এসো।' তা তো হয় না। সে যে মতেরই লোক হোক না দুটি ধর্ম কথা ছাড়া তার সাথে রামকৃষ্ণদেবের সম্পর্ক কি। কিন্তু যে তার নিকট সান্নিধ্যে থাকবে তাকে কিন্তু তিনি স্বমতে আনার চেষ্টা সব সময়ই করতেন।

ভক্তরা জানে ঈশ্বরকে যে যেভাবেই মানুক না কেন আসলে তিনি 'এক'। অতএব শিব মানব না কালী মানব, নারায়ণ মানব না বিষ্ণু মানব, এসব নিয়ে সমস্যা খুব একটা কারও থাকে না। কিন্তু এর মধ্যেও এক আধজন হয় অতি গোঁড়া। তারা কেউ সাকার মানে তো সাকারই মানে, নিরাকার মানে তো নিরাকারই মানে। শিব মানে তো শিবকেই মানে, কালী মানে তো কালীকেই মানে। এই রকম ভক্তরাই পরীক্ষার আসল জায়গা। যে ভক্ত মা কালী ছাড়া কিছু বোঝে না, বা শিব ঠাকুর ছাড়া কিছু মানে না, সেখানে রামকৃষ্ণদেবের উদারতা কতখানি সেটাই দেখার।

দক্ষিণেশ্বরে এসে দীর্ঘদিন ধরে রয়েছেন তোতাপুরী নামে এক সিদ্ধ যোগী। অভিনেতা তুলসি চক্রবর্তী (পরশপাথর) এবং শ্রীমৎ তোতাপুরি, মাত্র এই দুজন 'কিমিয়া' বিদ্যায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন এবং তামাকে সোনায় পরিণত করতে পারতেন। (ঠাকুর রামকৃষ্ণ— ব্রম্মচারী অক্ষয়চৈতন্য, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা-১৩১)। প্রধানত তিনিই শ্রীরামকৃষ্ণের সাধন গুরু। যদিও সোনা তৈরির কারিকুরিটুকু তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে শেখাননি। চেপে গেছিলেন। শিব, দুর্গা, কালী এসবে বিশ্বাস নেই, এক নিরাকারবাদী সন্ন্যাসী। শ্রীরামকৃষ্ণের হাততালি দিয়ে হরি সঙ্গীত শুনে কটাক্ষ করে বলেন 'কি হাত ঠুকে ঠুকে চাপাটি বানিয়ে চলেছ!' এহেন তোতাপুরীকে রামকৃষ্ণদেব শ্যামা ভক্তি জাগাবার বহু চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু কাজ হয় নি।

একবার তোতাপুরী বিষম পেটের গণ্ডগোলে কাহিল। যন্ত্রণায় কাতর হয়ে আত্মহত্যার চেষ্টাও করেন। বিফল হয়ে একদিন রামকৃষ্ণদেবকে বলছেন—

কহিল তাহারে কত করিয়া মিনতি।
কেমনে আরোগ্য হই করহ যুকতি।।
দয়া করি প্রভুদেব উত্তরিলা তায়।
আরোগ্য যদ্যপি কর প্রণাম শ্যামায়।। (পুঁথি, পৃষ্ঠা-১০৫)

এর পরের ঘটনা বুঝে নেওয়া সহজ। তোতাপুরী মন্দিরে গিয়ে শ্যামা মাকে প্রণাম করছেন, তার রোগ সেরে যাচ্ছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু এখান থেকে আমরা কি পেলাম, যে লোকটা শ্রীরামকৃষ্ণের শ্যামা মাকে মানে না তাকে তিনি তার শ্যামার পথে নিয়ে আসার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করছেন। সকলে যে মানবেই এমন কোনো কথা নেই, তবু তিনি চেষ্টা করছেন যদি সে মেনে নেয়।

এর পেছনে শ্রীরামকৃষ্ণের কোন কূট অভিসন্ধি আছে একথা আমি বলছি না। কিন্তু তিনি যে পথটি ঠিক বলে জানেন অন্যকেও সেই পথে নিয়ে আসার চেষ্টা করছেন। 'আরোগ্য যদ্যপি কর প্রণাম শ্যামায়', রোগ সেরে যাবে যদি আমার শ্যামা মাকে মেনে নাও। অর্থাৎ অন্যের সাধন মার্গ মুখে মুখে ঠিক বলে মেনে নিলেও কার্যক্ষেত্রে তার উল্টোটাই দেখতে পাচ্ছি। 'যত মত তত পথ' মোটেও সার্থক হল না।

খ্রীষ্টানরা যেমন বলে না ' সব ধর্মই সত্য, সব ধর্ম মতই মুক্তির পথ, তবে কথা একটা আছে বটে, যীশু ছাড়া গতি নেই।' রামকৃষ্ণদেবের বেলায়ও ঠিক তাই ঘটছে। 'সব মতই সত্য কিন্তু আমার শ্যামা কালী এবং অদ্বৈতবাদ ছাড়া গতি নেই।'

তিনি তার শ্যামা মার প্রতি কি ভীষণ অনুরক্ত তার কয়েকটি নমুনা রামকৃষ্ণ পুঁথি থেকে তুলে দিচ্ছি—

নানান সাধনে নানা মূর্তি আরাধনা।
সাধনান্তে সেই নাম শ্যামা শ্যামা শ্যামা।।

* * *

বুঝিতেন শ্যামা মায় সকলের সার।
যাবতীয় মুরতির শ্যামাই আধার।।
শ্যামা তুষ্টে সব তুষ্ট তবে সিদ্ধ কাজ।
সর্ব ঘটে এক শ্যামা করেন বিরাজ।।

* * *

শ্যামা সুপ্রসন্না অগ্রে না হইলে পরে।
নজর ফেলিয়া জীব দাঁড় টেনে মরে।।

শ্যামা মার প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তি শ্রদ্ধা এমন একটা স্তরে পৌঁছেছিল যেখান থেকে 'যত মত তত পথ' পালন করাটাই অসম্ভব। কেশব চন্দ্র সেনের ক্ষেত্রে কি ঘটছে লক্ষ্য করুন—

প্রায় অধিকাংশে বলিতেন ভগবান।
শ্রীমন্দিরে কর অগ্রে মায়েরে প্রণাম।।
সেই আজ্ঞা শ্রীকেশবে মঙ্গল লক্ষণ।
ভক্তি ভরে বন্দীবারে মায়ের চরণ।।
শুনিয়া কেশব কন অতি ধীরে ধীরে।
মনপ্রাণ সমর্পণ করেছি পিতারে।।
ভাব বুঝি প্রভুদেব করিলা উত্তর।
কহ কার খেয়ে মাই পুষ্ঠ কলেবর।।
যদি মাতৃ পয়োধরে হেন কান্তি কায়।
বল তবে কেন নাহি মানিবে শ্যামায়।।
মা ধরিয়া বাপে চিনে জগজনে জানা।
বুদ্ধিমান তুমি তবু কি হেতু বুঝ না।। (পুঁথি, পৃষ্ঠা-২৪০)

কেশব সেনকে শ্যামার প্রতি অনুরক্ত করে তোলার জন্য কি আকুল প্রচেষ্টা দেখুন রামকৃষ্ণদেবের মধ্যে। কেশব সেনও মস্ত সাধক। কিন্তু রামকৃষ্ণদেবের কথায় পরিষ্কার 'তুমি যে মতেরই সাধক হও না কেন শ্যামা মা ছাড়া মুক্তি নেই।' 'যত মত তত পথ' খুঁজে পাচ্ছেন? আমি পাচ্ছি না। তারপর বলছেন—

দর্পণ স্বরূপা শক্তি সহায় না হলে।
ব্রম্মতত্ত্ব ব্রম্মজ্ঞান কখনো না মিলে।।

যে পথ দিয়েই যাও না কেন 'শক্তি সহায় না হলে', মানে শ্যামা মা সহায় না হলে ব্রম্মজ্ঞান 'গাছে কাঁটাল গোঁফে তেল'। এখনও কেশব মানছেন না। তাই আবার বলছেন—

বৃহতী যেমন তিনি তেমতি করুণা।
ব্রম্মময়ী মা বলিয়া তাহারে ডাক না।।
এত কাল পিতা বলি কি কাজ করিলে।
এইবার ডাক তুমি ব্রম্মময়ী বলে।।

এতদিন অন্য মতে চলে কি ফল পেলে! শ্যামা মাকে ধর, তিনিই পারানির কড়ি। 'যত মত তত পথ' স্রেফ কথার কথা। তিনি বুঝতেন এক শ্যামা সত্য, সকলকে বোঝাতেনও ওই শ্যামা সত্য। অন্যগুলো মিথ্যে একথা বলতেন না বটে, তবে 'যীশু ছাড়া গতি নেই' এটাও বুঝিয়ে দিতেন।

একবার কথামৃতকার শ্রীম ভক্তদের বলছেন—"আমরা ব্রাম্ম সমাজে যাই কেন? ঠাকুর গিছলেন তাই। আর এদের ভিতর ঠাকুরের ভাব তিনি নিজেই ঢুকিয়ে দিয়েছেন। তাই যাই যদি ঐ ভাব percolate করে এদের ভিতর দিয়ে, তাই শুনতে। কেশব সেনের

ভিতর ঠাকুরের ভাব ঢুকেছে কিনা। 'মা, মা' করে এরা। এটা ঠাকুর ঢুকিয়েছেন।" (শ্রীম দর্শন, দ্বাদশ ভাগ, প্রথম সংস্করণ, পৃষ্ঠা-৯৭)।

এখানে একটা প্রশ্ন তোলা যায়, ব্রাহ্ম সমাজীরা তাদের নিজেদের মত করে ঈশ্বর ভজনা করে। তুমি সেখানে তোমার নিজের ভাব ঢোকাবে কেন! সব সাধন পথই ভগবান লাভের এক একটি পথ, এই তো 'যত মত তত পথ'। তাহলে তুমি তোমার নিজের মত সেখানে ঢোকালে কেন!

শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনীর বিখ্যাত হাজরা মশাইয়ের কথাও ধরা যাক। মাস্টারমশাই শ্রীম-র এক শিষ্য যাকে 'standing criticism' বলে উল্লেখ করেছেন। ইনি শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তিতত্ত্ব মানতেন না। এই নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের সাথে বাদানুবাদ হাজরামশাইয়ের লেগেই থাকত। একবার হাজরামশাই নরেন্দ্রকে শক্তিতত্ত্ব বিরোধী কিছু শিখিয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের কানে এ কথা যেতেই তিনি হাজরার কাছে ছুটে যান। তাকে শক্তিতত্ত্বের যত মাহাত্ম্য সব শুনিয়ে আসেন। একথাও বলেন "তুমি তো বড় পাজি।" এরপর শাপশাপান্ত, মুখ দিয়ে রক্তপাত, এই সবের মধ্যে দিয়ে ঘটনার ইতি।

আমরা এই সব গল্পের কিছুই জানতে চাই না। শুধু খুঁজছিলাম এর মধ্যে 'যত মত তত পথ' কোথায়। খুঁজে পাই নি। যা খুঁজে পেলাম তা হল, যে শ্রীরামকৃষ্ণের মা কালীর শক্তিতত্ত্ব বিরোধী তার সাথে শ্রীরামকৃষ্ণের বনিবনা কম।

'কথামৃত' পরিশিষ্ট পঞ্চমভাগ, পৃষ্ঠা ২২৮-২৯ পাতায় বৈষ্ণবদের ধর্মাচরণ নিয়ে একটি আলোচনা আছে। বৈষ্ণবদের সাধন পদ্ধতির মধ্যে কোথায় কি খুঁত তুলে ধরে শেষ পর্যন্ত রামকৃষ্ণদেব বলেছেন, "এ সাধন বড় নোংরা সাধন, যেমন পায়খানার মধ্যে দিয়ে বাড়ির ভিতর ঢোকা।" বৈষ্ণবদের সাধনা নোংরা কি পরিষ্কার তা আমার জানা নেই। জানার ইচ্ছেও নেই। শুধু এইটুকু জানি সেই পথ সত্য বলে বহুলোক মানছে। তোমার শ্যামা মায়ের সাথে মিলছে না বলেই তুমি তাকে উড়িয়ে দেবে, আবার মুখে বলবে 'যত মত তত পথ' তা তো হয় না। স্বামী বিবেকানন্দও বৈষ্ণব সাধন পদ্ধতির তীব্র সমালোচনা করে গেছেন। তার মতে মধুর-সখ্য ভাবের সাধকরা ভুল পথের যাত্রী। (বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড, পৃ - ৪৫)। আসলে যত মত তত পথ ভক্তদের ভক্তি দিয়ে গড়ে তোলা ইমারত। যুক্তি, তর্ক, সত্যের সাথে যার কোন সম্পর্ক নেই।

এক ভক্তের প্রশ্নের উত্তরে সারদামণি বলছেন—"তোমাদের গুরু অদ্বৈতবাদী তাই তোমরাও নিশ্চয়ই তাই।" (শ্রীশ্রী মায়ের পদপ্রান্তে—স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, তৃতীয় খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, চতুর্থ মুদ্রণ, পৃষ্ঠা-৭৪৭)। কেউ যদি কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হয়, তার কাছে তার নিজের সমাজটিই শ্রেষ্ঠজ্ঞান হয়। এটাই স্বাভাবিক অভিজ্ঞতা। স্বামী শিবানন্দ এক ভক্তকে চিঠি লিখছেন—'রামকৃষ্ণ সূর্য ভারতে উদিত হইয়াছেন; তাহার কিরণ বিবেকানন্দ পশ্চিম গগনে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছেন। সেদিকও পরিষ্কার হইতে

আরম্ভ করিয়াছে। প্রভুর সর্বগ্রাসী বেদান্ত এবার সমগ্র জগৎকে গ্রাস করিতে প্রস্তুত।' দেখাই যাচ্ছে সকলেই একটি বিশেষ মতের সমর্থক। ইহুদী ধর্মে কি বলা আছে সে মানবে কেন?

মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে এক দ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী যোগ দিয়েছেন। স্বামী বিবেকানন্দ তখন মায়াবতীতে। তিনি সকলকে নিবিড় ভাবে বোঝালেন এই অদ্বৈত আশ্রমে দ্বৈতবাদ না থাকাটাই শ্রেয়। 'উক্ত সন্ন্যাসী নিজের দ্বৈতভাব লইয়া ওরূপ স্থানে থাকা উচিৎ কি না শ্রী শ্রী মাতাঠাকুরাণীকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, "শ্রী গুরুদেব নিজে অদ্বৈতময় ছিলেন ও অদ্বৈতভাব প্রচার কর্তেন। তুমি তবে ঐ ভাব গ্রহণ কর্তে 'কিন্তু' কচ্চ কেন বাবা? তার সব শিষ্যই যে অদ্বৈতবাদী।" (স্বামী বিবেকানন্দ-জীবন চরিত-প্রমথনাথ বসু, চতুর্থ খণ্ড, দ্বিতীয় সং, পৃষ্ঠা—১০০১-২)। ইহুদী মত্ ঈশ্বর লাভের পথ একদম ভুল কথা।

একবার স্বামী অখণ্ডানন্দ নবদ্বীপ ঘুরতে গেছেন। নবদ্বীপের বিখ্যাত 'পাকা টোল'-এ ঘুরতে গিয়ে অধ্যক্ষ রাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের সাথে বাক্‌বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন। তারা দ্বৈতবাদী। অতএব তাদের মতে দ্বৈতবাদই ঠিক। স্বামীজী অদ্বৈতবাদী, তার কাছে অদ্বৈতবাদ ছাড়া জীবন বৃথা। অতএব—"তিনি শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের দোহাই দিয়া দ্বৈতবাদের পক্ষে অনেক কথা বলিলেন। আমিও অদ্বৈতবাদের পক্ষে অনেক কথা বলিলাম।" (স্মৃতিকথা—স্বামী অখণ্ডানন্দ, পৃষ্ঠা-২০৫)। যে যার মতকে সঠিক প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করবেই। তবে আর যত মত তত পথ কেন।

এক বার গাজীপুরে স্বামী বিজ্ঞানানন্দের কাছে ঘুরতে আসেন স্বামী অভেদানন্দ। সে সময় গাজীপুরে এক বিখ্যাত দ্বৈতবাদী পণ্ডিত থাকতেন। বিজ্ঞানানন্দের ইচ্ছা স্বামী অভেদানন্দকে দিয়ে দ্বৈতবাদী পণ্ডিতকে পরাস্ত করে বুঝিয়ে ছাড়বেন দ্বৈতবাদ নয় অদ্বৈতবাদই সেরা। দীর্ঘ তর্কাতর্কির পর পণ্ডিতজী মানতে বাধ্য হলেন অদ্বৈতবাদই গুড, বেটার, বেষ্ট। (প্রত্যক্ষদর্শীর স্মৃতিপটে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ-উদ্বোধন, পৃষ্ঠা - ২১৮-১৯)।

স্বামী বিবেকানন্দ বহু বার বলেছেন 'অদ্বৈতবাদই একমাত্র সঠিক ধর্মমত।' তাহলে দ্বৈতবাদ, বিশিষ্ঠাদ্বৈতবাদ, অজ্ঞেয়বাদ, সাকারবাদ, নিরাকারবাদ আরও কত কি বাদ আছে আমার জানা নেই, সে সব কি ভুল? আর নিজেরটা ছাড়া অন্যগুলো ভুলই যদি হয় তবে আর মুখে মুখে 'যত মত তত পথ'-কেন? স্বামীজী বলেছেন 'বেদান্তের অদ্বৈতবাদ পেয়ে খ্রীষ্টানরা বর্তে গেছে।' বর্তে গেছে কি অন্য কিছু হয়ে গেছে সে গবেষণার বিষয়। আমি শুধু বলতে চাই তারা যে বাইবেল-খ্রীষ্টধর্ম মেনে চলেছে সে সব কি ঠিক পথ নয়।

আমেরিকা থেকে ফিরে জাফনায় বক্তৃতা দিতে গিয়ে স্বামীজী বলছেন—"কে এই সৃষ্টি করিতেছেন?—ঈশ্বর। ইংরাজীতে সাধারণত 'গড' শব্দে যাহা বুঝায়, আমার অভিপ্রায় তাহা নহে। সংস্কৃত 'ব্রহ্ম' শব্দ ব্যবহার করাই সর্বাপেক্ষা যুক্তিসঙ্গত। তিনিই

এই জগৎ প্রপঞ্চের সাধারণ কারণ স্বরূপ।" (ভারতে বিবেকানন্দ—স্বামী শুধানন্দ, পৃষ্ঠা-৪০)।

আল্লা নয়, গড নয়, আহিরমান নয়, আরও কত কি আছে তারা কেউ নয়, স্রষ্টা একমাত্র 'ব্রম্ম'। কারণ বেদ বেদান্ত তাই বলেছে। যে রাম, সেই রহিম, সেই যীশু এ সবও স্রেফ ভেক কথা। রামকৃষ্ণদেব ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন বললে কত উদারমনা মানুষকেও দেখেছি কিছুতেই মেনে নিতে পারেন না।

স্বামীজী—"বাইবেল ও অন্যান্য ধর্মশাস্ত্র যতটা বেদের সহিত মেলে ততটা গ্রাহ্য, কিন্তু যেখানে না মেলে, সেখানটা মানিবার প্রয়োজন নাই। কোরাণ সম্বন্ধেও ঐ কথা।" (ভারতে বিবেকানন্দ, পৃষ্ঠা-৩৯৫)। স্বামী অভেদানন্দও এই একই কথা বলে গেছেন। 'হিন্দুরা পুনর্জন্মবাদ মানে, মুসলমান ও খ্রীষ্টানরা তা মানে না। তাদের মতে যে পুণ্য করবে সে অনন্তকাল স্বর্গ ভোগ করবে আর যে পাপ করবে সে অনন্তকাল নরক যন্ত্রণা ভোগ করবে।...এ মত ঠিক হতে পারে না।' এরপর আছে গীতায় পুনর্জন্ম নিয়ে কি সত্য কথা বলা আছে, সে সব কথা। তা হলে দেখা যাচ্ছে কোরান ও বাইবেলের গোড়ায় গলদ। আর গলদযুক্ত মত নিয়ে ঈশ্বরলাভের পথ খোঁজা! মাঝ রাস্তায় যাত্রা ভন্ডুল। ওদিকে আবার বাইবেল বলছেন—'যারা প্রতিমা পূজায় বিশ্বাসী, তারা ঈশ্বরের রাজ্যের অধিকারী হবে না।'

বলেছি না 'যত মত তত পথ' ওসব মুখে মুখে বোলচাল হয় ভাল। প্রয়োগের সময় তার টিকিটিও খুঁজে পাওয়া যাবে না। আমেরিকায় ধর্মপ্রচারে গিয়েও স্বামীজী দেশ থেকে গঙ্গা জল আনিয়ে রাখতেন। মাঝে মাঝে তার থেকে এক এক ঢোক খেয়ে নিতেন। (জোসেফাইন ম্যাকলাউড—প্রব্রাজিকা প্রবুদ্ধপ্রাণা, প্রথম সংস্করণ, পৃষ্ঠা - ৩৬)। মিশিসিপি-অ্যামাজনের জল তো আর শিবের জটা থেকে আসে না!

স্বামীজী কখনও কখনও কিছু কথা বলতেন যা মেনে নিতে খুব অসুবিধা হয়। আত্মার ক্রমোন্নতি সম্বন্ধে স্বামীজী লিখছেন—'নিম্নতর স্তরগুলি হইতে উচ্চস্তরের দিকে ক্রমবিকাশের পথে পশুত্ব একটি সাময়িক অবস্থা মাত্র। সময়ে পশুও মানুষ হয়। ইহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণীয় বিষয় যে, মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পশুদের সংখ্যা হ্রাস পাইতেছে। পশুদের আত্মা মানবে রূপায়িত হইতেছে। বহু বিভিন্ন শ্রেণীর পশু ইতঃপূর্বেই মানবে পরিণত হইয়া গিয়াছে। এইসব বিলুপ্ত পশুপক্ষী আর কোথায় বা যাইতে পারে?' (স্বামীজীর বাণী ও রচনা, তৃতীয় খণ্ড, তৃতীয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা-৩৬০)।

পশুপাখীর সংখ্যা কমে গেছে একথা ঠিক। বহু প্রজাতি ইতিমধ্যেই বিলুপ্ত, বহু প্রজাতি বিলুপ্তির পথে। কিন্তু এরা যে ভোল পাল্টে আমাদেরই মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে, স্বামীজী না জানালে আমাদের আর জানাই হত না। ভাবতে পারেন, আগের জন্মে আমিই হয়তো

একটা মোটাসোটা, সাদা ধবধবে 'ভেড়া' ছিলাম। আর এই জন্মে দিব্যি সোয়েটার পড়ে ঘুরছি।

আমেরিকায় থাকাকালীন স্বামীজীর বক্তৃতা অনেক পত্রিকায় ছাপা হত। ট্রিবিউন, ১লা এপ্রিল, ১৮৯৪ যে বক্তৃতাটির প্রতিবেদন বার করে তার কিছু অংশ এখানে তুলে দিচ্ছি। ব্রাহ্মণদের মাহাত্ম্য কীর্তন করতে গিয়ে তিনি কি কি বলেছেন তার অংশ বিশেষ এই রকম—

'হিমালয়ের পাদদেশে বসবাসকারী আর্যদের খাঁটি বংশধর এই ব্রাহ্মণরা। পাশ্চাত্য লোকের পক্ষে স্বপ্নেও এই উন্নত মানব গোষ্ঠীর ধারণা করা অসম্ভব।'

হয়তো সে সময় ব্রাহ্মণদের মধ্যে অনেকে ছিলেন যারা নীল আর্মস্ট্রঙের আগেই চাঁদে পা রেখে এসেছে, পেলে, মারাদোনা, কার্ল লিউইস অথবা নিউটন, শেক্সপিয়র হয়তো সে সময় আর্য ব্রাহ্মণদের ঘরে ঘরে জন্মাত। আমরা এখন আর জানতে পারি না। কিন্তু সে সময় নিশ্চয়ই এরকম কিছুই হত। না হলে আর স্বামীজী বলবেন কেন 'এমন উন্নত মানব গোষ্ঠীর কথা আমেরিকানরা স্বপ্নেও ভাবতে পারে না।'

এরপর আছে ব্রাহ্মণরা কতদূর পবিত্র, কতদূর নির্লোভ, তার বর্ণনা। কথায় বলে 'লাখ টাকায় বামুন ভিখারী'। লোভের প্রতীক হিসাবে যাদের ভারতবাসী চেনে, তাদেরই তিনি লোভ শূন্য প্রাণী বানিয়ে দিলেন। এরপর স্বামীজী ব্রাহ্মণদের অসাধারণ শারীরিক গঠনের বর্ণনা দিয়েছেন, 'গায়ের রং—আঙুল ছুঁচ বিদ্ধ করিলে উহা হইতে একটি রক্ত বিন্দু যদি এক গ্লাস দুধে পড়ে, তা হইলে যে রং সৃষ্ট হয়, সেই রং-এর।' পত্রিকার সংযোজন শুধু এইটুকুই—'অবিমিশ্র বিশুদ্ধ হিন্দুদের ইহাই বর্ণনা।' (স্বামীজীর বাণী ও রচনা, দশম খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, পৃষ্ঠা-৪৯-৫০)। শুনেছি হিমালয়ের কোলে কিছু জাতি আছে যারা নাকি সত্যিই সুন্দর। কিন্তু স্বামীজীর বর্ণনা শুনে মনে হচ্ছে সমগ্র ব্রাহ্মণ জাতই বুঝি এমন দুধে আলতায় সুন্দর।

আবার অন্যত্র দেখতে পাই শুধু ব্রাহ্মণরাই নয় সমস্ত হিন্দু জাতটাকেই তিনি জগৎ প্রসিদ্ধ সুন্দর বানিয়ে দিয়েছেন। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন—'কিন্তু কালো হোক, গোরা হোক, দুনিয়ার সব জাতের চেয়ে এই হিঁদুর জাত সুশ্রী সুন্দর। একথা আমি নিজের জাতের বড়াই করে বলছি না, কিন্তু একথা জগৎ প্রসিদ্ধ। শতকরা সুশ্রী নরনারীর সংখ্যা এদেশের মত আর কোথায়।' (বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড প্রথম সংস্করণ, পৃষ্ঠা-১৬৫)।

সারা বিশ্ব যাদের 'কালা আদমি' 'নিগার' বলে চেনে, ফারসী ভাষায় 'হিন্দু' কথার অর্থ 'কালো বিন্দু', অর্থাৎ বিচ্ছিরি একটা কিছু। স্বামীজী তাকেই জগৎ প্রসিদ্ধ সুন্দর বানিয়ে দিলেন। কথাগুলো শুনতে বেশ ভালই লাগে আমাদের। অন্যরা কিন্তু হাসে। যদিও আমরা

বলি 'কে হাসলো তাতে আমাদের বয়েই গেল।' এটাই আমাদের স্বভাব। মান সম্মানের তোয়াক্কা যারা করে না তারা এরকম কথাই বলে। একেই বলে 'গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল'।

আমেরিকায় বক্তৃতা দিতে গিয়ে স্বামীজী বলে দিলেন—"হিন্দুরা পশু বধের বিরোধী।" (পাশ্চাত্যে স্বামী বিবেকানন্দ—মেরি লুই বার্ক, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা-১৮২)। বিদেশ থেকে কোন লোক কোন কালে ভারতবর্ষে কী আসেনি? রোজকার খাদ্যের চাহিদা যোগাতেই অজস্র প্রাণী প্রতিদিন নিহত হচ্ছে। এছাড়াও আছে পুজো পার্বণে অগুনতি পাঁঠা মহিষের মুণ্ডচ্ছেদ। হিন্দুরা অবলা প্রাণীর মুণ্ডপাত করতে চায় না বললে কি সবাই মানবে! 'একবার তিনি তাদের (বিদেশি শিষ্যদের) কালীঘাটের সুপ্রাচীন কালী মন্দিরে নিয়ে গেলে দেবীর সামনে ছাগবলির রক্ত দেখে একজন রীতিমত শিউরে উঠে বললেন, "একি! দেবীর সামনে এত রক্ত কেন?" বিবেকানন্দ উত্তর দিলেন, "ছবিটি পূর্ণাঙ্গ করতে একটু রক্ত থাকলই বা, ক্ষতি কী"!' এই বলছেন হিন্দুরা রক্তপাত বিরোধী, পরমুহূর্তেই বলছেন রক্তপাত না থাকলে পুজো ইনকমপ্লিট।

বলি প্রসঙ্গে শিক্ষাবিদ মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত বেশ সুন্দর কিছু বক্তব্য রেখে গেছেন। একবার ভক্তদের মধ্যে বলি নিয়ে আলোচনা চলছে। 'শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—"যদি বল কেন এসব কাটাকুটি হচ্ছে? কেন তিনি এসব করছেন? তার উত্তর, কি করবে এই পশুর জীবন দিয়ে? তার দিকে মন নাই, তাহলে এ জীবনে কি লাভ? তাই বলির ব্যবস্থা। এই কথাই মনে হচ্ছে। আবার মানুষের মধ্যেও যারা পশুভাবাপন্ন, তাদেরও বলি দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল পূর্বে। মানে এই, কি করবে এই শরীর দিয়ে তার দিকে যদি মন না রইল"।' (শ্রীম দর্শন, নবম ভাগ, প্রথম সংস্করণ, পৃষ্ঠা-৮৯)। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ তার 'প্রিয় শ্রীরায়'-এর চিঠির উত্তরে জানাচ্ছেন—'নরবলির অর্থ নিজের ক্ষুদ্র আমিত্বকে বলি দেওয়া। এই ক্ষুদ্র আমিত্ব নিজেকে দুর্বল ও পাপী মনে করে। পশু বলির অর্থও একই প্রকার। যে তা করতে পারে সেই বীর।' অতএব, ওহে সুনীত দে, ঈশ্বরে মন নাই, এই বীর সেনানীর হাতে তোমারও বলি হবার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

আমরা স্বামীজীকে এক রকম ভেবে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। তা বলে সবাই যে সেই রকমই ভাবে তা কিন্তু মোটেও নয়। আমেরিকার লোকেরা স্বামীজীকে কি ভাবে, স্বয়ং স্বামীজীর বয়ানেই শুনে নিন—"আমেরিকায় আমাকে বলিত, আমি যেন পাঁচ সহস্র বৎসর পূর্বের কোন অতীত ও বিলুপ্ত গ্রহ হইতে আসিয়া বৈরাগ্য বিষয়ে উপদেশ দিতেছি। ইংলাণ্ডের দার্শনিকগণও হয়তো এইরূপই বলিবেন।" (স্বামীজীর বাণী ও রচনা, দ্বিতীয় খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ, পৃষ্ঠা-১৫)। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে রমাঁ রলাঁ-ও প্রায় একই মন্তব্য করে গেছেন। বলেছেন,.... 'রামকৃষ্ণের ভাব দেখে মনে হচ্ছে, তিনি যেন হাজার বছরের প্রাচীন কোন গীর্জায় বসে আছেন।'

এই স্বীকারোক্তিটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কলকাতায় বসে আমরা শুনি এই হলিউড সেন্টার, এই ক্যালিফোর্নিয়া সেন্টার, আরও কত কি। পয়সার অভাব নেই, লসএঞ্জেলসে একটা বাগানবাড়ি কিনে উপরে মিশনের সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দিলেই হল। হয়ে গেল একটা নতুন সেন্টার। সেখানে ক-জন আমেরিকান যাচ্ছে কে তার খবর রাখে। তবে আমরা নিন্দুকের দল তো, নিন্দার সুবিধার্থে এই খবরগুলো একটু একটু রাখি। ওখানে কেউ যায় না। এদের কেউ চেনেও না। ধর্ম কর্ম নিয়ে সেখানে যারা সময় কাটায় তাদের 'মাথা খারাপ' বলে লোকে সহানুভূতি দেখায়। বেশ কিছুদিন আগে উদ্বোধন পত্রিকায় একজনের আমেরিকা ভ্রমণ কাহিনী পড়েছিলাম। কোন্ সংখ্যা ঠিক মনে নেই। লেখক আমেরিকায় টরেন্টো রামকৃষ্ণ আশ্রমে এসেছেন। একদম ফাঁকা আশ্রম দেখে মহারাজকে জিজ্ঞাসা করেন, আশ্রম এত নির্জন কেন? উত্তরে মহারাজ বলেন, কেন, এখানে আমরা পাঁচজন একসাথে থাকি। তারা কোথায় মহারাজ? (ছবি দেখিয়ে) এই তো, ঠাকুর, স্বামীজি, শ্রীমা, যীশু আর আমি। আসলে কিছু প্রবাসী ভারতীয় সন্ধ্যাবেলায় ভিড় জমায় ঠিকই, অন্যকেউ সেদিকে তেমন ঘেঁসে না। সে দেশে পঁচিশ বছর কাটিয়ে আসা স্বামী অভেদানন্দ কেমন করে তার দিন কাটত বলতে গিয়ে বলছেন,—'কখনও কখনও জপধ্যান করতাম, কখনও পড়াশোনা করতাম, এমনি করে দিন কাটাতাম। সেখানে তো নিজের ভাবের লোক ছিল না, নিজের ভাবে নিজে একলা থাকতাম।' (যেমন শুনিয়াছি—স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ, দ্বিতীয় ভাগ, প্রথম সংস্করণ, পৃষ্ঠা - ১৬২)।

১৯০০ সালে স্বামী তুরীয়ানন্দ আমেরিকার এক নির্জন স্থানে 'শান্তি আশ্রম' স্থাপন করেন। সেটাই প্রথম। চারিদিকের লোক বলাবলি শুরু করে এরা কারা। নিশ্চয় একদল পাগল হবে। স্বামীজী সেই ১৮৯৩ থেকে আমেরিকায় বেদান্ত প্রচার করে চলেছেন। তারপর যথাক্রমে সারদানন্দ, অভেদানন্দ, তুরীয়ানন্দ আমেরিকার যত্রতত্র সভা সমিতি করে বেড়িয়েছেন। কিন্তু সাত বছর এই প্রচেষ্টার পর দেখা যাচ্ছে এদের কেউ চেনে না।

আসলে সর্ব দেশে সর্ব যুগে কিছু ধর্ম পাগল লোক জন্মায়। তারাই এই সব নিয়ে মাতামাতি করে। যেমন এক দল, মূলত মহিলারা, স্বামী বিবেকানন্দকে নিয়ে মাতামাতি করেছিল। কিন্তু সাধারণ মানুষ এ নিয়ে মাথা ঘামায় না। এদের চেনেও না। (আমার জীবন কথা—স্বামী অভেদানন্দ, দ্বিতীয় ভাগ, পৃষ্ঠা-২০৩)। দৈনিক বর্তমান পত্রিকায় বেশ কিছুদিন আগে একটা খবর পড়েছিলাম। কলকাতায় ধর্ম সম্মেলন উদ্বোধন করতে আসা নোবেল জয়ী আমেরিকান পদার্থবিদের (নাম ভুলে গেছি) কাছে স্বামীজা সম্বন্ধে জানতে চাওয়ায় বলেন তিনি স্বামী বিবেকানন্দের নামই শোনেন নি।

স্বামীজীর ছোট ভাই ডঃ ভুপেন্দ্রনাথ দত্ত সদ্য আমেরিকা থেকে ফিরেছেন। স্বামী সারদানন্দের সাথে দেখা করতে এসে তার অনুমতি নিয়ে একটা চুরুট ধরিয়ে বসেছেন।

ঘরে আরও উপস্থিত স্বামী শিবানন্দ। তাকে প্রশ্ন করা হয়—মার্কিনে এখন স্বামীজীর ভাব কেমন লোক নিচ্ছে? ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ভূপেন দত্ত — তার কথা আর কারুর মনে নেই। আর যে সব স্বামীরা বেলুড় থেকে যাচ্ছে তাদের কথায় কেউ Serious minded লোকে আমলই দেয় না। তারা নিম্ন শ্রেণীর মহিলাদের মধ্যে ধর্মপ্রচার করে বেড়ায়। (রামকৃষ্ণ পার্ষদ পরশে — স্বামী নির্লেপানন্দ, প্রথম প্রকাশ, পৃষ্ঠা-৩৯)।

যাক, আমরা আমাদের যত মত তত পথ থেকে অনেক দূর চলে এসেছি। আবার সেখানেই ফিরে যাই। স্বামীজী এককালে ব্রাম্ম সমাজের সাথে যুক্ত থাকলেও পরবর্তীকালে ব্রাম্ম সমাজী, আর্য সমাজীদের নিরাকারবাদ একদম উড়িয়ে দিয়েছেন। এবং তারা যে অদ্বৈতবাদ মানে না এর জন্য তাদের উপহাস মিশ্রিত ধমকানিও দিয়ে রেখেছেন। মূর্তি পূজার গুণাগুণ সম্বন্ধেও তাদের সম্যক অবহিত করে গেছেন। বলেছেন "আমি স্পর্ধা করিয়া বলিতে পারি আর কোন মত হইতে আমরা কোনরূপ নীতিতত্ত্ব পাই না।" "ইতিহাস খুঁজে দেখ, আদালত খুঁজে দেখ, বিশ হাজার অদ্বৈতবাদী বদমাইশ খুঁজে পেলে বিশ হাজার দ্বৈতবাদী বদমাইশও খুঁজে পাবে। বলতে কি দ্বৈতবাদীর সংখ্যা একটু বেশিই হবে।" (ভারতে বিবেকানন্দ, পৃষ্ঠা-৫৬৯)।

'স্বামীজী অকাট্য যুক্তিজাল প্রয়োগ করিয়া আর্য্য সমাজীদিগকে বিচার ও জ্ঞানের দৃষ্টিতে অদ্বৈতবাদ ব্যতীত আর কোন মতই টিকিতে পারে না, ইহা বেশ করিয়া বুঝাইতে লাগিলেন।' ....'আর তুমি আপনাকে যতদূর জ্ঞানী মনে করিতেছ, বাস্তবিক তুমি ততদূর জ্ঞানী নহ—তোমা অপেক্ষা উচ্চতর ভাবের ভাবুক (অদ্বৈতবাদী) আছে। এই রূপ নানাবিধ উপদেশ দ্বারা স্বামীজী আর্য্যসমাজের গোঁড়ামি দূর করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন।' (স্বামীজী বিবেকানন্দ, জীবন চরিত—প্রমথনাথ বসু, চতুর্থ খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৭৭২)। এরই নাম যত মত তত পথ।

শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী প্রশ্ন করছেন—"মহাশয় তবে কি আপনি বলিতে চাহেন, যাহারা মধুর সখ্যাদি ভাব অবলম্বনে এখন সাধনা করিতেছে, তাহারা কেহই ঠিক পথে যাইতেছে না?" স্বামীজী—"আমার তো বোধ হয় তাই—বিশেষত আবার যারা মধুর ভাবের সাধক বলে পরিচয় দেয় তারা।....." (স্বামীজীর বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, পৃষ্ঠা-১৪৫)।

আমরা দেখতে পাচ্ছি রামকৃষ্ণদেব এবং তার একান্ত পার্ষদরা নিজেদের উপাসনা ছাড়া অন্য সব উপাসনাকে উড়িয়ে দিয়েছেন। বৈষ্ণবদের ঘোষ পাড়া, পঞ্চনামী, কর্তাভজা, মধুর, সখ্য ইত্যাদি সাধনকে এক কথায় ভুল বলে দিয়েছেন। ব্রাম্মবাদীরা ভুল, আর্যসমাজীরা ভুল, দ্বৈতবাদ ভুল, বিশিষ্ঠা দ্বৈতবাদ ভুল, খ্রীষ্টানরা ভুল, বৌদ্ধরা ভুল, কোরাণ ভুল, সব ভুল। সবই যদি ভুল হবে তবে 'যত মত তত পথ' হবে কি করে? সেটাও ভুল।

স্বামীজী শিষ্যকে বলছেন—"অদ্বৈতবাদের সিংহনাদে বাঙাল দেশটা তোলপাড় করে তোল দেখি, তবে জানব তুই বেদান্তবাদী।" (বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৪৬)। "বেদান্তকে ছাড়লে সব ধর্মই কুসংস্কার।" (ঐ, পৃষ্ঠা-৪৬২)। তুমি যদি মান সব মত ধরেই সত্যে পৌঁছানো যায়, তবে সবাইকে বেদান্তবাদী করার জন্য তোমার এত আগ্রহ কেন? আর বেদান্ত ছাড়া অন্য সব মত কুসংস্কারই বা কেন? তুমি সেগুলো মান না বলে?

'রাজপুতানায় আলোয়ারের মহারাজা মঙ্গল সিং স্বামীজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। মহারাজা মূর্তি পূজায় বিশ্বাসী ছিলেন না। গুরু কৃপায় তিনি সেই বিশ্বাস লাভ করেন।' (নবযুগের মহাপুরুষ, পৃ - ৩৯৮) মূর্তি পূজায় কেউ অবিশ্বাসী হতেই পারে। তুমি বিশ্বাস করো বলে অন্যকেও প্রভাবিত করবে। তাহলে তো যত মত তত পথ অর্থহীন হয়ে পড়ল। তবে আমরা তো স্বামীজীর সবটা বুঝতে পারি না, স্বামীজী নিজেই বলে গেছেন "যদি আর একটা বিবেকানন্দ থাকত সে বুঝত এই বিবেকানন্দ কি করে গেল।" একটু যেন অহংকারের গন্ধ মিশে আছে না।

সব শেষে বলি, 'যত মত তত পথ' একটি নিরর্থক কথা। যার সত্যটা অন্য রকম। রামকৃষ্ণদেব নিজে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হলেও তার শিষ্যরা ছিলেন গোঁড়া হিন্দু। এতটাই গোঁড়া যে স্বামীজী বলে গেছেন—"কোন লোক হিন্দু সমাজ ত্যাগ করিলে সমাজে শুধু যে একটি লোক কম পড়ে তাহা নহে, একটি করিয়া শত্রু বৃদ্ধি হয়।" (বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৮৪)। এ হেন গোঁড়া মহাপুরুষরা নিজের মত ছাড়া অন্য মতকে স্বীকৃতি দেবে এ কখনও হয়?

স্বামী অভেদানন্দ বেদান্তের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে একটি সুন্দর শ্লোক আওড়াতেন। সংস্কৃত শ্লোকটির অর্থ করে বলতেন—"বনের মধ্যে শৃগালরা সব চিৎকার করছে, যেই সিংহ এসে গর্জন করতে লাগল তখন অন্যান্য পশু শৃগালাদি চুপ করে রইল, ভয়ে ত্রস্ত, কে কোথায় পালাবে পথ পায় না। সেই রকম জগতে যত শাস্ত্র আছে, এই শাস্ত্র এই বলছে, ও শাস্ত্র এই বলছে, নানা শাস্ত্রেতে নানা রকম, নানা মত, কেহ কারও সঙ্গে মিলে না, সেই সময় বেদান্ত যখন তার বাণী ঘোষণা করতে লাগল তখন সব চুপ। বেদান্তই হচ্ছে সনাতন ধর্ম, বেদান্তই হচ্ছে একমাত্র হিন্দুদিগের ধর্ম।" (যেমন শুনিয়াছি—ব্রহ্মচারী সম্বুদ্ধ চৈতন্য, প্রথম ভাগ, পৃষ্ঠা-৪৯)।

স্বামী অভেদানন্দজীর বোঝা উচিত ছিল, যখন সব ধর্মই বুঝতে পারছে তাদের ধর্মগুলো ভুল এবং বেদান্তই একমাত্র সত্য, তখন হিন্দুর সংখ্যা সত্তর কোটি না হয়ে সাতশ কোটি হওয়া উচিত ছিল। তা যখন হয় নি তখন বুঝতে হবে তোমার মত তুমি মান আর মানে তোমার অনুগামীরা, অন্য কেউ নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ শিষ্যদের প্রায় সকলের মধ্যেই আর একটা অদ্ভুত ধারণা কাজ করতে দেখেছি। প্রায় সকলেই মনে করেন ভারতের বৈদিক সত্যজ্ঞানের দিকে সারা বিশ্ব হাঁ করে তাকিয়ে আছে। এবং এই সত্যজ্ঞান লাভের উপরই আমেরিকা, জার্মান, ব্রিটিশ, ফরাসীদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। এই জ্ঞান যদি তারা লাভ করতে পারে তবেই টিকে থাকবে, না হলে ধ্বংস হবে। স্বামী বিবেকানন্দ, অভেদানন্দ, সারদানন্দ, গিরিশ ঘোষ, মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত থেকে শুরু করে সবাই এই কথাই বলে গেছেন।

বেড়ে হাসির কথাই বটে। তুমি একটা চাল নেই, চুলো নেই, চোর জোচ্চরে ভরা, কুসংস্কারে পরিপূর্ণ, পরাধীন দেশের নাগরিক, দুম করে বলে ফেললে "ভারতের নব অভ্যুত্থানে জগতের মুক্তি নির্ভর করছে।" অথবা "ভারত উঠলে জগৎ উঠবে।" কে বলল তোমাকে এমন রহস্যপূর্ণ কথা? জানলে কোত্থেকে তুমি তোমার ধর্ম না পেলে তারা আর বাঁচে না? আমরাই এইসব ধারণার একমাত্র খাদক। অন্যেরা মানে কিনা তারাই বলতে পারবে।

মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের এমনই একটি হাস্যকর উক্তি :—'ভারতবর্ষ পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ এ কথা আজকাল অনেকেই স্বীকার করেন। ভারতের লোক আবার বাংলার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে। কাজেই বাংলাদেশ পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান। তা না হলে তিনজন অবতার এখানে আসেন—বুদ্ধ, চৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ।' (শ্রীম দর্শন—তৃতীয় ভাগ, পৃ—১৬৪)। সত্যি, আনন্দে আমাদের ফুটিফাটা হওয়া উচিৎ ছিল। এই মুহূর্তে 'এবেলা' কাগজটি আমার হাতে। ৯.৫.২০১৩. দশম পৃষ্ঠায় 'আমেরিকায় আক্রান্ত শিখ', গিলবার্ট গ্রাসিয়া প্যারা সিংহ-র মাথায় লোহার রড দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত হেনেছে। কারণ, ভারতীয় দেখলেই তার রক্ত ফুটতে থাকে। এটা কোন বিচ্ছিন্ন একক ঘটনা নয়। কিছুদিন আগেই এক মহিলা এক ভারতীয় (বাঙালি) যুবককে মেট্রো রেলের সামনে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে। কারণ ঐ একই। ভারতীয় দেখলেই গা জ্বলতে থাকা। আমার এক দূরসম্পর্কীয় লতায় পাতায় আত্মীয় আমেরিকায় বসবাস করেন। ভদ্রলোক ইঞ্জিনিয়ার। অর্থাৎ সমাজে যথেষ্টই প্রতিষ্ঠিত। চুল দাড়ি কাটতে গেলে সেলুন তাকে ফিরিয়ে দেয়। কারণ নাপিতের ভয় এরপর হয়ত মার্কিনীরা আর তার সেলুনে ঢুকবেই না। তাহলে উপায়? উপায় আছে — 'ভারত উঠলে জগৎ উঠবে'— এই পাঁচনটা আমরা যেমন খেয়েছি বিদেশিদেরও খাওয়াতে হবে।

মুম্বইতে শুরু হয়েছে শচিন তেন্ডুলকরের অন্তিম টেস্ট। ২০০তম টেষ্ট খেলে তিনি অবসর নিতে চলেছেন। এই উপলক্ষে আমেরিকার এক বহুল প্রচারিত দৈনিকে 'হোয়্যার দ্য গডস লিভ অন অ্যান্ড অন' শিরোনামে একটি নিবন্ধ লেখা হয়েছে। 'এবেলা' পত্রিকা তার অংশবিশেষ আমাদের সকলের জন্য তুলে ধরেছে। লেখা হয়েছে 'এই ধারাবাহিক অকর্মন্যের দেশে (ভারতে) তিনি ছিলেন অনুতাপহীন ভাবে কর্মক্ষম;

এই আন্তর্জাতিক হীনমণ্যের দেশে তিনি ছিলেন জগৎ সেরা; যে দেশে বিশিষ্টরা পেখম তোলা ময়ূরের মতো ঘুরে বেড়ান সেখানে বহু সময়েই তিনি ছিলেন বেদনাদায়ক ভাবে নম্রতার প্রতীক; আত্ম-সম্মানের জন্য বুভুক্ষু দেশে তিনি ছিলেন মূর্ত আত্মাভিমান।' ......'এই মুহূর্তে এই অতিজীবিত ঈশ্বরের দেশে শচিনই সবচেয়ে সম্মানিত ভারতীয়।' .....'তবে কিনা, মূর্তি পূজা ভারতীয় শিল্পের অংশ। কয়েকটি ভারতীয় দেবমূর্তির তিনটি মাথা বা দশটি হাত। কারও শরীরে সাপ জড়ানো, কারও মাথার উপর দিয়ে নদী বয়। সচিন পবিত্র ক্রিকেট ব্যাট চালান।' 'শিব জ্ঞানে জীব সেবা'র পাঁচন বিদেশিদের গেলাতে না পারলে এমন হাস্যাস্পদ হয়েই চিরকাল কাটাতে হবে। তবে আমরাতো আত্মসম্মান বর্জিত জাত, আমরা বলতেই পারি কে কি বলল তাতে ভারি বয়েই গেল।

পাশ্চাত্যের লোকেদের ঈশ্বর ভাবনা ব্যাপারটা ঠিক কি রকম, আমরা বুঝে উঠতেই পারি না। মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ থেকে এটি আলোচনা করার চেষ্টা করছি।

পূর্বকালের ঋষিরা-চাষীরা দিবারাত্র হরিনামের কেমন বন্যা বইয়ে দিত প্রথমে সেই কথা বলে নিয়ে শ্রীম বলছেন—"ও দেশের লোকেরা কেবল ভোগ নিয়ে আছে। ওদের ওই উদ্দেশ্য কিসে বেশি দেহ সুখ লাভ হয় তার চেষ্টা। রেল, স্টীমার, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, শিল্পবাণিজ্য, কৃষিবিদ্যা, হাসপাতাল, ঔষধাদি, রেডিও, এরোপ্লেন, মায় সমস্ত বিজ্ঞানটাই দেহ সুখে লাগিয়েছে। সমগ্র মন দিয়ে ভগবানকে ভালবাস—ক্রাইস্টের এ কথা কেউ শুনছে না। মিশনারিদের চেষ্টাও বিফল হয়েছে।"

আসলে এরা ধর্ম ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ির মধ্যে একেবারেই নেই। যীশু গীর্জায় আছেন, থাকুন। মাঝে মধ্যে একবার দেখা দিয়ে এলেই তিনি খুশী। অতসব অষ্টপ্রহর নামগানের কোন প্রয়োজন নেই। তাও এসব যারা ধর্ম কর্ম মানে তারাই করে। বেশির ভাগই আমাদের মত, যীশুও এদের চেনে না, এরাও যীশুকে চেনে না। আর এই যে কিছু কিছু লোক মাঝে মধ্যে গীর্জায় যায় এটাই আমাদের মস্ত হাতিয়ার। তবে, ওরা কি ধর্ম মানে না? তাহলে গীর্জায় যায় কেন? কিন্তু কারা গীর্জায় যায়, আর এসবের পিছনে কত সময় ব্যয় করে, কে তার খবর রাখে। তাও এসব একশ বছর আগের কথা। এখন তো যারা ধর্ম নিয়ে মাতামাতি করে লোকে তাকে 'মাথা খারাপ' বলে অনুকম্পা দেখায়। স্বয়ং শ্রীমকেই এক পাশ্চাত্য ভক্ত ডক্টর হামেল এ কথা বলে গেছেন।

শ্রীম আর একটি কথা বলেছেন যা কিনা ভীষণ ভাবে সত্যি। আমাদের অভূতপূর্ব ভক্তি বিশ্বাসের গুণ গাইতে গিয়ে তিনি বলছেন—"বার মাসে তের পার্বণ সব ঈশ্বরকে নিয়ে। এমনটি কোথায় আছে? পাড়াগাঁয়েই এ সরল বিশ্বাস বেশি। শহরে পরে আসছে সব। পাড়াগাঁয়ের লোকেরাই ধর্মের এই সব আচরণ পালন করছে।"

আমরা এটা ভালই জানি একে তো অশিক্ষিতের দেশ, তায় শহরের তুলনায় গ্রামে শিক্ষার হার অতি কম। তাহলে কি বলা যায় না শিক্ষা যেখানে যত কম ধর্মও সেখানে তত বেশি। শহরে শিক্ষা একটু বেশি, ধর্ম একটু কম। সম্পর্ক হয়তো সরাসরি পাওয়া যাবে না, কিন্তু এটা হলে ওটা হয়। এ ঘটনা আমরা এ দেশেই দেখতে পাচ্ছি। আর যে দেশে শিক্ষার হার আমাদের তুলনায় অনেক বেশি সেখানে 'ধর্ম' যে তলানিতে গিয়ে ঠেকবে, একথা জোর দিয়েই বলা যায় না কি?

শ্রীম আমাদের ধর্মের সাথে পাশ্চাত্যের তুলনা টেনে বলছেন—"ওদেশের লোকেদের ঈশ্বর কি বস্তু তারই জ্ঞান নেই। এ সব বুঝবে কি করে?" (শ্রীম দর্শন, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৮৩)। এই ঈশ্বর জ্ঞান যাদের যত বেশি, অন্যান্য জ্ঞান তত কম। একথা মানতে আজ কষ্ট হবে, ভবিষ্যৎ কিন্তু বলবে ইহাই ঠিক। আজও আমরা সঠিকভাবে জানতে পারলাম না ঈশ্বর নামক শক্তিটি আসলে কী! জগৎ সংসারে তার প্রয়োজনীয়তা কতটুকু। আমাদের নিয়েই বা তার প্রয়োজন কী! তিনি এলেন কীভাবে! কোন্ সময়ই বা এলেন! এর প্রতিটি প্রশ্ন আমাকে তাড়া করে বেড়ায়। গন্ডা গন্ডা বাক্যজাল ছাড়া সঠিক উত্তর কেউ দেন না। বাজে কূট কাচালি ছেড়ে 'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহু দূর' মেনে নিয়ে 'সন্দেহের' জগৎ থেকে দূরে থাকতে উপদেশ দেন। কিন্তু তা বললে কি হয়! প্রশ্ন জাগে বলেই না মানুষ অন্য সব প্রাণীর থেকে আলাদা। 'বিশ্বাস' যুক্তিপূর্ণ হওয়াই কাম্য। যুক্তিপূর্ণ বিশ্বাসের জন্য মনে প্রশ্ন জাগাও অবধারিত। এ অধমের জগৎ সংসারে একটিই প্রশ্ন 'ঈশ্বর এলেন কীভাবে'। তিনি আছেন যখন, সৃষ্টি হয়েছেনও নিশ্চিৎ। সেটা কখন ও কীভাবে।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তার 'হিন্দু রসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাস' গ্রন্থে প্রথম সংস্করণে বলেছেন 'যে জাতের ধর্মগ্রন্থ বলছে ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা সেই জাতের পক্ষে বিজ্ঞান সাধনায় বেশিদূর এগোনো সম্ভব নয়।' আজ যদি আমরা আচার্য প্রফুল্ল রায়কে জীবনের পথপ্রদর্শক করতে পারতাম এই হীন দশায় পড়ে থাকতে হত না। বইটির প্রথম সংস্করণে উক্ত মন্তব্যটি ছিল। তখন তিনি জীবিত। মৃত্যুর পরের সংস্করণে এই মন্তব্যটি আর পাওয়া যায় না।

যত মত তত পথ-এর বার্তাবাহী শ্রীম একবার তার ভক্তদের এক নতুন সাধুর বক্তৃতা শুনতে পাঠান। সেদিনের বক্তৃতায় নবাগত সাধু বলেন, "যাও, গ্রামে গ্রামে যাও। টেকনিক্যাল সব শিক্ষা দাও। নিজেরাও শিখে নাও। দেশ সেবা কর। স্কুল কর, ঔষধ দাও, তোল, ওদের তোল।" ভক্তদের মুখে বক্তৃতার বিবরণ শুনে মাস্টারমশাই আঁতকে ওঠেন। 'ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া বলিতেছেন, "এ তো মহা মুশকিল। এ সব বিস্মরণ (ভুলতে) করতে আবার কত হ্যাঙ্গাম।" (শ্রীম দর্শন, ত্রয়োদশ ভাগ, প্রথম সংস্করণ, পৃষ্ঠা-৯৫)। মনে হয় কি শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ষদরা সকলের মতকে সমান গুরুত্ব দিতেন? তবুও 'যত মত তত পথ'।

টাকা মাটি মাটি টাকা

শোনা যায় বালক ব্রম্মচারী-রজনীশের মত সাধকেরা কখনও টাকা ছুঁয়ে দেখেন নি। আসলে যাদের হাতে বাঘা বাঘা ডোনেটর আর বাঘা বাঘা অ্যাকাউন্টেন্ট থাকে তাদের টাকা ঘেঁটে হাত ময়লা করার প্রয়োজনও পড়ে না। রামকৃষ্ণদেবকেও সুখে স্বচ্ছন্দে রাখার মত দাতার অভাব কোনদিনই হয় নি, তারও টাকা ছুঁয়ে দেখার প্রয়োজন কোনদিনও পড়ে নি। সব সময় তিনি মনে করতেন টাকা পয়সা নিয়ে যে জন মজেছে, সে জন ডুবেছে। এই ধারণটাকেই মনের মধ্যে এমন বধমূল করে নিয়েছিলেন যে সত্যি সত্যিই কোনদিনও তিনি পয়সা ছুঁতে পারতেন না। টাকা পয়সার স্পর্শে তার হাতের আঙুল বেঁকে যেত পর্যন্ত। কখনও মথুর বাবু, কখনও মাড়োয়ারী লক্ষীনারায়ণ, কখনও বা অন্য কোন জমিদার তাকে বেশ মোটা অঙ্কের টাকা দিতে চাইলেও, সে টাকা তিনি নিতে পারেননি। টাকার প্রতি লোভ তার কোনদিনও ছিল না।

একবার এক ভক্ত রামকৃষ্ণদেবকে পরীক্ষা করার জন্য তার বিছানার নিচে টাকা লুকিয়ে রাখে। রামকৃষ্ণদেব সে বিছানায় বসতে পারেন নি। যদিও গুরুদেব কাঞ্চনের প্রতি কতদূর নিরাসক্ত সেটি বোঝানোর জন্য এটি নিছক একটি গল্প মাত্র হতে পারে। ওই যে অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার বা স্বামী নির্লেপানন্দ স্বীকার করে গেছেন না রামকৃষ্ণের জীবনী গ্রন্থে কিছু অসঙ্গতি, কিছু অর্ধসত্য এবং কিছু অসত্য লুকিয়ে আছে। লুকিয়ে রাখা পয়সার কারণে বিছানায় বসতে না পারাটা ওই পর্যায়েরই কোন গল্প হবে।

অন্যের মার খাওয়া দেখে শ্রীরামকৃষ্ণের শরীরে প্রহারের চিহ্ন ফুটে উঠেছে, মেনে নেওয়া যায়। স্ত্রী-ভাবে সাধনকালে তার শরীরের ঘর্মগ্রন্থি বিদীর্ণ হয়ে রক্ত বেরিয়ে আসছে, তাও কষ্ট করে মেনে নিতে পারি। যদিও কথামৃতকার কথাটিকে অস্বীকার করে বলেছেন, 'কই, আমরা ঠাকুরের রক্তপাত দেখিনি।' (শ্রীম কথা—স্বামী জগন্নাথানন্দ, পৃষ্ঠা-২৩৪) । তবুও এগুলোর মধ্যে একটা ক্ষীণ সম্ভাবনা আছে। কিন্তু মহাবীরের ভাবে সাধনকালে রামকৃষ্ণদেবের ল্যাজ গজিয়েছিল একথা মানতে পারব না। কিন্তু সব জীবনী গ্রন্থ, যেমন লীলাপ্রসঙ্গ-২২৩ পাতা সে কথাই বলছে। জানিনা কিভাবে একই কথা সকলে ব্যবহার করছে। কিন্তু বিছানার নিচে টাকা আছে না জেনেই রামকৃষ্ণদেব বিছানায় বসতে চাইছেন না, বা, হঠাৎ করেই তার ল্যাজ গজাচ্ছে, আবার হঠাৎ করেই তা উধাও হয়ে যাচ্ছে। এসব মেনে নেওয়া একটু মুশকিলের ব্যাপার। আসলে ভক্তরা তাদের গুরুদেবের কাঞ্চনের প্রতি তীব্র অনীহা প্রমাণ করার জন্য এরকম একটা গল্প রূপক হিসাবে ব্যবহার করেছেন।

সোজা পথে দেখতে গেলে শ্রীরামকৃষ্ণের সাথে কাঞ্চনের কোন সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু নিন্দুকের তাতে কি! তাকে তো কিছু খুঁত খুঁজে বার করতেই হবে। অতএব সোজা পথে না হয় তো বাঁকা পথ ধর।

আচ্ছা, মানুষের টাকার প্রয়োজন হয় কেন? সোজা উত্তর, বিত্ত বৈভব বাড়ানোর জন্য, ঘর সংসার প্রতিপালনের জন্য। ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু সন্ন্যাসী মানুষ তার আবার বিষয় বৈভব কিসের! একমাত্র হতে পারে স্ত্রী পুত্রের জন্য সঞ্চয়। সন্তান তো তার ছিল না, অতএব স্ত্রীর জন্য সঞ্চয়। সেটা কিন্তু তিনি যথেষ্ট বিচক্ষণতার সাথেই করেছেন। স্ত্রীর জন্য সঞ্চয় সব মানুষেরই করা উচিত। সংসারীর এটি অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু রামকৃষ্ণদেব তো সংসারবন্ধ জীব নন। তিনি তো সংসারী কীটের অনেক উর্ধে। তাহলে তার স্ত্রীর জন্য সঞ্চয় কেন?

রামকৃষ্ণদেব দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে সাত টাকা মাইনের পূজারী ছিলেন। তিনি তো টাকা পয়সা ছুঁতে পারতেন না, তাই ভাগ্নে হৃদয়কে দিয়ে সেই টাকা একটি বাক্সে তুলিয়ে রাখতেন। টাকা বড় তরল পদার্থ। যখন তখন খরচ হয়ে যাবার আশঙ্কা। বেহাত হবারও।

ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্যের 'ঠাকুর রামকৃষ্ণ' ২৩৫ পাতা থেকে কিছু অংশ তুলে দিচ্ছি— 'কালী বাটী হইতে প্রতি মাসে ঠাকুরকে সাতটি করিয়া টাকা দেওয়া হইত ও সেই টাকা হৃদয় একটি বাক্সে ফেলিয়া রাখিত। ঠাকুর একদিন বলিলেন হৃদয়কে—"দেখতো তোর বাক্সে কত টাকা আছে, ওকে গয়না গড়িয়ে দিতে হবে, ওরে ওর নাম সারদা-ও সরস্বতী, তাই সাজতে ভালবাসে।" "ওরে ওর সাথে আমার এই সম্পর্ক।" দেখা গেল বাক্সে তিনশ টাকা জমেছে। তাই দিয়ে সীতার মতো ডায়মন কাটা বালা সারদামণিকে গড়িয়ে দেওয়া হল। যদিও খরচ হয়েছিল দুশ টাকা। একশ টাকা সারদামণিকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।'

ঘটনা এই পর্যন্তই। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে এখান থেকেই অনেক রত্ন উঠে আসতে পারে। যার দাম তিনশো টাকার অনেক বেশি। প্রথমত, সোনা সব সময় মূল্যবান সম্পত্তি। স্ত্রীকে সোনার কিছু গড়িয়ে দিলে সেই সোনাটুকুই তার আপদে বিপদে ভরসা হয়ে দাঁড়াবে। আর একটি কারণ আছে, যেটি আমার ধারণায় সোনা গড়িয়ে দেবার পিছনে প্রধান কারণ। একটু ব্যাখ্যা করে বলবার চেষ্টা করছি।

রামকৃষ্ণদেব নিজে টাকা পয়সা ধরতেন না। মাইনের পুরো টাকাটাই হৃদয়ের বাক্সে, হৃদয়ের ভরসায় তুলে রাখতেন। কিন্তু তিনি খুব ভালো ভাবেই জানতেন হৃদয় খুব একটা সুবিধার লোক নয়। গ্রামে তার অনেক ধারদেনা রয়েছে। দক্ষিণেশ্বর মন্দির থেকে যে টাকা মাইনে পেতেন তাতে তার অবস্থার তেমন কোন উন্নতি হয়নি। এমনকি স্বয়ং রামকৃষ্ণদেবকে শিখণ্ডী সাজিয়ে ব্যবসা করার মতলবও তার ছিল। হৃদয়ের কথায় রাজী

না হওয়ায় রামকৃষ্ণদেবকে অনেক ঝকমারিও সইতে হয়। তাকে সে সময় হৃদয় ভিন্ন কেউ দেখার ছিল না বলে হৃদয়ের দুর্ব্যবহার মুখ বুজে সইতেও হয়।

সব মিলিয়ে রামকৃষ্ণদেব খুব ভালো ভাবেই জানতেন হৃদয়ের কাছে জমানো টাকা খুব সুরক্ষিত নয়। আবার ভাগ্নে বলে কথা, একবার রাখতে দিয়ে ফেলেছেন, আবার বলেন কি করে 'অ্যাই, আমার টাকা আমাকে ফিরিয়ে দে।' সে তো বলা যায় না। তাই ওই গয়না গড়ানোর প্রয়োজন। গয়না একবার গড়ানো হলে সে তো আর হৃদয়ের বাক্সে পড়ে থাকবে না। যার জন্য গড়ানো হল তার কাছে চলে যাবে। এমনকি জমানো তিনশ টাকার দুশ টাকায় কাজ মিটে গেলেও বাকি একশ টাকা কিন্তু আর হৃদয়ের বাক্সে ফিরে যায় নি। সেটা কিন্তু সারদাদেবীর হাতে চলে গেছে। অতএব হৃদয়ের হাত থেকে টাকা উদ্ধার করাটাও গয়না গড়ানোর একটা কারণ হতে পারে।

আবার বিয়ের সময় গয়না নিয়ে একটু গণ্ডগোল হওয়ায় রামকৃষ্ণদেব কথা দিয়েছিলেন সময় এলে সারদাদেবীকে বহু গয়না তিনি গড়িয়ে দেবেন। আবার বউটাকে তো কিছুই দিলাম না, গয়না মেয়েদের প্রিয় জিনিস। তাই পরে একটু আনন্দ করুক। এমন মনোভাবও হয়তো শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে কাজ করেছিল। তবে যে মনোভাবই থাক না কেন, স্ত্রীর ভবিষ্যৎ এবং হৃদয়ের হাত থেকে অর্থ উদ্ধার, এ দুটি কারণ নিয়ে কোন সংশয় নেই।

আজ থেকে প্রায় দেড়শো বছর আগে তিনশ টাকাটা নেহাত কম টাকা নয়। আজকের দিনের হিসাবে হাজার হাজার তো হবেই। কারণ ঐ রকম একটি বালা তৈরি করতে আজকের দিনে বহু হাজারের নিচে কোন মতেই হবে না। এতগুলো টাকা একজন অভাবী লোকের কাছে বিনা সাক্ষ্য প্রমাণে পড়ে থাকলে বেহাত হয়ে যাবার সমূহ আশঙ্কা। রামকৃষ্ণদেব একথা বিলক্ষণ বুঝেছিলেন।

তবে একথা বুঝে যে রামকৃষ্ণদেব মস্ত অন্যায় করে ফেলেছেন তা মোটেও বলছি না। বলছি শুধু 'টাকা মাটি, মাটি টাকা'র অঙ্কটা ঠিক মিলছে না। নিজের উপার্জিত অর্থের প্রতি এবং স্ত্রীর ভবিষ্যতের প্রতি তার যথেষ্ট সজাগ নজর ছিল। তাকে তো একদম বিষয় বুদ্ধি রহিত বলে মনে হচ্ছে না। নিজের পেটের চিন্তা তার ছিল না। স্ত্রীর ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবাটাও বৈষয়িক লোকেরই লক্ষণ। এবং রামকৃষ্ণদেব সেই বিষয়ী লোকের ধর্ম যথাযথ ভাবেই পালন করেছেন। অর্থ তার কাছে অচ্ছুৎ হলেও অকিঞ্চিৎকর হয়ে ওঠেনি।

এই ঘটনাটাই অন্য একটি বই থেকে পড়ে শোনাচ্ছি। সঙ্গে নতুন কিছু তথ্যও পাওয়া যাবে—'শ্রীমা ঠাকুরের দেহাবসানে একদিন বলিলেন, "ঠাকুর তার মাহিনার টাকা জমাইয়া আমার তাবিজ গড়াইয়া দিয়াছিলেন। হৃদু একটি বাক্সে টাকা রেখে দিত। নিজে টাকা ছুঁতে পারতেন না। আমি দক্ষিণেশ্বরে যাবার কিছুদিন পরে একদিন হৃদুকে বলেন, দেখতো বাক্সে কত আছে। হৃদু গুনিয়া বলায় তিনি বলেন, ওতে হয়ে যাবে। সেই টাকার তাবিজ গড়াইয়া দেন। তার সকল দিকে আমার প্রতি কর্তব্য জ্ঞান ছিল"।'

'একদিন দক্ষিণেশ্বরে তিনি নহবতে এসে জিজ্ঞাসা করেন, "হ্যাঁগা, তোমার ক-টাকা হলে হাত খরচ চলে?" "এই পাঁচ-ছয় টাকা হলেই চলে।" তারপর প্রশ্ন করলেন "বিকেলে কখানা রুটি খাও?" তিনি লজ্জায় মাটিতে মিশিয়া গেলেন, খাবার কথা কি করিয়া বলেন? এদিকে ঠাকুরেরও প্রশ্নের বিরতি নাই। তখন তিনি বলিলেন "এই পাঁচ-ছয় খানা খাই।" ঠাকুর খরচের পরিমাণ হিসাব করিয়া বলিলেন "তাহলে পাঁচ-ছয় শত টাকায় তোমার খুব চলে যাবে।" পরে ঐ পরিমাণ টাকা এক সঙ্গে জমা হলে তিনি উহা বলরামকে দেন। বলরাম জমিদারীতে খাটাইয়া ছয় মাস অন্তর তিরিশ টাকা সুদ আমাকে দিত।' (শ্রীশ্রী লক্ষ্মীমণিদেবী—শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র সেনগুপ্ত, পৃষ্ঠা-৪২)। অথবা, (শ্রী শ্রীমায়ের পদপ্রান্তে—স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৮৮৯-৮৯০)।

দেখা যাচ্ছে রামকৃষ্ণদেব সারদামণির ভবিষ্যতের কথা ভেবে কিছু টাকা সংগ্রহ করে বলরাম বসুর জমিদারীতে জমা রাখছেন। টাকার সঠিক পরিমাণ চারশত। কিন্তু চারশ টাকাও তো কম নয়। কোথায় পেলেন তিনি এতগুলো টাকা? এ ব্যাপারে সঠিক আলোকপাত করবেন শ্রীম-মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

"স্ত্রী সতী-সাধ্বী হলে তার জন্য অন্ন বস্ত্রের ব্যবস্থা করে যেতে হয়। ঠাকুর নিজে মা ঠাকুরণের জন্য একটি কুটির রেখে গিছলেন, আর চারশ টাকা। সখী ভাবের সাধনের সময় যে সব অলঙ্কার দিছলেন মথুরবাবু, সেইগুলি বিক্রি করে এই চারশ টাকা হয়। বলরামবাবুদের জমিদারীতে জমা ছিল। সুদ হতো বছরে (মতান্তরে ছয় মাসে) ত্রিশ টাকা। (সহাস্যে) ঠাকুর মাঝে মাঝে আমাদের জিজ্ঞেস করতেন, আচ্ছা, একজন ব্রাহ্মণ বিধবার মাসে দু টাকা হলেই হয়ে যায়, কি বল? এদিকে তো দিন রাতের খবর নাই, গায়ে কাপড় আছে কি নাই তার খবর নাই, ওদিকে কত ভাবনা।" (শ্রীম দর্শন, সপ্তম ভাগ, প্রথম সংস্করণ, পৃষ্ঠা-৬২)। গয়না বেচা চারশ টাকার সাথে মাইনের সাত টাকাও বলরাম বসুর জমিদারীতে সুদ খাটত।

রামকৃষ্ণদেব জানতেন টাকার বদলে মাটি পাওয়া যায়, মাটির বদলে টাকা। তাই দুটোই তার কাছে সমান ত্যাজ্য। তবুও স্ত্রীকে উপদেশ দিচ্ছেন—"তোমাকে ভক্তেরা যে যেখানেই নিজের বাড়িতে আদর করে রাখুক না কেন, কামারপুকুরের নিজের ঘরখানি কখনো নষ্ট কোর না।" (শ্রীমা সারদাদেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ, পৃষ্ঠা-১৬৩)। স্ত্রীর ভবিষ্যতের কথা ভেবে সঞ্চয় মোটেও নিন্দনীয় নয়। তবে যে আদর্শ থেকে টাকা মাটি মাটি টাকা বলা হয় তার সাথে ঠিক মেলাতে পারছি না।

এই সূত্র ধরে আর একটি কথা তিনি বলেছেন—"একটি পয়সার জন্য যদি কারও কাছে হাত পাত, তবে তার কাছে মাথাটি কেনা হয়ে থাকবে। বরং পরভাতা ভাল, পরঘোরো ভাল নয়।" এই 'পরভাতা ভাল' কথাটা আমার কাছে ঠিক পরিষ্কার নয়।

পরের ঘরে খাওয়া সে আর ভালো হয় কি করে! তবুও হলফ করে বলতে পারি শ্রীরামকৃষ্ণকে ভক্তরা টাকা পয়সার ব্যাপারে যতটা নিস্পৃহ বলে জানেন, ততটা তিনি নন। 'ঠাকুর একবার দেশে গিয়ে ঘরে চাউলের অভাব হইয়াছে জানিয়া, কামারপুকুরে দেড় বিঘা ও শিহরে চৌদ্দ বিঘা এই মোট সাড়ে পনেরো বিঘা জমি বাড়ির গৃহদেবতা রঘুবীরের নামে খরিদ করেন।' (শ্রীশ্রীমা সারদামণি দেবী—মানদাশঙ্কর দাশগুপ্ত, পৃষ্ঠা - ১২৩)। ঘর সংসার নিয়ে চিন্তা তার যথেষ্টই ছিল।

'একবার—"ঠাকুরের মাইনে নিয়ে হিসাবে কি গোল ছিল, কম দিয়েছিল। আমি খাজাঞ্চীকে বলতে বলায় বললেন 'ছি ছি! হিসাব করব'?" হিসেব নিকেশের মামলায় শ্রীরামকৃষ্ণের তবু একটু 'কিন্তু কিন্তু' ভাব ছিল। ভগবতী সারদামণি কিন্তু ঘোর হিসাবি।

সবশেষে বলি, এক সাধুর টাকা জমানো দেখে রামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন—"যে আগু পিছু ভাবে সে শালা যাবে।" তিনি নিজে কিন্তু স্ত্রীর ভবিষ্যৎ নিয়ে যথেষ্টই 'আগু পিছু' ভাবতেন। কেন ভাবতেন সেটাও বলব? যে কিনা সাক্ষাৎ ভগবতী তার আবার ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তা কিসের! কিন্তু তখনও তো তিনি ভগবতী হন নি। আর ভগবতী যে হতে পারবেনই এমন নিশ্চয়তাও তখনও রামকৃষ্ণদেব পাননি। তাই তার এত চিন্তা।

ভগবানের স্ত্রী, অতএব ভগবতী হবার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েই আছে। তার সাথে স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি, 'সারদা আসলে সরস্বতী, জ্ঞান দিতে এসেছে,' 'আমার কাজ অর্ধেক করা হয়েছে, জগতের কল্যাণের জন্য বাকী কাজ 'ও' করবে।' ইত্যাদি ইত্যাদি। ফলস্বরূপ জগজ্জননী রূপে সারদামণির দ্বিতীয় জন্ম। একবার সারদামণির 'দৈব শরীর' প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে রামকৃষ্ণদেব বলেন, "নবতে যিনি থাকেন, তার বুকের গড়ন মা জগদ্ধাত্রীর মতো, দোমেটে করে গড়া।" (সারদা-রামকৃষ্ণ, শ্রীদুর্গাপুরী দেবী, প্রথম প্রকাশ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৩৬১ পৃ - ৩৩৭)। এটা তিনি জানলেন কীভাবে কে জানে।

আরও একজনকে রামকৃষ্ণদেব ভগবতী জ্ঞানে সকলকে পুজো করতে বলে গেছেন। তিনি হলেন সারদামণির সহচরি এবং তার নিজের ভ্রাতুষ্পুত্রী, বালবিধবা এবং অনাথা লক্ষ্মীমণিদেবী। খুব একটা কেউ কেটা না হলেও তিনিও দিব্যি গুরু মা হয়েছিলেন। এবং নিশ্চিন্ত জীবন কাটিয়েছেন। রামকৃষ্ণের অবর্তমানে লক্ষ্মীমণির ভবিষ্যৎ যে অন্ধকার তা তিনি বেশ বুঝেছিলেন।

রামকৃষ্ণদেব বলতেন লক্ষ্মীর 'মা শীতলার' অংশে জন্ম। তাকে দু-তিন বার রামকৃষ্ণদেব পুজোও করেন। বিধবা হলেও তাকে মাছ খাইয়ে সকলকে বুঝিয়ে দেন মা শীতলার জন্য নির্দিষ্ট মৎস্য প্রসাদ লক্ষ্মীমণিরও প্রাপ্য। বলতেন, 'আর আসব না বললেই হল, কলমীর দল, টান মারলেই এসে হাজির হবি।'

কাশীপুরে রামকৃষ্ণদেব লক্ষ্মীদিদিকে দুইবার শীতলা জ্ঞানে পুজো করেন। গিরিশচন্দ্রকে বলেন, "লক্ষ্মীকে মিস্টি টিস্টি একদিন খাইও, তাহলে মা শীতলাকে ভোগ দেওয়া হবে। ও তারই অংশ।" (ভক্তমালিকা—স্বামী গম্ভীরানন্দ, দ্বিতীয় ভাগ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৬১, পৃ-৫০৬)। স্বয়ং মা শীতলাকে মাত্র একদিন মিস্টি খাইয়ে দায়িত্ব খালাস করে কোন্ পামর।

পরবর্তীকালে লক্ষ্মীমণির কিছু শিষ্য জুটেছিল এবং তাদের দ্বারাই শেষ বয়সে তিনি পালিতা হয়েছিলেন। পুরীতে নিজের জন্য একটি বাড়িও করেছিলেন। (শারদীয়া উদ্বোধন, ১৪১৭, পৃষ্ঠা - ৬৯১)। ভাই শিবরামকে প্রতি মাসে কুড়ি-বাইশ টাকা পাঠাতেন। ভাই দক্ষিণেশ্বরে এলে পঞ্চাশ-ষাট টাকাও হাতে গুঁজে দিতেন। (শ্রী শ্রী লক্ষ্মীমণি দেবী—শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র সেনগুপ্ত, পৃ - ৬১, ২৬৭)। সময়ের বিচারে টাকাটা কিন্তু খুব সামান্য নয়। নাচ, গান, অভিনয় কলায় তিনি বেশ পটু ছিলেন।

রামকৃষ্ণ এবং সেকালের মহাপুরুষেরা

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

আগে একবার উল্লেখ করেছি সে যুগের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাথে শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎকারগুলি প্রতিটি 'অসফল'। তবে এর মধ্যে কেশবচন্দ্র সেন, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, বৈষ্ণবচরণ, শশধর তর্কচূড়ামণি, পণ্ডিত পদ্মলোচন, গৌরী পণ্ডিত এদের আমি ধরতে চাই না। এরাও যথেষ্ট নামকরা লোক ছিলেন, কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এরা প্রত্যেকেই ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের মতই ধর্ম জগতের লোক। শিব ঠাকুর সত্যি না মা কালী সত্যি। সাকার সত্যি না নিরাকার সত্যি। ব্রম্ম সত্য জগৎ মিথ্যা, না, ব্রম্মও সত্য জগৎও সত্য। এদের সমস্যাগুলো এইরকম। আর এই সমস্যাগুলোর একটা সমাধান হয়ে গেল তো সব ভাই ভাই।

এরা প্রতেকেই একই তরণীর যাত্রী। আর একই তরণীর যাত্রীদের মধ্যে সম্পর্কটাও সুষ্ঠ হওয়াই স্বাভাবিক। এদের মধ্যেকার সাক্ষাৎকারে একে অপরের সমালোচনার সুযোগ খুব কম। ভয়ও যে একদম নেই তাও নয়। এর ভগবানকে ছোট করলে ও কি ছেড়ে কথা বলবে? অতএব এদের মধ্যের আলাপ আলোচনা থেকে সে যুগের নামকরা লোকেদের সাথে শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎকার বুঝে ওঠা যাবে না। সেটা বুঝতে গেলে দেখতে হবে মধুসূদনের সাথে, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে, বঙ্কিমচন্দ্রের সাথে, বিদ্যাসাগরের সাথে, শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎকার। এমনকি সাক্ষাৎকার না ঘটলেও প্রায় সমসাময়িক রবীন্দ্রনাথের আলাপ আলোচনাকেও এসবের মধ্যেই দেখতে হবে। এবার কিন্তু দেখা যাবে রামকৃষ্ণদেব 'অসফল' অথবা 'ফেল'।

এখানে আমার উক্তির সমর্থনে আবার রমাঁ রলাঁর বিখ্যাত আলোচনামূলক জীবনীগ্রন্থটিকে ব্যবহার করব। রলাঁ অতবড় জীবনী লিখে ফেললেন, অথচ তার বইতে কোথাও মাইকেল অথবা বঙ্কিম অথবা বিদ্যাসাগরের সাথে শ্রীরামকৃষ্ণের বিখ্যাত সাক্ষাৎকার গুলির একটিকেও রাখলেন না। কেন?

যে সাক্ষাৎকারগুলি ভক্তমণ্ডলীতে এত প্রচারিত। বিভিন্ন সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক অথবা বাৎসরিক পত্রিকায় হামেশাই দেখা যায় 'ঠাকুর এবং মাইকেল', 'ঠাকুর এবং বঙ্কিম' অথবা 'ঠাকুর এবং বিদ্যাসাগর' এই রকম নামে কত প্রবন্ধ। অথচ রমাঁ রলাঁ সেগুলির দিকে তাকালেনই না। এ কখনও হতে পারে? কিন্তু এই রকমই হয়েছে। আসলে রমাঁ

রলাঁ দেখেছিলেন এই সাক্ষাৎকারগুলি শ্রীরামকৃষ্ণের পক্ষ নিয়ে আলোচনার যোগ্যই নয়, অথবা প্রতিটি সাক্ষাৎকারই শ্রীরামকৃষ্ণের দিক থেকে 'ব্যর্থ'।

দেবেন্দ্রনাথের সাথে শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎকারকেও তিনি নিশ্চিৎ ভাবেই বাদ দিতেন। কিন্তু বাধ সেধেছে কেশবচন্দ্র এবং ব্রাহ্ম সমাজ। ব্রাহ্ম সমাজের সূত্র ধরে বাধ্য হয়েই দেবেন্দ্রনাথকে তিনি জায়গা দিয়েছেন। মধ্যিখানে ব্রাহ্ম সমাজ না থাকলে দেবেন্দ্রনাথ প্রসঙ্গ উহ্যই থেকে যেত। রবীন্দ্রনাথকেও তিনি বিশেষ জায়গা দিতে পারেননি। সেখানেও সফলতা কম।

যদিও এই সাক্ষাৎকারগুলি নানা হাত ঘুরে রামায়ণ মহাভারত হয়ে আমাদের হাতে এসে পৌছায়। নিন্দুক ডুব দিয়েছে গহিন সাগর তলে। মনে আশা যদি উঠে আসে অরূপরতন।

১৮৬৮ সালের পরে কোন এক সময় মাইকেল মধুদূদন দত্ত দক্ষিণেশ্বরে এসেছিলেন। মন্দিরের সাথে মন্দির লাগোয়া ম্যাগাজিন কোম্পানীর মোকদ্দমা সংক্রান্ত কাজকর্ম দেখতে মথুরবাবুর বড় ছেলে দ্বারিকবাবু মাইকেলকে মন্দিরে নিয়ে এসেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের নামডাক তখন কলকাতা এবং সংলগ্ন এলাকায় বেশ একটু ছড়িয়েছে। মাইকেলও নিশ্চয়ই তার নাম শুনেছিলেন। মামলার কাজকর্ম মিটে যাবার পর মন্দির ঘুরতে ঘুরতে মাইকেল ভাবলেন 'যাই একবার দেখে আসি সেই সাধুকে।' মন্দিরের দপ্তরখানার সাথে বড় ঘর। সেখানেই শ্রীরামকৃষ্ণের সাথে মাইকেলের দেখা হয়।

তখন রামকৃষ্ণদেবের সাথে নারায়ণ শাস্ত্রী নামে এক যোগী থাকতেন। রামকৃষ্ণদেব নারায়ণ শাস্ত্রীকে মাইকেলের সাথে কথা বলতে বলেন। কেন তিনি নিজে কথা বললেন না? মাইকেল নিজের ধর্ম ত্যাগ করেছেন, তাই।

মাইকেল বলেন পেটের জন্য তিনি অন্য ধর্ম গ্রহণ করেছেন। যদিও আমরা সকলেই জানি পেটের জন্য তিনি হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করেননি। তার মধ্যে একটু বাড়াবাড়ি রকমের সাহেবিয়ানা ছিল। আর তাতেই তিনি খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে বসেন। কথামৃত ছেড়ে এই সাক্ষাৎকারটি একটু অন্য জায়গা থেকে দেখা যাক। সেখানেও শ্রীম, মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

'শ্রীম (স্বগত)—কি আশ্চর্য! মাইকেল মধুসুদন দত্ত অত বড় লোক। উনি আমার হিরো ছিলেন ছেলেবেলায়। কিন্তু তার সঙ্গে কথা কইতে পারলেন না ঠাকুর। বলছেন, কে যেন আমার জিভ টেনে ধরেছে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—তিনি কি মাইকেলকে নিন্দা করলেন? তা নয়। একটা উচ্চ আদর্শ দেখালেন। এরা সংসারের সব বুদ্ধি নিয়ে বড়। তাকে ঠাকুর বলতেন 'চিড়া ভেজা বুদ্ধি'। আর ঠাকুর হলেন ব্রহ্ম ধনে ধনী। আলোচনার সাধারণ বিষয় নাই। একজনের

জীবনের আদর্শ কামিনী কাঞ্চন, আর একজনের-ঈশ্বর। ঈশ্বরের কথা বললে ও বুঝবে কেন? বিকারের রোগী প্রবোধ মানে না।

একজন ভক্ত—ঠাকুরই বলছেন, যাকে দশজনে মানে গণে তার ভিতর ঈশ্বরের শক্তি বিশেষ। মাইকেলের ভিতর তো ঈশ্বরের শক্তি। অত বড় কবি, বাংলায় অমিতাক্ষর ছন্দের জনক। তবে ঠাকুর কেন কথা কইলেন না এর সঙ্গে?

শ্রীম—হ্যাঁ, শক্তি বিশেষ বটে, তবে অবিদ্যা শক্তি, বিদ্যা শক্তির কথা বললে ও শুনবে না। নেশা কমলে তখন হিতবচন শোনে। নইলে বলে, বেশ আছি বাবা। তাইতো গীতায় বলেছেন অর্জুনকে......।' (শ্রীম দর্শন, একাদশ ভাগ, প্রথম সংস্করণ, পৃষ্ঠা-৪৪-৪৫)।

গীতায় কৃষ্ণঠাকুর অর্জুনকে কি কি বলেছেন আপাতত সে সব আমাদের দরকারে লাগছে না। আমরা যেটুকু জানার জেনে নিয়েছি। ধর্মত্যাগী মাইকেলের সাথে শ্রীরামকৃষ্ণ কথা পর্যন্ত বলতে পারেননি। কে যেন তার জিভ টেনে ধরেছে।

পেটের জন্য ধর্ম ত্যাগ। শ্রীরামকৃষ্ণ হয়তো তার যুক্তিতে ঠিকই আছেন। কিন্তু সাক্ষাৎকারটি যে মিশনের প্রচারের পক্ষে খুব একটা সফল নয় একথা বলাই যায়। শ্রীরামকৃষ্ণদেবও কিন্তু স্বেচ্ছায়, সব রকম নিয়ম বিধি পালন করেই ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে শ্রীরামকৃষ্ণের যোগাযোগ করিয়ে দেন মথুরবাবু। তারা সহপাঠী ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে আলোচনার সময় ব্রাম্ম সমাজ এবং ব্রাম্ম সমাজীদের সাথে শ্রীরামকৃষ্ণের সম্পর্ক নিয়ে কিছু বলার চেষ্টা করব।

দেবেন্দ্রনাথকে দেখে রামকৃষ্ণ তার বুক-পিঠ দেখতে চান। তার কাছে কিছু ধর্ম কথা শোনেন। কিছু হাসি ঠাট্টা এসব হয়। রামকৃষ্ণদেব বুঝতে পারেন দেবেন্দ্র খুব 'বড় মানুষ'। তার যোগ-ভোগ দুইই আছে। তিনি কলির জনক। এই রকম অনেক কিছু। পরের অংশ কথামৃত থেকে তুলে দিচ্ছি। পদটির নামকরণ এই রকম—

ব্রাম্ম সমাজে 'অসভ্যতা'—কাপ্তেন, ভক্ত গৃহস্থ

রামকৃষ্ণ—"অনেক কথাবার্তার পর দেবেন্দ্র খুশি হয়ে বললে, 'আপনাকে উৎসবে (ব্রাম্মৎসব) আসতে হবে।' আমি বললাম, সে ঈশ্বরের ইচ্ছা, আমার তো এই অবস্থা দেখছ!—কখন কিভাবে তিনি রাখেন। দেবেন্দ্র বললে 'না আসতে হবে, তবে ধুতি আর উড়নি পরে এসো,—তোমাকে এলোমেলো দেখে কেউ কিছু বললে আমার কষ্ট হবে।'

আমি বললাম, তা পারব না। আমি বাবু হতে পারব না। দেবেন্দ্র সেজবাবু সব হাসতে লাগল। 'তার পরদিনই সেজো বাবুর কাছে দেবেন্দ্রর চিঠি এলো—আমাকে উৎসব দেখতে যেতে বারণ করেছে। বলে—অসভ্যতা হবে, গায়ে উড়ানি থাকবে না'।" (কথামৃত, প্রথমভাগ, পৃষ্ঠা-২২২)।

স্বামীজীর বাল্যবন্ধু গুরুদাস বর্মণ, ওরফে প্রিয়নাথ সিংহ এই বর্ণনাটি আরও সোজাসুজি লিখেছেন—'পরদিন দেবেন্দ্রনাথ পত্র দ্বারা মথুরকে জানাইলেন যে, পরমহংসদেব যদি বস্ত্রাদি পরিধান পূর্বক সভ্য হইয়া আইসেন তো ভালো নতুবা তাহাকে আনিবার আবশ্যক নাই।' (শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ চরিত—গুরুদাস বর্মণ, প্রথম ভাগ, প্রথম সংস্করণ, পৃষ্ঠা-৮০)। এই সাক্ষাৎকারটিও অসফল। নিমন্ত্রণ করলেন আসার জন্য, পরে জানিয়ে দিলেন আসতে হবে না। প্রকারান্তরে এও জানিয়ে দিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে সভ্যতার খামতি আছে।

পরবর্তী কালে রামকৃষ্ণদেবের নানান আলাপ আলোচনার মধ্যে স্পষ্ট, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ঈশ্বর ভক্তি প্রসঙ্গে তিনিও সম্পূর্ণ খুশি হতে পারেননি। কারণ, তার মতে অতটা সুখ ঐশ্বর্যের মধ্যে থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে ঈশ্বরে সঁপে দেওয়া সম্ভব নয়।

স্বামী প্রভানন্দের মতে এই সাক্ষাৎকারে দেবেন্দ্রনাথও বিন্দুমাত্র প্রভাবিত হন নি। একবার এক ভক্ত রামকৃষ্ণদেবকে দেবেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে রামকৃষ্ণদেব একটি গল্প শোনান। যার মর্মার্থ 'দাঁত পড়ে গেছে বলে বলি দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছি।' অর্থাৎ যা সুখ ভোগ করার করে নিয়েছি, এবার ঈশ্বর চিন্তা। শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে এইরকম উক্তি শুনে রমাঁ রলাঁ শ্রীরামকৃষ্ণকে 'অশ্রদ্ধাবান কাহিনীকার' বলে উল্লেখ করেছেন। (রামকৃষ্ণের জীবন, প্রথম সংস্করণ, পৃষ্ঠা-১২৯, পঞ্চম সংস্করণ, পৃষ্ঠা-১১৬)।

ব্রাহ্ম সমাজের এক বেতনভুক আচার্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। তিনি রামকৃষ্ণদেবের একজন ভক্ত ছিলেন। তিনি দাবী করেন ঢাকায় থাকা কালে রামকৃষ্ণদেব একদিন সূক্ষ্ম শরীরে তাকে দেখা দেন। তিনি রামকৃষ্ণদেবকে ছুঁয়ে পর্যন্ত দেখেন। ব্রাহ্ম সমাজীদের কাছে এই সব গল্প বলায় সবাই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিজয় গোস্বামীকে একটি কড়া চিঠি লেখেন, যার সারমর্ম 'সাধুসন্ত নিয়ে এইসব ভেলকি বাজীর প্রচার বিজয় যেন আর না করেন।' (শ্রী রামকৃষ্ণ অন্ত্যলীলা—স্বামী প্রভানন্দ, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, পৃষ্ঠা-২৩)।

এরপরেও কি মনে হচ্ছে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দ্বারা কোন ভাবে প্রভাবিত? একেবারেই নয়। এই ঠাকুর বাড়ী থেকেই স্বামী বিবেকানন্দের কাছে প্রস্তাব রাখা হয়েছিল 'রামকৃষ্ণকে ছাড়, তোমাকে মেনে নেব।' 'দেবেন্দ্রনাথের আদি ব্রাহ্ম সমাজ রামকৃষ্ণকে

একজন নিম্নস্তরের মানুষ বলেই ভাবত।' (রামকৃষ্ণের জীবন—রমাঁ রলাঁ, প্রথম সংস্করণ, পৃষ্ঠা-১৪৮, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃষ্ঠা-১৩২)।

শ্রীরামকৃষ্ণেরও ব্রাহ্ম সমাজীদের প্রতি ধারণা একই রকম ছিল। গোপাল মিত্র, মনমোহন মিত্র, রামচন্দ্র দত্ত, শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে প্রথম দর্শনে এসেছেন। তাদের আসতে দেখেই রামকৃষ্ণ ভাগ্নে হৃদয়রামকে বলছেন —"দেখ হৃদু, এদের কেমন শান্ত প্রকৃতি—এরা ব্রাহ্ম দলের লোক নহে।" (ভক্ত মনমোহন—উদ্বোধন, পৃষ্ঠা-২৮)। রামকৃষ্ণদেবও ব্রাহ্ম ভক্তদের ঠিক সভ্য ভব্য লোক বলে ভাবতেন না।

একবার রামকৃষ্ণদেব কলকাতায় বলরাম বসুর বাড়িতে এসেছেন। ভক্তরাও একে একে এসে জুটেছেন। ব্রাহ্ম ভক্ত 'কেশব চরিত' রচয়িতা ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল রামকৃষ্ণদেবকে দেখতে এসেছেন। কথায় কথায় ত্রৈলোক্যনাথ বলছেন 'মানুষের মধ্যে ভগবান অর্থাৎ অবতার হতেই পারে না।' রামকৃষ্ণদেব বোঝাবার চেষ্টা করছেন 'খুব হতে পারে, এই যে আমি হয়েছি।' গিরিশ ঘোষও বোঝাবার অনেক চেষ্টা চালান।

কিছু পরে ত্রৈলোক্যনাথকে মিষ্টি মুখ করাতে বলরাম বসু বাড়ির ভিতরে নিয়ে যান। সেই সুযোগে শ্রীরামকৃষ্ণ গিরিশের প্রতি—"ওদের সঙ্গে বকচো কেন? দুইই নিয়ে আছে। ভগবানের আনন্দের আস্বাদ না পেলে, সে আনন্দের কথা বুঝতে পারে না।" (ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ—গিরিশচন্দ্র ঘোষ, পৃষ্ঠা-১১৬)। শ্রীরামকৃষ্ণের কথার মধ্যে পরিষ্কার 'ওরা' একটা দল, 'আমরা' একটা আলাদা দল। তবে ওরা নানান ভোগ সম্ভোগে জড়িয়ে, আমরা সত্যিকারের ঈশ্বর প্রেমিক।

ব্রাহ্মদের উপাসনাকে তিনি বাঁদরের তিতিক্ষার সাথে তুলনা করেছেন। বলতেন—'দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটীতে গাছে গাছে বাঁদরগুলো যেমন চুপ করে বসে থাকে কিন্তু লক্ষ্য সব সময় কার বাগানে কলাটি পাকলো, কার বাগানে কুমড়োটি পাকছে। ব্রাহ্মদের উপাসনাও ঠিক এই প্রকৃতির।' আসলে রামকৃষ্ণদেব এবং ব্রাহ্ম দুজনেই দুজনের প্রতি খুব বেশি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন না। যদিও প্রামাণ্য গ্রন্থের বর্ণনায় কিছু অসঙ্গতি থেকেই গেছে। কিন্তু সত্য অন্য কিছু। তবে একই সময়ের এবং কাছাকাছি অবস্থান হেতু দুপক্ষেরই দুদিকে অল্প বিস্তর যাতায়াত ছিল।

একবার ব্রাহ্মরা শ্রীরামকৃষ্ণকে পরখ করার জন্য কিছু লোক লাগায়। ঠিক হয় তারা চব্বিশ ঘন্টা রামকৃষ্ণদেবকে লক্ষ্য রাখবে। তারা রামকৃষ্ণদেবের ঘরেই থাকবার মতলব করে। রামকৃষ্ণদেব তাদের বিদেয় করে দেন। আসলে কেশবচন্দ্র সেন ছিলেন রামকৃষ্ণদেবের একনিষ্ঠ ভক্ত। দক্ষিণেশ্বরে তার যাতায়াতও ছিল যথেষ্ট। যেহেতু কেশব সেন ব্রাহ্ম তাই আমরা ধরে নিয়েছি ব্রাহ্মদের সাথে রামকৃষ্ণদেবের সম্পর্ক অতি মধুর। ঘটনা কিন্তু আদপেই তা নয়। ব্রাহ্মদের তিনি কোনকালেই সহ্য করতে পারতেন না, ব্রাহ্মরাও

রামকৃষ্ণদেবকে আলাদা করে কোন খাতির কোনদিনই করে নি। তারা ঠাট্টা করে রামকৃষ্ণদেবকে বলতেন 'মশাই আমাদের জনক রাজার মত।' (শ্রীম দর্শন, পঞ্চম ভাগ, প্রথম সংস্করণ, পৃষ্ঠা-৭২)।

শ্রীম ভক্তদের একটি গানের কথা বলছেন, কেশব সেনের 'লিলি কটেজে' গিয়ে রামকৃষ্ণদেব এই গানটি গেয়েছিলেন। ব্যাখ্যা করে গানটিকে বোঝাচ্ছেন ভক্তদের, গানে আছে 'দিলাম তোরে সেই মন্ত্র', মানে কেশবকে রামকৃষ্ণদেব যে মহামন্ত্র দিয়েছেন। আবার বলছেন—কেশববাবুর শিষ্যরা সব unsympathetic ছিল, তাই 'কথা কইতে ডরাই'। এক কেশব সেনই ঠাকুরকে বুঝেছিলেন (শ্রীম দর্শন, দ্বিতীয় ভাগ, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা-১৫২-৫৩)। কেশব শিষ্যরা সব unsympathetic, শ্রীম কেন একথা বললেন? তিনি জানতেন ব্রাহ্মরা কেউ শ্রীরামকৃষ্ণকে আমল দেয় না। তাদের চোখে শ্রীরামকৃষ্ণ যেন ঠাট্টার 'জনক রাজা'।

তবে ব্যক্তি বিশেষের কথা আলাদা। সামগ্রিক ভাবে ব্রাহ্মরা শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি একেবারেই উদাসীন ছিলেন। কেশবচন্দ্রের শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে যাতায়াত অনেক ব্রাহ্ম ভক্তই মন থেকে মেনে নিতে পারেননি। কেশবের মেয়ের বিয়েকে উপলক্ষ করে প্রায় চোদ্দ আনা ব্রাহ্ম কেশবের দল ছেড়ে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে যোগ দেয়।

এবার একটি ঘটনার উল্লেখ করছি কথামৃত থেকে। অন্য সব বইতেও এ ঘটনা পাওয়া যাবে—

শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রাহ্ম সমাজে এসেছেন। নন্দন বাগানের ব্রাহ্ম মন্দির। যুবক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও অনুষ্ঠানে উপস্থিত। ব্রাহ্ম ভক্তদের সাথে রামকৃষ্ণদেবের নানা প্রশ্ন উত্তর চলছে। যদিও রামকৃষ্ণদেবকে ঠাট্টা করে যারা 'জনক রাজা' বলে তাদের আলাপচারিতাও ঠাট্টাচ্ছলেই হবার কথা। 'Empress' পত্রিকায় নিবেদিতার কিছু প্রবন্ধকে কেন্দ্র করে ব্রাহ্মসমাজীরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। তারা নিবেদিতাকে লেখেন—The source of all this is the blindness which lies in the teaching of Ramakrishna. (নিবেদিতা—লিজেল রেমঁ, পৃষ্ঠা - ২৬০)। এই যাদের ধারণা তারা ঠাকুরের সাথে খুব তাত্ত্বিক আলোচনায় ব্যস্ত ছিল, মনে হয় না।

ব্রাহ্মরা যে শ্রীরামকৃষ্ণের ঈশ্বর তত্ত্বে বিন্দু মাত্র প্রভাবিত নয় তার আরও প্রমাণ পাওয়া যাবে একটু পরেই—'উপাসনা হইয়া গেল। ভক্তদের লুচি, মিষ্টান্নআদি খাওয়াইবার উদ্যোগ হইতেছে। ব্রাহ্ম ভক্তেরা অধিকাংশই নিচের প্রাঙ্গণে ও বারান্দায় বায়ু সেবন করিতেছে। রাত নয়টা হইল। ঠাকুরের দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ফিরিয়া যাইতে হইবে। গৃহস্বামীরা আহূত সংসারী ভক্তদের লইয়া খাতির করিতে করিতে এত ব্যতিব্যস্ত হইয়াচেন যে ঠাকুরের আর কোন সংবাদ লইতে পারিতেছেন না।

শ্রী রামকৃষ্ণ (রাখালের প্রতি)—কি রে কেউ ডাকে না যেরে।

(উচ্চ কণ্ঠে ফুকারিয়া লাগিলা ডাকিতে।
ওগো আমি ক্ষুধাতুর দাও কিছু খেতে।।
একবার দুইবার নহে, বার বার।
কেহ না উত্তর করে প্রভুরে আমার।।

শ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি, পৃষ্ঠা-৩৪৪)

রাখাল (সক্রোধে)—মহাশয় চলে আসুন—দক্ষিণেশ্বরে যাই।

শ্রী রামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—আরে রোশ—গাড়ী ভাড়া তিন টাকা দু আনা কে দেবে।—রোক্ করলেই হয় না—পয়সা নেই আবার ফাঁকা রোক্। আর এত রাত্রে খাই কোথা।

(ওগো আমি এত ডাকি না পাও শুনিতে।
বড়ই পেয়েছে ক্ষুধা দাও কিছু খেতে।।
এবার শুনিয়া কথা কোন ব্রাম্ম ভাই।
প্রভুরে করিয়া দিল ভোজনের ঠাঁই।।   পুঁথি, পৃষ্ঠা-৩৪৫)।

অনেকক্ষণ পর শোনা গেল পাতা হইয়াছে। সব ভক্তদের এককালে আহ্বান করা হইল। সেই ভিড়ে ঠাকুর রাখাল প্রভৃতির সঙ্গে দ্বিতলায় জলযোগ করিতে চলিলেন। ভিড়েতে বসিবার জায়গা পাওয়া যাইতেছে না। অনেক কষ্টে ঠাকুরকে একধারে বসানো হইল। স্থানটি অপরিষ্কার।

'ভোজনের ঠাঁই অতি কদাকার স্থান।
কাছে এত জুতা যেন জুতার দোকান।।' —পুঁথি

পরবর্তী ঘটনা এইরকম—রামকৃষ্ণ খেতে বসলেন। তাকে লুচি দেওয়া হল। 'অপবিত্র অঙ্গ আর অশুচি অন্তরের' এক মহিলা তরকারি দিয়ে গেলেন। রামকৃষ্ণদেব খেতে পারলেন না। শুধু নুন দিয়ে একটু লুচি খেয়ে উঠে পড়লেন। তাও খেলেন কেন, না, গৃহস্বামীর কল্যাণের জন্য। সারা জীবন খাদ্যের অগ্র ভাগটি তিনি খেয়ে এসেছেন। এখানে অনেকের পরে তিনি খেলেন। ভক্তরা বলেন এও প্রভুর এক আশ্চর্য লীলা।

গণ্ডগোল কিন্তু এখনো মেটেনি। 'আহারান্তে ঠাকুর গাড়িতে উঠিলেন। গাড়ি ভাড়া দেবে কে? গৃহস্বামীদের দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে না। ঠাকুর গাড়ি ভাড়া সম্বন্ধে ভক্তদের কাছে আনন্দ করিতে করিতে গল্প করিয়াছিলেন—"গাড়ি ভাড়া চাইতে গেল। তা প্রথমে হাঁকিয়ে দিল।—তারপর অনেক কষ্টে তিন টাকা পাওয়া গেল। দু আনা আর দিলে না। বলে ঐতেই হবে।" (কথামৃত, চতর্থ ভাগ, পৃষ্ঠা-১৯)। সবাই খেতে বসছে তুমিও চলে এসো। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি ব্রাম্মদের এই ভাব। আলাদা করে খাতির আপ্যায়ণ, তাদের মধ্যে কখনই দেখা যায় নি।

ব্রাহ্মদের শ্রীরামকৃষ্ণ প্রীতির আর একটি বর্ণনা—নরেন্দ্রনাথকে দেখতে রামকৃষ্ণদেব কলকাতায় ব্রাহ্ম সমাজে এসেছেন। রামকৃষ্ণদেবকে দেখামাত্র ব্রাহ্মরা যে ব্যবহার শুরু করেন তার মধ্যে থেকে রামকৃষ্ণদেবকে উদ্ধার করতে নরেন্দ্রকে রীতিমত নাকানি চোবানি খেতে হয়। কোনরকমে বার করে একটা গাড়িতে তুলে দক্ষিণেশ্বরের দিকে চলেছেন। 'পথে ঠাকুরকে বকতে লাগল নরেন। "কেন আপনি এসেছিলেন এখানে?" "তুই জানিস না কেন এসেছিলাম?" সুখস্মিত মুখে তাকিয়ে রইলেন ঠাকুর। নরেন—"সেজন্য আপনি এখানে আসবেন, এই ব্রাহ্ম সমাজে? এখানে ওরা আপনাকে সম্মান দেখাল, না অভ্যর্থনা করল? ঘর অন্ধকার করে পালিয়ে গেল সকলে, আমার জন্যে আপনি কেন এ অপমান নিতে এলেন? আপনার অপমানে বুক ফেটে যাচ্ছে।" রামকৃষ্ণ—"অপমান।" ঠাকুরের মুখপদ্মের প্রসন্নাভা এতটুকু ম্লান হল না। নরেন—'অপমান ছাড়া আবার কি। ওরা আপনাকে বোঝে না, বোঝবার ওদের সাধ্যও নেই—ওদের ওখানে আসবার আপনার কি দরকার? আমাকে ভালবাসেন বলে আপনার সমস্ত কাণ্ডজ্ঞান খোয়াতে হবে?"

ব্রাহ্ম বিজয় গোস্বামী ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে তার মাঝে মাঝে যাতায়াত ছিল। রামকৃষ্ণদেব তাকে পছন্দই করতেন। কিন্তু তার শিষ্য মণ্ডলী তাকে খুব একটা পছন্দ করতেন বলে মনে হয় না। এই সূত্রে সাধু নাগ মহাশয় গ্রন্থ থেকে কিছু অংশ তুলে দিচ্ছি— বিজয় গোস্বামী ঢাকায় গেছেন। নাগ মহাশয় একদিন তার সাথে দেখা করতে এসেছেন। 'বিজয়কে দেখিয়া নাগ মহাশয়ও আহ্লাদিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি বলিতেন—"ঠাকুরকে দর্শন করিয়াও কেন যে তিনি (বিজয়) অন্যান্য সাধুর কাছে গিয়ে ঢলিয়া পড়িতেন ইহাই এক আশ্চর্যের বিষয়।" বিজয় বিখ্যাত বারদীর ব্রহ্মচারীর (লোকনাথ বাবা) নিকট যাতায়াত করিতেন। তারপর নাগ মহাশয় আরও বলিতেন—"গোস্বামী মহাশয়ের ন্যায় মহাজনেরও যখন মতিভ্রম হয়, তখন অন্যে পরে কা কথা।"

বিজয় রামকৃষ্ণদেবের নিকটে বসিয়া চক্ষু মুদিয়া ধ্যান করিতেন শুনিয়া গিরিশবাবু বলিয়াছিলেন—"যাহাকে পলকহীন নেত্রে দর্শন করা উচিত, তার সামনে চোখ বুজে বসে থাকে, এ আবার কেমন লোক।" এই কথার উল্লেখ করিয়া নাগ মহাশয় গিরিশবাবুর বিদ্যা বুদ্ধির বিশেষ প্রশংসা করিতেন ও "জয় রামকৃষ্ণ, জয় রামকৃষ্ণ" বলিয়া গিরিশের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিতেন। (সাধু নাগমহাশয়, পৃষ্ঠা-৯৮-৯৯)।

শ্রীরামকৃষ্ণ শিষ্যদের অনেকেই পূর্বে ব্রাহ্ম সমাজেরই শরিক ছিলেন। পরে সব একে একে ব্রাহ্ম সমাজ থেকে দূরে সরে যান। ব্রাহ্ম সমাজ তো শুধু একটা ধর্মীয় সংস্থাই নয়, ধর্ম পালন ছাড়াও তারা মনে করত সমাজে তাদের কিছু দায় আছে। সমাজে প্রচলিত কিছু কুসংস্কারের বিরুদ্ধেও তারা আন্দোলন ডেকেছিল। আর এখানেই শ্রীরামকৃষ্ণ এবং তার শিষ্যদের সাথে তাদের অমিল।

খবর এসেছে কেশব সেনের অসুখ খুব বাড়াবাড়ি। তারই প্রসঙ্গ ধরে ব্রাম্ম সমাজ নিয়ে আলোচনা চলছে—'শ্রী রামকৃষ্ণ (মণির প্রতি) "হ্যাঁ গা, ওদের ওখানে কি কেবল লেকচার দেওয়া? না ধ্যানও আছে? ওরা বুঝি বলে উপাসনা। কেশব আগে খ্রীষ্টধর্ম, খ্রীষ্টানী মত খুব চিন্তা করেছিলেন। সেই সময় ও তার আগে দেবেন্দ্র ঠাকুরের ওখানে ছিলেন।" মণি—"কেশব বাবু প্রথম প্রথম যদি এখানে আসতেন তাহলে সমাজ সংস্কার নিয়ে ব্যস্ত হতেন না। জাতি ভেদ উঠানো, বিধবা বিবহ, অন্য জাতে বিবাহ, স্ত্রী শিক্ষা ইত্যাদি সামাজিক কর্ম লয়ে অত ব্যস্ত হতেন না।" (কথামৃত, পঞ্চম ভাগ, পৃষ্ঠা-১৩২)।

'পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং ভাব সহায়ে ইহারা যে জাতীয় ধর্মাদর্শ হইতে বহু দূরে বিচ্যুত হইয়া পড়িতেছেন এবং অনেক সময় সমাজ সংস্কারকেই ধর্মানুষ্ঠানের চূড়ান্ত জ্ঞান করিয়া বসিতেছেন একথা বুঝিতে ঠাকুরের বিলম্ব হয় নাই। তিনি সেজন্য তাহাদিগের ভিতর যথার্থ সাধনানুরাগ প্রবুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং সমাজ তাহাদিগের সহিত ঐ পথে অগ্রসর হউক বা না হউক, একমাত্র ঈশ্বর লাভকেই তাহাদিগের জীবন উদ্দেশ্য রূপে অবলম্বন করাইতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন।' (লীলাপ্রসঙ্গ, পৃষ্ঠা-৬৭০)। দরিদ্র নারায়ণ সেবা, সমাজসেবা বহু সেবা প্রতিষ্ঠানই করে থাকে। তার একটা উদ্দেশ্যও আছে। সমাজসেবা কিন্তু সমাজ সংস্কার নয়। সমাজসেবক ব্রম্মপদ লাভ করেন। সংস্কারকের প্রাপ্তি গালাগাল।

ব্রাম্মদের সাথে রামকৃষ্ণদেবের সম্পর্কের যে ছবিটা আজ আমরা পাই তা মূলত কেশব সেনকে সামনে রেখেই। কিন্তু সেখানেও বিস্তর গণ্ডগোল লুকিয়ে আছে। রমাঁ রলাঁ বলেছেন—'রামকৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্র সম্পর্কে কিছু বলার পূর্বে আমি দুঃখের সহিত জানাইতে চাই, তাহাদের উভয়ের শিষ্যরাই পক্ষপাত দুষ্ট বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন। একের শিষ্যরা অন্য ভগবৎ ভক্তকে নিজেদের গুরুদেবের অনুগতে পরিণত করিতে প্রচুর চেষ্টা করিয়াছেন।' (রামকৃষ্ণের জীবন, পৃষ্ঠা-১৩১)।

কিছু কিছু ব্রাম্ম সেখানে আসতেন স্রেফ এই ভেবে যে 'লোকটা তো খারাপ নয়, কারও ক্ষতি করা বা নিজেকে গুছিয়ে নেবার লোক তো নন! কেমন সুন্দর কথা বলেন, আপন করে কাছে ডাকতে পারেন, এই গুলোই বা কম গুণ কি। না হয় কিছু সময়ের জন্য গেলামই তার কাছে। গেলে যখন খুশি হন।' এই রকম মানসিকতা নিয়ে অনেকে তার কাছে আসতেন। তা হলেও সামগ্রিকভাগে দুপক্ষের সম্পর্ক মোটেও সুখকর ছিল না। পুঁথিকারের কিছু পদ—

ভক্তি ভরে মার নামে মত্ত অনুরাগে।
ব্রাম্ম মধ্যে কভু নাহি ছিল এর আগে।।

ব্রাহ্ম ধর্ম শুষ্ক ধর্ম কঠোর প্রকৃতি।
বিবেক বৈরাগ্য মানে জ্ঞান পূর্ণ নীতি।।

*　　*　　*

কেবল বিশুষ্ক তর্কে ধর্মের গঠন।
যে পারে করিতে তর্ক সেই একজন।।

*　　*　　*

হরিপদ লুব্ধ যারা শ্রীগুরু বিহনে।
নিজের গন্তব্য পথ কিছুই না চিনে।।
আসিয়া মিশেন এই ব্রাহ্মদের দলে।
আশায় ভরসা করি যদি কিছু মিলে।।

*　　*　　*

ধর্ম মধ্যে ব্রাহ্ম ধর্ম লেজা মুড়া ছাড়া।
বিচিত্র দেউল শূন্যে ভিত্তি হীনে গড়া।।

এই ভাবেই তারা একে অপরের দোষ ত্রুটি নিয়ে মত্ত থাকত। যদিও মুখে সবাই 'যত মত তত পথ'।

ব্রাহ্ম শিবনাথ শাস্ত্রী প্রথম দিকে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় পাত্রই ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয়পাত্র হয়ে থাকার গৌরব থেকে বঞ্চিত হন। তিনি বলে বসেন রামকৃষ্ণের যে সমাধি দেখে লোক অবাক হয়ে যায়, তা নাকি 'স্নায়বিক বিকারজনিত রোগ বিশেষ।' এর পরেও কি আর প্রিয় পাত্র থাকা যায়।

আর একবার শাস্ত্রী মশাই শ্রীরামকৃষ্ণকে বলেন—"সব সময় ওই নিয়ে থাকলে মাথা যে বেহেড হয়ে যাবে।" (শ্রীম দর্শন, দ্বিতীয় ভাগ, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ - ৩৩)। তিনি রামকৃষ্ণদেবকে স্রেফ আর পাঁচটা সাধুর মতই ভাবতেন। (ঐ, পৃ - ১৮০)।

একবার শ্রী মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত অতীতের স্মৃতি মন্থন করে ভক্তদের একটি ঘটনা শোনাচ্ছেন—'একজন ভক্ত রেগে গিয়ে ঠাকুরকে বললেন, "শিবনাথবাবু আপনাকে একজন সাধারণ সাধু বলে মনে করেন।" ঠাকুর শুনে উত্তর করলেন, "তা তুমি অত চট কেন? একটা গল্প বলি শোন, একজনের একটুকরো হীরা ছিল। তার বেচবার দরকার তাই বেগুনওয়ালার কাছে নিয়ে গেল। সে বললে ন'সের বেগুন দেব। কাপড়ওয়ালা বললে ন'শ টাকা। জহুরী দেখেই একেবারে লাখ টাকা দাম দিলে।" তেমনি যার যেরূপ আকর সে সেই দাম দেবে। হীরা চেনে জহুরী।' (শ্রীম দর্শন, দ্বিতীয় ভাগ, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা-১৮০)। রামকৃষ্ণদেব নিজেই জহুরী। কেউ তাকে সাধারণ বললে তিনি মানবেন কেন!

সব মিলিয়ে আমি যেটা বলতে চাই রামকৃষ্ণদেবের সাথে মধুসূদনের সাক্ষাৎকারটি যেমন 'অসফল', দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে সাক্ষাৎকারও তেমনই 'অসফল'। বিক্ষিপ্ত ভাবে কিছু ব্রাম্ম রামকৃষ্ণদেবের ভক্ত হলেও, মোটামুটি ভাবে বলা যায় ব্রাম্মদের সাথে শ্রীরামকৃষ্ণের সম্পর্কটি মোটেও মধুর নয়।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ভক্ত অধরলাল সেনের বাড়িতে বঙ্কিমচন্দ্রের সাথে শ্রীরামকৃষ্ণের দেখা হয়। দিনটি ছিল ৬ই ডিসেম্বর ১৮৮৪।

এর আগেও রামকৃষ্ণদেব বেশ কয়েকবার অধরের বাড়ি এসেছেন। তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। আজ তিনি তার কয়েকজন বন্ধু ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটকে নিমন্ত্রণ করে এনেছেন। তাদের মধ্যে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রও আছেন। এই সাক্ষাৎকারটিও প্রায় সব বইতেও আছে। আমি ব্রম্মচারী অক্ষয়চৈতন্যের 'ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ' গ্রন্থটি এখানে ব্যবহার করলাম। (পৃষ্ঠা - ৪৩৫)।

এই আলোচনাটি যখনই পড়েছি প্রতিবারেই মনে হয়েছে ব্রাম্মরা যেমন শ্রীরামকৃষ্ণের সাথে মস্করা করত, বঙ্কিমচন্দ্রও তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণের সাথে খানিক কৌতুকপূর্ণ সময় কাটিয়ে গেলেন। লক্ষ্য করে দেখুন বঙ্কিমের প্রতিটি উত্তরই কি ভীষণ ব্যঙ্গাত্মক।

শ্রীম ভক্তদের উদ্দেশ্যে উপদেশ দিতে গিয়ে বলছেন—'ঠাকুর বঙ্কিমবাবুকে জিজ্ঞেস করেছিলেন অধর সেনের বাড়িতে বেনেটোলায়, "মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য কি?" বঙ্কিমবাবু অবজ্ঞা ভরে উত্তর করিলেন, "আহার, বিহার, মৈথুন।" (শ্রীম দর্শন, দ্বিতীয় ভাগ, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা-১৬০)। এখানে শ্রী মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত 'বঙ্কিমবাবু অবজ্ঞাভরে উত্তর করিলেন' এই কথা কেন ব্যবহার করলেন? তিনি দিব্যি বুঝেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তরগুলি অবজ্ঞাপূর্ণই ছিল।

আলোচনাটি বড্ড বড়। আমি বঙ্কিমের কথাগুলি সব রাখবার চেষ্টা করব। পক্ষান্তরে শ্রীরামকৃষ্ণের মূল বক্তব্যটুকুই রাখব। রামকৃষ্ণদেবের সমস্ত কথা বিস্তারিত ভাবে দেবার প্রয়োজনও হয়তো নেই। কারণ সকলকে রামকৃষ্ণদেব যা বলেন, বঙ্কিমকেও ঠিক তাই বলেছেন। তার কথার বৈচিত্র তেমন কিছু পাই নি। অতএব একই কথা হাজার জায়গায় না ব্যবহার করলেও চলে। ঐ যে ভাগ্নে হৃদয়রাম বলেছিলেন না 'মামা তোমার বুলি গুলি সব এক সময় বলে ফেল না, ফি বার এক বুলি কেন বলবে?' রামকৃষ্ণদেবের বক্তব্যগুলি ঠিক তাই। একই কথার পুনরাবৃত্তি।

'রামকৃষ্ণ (বঙ্কিমের প্রতি)—"তুমি কার ভাবে বাঁকা গো!"

বঙ্কিম (হাসিতে হাসিতে)—"আর মহাশয়, জুতোর চোটে। (সকলের হাস্য)। সাহেবের জুতোর চোটে বাঁকা।"

কি সুন্দর প্রশ্ন উত্তর। এই উত্তর যদি বঙ্কিমচন্দ্র না দিতেন তিনি 'বন্দেমাতরম্' লিখতেন না। রামকৃষ্ণদেব কিন্তু বঙ্কিমের উত্তরের বাঁক ধরতে পারলেন না। আর যদিও বা ধরে থাকেন বঙ্কিমের থেকেও সুচতুর ভাবে বঙ্কিমের রাখা পথ থেকে নিজের পথে সরে এলেন। সেই কৃষ্ণ কার প্রেমে বাঁকা, কেন কৃষ্ণ 'কালো', রাধা কেন 'ধোলো'। ঈশ্বরের স্বরূপ কেমন, রাধা প্রকৃতি, কৃষ্ণ পুরুষ, এই রকম যে কটি কথা তিনি সকলকে বলতেন একে একে বলে গেলেন।

ডেপুটিরা ইংরাজী কথা বলায় রসিকতা করে এক নাপিত ও এক সাহেবের মজার একটি গল্প শোনালেন। এই নিয়ে একটু হাসাহাসি হল।

বঙ্কিমচন্দ্র রামকৃষ্ণদেবকে প্রচার করেন না কেন জিজ্ঞাসা করেন। রামকৃষ্ণদেব বলেন তিনি অতি ক্ষুদ্র জীব। ভগবানের 'চাপরাস' না পেলে প্রচার হয় না। যিনি চন্দ্র সূর্য করেছেন, ধ্যান ভজন করে তার কাছে শক্তির আরাধনা করতে হয়। তবে হয় প্রচার।

এইসব কথার পর রামকৃষ্ণদেব বঙ্কিমকে প্রশ্ন করেন—"আচ্ছা, আপনি তো খুব পণ্ডিত, আর কত বই লিখেছ, আপনি কি বল, মানুষের কর্তব্য কি? কি সঙ্গে যাবে? পরকাল তো আছে?" বঙ্কিম—"পরকাল—সে আবার কি?"

বঙ্কিমচন্দ্র অবাক। আসলে পরলোক নিয়ে আমাদের কুসংস্কারগুলো বঙ্কিমচন্দ্রের ভালই জানা আছে। তিনি সেই কুসংস্কারের একটু প্রতিবাদ জানালেন মাত্র। তাই এই পাল্টা প্রশ্ন। 'পরকাল—সে আবার কি?'

শ্রীরামকৃষ্ণ বঙ্কিমচন্দ্রকে বোঝাতে থাকেন যতক্ষণ জ্ঞান লাভ না হয় ততক্ষণ পরকাল আছে। ধরাধামে ফিরে ফিরে আসতে হয়। তবে একবার জ্ঞান লাভ হলে পরমেশ্বরের পাশে 'রিজার্ভ সিট' কনফার্ম। পৃথিবীতে আর ফিরে আসতে হয় না। 'সিধোনো ধান পুতলে আর গাছ হয় না।......'

বঙ্কিমচন্দ্র (হাসিতে হাসিতে)—"মহাশয়, তা আগাছাতেও কোন গাছের কাজ হয় না।" রামকৃষ্ণদেব বলেন 'জ্ঞানী তো আগাছা লাউকুমড়ো নয়, সে অমৃত ফল লাভ করেছে। ঈশ্বর জ্ঞানীকে লোক শিক্ষার জন্য রেখে দেন।' ইত্যাদি।

এরপর বঙ্কিমের প্রতি—"আচ্ছা, আপনি কি বল, মানুষের কর্তব্য কি?" বঙ্কিম (হাসিতে হাসিতে)—"আজ্ঞা, তা যদি বলেন, তা হলে আহার, নিদ্রা আর মৈথুন।"

বঙ্কিমের তাচ্ছিল্য শুনে রামকৃষ্ণদেব একটু চটে যান। তার গ্রাম্য ভাষায় সাদাসিধে ভাবেই ধমকের সুরে বঙ্কিমকে অনেক কথা বলেন। তবে তার মধ্যেই যেন বঙ্কিমের সাধন ভজন হীন শুষ্ক পাণ্ডিত্যকে একটু উপহাস করেন। তারপর একটু কোমল ভাবে বলেন "আপনি কিছু মনে কর না।" বঙ্কিম—"আজ্ঞা, মিষ্টি শুনতে আসি নি।"

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতে থাকেন কামিনী বর্জন করে কি ভাবে সংসারে থাকা যায়। কি ভাবে স্ত্রীর সাথে ভাই বোনের মতো থাকতে হয়। তাতে দুজনেই দুজনের ধর্ম পথের সহায় হবে। অর্থ কতদূর অনর্থের মূল বলতে গিয়ে বলেন—"আর—কাঞ্চন। আমি গঙ্গার ধারে বসে 'টাকা মাটি, মাটি টাকা, টাকাই মাটি, মাটিই টাকা' বলে জলে ফেলে দিছলুম।" বঙ্কিম—"টাকা মাটি! মহাশয়, চারটে পয়সা থাকলে গরিবকে দেওয়া যায়। টাকা যদি মাটি, তাহলে দয়া পরপোকার করা হবে না।"

ব্যস, এর পরেই শুরু হয় শ্রীরামকৃষ্ণের সেই ছকে বাঁধা কথাবৃষ্টি। 'পরোপকার করার তুমি কে। যে চন্দ্র সূর্য করেছে, ফুল ফল দিয়েছে তার কাজ সে নিজেই করে নেবে। জীবের কর্তব্য তার শরণাগত হওয়া, আর তাকে যাতে লাভ হয়, দর্শন হয়, সেই জন্য ব্যাকুল হয়ে তার কাছে প্রার্থনা করা।'

এরপর তিনি অন্য অনেকের মত বিজ্ঞান শাস্ত্রকে সমালোচনা করে বলেন—"কেউ কেউ মনে করে, শাস্ত্র না পড়লে, বই না পড়লে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। তারা মনে করে আগে সায়েন্স পড়তে হয়। (সকলের হাস্য)। তারা বলে ঈশ্বরের সৃষ্টি এ সব না বুঝলে ঈশ্বরকে জানা যায় না। তুমি কি বল? আগে সায়েন্স না আগে ঈশ্বর?"

বঙ্কিম—"হ্যাঁ, আগে পাঁচটা জানতে হয়, জগতের বিষয়। একটু এদিককার জ্ঞান না হলে ঈশ্বর জানব কেমন করে? আগে পড়াশুনা করে জানতে হয়।"

রামকৃষ্ণদেব খুশি নন। বলছেন—"ওই তোমাদের এক। আগে ঈশ্বর, তারপর সৃষ্টি। তাকে লাভ করলে, দরকার হয় তো সবই জানতে পারবে।" এ কথার যে কি মানে শুধু ভক্তরাই বলতে পারবে। বঙ্কিমচন্দ্র পারবেন না। তাকে লাভ করলে সব জানতে পারব। পাণিপথের প্রথম যুদ্ধ, হিটলারের মৃত্যু রহস্য থেকে শুরু করে শেক্সপিয়র, নিউটন সব। শুধু 'পাগলা ষাঁড়ে করলে তাড়া কেমন করে ঠেকাব তায়' এইটুকু বাদ দিয়ে আর স-ব জানা যাবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন 'তোমার দরকার ঈশ্বরকে লাভ করা। তুমি অত জগৎ, সৃষ্টি, সায়েন্স, ফায়েন্স এসব করছ কেন? আম খেতে এসেছ আম খেয়ে যাও। কটা পাতা কটা ডাল তা দিয়ে তোমার কি?'

বঙ্কিমচন্দ্র—"আম পাই কই?" শ্রীরামকৃষ্ণ—'ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করলে তিনি শুনবেনই শুনবেন। হয়তো এমন কেউ জুটে গেল যে বলে দেয় এমন এমন কর। তাহলে ঈশ্বরকে পাবে।' বঙ্কিমচন্দ্র—"কে—গুরু? তিনি আপনি ভাল আম খেয়ে আমায় খারাপ আম দেন।" (হাস্য)।

লক্ষ্য করে দেখুন গুরুবাদের উপর বঙ্কিমচন্দ্রের ভক্তি শ্রদ্ধা খুব একটা বেশি নয়। রামকৃষ্ণদেব কিন্তু সে সব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন না। তিনি তার জানা কথাগুলি একের পর এক বলে চলেছেন। যেমন এখন বললেন, বাড়িতে মাছ এলে যার যা পেটে সয় মা তাকে তাই রান্না করে দেন। তা বলে মা কি কোন ছেলেকে কম ভালোবাসেন! গুরুই সচ্চিদানন্দ। তাকে বিশ্বাস করে ধরে থাকলে নিশ্চিত ঈশ্বর লাভ।

বঙ্কিম ভক্তি লাভের উপায় জানতে চান। রামকৃষ্ণ বলেন 'ব্যাকুলতা'। বঙ্কিমকে উদ্দেশ্য করে বলেন—"তোমায় বলি, উপরে ভাসলে কি হবে? একটু ডুব দাও। ঠিক মাণিক ভারী হয় জলে ভাসে না। তলিয়ে গিয়ে জলের নীচে থাকে।" কি সর্বনাশ। বঙ্কিমচন্দ্রের মত গভীর মননশীল সাহিত্য সম্রাটকে রামকৃষ্ণদেব হালকা থাকের মানুষ ধরে নিয়েছেন।

তবে দুম করে এই ধরণের উপদেশ দেওয়া খুব একটা কঠিন ব্যাপারও নয়, অনেকেই অনেককে দিয়ে ফেলে। এতে নিজের গুরুত্বও একটু বাড়িয়ে নেওয়া যায়।

স্বামী অখণ্ডানন্দের সাথে দেখা করে কনখল আশ্রম ঘুরে যান 'মা আনন্দময়ী'। অখণ্ডানন্দজী তাকে সব ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখান। হাসপাতালের অস্ত্রোপচার টেবিলটি দেখিয়ে তার কার্যকারিতা বোঝাতে থাকেন। সব শুনে মা আনন্দময়ী বলেন—"যার যেদিকে দৃষ্টি। এই সবের একটা ছাপ তোমার মনে পড়ে রয়েছে। সেটা কি সহজে যায়।" (মা আনন্দময়ীর কথা—অভয়, পৃষ্ঠা-৩২)।

মা আনন্দময়ী স্বামী অখণ্ডানন্দের মত শ্রীরামকৃষ্ণের একজন সাক্ষাৎ পার্ষদ, একজন প্রবীণ সন্ন্যাসীকে একটু যেন নাড়িয়ে দিলেন। বুঝিয়ে দিলেন এই সব নিয়েই আছ, ঈশ্বর লাভ এখনও দূরঅস্ত।

বলতে পারেন কে না কে কি বলল, তাই নিয়ে আবার ভাবার কি আছে। কিন্তু মা আনন্দময়ী কি খুব ছোট খাট লোক। প্রচুর সাধনা করেছেন তিনি। সব সময় নানা রকম 'ছায়া-কায়া' মাকে ঘিরে থাকত। পুলস্ত ঋষির সাথে কথা বলতেও মাকে অনেকে দেখেছে। মা খুব ফেলনা নয়।

আসলে উপযাচক হয়ে কারও ভাষণ শুনতে গেলে বা কাউকে বেশি প্রাধান্য দিয়ে ফেললে সে একটু মাথায় চড়েই বসে। একবার কথামৃতকার শ্রীম বৈষ্ণবদের গৌড়ীয় মঠে এসেছেন মঠ প্রধান শ্রী প্রভুর উপদেশ শুনতে। এখানে শ্রীম উপযাচক। অতএব

শ্রী প্রভুর হাতে কর্তৃত্ব। আলোচনার মধ্যে শ্রীমর কথা শ্রী প্রভু 'না, এরকম নয়, ওই রকম' বলে উড়িয়ে দিচ্ছেন। এমন কি 'শ্রীম দর্শন' প্রণেতা স্বামী নিত্যাত্মানন্দ গৌড়ীয় মঠের যে ভক্তটিকে 'রিস্ট ওয়াচ ওয়ালা গৃহস্থ ভক্ত' বলে বর্ণনা করছেন সেও শ্রীমকে উপদেশ দিচ্ছেন—"আসবেন মাঝে মাঝে। তাহলে বুঝতে পারবেন। আলোচনা না হলে কি করে বোঝা যায়।" (শ্রীম দর্শন, নবম ভাগ, প্রথম সংস্করণ, পৃষ্ঠা-২০৪)। ভেবে দেখুন একবার জ্ঞান দেওয়া কত সহজ। কথামৃতকারকেও জ্ঞান দিয়ে দিল। আমরাও যখন কোন গুরুদেবের জ্ঞান শুনতে যাই তিনিও এই একই ভাবে 'এই এই কোরো না, এই এই করো' বলে আমাদের পরকালের রাস্তা পরিস্কার করে দেন।

তবে বঙ্কিমচন্দ্র আর এক কাঠি এগিয়ে। শ্রীরামকৃষ্ণের ঐ ডোবাডুবির কথা শুনে হাসির ছলেই বলেন—"মহাশয়, কি করি, পেছনে শোলা বাঁধা আছে। ডুবতে দেয় না।" রামকৃষ্ণদেব গান শোনালেন। তার গানে সকলে তন্ময়।

বঙ্কিম এবার যাবেন। রামকৃষ্ণদেবকে তার বাড়িতে যাবার নিমন্ত্রণ জানালেন। শ্রীরামকৃষ্ণও তাকে দক্ষিণেশ্বরে আসতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু তাদের মধ্যে আর দেখা হয় নি।

রামকৃষ্ণদেব কথামৃতকার শ্রীম এবং গিরিশ ঘোষকে বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়ি পাঠিয়ে ছিলেন। কেন তিনি নিজে গেলেন না? শ্রীরামকৃষ্ণতো অনেক ভক্তের বাড়িতেই যেতেন। নিমন্ত্রণ করা সত্ত্বেও বঙ্কিমের বাড়ি কেন তিনি গেলেন না? আসলে রামকৃষ্ণদেব বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে ভগবানের কাছে সেই নিঃশর্ত আত্মসমর্পণকারী ভক্তটিকে খুঁজে পাননি। তাই বঙ্কিমের বাড়ি যাবারও বিশেষ উৎসাহ দেখান নি। অপরপক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রও 'কাজের চাপে ব্যস্ত' এই অছিলায় কোনদিনই দক্ষিণেশ্বরে এসে পৌছাতে পারেন নি।

শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে বিদায়কালে বঙ্কিমকে চিন্তা মগ্ন দেখা গেছিল। তিনি নিজের চাদর নিতে ভুলে গেছিলেন। অনেকে বলেন বঙ্কিম সুখ স্বপ্নে বিভোর হয়ে পড়েছিলেন। আমার কিন্তু মন বলে অন্য রকম, অধঃপতিত সমাজ আরও কত অধঃপাতে নামতে চলেছে সেই চিন্তায় বঙ্কিম চাদর ভুলে গেছিলেন।

এই সাক্ষাৎকারটি সফল কি অসফল নির্ণয় করা কিছুটা আপেক্ষিক। কেউ বলতে পারেন 'হ্যাঁ', কেউ বলতে পারেন 'না'। তবে নিন্দুককে যদি মনে ধরে, সাক্ষাৎকার ব্যর্থ।

বিদ্যাসাগর

প্রামাণ্য জীবনীকার শ্রী চন্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধারণায় বিদ্যাসাগর মশায় হয়তো সম্পূর্ণ ভাবে নিরীশ্বরবাদী নাস্তিক ছিলেন না। হয়তো যুগ অনুযায়ী সেটা সম্ভবও ছিল

না। তবুও ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে তার মনে গভীর সংশয় ছিলই। তার ধারণায় সত্যিই যদি তেমন কিছু থাকত তাহলে বিশ্ব জোড়া, বিশেষ করে আমাদের মত অনুন্নত দেশে এত অনৈক্য তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারতেন না। যেখানে একজন সোনার বিস্কুট চিবিয়ে খায়, আর একজন অসুস্থ বাবা মাকে ওষুধ খাওয়াতে পারে না। একজন গদির নিচে কালো টাকা লুকিয়ে রাখে, আর একজনের অন্ন জোটে না। বিদ্যাসাগর গভীর ভাবে এই অসাম্য লক্ষ্য করেছিলেন। এবং তিনি নিশ্চিত হয়েছিলেন সম্পূর্ণ ব্যাপারটাই মিথ্যে। বেদ-বেদান্ত, মায় আমাদের পুরাণ শাস্ত্র তিনি কম পড়েন নি এবং শেষ পর্যন্ত তার অভিমত, সম্পূর্ণ বিষয়টিই "দর্শনের ভ্রান্ত পদ্ধতি", "সাংখ্য ও বেদান্ত ভ্রান্ত দর্শন, এদের মূলটাই অমূলক।" 'মূল' বলতে সেই 'মহাশক্তি'। যার উৎপত্তি এবং উৎপত্তিকাল দুটোই আমাদের অজানা।

এর থেকে সুন্দরভাবে এমন মহৎ বাণী আমাদের জন্য আর কেউ রেখে যান নি। আমরা পারিনি এই টাক মাথা লোকটাকে মনে প্রাণে মেনে নিতে। রবীন্দ্রনাথ আমাদের কার্যকলাপ দেখে স্থির বুঝেছিলেন এরা মানুষের পর্যায়েই পড়ে না। সে কথা তিনি লিখেও গেছেন—'সাত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী, রেখেছ বাঙালী করে মানুষ কর নি।' বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলেছেন 'ঈশ্বর সাত কোটি বাঙালীর মধ্যে একটি মানুষ বানিয়ে ফেলেছেন।' ক্ষোভ লুকোতে আর কিই বা বলতে পারেন তিনি! যত্রতত্র তার চোখের সামনে যে মূর্খামো ঘটে চলেছে, হতাশ হওয়া ছাড়া কিই বা হবেন তিনি!

বিদ্যাসাগর অ-আ-ক-খ না লিখলেও অন্য কেউ লিখত। দরিদ্র সেবা তিনি না করলেও অন্য কেউ করত। না হয় না করত। কিন্তু কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম-ই আসল বিদ্যাসাগর। সেই বিদ্যাসাগর শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্ম বাণী শুনে যদি মজে যেতেন মহাপুরুষদের মানহানি ঘটানোর মত কাজে কোন দিন হাত দিতাম না। আমাদের প্রেরণা স্বয়ং বিদ্যাসাগর। তার পেছনে দাঁড়িয়েই এই কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই করে যাব।

যেহেতু বিদ্যাসাগর কুসংস্কারের সম্পূর্ণ বিরোধী তাই তাকে ব্যবহার করেই প্রচার হয় সবচেয়ে ভালো। তাই দেখবেন প্রবন্ধে লেখা 'বিদ্যাসাগর মশাই ঠাকুরকে হাতজোড় করে নমস্কার করলেন,' 'মহাশয় বসতে আজ্ঞা হোক', 'একটু ধূম পান করুন', 'একটু মেঠাই খান', 'ফেরার পথে লম্ফ ধরে আলো দেখালেন', এই রকম টুকরো টুকরো অনেক কিছু।

কিছুদিন আগে ১৪১০ শারদীয়া উদ্বোধন পত্রিকায় ডঃ রেণুপদ ঘোষের 'শরৎ সাহিত্যে শিব-ভাবনা' নামে একটি প্রবন্ধ পড়েছিলাম। তাতে তিনি আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছেন এটা বোঝাতে যে নিরিশ্বরবাদী শরৎচন্দ্রও শিবঠাকুর দ্বারা দারুণ প্রভাবিত। শরৎ সাহিত্যে যে

কটি সরল সাদা চরিত্র তিনি পেয়েছেন, প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন এরা সবাই শিবঠাকুরের ফল। যাহোক করে বোঝানোর চেষ্টা শিবঠাকুর + শরৎচন্দ্র = ভক্ত শরৎচন্দ্র। এমনটাই হয়। নাস্তিকগুলোও যদি ঈশ্বর বিশ্বাসী হয়ে ওঠে মন্দ কী।

যাক, আগের প্রসঙ্গে ফিরে যাই। শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছেন বিদ্যাসাগর মশায়ের বাড়ি। তিনিই প্রথম বিদ্যাসাগরকে নমস্কার জানান। উত্তরে প্রতি নমস্কার। বাড়িতে অতিথি এলে বসতে বলাটাই স্বাভাবিক। ধূম পান করতে চেয়েছেন, ভিতর থেকে হুঁকো আনিয়ে দিয়েছেন। জল খেতে চেয়েছেন তো 'একটু মিষ্টি খেয়ে জল খান'। বাইরের বারান্দায় আলো কম, তাই আলো হাতে সদর পর্যন্ত এগিয়ে দিয়েছেন। এগুলোর মধ্যে ভক্তি শ্রদ্ধার বাড়াবাড়ি তেমন কিছু খুঁজে পাই না।

এই সাক্ষাৎকারটি নিয়ে সমাজে বহু গল্প চালু আছে। কিন্তু চিঁড়ে যে একটুও ভেজেনি ঠিক ঠিক বুঝেছিলেন স্বয়ং রামকৃষ্ণদেব। ফেরার সময় তিনি বিদ্যাসাগরকে 'রাণীর বাগান বাড়ি একবার ঘুরতে যেও' বলে নিমন্ত্রণ করে অসেন। 'মন্দির দেখতে যেও' কেন বললেন না? সকলকে তো মন্দিরই দেখান, আজ হঠাৎ বাগান বাড়ি দেখার কথা কেন?

রামকৃষ্ণদেব বুঝেছিলেন মন্দির ঘোরার লোক আর যেই হোক বিদ্যাসাগর নন। বাগান ঘুরতে যদিও বা যান, মন্দির দেখতে তিনি কখনই আসবেন না। যানও নি তিনি কোনদিনই। এই জন্যে রামকৃষ্ণদেবের মনে সারা জীবনই ক্ষোভ জমেছিল। বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ উঠলেই সেই জমে থাকা ক্ষোভ প্রকাশ হয়েও পড়ত।

'শ্রী রামকৃষ্ণ—"বিদ্যাসাগর সত্য কথা কয় না কেন?....সত্যতে থাকলে তবে ভগবানকে পাওয়া যায়। বিদ্যাসাগর সেদিন বললে এখানে আসবে কিন্তু এলো না। পণ্ডিত আর সাধু অনেক তফাৎ।......পণ্ডিত বলে এক, আর করে এক।" (কথামৃত, দ্বিতীয় ভাগ, পৃ - ৬৫-৬৬)। বিদ্যাসাগর মিথ্যাবাদি! জানা ছিল না।

বিদ্যাসাগরের জ্ঞান বুদ্ধি নিয়ে কটাক্ষ করে বলছেন—"বিদ্যাসাগরের এক কথায় তাকে চিনেছি, কত দূর বুদ্ধির দৌড়!....বিদ্যাসাগরের এত বিদ্যা, এত নাম, কিন্তু কাঁচা কথা বলে ফেললে, 'তিনি কি কারোকে বেশি শক্তি, কারোকে কম শক্তি দিয়েছেন?'.....ঈশ্বরকে না জানলে ক্রমশ ভিতরের চুনোপুঁটি বেরিয়ে পড়ে। শুধু পণ্ডিত হলে হবে কি?" (কথামৃত, দ্বিতীয় ভাগ, পৃষ্ঠা-৬৪)।

এক ভক্ত জিজ্ঞেস করছেন—"মহাশয়, বিদ্যাসাগরকে দেখেছেন, কি রকম বোধ হল?" শ্রীরামকৃষ্ণ—"বিদ্যাসাগরের পাণ্ডিত্য আছে, দয়া আছে, কিন্তু অন্তর দৃষ্টি নাই।" (কথামৃত, প্রথম ভাগ, পৃষ্ঠা-১০৮)। এরপর আছে, বিদ্যাসাগরের ভিতর সোনা চাপা আছে। তার সন্ধান পেলে দান দাক্ষিণ্য ছেড়ে তিনি সন্ন্যাসী বনে যেতেন। তবেই তার ঈশ্বর লাভ ঘটত। এই রকম সব কথা কিছু আছে।

একবার সাধন ভজনের গুণকীর্তন করতে গিয়ে বলছেন—"সাধনা চাই—শুধু শাস্ত্র পড়লে হয় না। দেখলাম বিদ্যাসাগরকে—অনেক পড়া আছে, কিন্তু অন্তরে কি আছে দেখে নাই, ছেলেদের লেখাপড়া শিখিয়ে আনন্দ। ভগবানের আনন্দের আস্বাদ পায় নাই। শুধু পড়লে কি হবে? ধারণা কই? পাঁজিতে লিখেছে, বিশ আড়া জল, কিন্তু পাঁজি টিপলে এককোঁটাও জল পড়ে না।" (কথামৃত, তৃতীয় ভাগ, পৃষ্ঠা-২১৫)।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বুঝেছিলেন তার দেখা গুটিকয় লোকের মধ্যে বিদ্যাসাগর একজন, যিনি তার ঈশ্বরতত্ত্ব বিন্দুমাত্রও নিতে পারেননি। তার সম্বন্ধে তো রামকৃষ্ণদেব ভালো ভালো কথা বলতে পারেন না। তবে অত নামকরা লোক, উড়িয়ে দেব বললেই তো আর উড়িয়ে দেওয়া যায় না। মন না চাইলেও যেটুকু সম্মান না দিলেই নয় সেটুকুই দিতেন, তার বেশি কোন ভাবেই নয়। আবার মাঝে মধ্যে সেই সীমারেখা টুকুরও ঘাটতি দেখা যেত সে কথাও বলতে পারি বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে তার মন্তব্যগুলি লক্ষ্য করে।

এখন কথা হচ্ছে কি এমন ঘটেছিল যার জন্য রামকৃষ্ণদেব হঠাৎ বিদ্যাসাগরের প্রতি বিরূপ হয়েছিলেন? তা হলে আরও একটু আগে থেকে এই আলোচনায় ঢুকতে হবে। তবে নির্দিষ্ট কোন গ্রন্থ এখানে ব্যবহার করতে পারলাম না। কারণ শ্রীরামকৃষ্ণের সাথে বিদ্যাসাগরের সাক্ষাৎকারটি কোন বইতেই সম্পূর্ণ ভাবে চোখে পড়েনি। এমনকি আয়োজক শ্রীম তার কথামৃতেও এই সাক্ষাৎকারটি সম্পূর্ণ ভাবে বর্ণনা দেন নি। খাপছাড়া ভাবে এখানে কিছু ওখানে কিছু, এমনকি যে কথাগুলি তার পছন্দ নয় সেগুলি বাদ, এই ভাবেই এগোতে হয়েছে। অন্য জীবনীকাররাও তাদের পছন্দসই কিছু কথোপকথন রেখে বাকিটা এড়িয়ে গেছেন। অতএব সম্পূর্ণ বর্ণনাটুকু পেতে গেলে অনেকগুলো বই এর সাহায্য নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। তারপরও প্রাপ্তি সম্পূর্ণ হল কিনা সন্দেহ থেকেই যায়।

বিদ্যাসাগরের সাথে শ্রীরামকৃষ্ণের দেখা করার ব্যবস্থা করেছিলেন শ্রীম, মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত। তিনি বিদ্যাসাগরের মেট্রোপলিটন স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন। বাদুড়বাগানে বিদ্যাসাগরের বাড়িতে এলে রামকৃষ্ণদেব তাকে হাতজোড় করে নমস্কার জানান। উত্তরে বিদ্যাসাগর প্রতি নমস্কার এবং "আসতে আজ্ঞা হয়" বলে অভ্যর্থনা করেন। রামকৃষ্ণ—"এতদিন খাল বিলে ছিলুম, আজ সাগরে এসে মিশলুম।" বিদ্যাসাগর "এতদিন মিষ্টি জলে ছেলেন, এখন নোনা জলে এলেন, তা খানিক নোনা জল নিয়ে যান।"

সুন্দর কবিতার মত প্রশ্ন উত্তর। রামকৃষ্ণদেব হেসে বলেন "তা কেন গো, অবিদ্যার সাগর নোনা হয়, তুমি যে বিদ্যার সাগর—তোমাতে কেন নোনা জল হবেক? আমি ক্ষীর সমুদ্রে এসেছি।" বিদ্যাসাগর একটু বিনয় প্রকাশ করে হুঁকো নিয়ে ধূমপান করতে থাকেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবান্তর ঘটতে থাকে। তিনি "তামুক খাব, তামুক খাব" বলতে থাকেন। বিদ্যাসাগর তার নিজের হুঁকোটিই এগিয়ে দেন। রামকৃষ্ণ বলেন "না কারুর

হুঁকোয় খাইনি, তুমি কলকেটা দেও।" বিদ্যাসাগর বাড়ির ভিতর থেকে একটি নতুন হুঁকো আনিয়ে দেন। রামকৃষ্ণদেব ধূমপান করতে থাকেন।

এখানে একটু লক্ষ্য করার ব্যাপার, মহেন্দ্র মাস্টার আগে থেকেই বিদ্যাসাগরকে জানিয়ে রেখেছিলেন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে নিয়ে আসবেন। শ্রীরামকৃষ্ণের নাম ডাক তখন বেশ ছড়িয়েছে। তারপরেও বিদ্যাসাগর তার দিকে নিজের খাওয়া হুঁকো বাড়িয়ে দিচ্ছেন। তার কোন সম্ভ্রান্ত অতিথির প্রতি এটা তিনি করতে পারতেন কি? মনে তো হয় না।

রামকৃষ্ণদেবের গলা শুকিয়ে গেছে, একটু জল খেতে চান। বিদ্যাসাগর মশাইয়ের বাড়িতে বর্ধমান থেকে মেঠাই এসেছে। তিনি রামকৃষ্ণদেবকে মেঠাই সহযোগে জল খেতে বলেন এবং ভিতর থেকে একজনকে মেঠাই আনতে বলেন। সে অনেক দেরী করায় নিজেই গিয়ে চারটি মেঠাই নিয়ে আসেন। রামকৃষ্ণদেব একটু খান, বাকী সকলের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়।

এরপর শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মবাণী বর্ষণ শুরু হয়ে যায়। ব্রহ্ম সগুণ না নির্গুণ, এঁটো না এঁটো হন নি, নানান গল্প উপমা টেনে সেসব বলতে থাকেন। বিদ্যাসাগর মশাই বলেন 'আজ একটা নতুন কথা শুনলাম'। জীবনীকাররা এসব বর্ণনার মধ্যে মধ্যে এটা বোঝাবার চেষ্টা চালিয়ে যান যেন বিদ্যাসাগর বেশ দ্রবীভূত হয়েছেন। যদিও সেরকম হবার কোন সম্ভাবনা দেখছি না। কারণ একটু পরেই তিনি একটি প্রশ্ন তুলছেন, যার থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ বিলক্ষণ বুঝতে পারেন চিঁড়ে একটুও ভেজেনি।

বিদ্যাসাগর—"ঈশ্বরকে ডাকবার আর কি দরকার! দেখ চেঙ্গিস খাঁ যখন লুটপাট আরম্ভ করলে তখন অনেক লোককে বন্দী করলে। ক্রমে প্রায় এক লক্ষ বন্দী জমে গেল। তখন সেনাপতিরা এসে বললে মহাশয়, এদের খাওয়াবে কে? সঙ্গে এদের রাখলে আমাদের বিপদ। কি করা যায়? ছেড়ে দিলেও বিপদ। তখন চেঙ্গিস খাঁ বললেন, তাহলে কি করা যায়, ওদের সব বধ কর। তাই কচাকচ করে কাটবার হুকুম হয়ে গেল। এই হত্যাকাণ্ড তো ঈশ্বর দেখলেন? কই, একটু নিবারণ তো করলেন না। তা তিনি থাকেন থাকুন, আমার দরকার বোধ হচ্ছে না। আমার তো কোন উপকার হল না।"

রামকৃষ্ণদেব অনেক করে বোঝাবার চেষ্টা করেন ঈশ্বরের ইচ্ছা অনিচ্ছা একান্ত ভাবে তারই। আমাদের কি দরকার ওসব নিয়ে মাথা ঘামাবার। বিদ্যাসাগর মশাইও আর মাথা ঘামাতে চান নি, তিনি চুপ করে গেছেন।

রামকৃষ্ণদেব বলেন "আপুনি একবার রাসমণির বাগান দেখতে যাবে, খুব চমৎকার জায়গা।" বিদ্যাসাগর "নিশ্চয়ই যাব।" কিন্তু রামকৃষ্ণদেব তখনই বুঝেছিলেন এ

কোনদিনই যাবে না। বলেও ফেললেন সে কথা, "আপুনি যেতে পারবেক নি।" বিদ্যাসাগর জিজ্ঞেস করেন কেন একথা বলছেন? রামকৃষ্ণ বলেন, 'যারা ডিঙি নৌকো, খাল, বিল, নদী, নালা সব জায়গায় যেতে পারে। কিন্তু তুমি তো জাহাজ, খাল বিলে যাবে কি করে? চড়ায় আটকে যাবে না?'

আসলে রামকৃষ্ণদেব বুঝেছিলেন সাক্ষাৎকারটি ব্যর্থ। ব্যর্থতা থেকে আসে হতাশা। হতাশা থেকেই জন্ম নেয় খেদোক্তি। যে খেদোক্তি রামকৃষ্ণদেব সারা জীবন ধরেই করে গেছেন।

মহেন্দ্র নাথ গুপ্তও অন্যত্র বলে গেছেন সাক্ষাৎকারটি সম্পূর্ণ ব্যর্থ। তিনি ভক্তদের বলছেন—"দয়া পরোপকার ভাল, তার চইতেও ভাল সেবা—ঈশ্বর বুদ্ধিতে সেবা। এই কথাটাই বলতে ঠাকুর গিছলেন বিদ্যাসাগর মশাইয়ের কাছে। বললেও কিছু কাজ হল না।" (শ্রীম দর্শন, ত্রয়োদশ ভাগ, প্রথম সংস্করণ, পৃষ্ঠা-৮২)।

বিদ্যাসাগরের সাথে শ্রীরামকৃষ্ণ বা রামকৃষ্ণ মণ্ডলীর সম্পর্ক কিন্তু এখানেই শেষ নয়। আরও অনেক কিছু আছে। যেটুকু আমার জানা আছে একে একে বলে যাচ্ছি—স্বামী বিবেকানন্দের পিতা তখন সবে মারা গেছেন। দুদিন পরেই দেখা গেল উনুনে হাঁড়ি চড়া বন্ধ হয়ে গেছে। কেন এমন হল? বিশ্বনাথ দত্ত একজন অ্যাটর্নি ছিলেন। প্রচুর রোজগারও করেছেন, আবার দানও করতেন যথেষ্ট। কিন্তু সে হর্ষবর্ধন কি আর আছে যে পরণের কাপড়টা খুলে দান করে আসবে? হর্ষবর্ধন জানতেন রাজধানী ফিরে গেলেই অমন হাজার পোষাক তার জন্য অপেক্ষা করে আছে। বিশ্বনাথ দত্তের তো কোন রাজকোষ ছিল না। বরং বহু সন্তানের পিতা তিনি। তাদের ভবিষ্যৎ চিন্তা আছে। দান করলেই হলো? নিজের ঘর ভাসিয়ে দান করার মতো বোকা কেউ নেই। তবে এমন হলো কেন?

ঘরে এক মুঠো চাল ডাল নেই। ছোট ছোট ছেলে মেয়ে, বড় বলতে নরেন্দ্রনাথ। তারই বা তখন বয়স কত! হাঁড়ির হাল দেখে প্রায়ই নরেন্দ্রনাথকে 'বন্ধুর বাড়ি নিমন্ত্রণ' খেতে হত। শহীদ মিনারের নীচে বসে হাওয়া খাওয়া। এই ভাবে কি কোন দানবীর দান করেছে কখনো! মহাভারতের কর্ণ, ইতিহাসের হর্ষবর্ধন—এর কাছে নেহাত শিশু মাত্র। কর্ণ দান করে নিজে ডুবেছিলেন, বিশ্বনাথ দত্তের দানের ঠেলায় ঘর সংসার পর্যন্ত ডুবেছে।

দানশীল তিনি ছিলেন, সকলেই জানি। কিন্তু মনে হয় এর সাথে আরও কিছু কারণ ছিল। হয়তো আগেকার বড়লোকদের যে সমস্ত দোষ ছিল, তার মধ্যেও সেরকম কিছু বাসা বেঁধেছিল। স্বামী সারদানন্দের বর্ণনা থেকে একটা আভাসও যেন পাচ্ছি। সারদানন্দ লিখেছেন—'পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়াই সাহায্য করিতে অগ্রসর হইতেন, স্নেহ পরায়ণ

হইলেও বিদেশে দূরে অবস্থান কালে অনেক দিন পর্যন্ত আত্মীয় পরিজনের কিছু মাত্র সংবাদ না লইয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন—ঐরূপ অনেক বিষয় তাহার সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে।' (লীলাপ্রসঙ্গ, পৃষ্ঠা-৭১০)।

বিশ্বনাথ দত্তকে কার্যোপলক্ষে প্রায়ই বাইরে যেতে হতো। কখনো বা নাগাড়ে দু তিন বছরও থাকতে হত। দেখতে পাচ্ছি এ সময় তিনি বউ ছেলেমেয়ের খবর বড় একটা নিতেন না। হয়তো তার কিছু বড়লোকী দোষ ছিল, যে সব ছেড়ে বউ বাচ্চার কথা তার মনে তেমন আসত না। এ ভাবেই তিনি দেউলে বনেছিলেন, হতে পারে না কি? খুব হতে পারে। আগেকার বহু জমিদার এ ভাবেই শেষ হয়েছে এ আমরা সকলেই জানি। এক্ষেত্রে হতে পারবে না কেন?

বিশ্বনাথ দত্ত সম্পর্কে যখন আলোচনা চলছে একটা অজানা খবর এখানে জানাই। যদিও উদ্বোধন পত্রিকা প্রাসঙ্গিকী বিভাগে ১১৫ তম বর্ষ—সংখ্যায় খবরটি বেরিয়েছিল। অতএব অজানা হলেও অনেকেরই জানা। শিরোনাম ছিল— 'নরেন্দ্র জীবনের এক অশ্রুত পূর্ব কাহিনী।' লেখাটি বেশ বড়। আমি খুব সংক্ষেপে মূল বিষয়টুকু তুলে ধরার চেষ্টা করছি। নরেন্দ্রনাথের ছোট ভাই ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত হেদুয়া পার্কে পায়চারী করতে করতে আন্দুলবাসি ভবদেব বন্দ্যোপাধ্যায়কে কাহিনীটি বলেন। এক কালে আন্দুলের রাজবাড়িতে সঙ্গীতের আসরে বিশ্বনাথ দত্ত নিমন্ত্রিত হতেন। বন্ধু এবং রাজবাড়ির অ্যাটর্নি নিমাইচরণ বসু তার সঙ্গী হতেন। কালী কীর্তন সমিতির প্রেমিক মহারাজ—কৌলচারী অবধূত মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের কাছে তাদের মা ভুবনেশ্বরী দেবী দীক্ষা নেন। এই রাজবাড়ির রাজা বিজয় কেশব রায় তার দুই রাণীকে অপুত্রক রেখে স্বর্গারোহণ করেন। জমিদারীর দাবিদার হিসাবে দুই রাণী দুটি দত্তক নেবেন এমনই ঠিক হয়। নিমাইচরণ বসু মারফত প্রস্তাব পেয়ে বিশ্বনাথ দত্ত নরেন্দ্র ও মহেন্দ্রকে দত্তক দিতে রাজি হয়ে যান। অবশ্য তাদের মায়ের আপত্তিতে প্রক্রিয়াটি আপাততঃ স্থগিত থাকে। নরেন আর মহিমের বয়সও তখন একটু বেশি হয়ে গেছিল। কিছুদিন পর ছোট ছেলে ভূপেন্দ্রনাথের জন্ম হয়। ঠিক হয় ভূপেনকেই দত্তক দেওয়া হবে। নরেন্দ্রনাথ তখন প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রথম বর্ষের ছাত্র। সে নির্ঘাৎ কানাঘুষো কিছু শুনেছিল। তাকে জানানো হয়, ও নরেন শুনেছিস, ভূপেন রাজা হবে। ব্যস, হিরোসিমার আগেই বিশ্বনাথ দত্তের বাড়িতে প্রথম অ্যাটম বোমাটি পড়ে, আন্দাজ করছি। দত্তক বাতিল।

যাক, বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে আবার ফিরে যাই। নরেন্দ্রনাথের তখন দারুণ দুর্দিন চলছে। একটা চাকরি বাকরি না জোটালেই নয়। কিন্তু চাকরি দেবে কে! সব জায়গা থেকে হতাশ হয়ে ফিরতে হচ্ছে। নামকরা উকিল বাড়ির ছেলে। একদম সাদামাটা একটা চাকরিতে

যোগ দেনই বা কি করে। হয়তো একটু ভাল কোন কাজের খোঁজেই ছিলেন। না হলে সে যুগে একটা চাকরি জুটবে না, হয় কি করে। শুনেছি সে সময় নাকি ডেকে ডেকে চাকরি দেওয়া হত। এন্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন ঠিকই, এফ. এ. এবং বি. এ. পরীক্ষার রেজাল্ট মোটেও ভাল ছিল না। ইংরাজিতেই সবচেয়ে বেশি নম্বর পেতেন বরাবর। এফ. এ. তে পেয়েছিলেন ৪৬ বি.এ.তে ৫৬। অন্য সব বিষয়ে তিরিশ চল্লিশের ঘরে। লজিকে পেয়েছিলেন মাত্র ১৭। সাদা মাটা চাকরি হয়তো জুটে যেত। ভাল চাকরি মুস্কিল।

শ্রীরামকৃষ্ণই মহেন্দ্র মাস্টারকে তার স্কুলে নরেনের একটা ব্যবস্থার কথা বলেন। মহেন্দ্র মাস্টার স্কুলের প্রধান বিদ্যাসাগরের কাছে নরেন্দ্রর জন্য সুপারিশ করেন। বিদ্যাসাগরের স্কুল তখন সবে গড়ে উঠছে। কর্মীর তো দরকারই। তিনি নরেন্দ্রকে বউবাজার শাখার হেডমাস্টার নিযুক্ত করে নেন।

একমাস যেতে না যেতেই বিদ্যাসাগর মহেন্দ্রনাথকে ডেকে নরেন্দ্রনাথের বরখাস্তের কথা জানিয়ে দেন। বলে দেন "তা হলে নরেন্দ্রকে বলো আর না আসে। দরকার হবে না।" (শ্রীম দর্শন, চতুর্থ ভাগ, প্রথম সংস্করণ, পৃষ্ঠা-৫৬)।

এই বরখাস্তের কারণ হিসাবে যা দেখানো হয় সেখানে কিছু অসঙ্গতি মিশে রয়েছে। বিদ্যাসাগরের জামাই ছিলেন স্কুলের সেক্রেটারী। তিনি নাকি নরেন্দ্রকে পছন্দ করতেন না। ফার্ষ্ট এবং সেকেণ্ড ক্লাসের ছাত্রদের দিয়ে তিনি অভিযোগ লেখান 'নরেন্দ্র পড়াতে পারেন না।' এই দেখে বিদ্যাসাগর নরেন্দ্রকে স্কুলে আসতে বারণ করে দেন।

এখানে আমার একটু বক্তব্য আছে। বিদ্যাসাগর মশাই কি এতই 'কান পাতলা' লোক যে তার স্কুলের হেডমাস্টারের অনুরোধে যাকে তিনি নিয়োগ করলেন, ছাত্রদের অভিযোগ ওঠা মাত্র কোন রকম অনুসন্ধান না করেই তিনি তার চাকরি খেয়ে নেবেন? এ হতে পারে না। অভিযোগ তিনি পেয়েছিলেন ঠিকই। তিনি নরেন্দ্রর সাথে আলোচনায় বসতে পারতেন। অনুরূপ পরিস্থিতিতে সব জায়গায় তাই করা হয়ে থাকে। কিন্তু তা তিনি করলেন না।

আসল কথা বিদ্যাসাগর মশাই আগে থেকেই খবর পেয়েছিলেন নতুন মাস্টার ছাত্রদের খুব 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা' বোঝাচ্ছে। মনোমোহন গাঙ্গুলীর সাক্ষ্য 'আমার অন্যতম বন্ধু, স্বামীজীর এক ছাত্রের কাছে শুনেছি, তিনি নীতি ও ধর্মশিক্ষার উপর বিশেষ জোর দিতেন।' {(বিবেকানন্দ জীবন ও জিজ্ঞাসা—প্রথম প্রকাশ ১৯৬৩, কনটেম্পোরারী পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা - ৩৩)। এই বইটির মূল ইংরাজি বইটি সম্ভবতঃ স্বামীজীর প্রথম ক্ষুদ্র জীবনী গ্রন্থ।} বোঝাই যাচ্ছে বিজ্ঞানের সাথে ধর্মবিজ্ঞানও সমান তালে চলছিল। অতএব প্রথম যে সুযোগ হাতে এসেছে বিদ্যাসাগর তাকেই কাজে লাগিয়েছেন। তিনি চাননি তার স্কুলের

কোন শিক্ষক ছাত্রদের ধর্ম শিক্ষা দিক। এই একই কারণে তার হেডমাস্টার শ্রীম, মানে কথামৃতকার শ্রী মহেন্দ্রনাথ গুপ্তও তার নজরে ছিলেন। তিনি সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। কবে সেই সুযোগটি আসে!

শ্রীম তখন ছাত্রদের ধরছেন আর রামকৃষ্ণদেবের কাছে চালান করছেন। তার নামই হয়ে গেল 'ছেলে ধরা মাস্টার'। বিদ্যাসাগর মশাই এতটা জানতেন না। জানলে আর একদিনও তার চাকরি থাকতো না। কিন্তু ধর্ম নিয়ে যে মাতামাতি করেন এটা জানতেন।

একবার স্কুলের রেজাল্ট খারাপ হয়েছে। এমন সুযোগ বিদ্যাসাগর হাত ছাড়া হতে দেবেন না। 'অন্ত্যলীলা'র বর্ণনা এখানে তুলে দিলাম—'বৃহস্পতিবার, ২০মে ১৮৮৬, মাস্টার মশাইয়ের জীবনে উপস্থিত হয় একটি বড় রকমের দুঃসময়। সেবার তার স্কুলের ফল তেমন ভাল হয় নাই। বিদ্যাসাগর তাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। দেখা হতে বিদ্যাসাগর মশাই অভিযোগ করেন যে মাস্টারমশায় স্কুলে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব ঠিক মতো পালন করছেন না। তার অবহেলার জন্যই ছাত্রদের প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল আশানুরূপ হয় নি। উপরন্তু বিদ্যাসাগর অভিযোগ তোলেন যে পরমহংসদেবের নিকট অত্যধিক যাতায়াতের ফলেই এই ধরণের অবহেলা ঘটেছে। (শ্রী রামকৃষ্ণের অন্ত্যলীলা—স্বামী প্রভানন্দ, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, পৃষ্ঠা-২৫৮, স্বামী নিত্যাত্মানন্দের 'শ্রীম দর্শন' ষোলটি খণ্ডের বহু জায়গাতেই এই ঘটনাগুলির ইতিহাস পাওয়া যাবে)।

মহেন্দ্রনাথ বুঝলেন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে তার যাতায়াতকেই বিদ্যাসাগর কটাক্ষ করেছেন। পরের দিনই তিনি ইস্তফা দিয়ে দেন। এই খবর শুনে রামকৃষ্ণদেব মহেন্দ্রনাথের পরিবার নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েন। আবার বিদ্যাসাগরের মত অন্তঃসার শূন্য আকাটের স্কুলের চাকরি ছেড়ে দেবার জন্য আনন্দ প্রকাশও করেন।

আর একটি ঘটনার উল্লেখ করে বিদ্যাসাগর শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গ শেষ করব। হয়তো আরও অনেক আছে, আমাদের আর দরকার লাগছে না।

স্বামী বিরজানন্দ, স্বামী বোধানন্দ, স্বামী শুদ্ধানন্দ, স্বামী বিমলানন্দ, স্বামী প্রকাশানন্দ আরও কয়েকজন 'নন্দ', যদিও তখনও এরা 'নন্দ বংশে' নাম লিখিয়ে ফেলেনি, মানে পুরোদস্তুর সন্ন্যাসী হয়ে যায় নি। তবে তার প্রস্তুতি চলছে। রামচন্দ্র দত্তের কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে নিত্য যাতায়াত, সাধন ভজন কীর্তন নিয়ে দারুণ দিন কাটছে। আনন্দের হাট লেগেই আছে। একদিনের আনন্দের বর্ণনা এই রকম—'যোগোদ্যানে রামবাবু ও মনমোহন বাবুর নাচতে নাচতে ভাব হল। এই প্রথম ভাবাবেশ দেখলুম। রামবাবু "জয় রামকৃষ্ণ" বলে হুঙ্কার দিয়ে সিংহ বিক্রমে নেচে নেচে ঘুরতে লাগলেন। মনমোহন বাবু যেন কি অপূর্ব দর্শন করছেন, খিল খিল করে অপরূপ হেসে কুঁজো ও আড়ষ্ট হয়ে দৌড়াদৌড়ি

করতে লাগলেন। খুব মাতামাতি হল। আমরা সব দেখে অভিভূত হলাম। রামবাবু আমাদের খুব আদর যত্ন করলেন, আবার আসতে বললেন।'

এই আনন্দবাজারে বেশ দিন কাটত। যদিও রমাঁ রলাঁর মতে 'ইউরোপ হলে এদের মানসিক শোধনাগারেই ঠাঁই হত।' এখানে কিন্তু এই বিকৃত মানুষগুলোই দিবারাত্র ঠাকুরের অন্নভোগ, সাজ পরিবর্তন, জন্মোৎসব এই সব নিয়ে দিব্যি দিন কাটিয়ে দিচ্ছে।

কালীকৃষ্ণ মহারাজের স্মৃতিকথার কিছু বর্ণনা আগেই দিলাম। পরবর্তী অংশও সেখান থেকেই তুলে আনছি। কালীকৃষ্ণ মহারাজ—স্বামী বিরজানন্দ, বিরাট চুল রাখতেন, মায়ের কাছে আব্দার করে খোপা বেঁধে নিতেন। মায়ের জামা কাপড় লুকিয়ে নিয়ে এসে তাই পরে শ্রীরাধিকা সাজতেন। একজন পুরোদস্তুর বিকৃত মানুষ। তিনি স্মৃতি কথায় বলছেন—

'এই সময় একবার উপেনের প্রস্তাব মত আমরা ঠিক করেছিলুম যে, সকলে ভিক্ষা করে যা পাওয়া যাবে তাতে যোগোদ্যানে একদিন ঠাকুরের ভোগ দেওয়া হবে। সেজন্য আমাদের মধ্যে কয়েকজন ভিক্ষা করে চাল পয়সাদি যা সংগ্রহ করত সব জমানো হত। ঐ উদ্দেশ্যে সুধীর প্রভৃতি দুই তিন জন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছে গিয়েছিল। তিনি সব শুনে মিষ্ঠ কথায় বললেন—"দেখ বাবু, তোমরা নিজে উপার্জন করে ভোগ দেবার ব্যবস্থা কর।" (অতীতের স্মৃতি—স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা-২৩)।

অন্যত্র দেখেছি বিদ্যাসাগর মশায় আরও বলেছিলেন "এই ব্যাপারে একটি পয়সা দিয়েও তোমাদের আমি সাহায্য করব না।" সুধীর (স্বামী শুদ্ধানন্দ) ছাড়াও ভিক্ষার জন্য আর যারা গেছিলেন—সুধীরের ভাই স্বামী প্রকাশানন্দ, স্বামী বোধানন্দ এবং আর একজন। বিদ্যাসাগর মশায় এদের সাথে মিষ্টি ব্যবহার করেছিলেন বলে উল্লেখ থাকলেও মনে হয় সেটা ঠিক নয়।

আর এক জায়গা থেকে এই ঘটনাটির বর্ণনা দিচ্ছি। কথামৃতকার শ্রীম বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষ সম্বন্ধে ভক্তদের বলছেন—"বোধানন্দরা তখন কলেজে পড়ে, এফ. এ। বিদ্যাসাগর মশাইয়ের কাছে গিছল কিছু চাঁদার জন্যে। কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে উৎসব হবে। তাই কিছু কিনে দিবে ঠাকুরকে ভিক্ষা করে। বিদ্যাসাগর মশায় বললেন, 'বেশ তো, তোমাদের কিছু দিতে ইচ্ছে হয়, তো রোজগার করে দাও না।' মানে, এরা এই সব মানে না। গরীবকে হয়তো দিবেন, ওসবে বিশ্বাস নাই। তারপর তারা চাল ভিক্ষা করে সেই চাল বেচে। তখন ফল আম কিনে নিয়ে গেল। বিদ্যাসাগর মশাই কিছুই দিলেন না। বিশ্বাস নাই যে ওতে।" (শ্রীম দর্শন নবম ভাগ, প্রথম সংস্করণ, পৃষ্ঠা-১৮৭)।

বিদ্যাসাগরের প্রসঙ্গ ধরেই শ্রীম আরও বলে যাচ্ছেন—"আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ও শুনতে পাই ওই রকম। পার্শি বাগানে শরৎকে দেখতে গিছলাম। ওরা বললে সমিতির ঘরে এসে (প্রফুল্লচন্দ্র রায়) ডাক্তারখানা দেখে গেলেন। কিন্তু যেদিকে ঠাকুর আছেন

সেদিকে গেলেন না। তা কি করবে, সবাই কি একরকম হবে? ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি। বিদ্যাসাগর, পি. সি. রায় এরা তো ফেলনা লোক নন। এদের যেখানে এই ভাব, বুঝতে হবে তিনিই এইরূপ করেছেন। Division of labour। কতকগুলি লোককে এক একটা ডিপার্টমেন্টে রেখে দিয়েছেন।'' (শ্রীম দর্শন নবম ভাগ, প্রথম সংস্করণ, পৃষ্ঠা-১৮৮)।

তাহলে দেখতে পাচ্ছি সেই সময়ের আর এক মহান ব্যক্তিত্ব আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ও শ্রীরামকৃষ্ণ এবং ধর্ম দুটোকেই আমল দিতে চাননি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথের সাথে শ্রীরামকৃষ্ণের মাত্র একবারই দেখা হয়েছিল। সেই নন্দনবাগান ব্রাম মন্দিরে। রবীন্দ্রনাথ তখন একুশ বাইশ বছরের যুবক। সম্ভবত শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে কিছুই জানতেন না অথবা জানার প্রয়োজন বোধ করেননি। যদি তিনি রামকৃষ্ণদেবের ব্যাপারে কিছু জানতেন অথবা যদি তার প্রতি কোন আগ্রহ থাকত তাহলে হয়তো ওই দিন একটি বারের জন্যেও রামকৃষ্ণদেবের কাছে আসতেন। কিন্তু সেরকম হয় নি। ধরে নেওয়া যায় ওই সময় পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণদেব রবীন্দ্রনাথের কাছে অজানাই ছিলেন। এই রকমই যদি চলত তাহলে রামকৃষ্ণ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলে কোন কথাই উঠত না, ল্যাঠা চুকে যেত। তা কিন্তু হয় নি। রবীন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণ অথবা তার শিষ্যদের নিয়ে নানান মন্তব্য করেছেন। আবার তারই মধ্যে মিশন রবীন্দ্রনাথের মুখে কিছু কথা বসিয়েছে যার সত্যতা নিয়ে সংশয় আছে।

রবীন্দ্রনাথ একবার শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসবে সভাপতিত্ব করেন। একবার বেলুড় মঠেও যান। সম্ভবত দুটি ক্ষেত্রেই তিনি কোনো এক ঘনিষ্ঠজনের অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারেননি। প্রখ্যাত জীবনীকার প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় 'রবীন্দ্রজীবনকথায়' লিখছেন—'রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের জন্য রবীন্দ্রনাথ চার পংক্তির কবিতা ও তার ইংরাজী তর্জমা লিখে পাঠালেন। কবি এ পর্যন্ত রামকৃষ্ণ সম্পর্কে কখনও কোন ভাষণ বা উক্তি করেন নি; এবার যে করলেন তার পিছনে ছিল অন্যের অনুরোধ।' স্বামী শ্যামানন্দের 'শ্রী রামকৃষ্ণ কাব্য লহরী' বইটির ভূমিকাও লেখেন রবীন্দ্রনাথ।

একবার কুমুদবন্ধু সেন এসেছেন গিরিশ ঘোষের সাথে দেখা করতে। কথায় কথায় রবীন্দ্রনাথের সদ্য প্রকাশিত 'রূপ ও অরূপ' প্রবন্ধের কথা ওঠে। 'কুমুদ বন্ধু বলেন, রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, তিনি শুনেছেন—শক্তি উপাসক কোন একজন বিখ্যাত ভক্ত মহাত্মা আলিপুর পশুশালায় সিংহকে বিশেষ করে দেখবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুলতা প্রকাশ করেছিলেন—কেননা 'সিংহ মায়ের বাহন'। রবিবাবু বলেন যে, শক্তিকে সিংহ রূপে কল্পনা করতে দোষ নেই—কিন্তু সিংহকেই শক্তি রূপে দেখলে কল্পনার মাহাত্ম্যই চলে যায়।'

শ্রীরামকৃষ্ণের নামে কটাক্ষ শুনে গিরিশ ঘোষ ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন। বলেন রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন এটা যে কি তা তিনি বোধ হয় নিজেই ভাল করে প্রকাশ করতে পারেননি। হিন্দুরা সিংহকে মহাশক্তি বলে পূজা করে না। তিনি যত বড় সাহিত্যিক হোন না কেন, তা তার অনধিকার চর্চা।

এরপর অনেক কথা কাটাকাটির শেষে গিরিশ বলেন, "যিনি এই পরম প্রেমের জীবন্ত মূর্তিকে চিনতে পারেননি তিনি যিনিই হোন—সাধু হোন, কবি হোন, দার্শনিক হোন, রাজনীতিজ্ঞ হোন, যিনিই হোন তিনি এই যুগের যথার্থ বাণী দিতে পারবেন না—জগতের সভ্যতা ভাণ্ডারে স্থায়ী দান করতে পারবেন না।" (ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ—গিরিশ ঘোষ, পৃষ্ঠা-২০৭-২১০)।

রবীন্দ্রনাথও গিরিশ ঘোষ সম্বন্ধে আজীবন নীরব থেকেছেন। শুধু একবার গিরিশের রচিত একটি গান শুনে, "শুনিয়াছি লোকটা বেশ গান বাঁধতে পারে।" ব্যস, এইটুকুই। আর কোথাও কোন মন্তব্য নেই।

স্বামীজী কিন্তু সুস্পষ্ট ভাবেই নিবেদিতার কাছে ঠাকুরবাড়ি এবং রবীন্দ্রনাথের জীবন দৃষ্টি সম্বন্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। মহর্ষির প্রতি তার যথেষ্ট শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল। কিন্তু তিনি সরাসরি নিবেদিতাকে বলেছিলেন, ঠাকুরবাড়ির আদর্শ বাঙালির জীবনে পৌরুষ জাগরণের সহায়ক নয় এবং ঠাকুরবাড়ির সাহিত্য সৃষ্টিও তার কাছে ছিল অপৌরুষেয়। আক্ষরিক ভাবে স্বামী বিবেকানন্দ নিবেদিতাকে যা বলেছিলেন—"Remember that family had poured a flood of erotic venom over Bengal." (রবীন্দ্রনাথ চাইলেও বিবেকানন্দ মেশেননি—তুহিনশুভ্র ভট্টাচার্য, প্রথম প্রকাশ, পৃষ্ঠা-১২৮)। 'মনে রেখ, ওই পরিবারটি বাংলার উপর আদি রসের এক বিষাক্ত প্রভাব বিস্তার করে চলেছে।'

মাঝে মধ্যেই তিনি নিবেদিতাকে রবীন্দ্রনাথের সাথে মেলামেশার জন্য সাবধান করতেন। নিবেদিতার চিঠি থেকে পাই ১১ই মার্চ ১৮৯৯ স্বামীজী তাকে লিখেছিলেন—"মার্গট, তুমি যতদিন ওই ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে তোমার মেলামেশা চালিয়ে যাবে, ততদিন আমাকে বারবার সাবধান করে যেতেই হবে।" অথবা, জাপান থেকে আগত ওকাকুরার সাথে নিবেদিতার মেলামেশাকে সাবধান করে মৃত্যুর ঠিক আগের রবিবার ২৯শে জুন ১৯০২ স্বামীজী লিখেছিলেন—"পূর্বে তোমার ছিল ব্রাহ্মদের প্রতি প্রত্যয়, টেগোরের প্রতি প্রত্যয়, আর এখন এইসব প্রত্যয়। এটিও যাবে, যেমন অন্যগুলো গেছে।" (নিবেদিতার পত্রাবলী, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৮২, ৫২৬)। উল্টো দিকে রবীন্দ্রনাথ কোনো এক অজ্ঞাত ব্যক্তিকে ২৪ নভেম্বর ১৯২১ চিঠি লিখছেন—"ভগিনী নিবেদিতা বিবেকানন্দের শিষ্যা হইয়া কুশিক্ষা গ্রস্ত হইয়াছেন।" (রবিজীবনী, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৪৪)।

পরবর্তীকালে সত্যসত্যই দেখতে পাই নিবেদিতা রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কটি ফিকে হয়ে এসেছে। নিবেদিতাও রবীন্দ্রনাথের কাছে আর আসেননি, রবীন্দ্রনাথও নিবেদিতাকে ডেকে পাঠাননি। রবীন্দ্রনাথের অনেক ভক্তই হয়তো একথা জানেন না স্বামী বিবেকানন্দ তাদের গুরুদেবের জীবন দর্শন এক কথায় নস্যাৎ করে দিয়ে গেছেন। যদিও স্বামীজী রবীন্দ্রনাথের গান অনেক গাইতেন। এর মধ্যে থেকেই দুজনের সৌভ্রাতৃত্ব খুঁজে বার করা হয়। সেটা ভুল। 'ও দুনিয়া কে রাখওয়ালে' আমি ঘরে বসে পাঁচ হাজার বার গেয়েছি। আমি কি ভগবান ভক্ত হয়ে গেছি!

এই আলোচনাটি আর বেশি বাড়াতে পারছি না। কারণ, নিজেরই জানার অভাব আছে। 'ভারতবর্ষকে জানতে হলে বিবেকানন্দকে জান। তার সবই ইতিবাচক, নেতিবাচক কিছুই নেই,' এই বিখ্যাত উক্তিটি নিয়ে উদ্বোধন পত্রিকার আশ্বিন, ১৩৯৫, ৯০ তম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা ৫৮১ পৃষ্ঠায় যা বলা হয়েছে এবং এ বিষয়ে স্বামী পূর্ণাত্মানন্দের গবেষণা সম্পূর্ণ তুলে দিয়ে প্রসঙ্গ শেষ করব। শোনা যায় ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের সাথে রমাঁ রলাঁর যখন প্রথম দেখা হয় কবি তখন ফরাসী মনীষীকে এই কথাটি বলেছিলেন। দুঃখের বিষয়, রলাঁর ডায়েরিতে উক্ত সাক্ষাৎকারের যে বিবরণ আছে সেখানে রবীন্দ্রনাথের ঐ উক্তির কোন উল্লেখ নেই। রলাঁ অথবা রবীন্দ্রনাথের প্রকাশিত কোন রচনাতেও উক্ত মন্তব্যটির কোন উল্লেখ নেই। স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ জানাচ্ছেন ঃ—স্বামী অভয়ানন্দ বলেছেন রলাঁ নিজেই এই তথ্য এক সময়ে স্বামী অশোকানন্দকে জানিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর উদ্বোধন পত্রিকায় যে বিশেষ সংবাদ-নিবন্ধ প্রকাশিত হয় (ভাদ্র ১৩৪৮) সেখানে এক জায়গায় বলা হয়েছে যে, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ চরিতের জন্য রলাঁ যখন উপাদান সংগ্রহ করছিলেন, সেই সময় শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের এক সন্ন্যাসীকে তার ঐ উক্তির কথা জানিয়েছিলেন। দেখা যাচ্ছে উভয় ক্ষেত্রেই আমাদের নির্ভর করতে হয় শ্রুতি ও স্মৃতির উপর। নির্ভরযোগ্য দলিলের অভাবে কেউ কেউ তথ্যটির প্রামাণিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতেই পারেন। একথা অবশ্য স্বীকার্য যে, শ্রুত রচনাকে উপেক্ষা করা চলে না। কিন্তু এক্ষেত্রে অসুবিধার সৃষ্টি করেছে দেশ পত্রিকায় ১৯৮৬, ২৭ ডিসেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের একটি পত্রের অংশ বিশেষ। সংশ্লিষ্ট পত্রটি রবীন্দ্রনাথ লেখেন ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বস্টন শহর থেকে ক্ষিতিমোহন সেনকে। সেই পত্রে রবীন্দ্রনাথ বলছেন—"......আমাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কোন উপলক্ষে একবার পশ্চিম সাগরকূল ঘুরিয়ে নিয়ে যাবার ইচ্ছা আমার মনে জাগ্রত আছে। সেইজন্য আরবানা থেকে বেরিয়ে অবধি এই চেষ্টা করচি, কিন্তু এ পর্যন্ত যাকেই বলেছি কেউ কর্ণপাত করেননি। তার প্রধান কারণ এই বুঝেচি যে বিবেকানন্দের চেলারা এদেশে বেদান্ত প্রভৃতি সম্বন্ধে বক্তৃতা করে বেদান্ত এবং ভারতবর্ষের বিদ্যাবুদ্ধির উপর এদের শ্রদ্ধা একেবারে ঘুচিয়ে দিয়েছে।....

"১৯২১ খ্রিস্টাব্দে রলাঁকে যিনি বললেন ভারতবর্ষকে জানতে হলে বিবেকানন্দকে জানতে হবে, তিনিই সেই ১৯২১ খ্রিস্টাব্দেই 'বিবেকানন্দের চেলাদের' সম্পর্কে করলেন এই ঘোর অশ্রদ্ধাসূচক মন্তব্য! রবীন্দ্রনাথের কি ধারণা, স্বামীজীর অনুগামীরা বেদান্ত প্রভৃতি বিষয়ে যা বলতেন তা স্বামীজীর ধ্যানধারণার পরিপন্থী? অথবা তিনি কি মনে করতেন, বিবেকানন্দ নিজেও বেদান্ত বুঝতেন না, বিদেশীদের বোঝাতেও পারতেন না? যাই হোক, রলাঁর নিকট ঐ উক্তি আর ক্ষিতিমোহন সেনকে লেখা চিঠির উক্ত অংশ—এই দুই বস্তুকে মেলাতে গিয়ে বিভ্রান্ত বোধ করতে হয়। কোথাও একটা গণ্ডগোল আছে কি?'

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দের মতামত সম্পূর্ণ তুলে দিলাম, গণ্ডগোল খুঁজে বার করার দায়িত্ব পাঠকের। তবে স্বামীজীর 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' প্রবন্ধটির কথা রবীন্দ্রনাথ খুব বলতেন। দু-একটি প্রবন্ধে স্বামীজীর কিছু সুখ্যাতিও তিনি করেছেন।

১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে রলাঁর সাথে রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় সাক্ষাৎকারের কিছু আগে রলাঁর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনচরিতমূলক গ্রন্থ দুটি প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ সেদিন ঐ গ্রন্থদ্বয়ের জন্য রলাঁকে অভিনন্দন জানান নি। আলোচনাকালে গ্রন্থ দুটির স্পষ্ট উল্লেখও করেননি। তবে ঐ দুই গ্রন্থের কোন-কোনও অংশ পড়ে তার যা মনে হয়েছে সে কথা রলাঁকে জানানোর সূত্রেই সেদিন তিনি মা কালীর উপাসনা এবং মা কালী উপাসনার সমর্থকদের উপর তীব্র আক্রমণ করেছিলেন। স্পষ্টতই শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দকে উদ্দেশ্য করেই। দিনিলিপির শুরুতেই রমা রলাঁ একথা উল্লেখ করেছেন।

মিস্ ম্যাকলাউডকে লেখা নিবেদিতার ৩০/১/১৮৯৯ তারিখের একটি চিঠি থেকে জানতে পারছি বাগবাজারে নিবেদিতার ব্যবস্থাপনায় ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দে ২৭ জানুয়ারীর এক সভায় রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ দুজনেই উপস্থিত থাকলেও কেউ কারো সাথে কথা বলে নি।

এক রবীন্দ্র গবেষকের মন্তব্য তুলে দিয়ে এই অধ্যায় শেষ করব। 'হৃদয়ের যোগ তেমন ছিল না বলেই তাঁর রচনাবলীর হাজার হাজার পৃষ্ঠায় শ্রীরামকৃষ্ণ অধিকার করে আছেন মাত্র কয়েক ছত্র।'

স্বাধীনতা সংগ্রামে রামকৃষ্ণ মিশন

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের যে সময় জন্ম এবং বেড়ে উঠা, ভারতবর্ষ তখন ইংরেজের অধীন এক পরাধীন দেশ। রাণী রাসমণির মতো জমিদার এবং ধনিক সম্প্রদায়ের 'রায়' 'রায়বাহাদুর' খেতাবের বদান্যতায়, নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে, দেশীয় রাজাদের অক্ষমতায় এবং আরও নানা কারণে স্বাধীনতা তখন অস্তগত। দেশের শত শত যুবক যুবতী বিপ্লবের যূপকাষ্ঠে আত্মবলি দিতে উদ্যত। ইংরেজের অত্যাচারে দেশবাসীর জীবন অতিষ্ঠ। ঠিক সেই মুহূর্তে রামকৃষ্ণদেব এবং তার শিষ্যমণ্ডলী দেশকে কি উপহার দিলেন? এই অধ্যায়ে তাই আমাদের আলোচ্য।

'রামকৃষ্ণ মিশন' মোড়কে ইংরেজ সরকার একটি 'বন্ধু' সংস্থা পেয়েছিল। যাদের প্রভাবে বহু বিপ্লবী বিপ্লব জীবন ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়েছিলেন। হয়তো আরও বহু যুবক যারা ভবিষ্যতে বিপ্লবীই হতো, কিন্তু মিশনের প্রভাবে বিপ্লবের পথে না এসে সন্ন্যাসীর জীবন বেছে নিল। নেতাজী সুভাষ বোসকে সামনে রেখে মিশনের এরকম একটা ভাবমূর্তি আছে যে মিশন বুঝি বিপ্লবকে নানা ভাবে সাহায্য করেছে এবং বহু বিপ্লবীর জন্ম দিয়েছে। আমি গাদা গাদা প্রমাণ দিয়ে দেখাব কথাটা একদমই ঠিক নয়। বরং ধর্মান্ধতায় ডুবে গিয়ে সে সময় বিপ্লব কি ভীষণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরিমণ্ডলের মধ্যে দু-একজন যেমন স্বামী বিবেকানন্দ, যার মধ্যে বিপ্লবের ভাব ছিল। কিন্তু তিনিও ধর্মকে প্রাধান্য দিতে সেই বিপ্লবকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে দেন নি। যে উচ্চতায় তিনি পৌঁছেছিলেন সেখান থেকে তিনি এটা করতেই পারতেন। কিন্তু তা তিনি করেননি। এতে দেশবাসী কি পেল? ধর্ম! সে তো হাজার হাজার বছর ধরে আমাদের প্রচুর আছে। তাকে একটু উসকে দেওয়া ছাড়া নতুন করে দেবার কি আছে।

স্বাধীনতা সংগ্রাম মানে সবাইকে ছুরি বোমা নিয়ে সাহেবের পেছনে ছুটতে হবে তা নয়। সংগ্রামকে যারা অর্থ সাহায্য করছে, পরামর্শ দিচ্ছে, পত্র পত্রিকায় লিখছে, নিদেনপক্ষে বিপ্লবের ক্ষতি না করে তার জয় কামনা করছে, তাকেও স্বাধীনতা সংগ্রামী অথবা দেশপ্রেমিক মেনে নিতে রাজী আছি। পরাধীন দেশের নাগরিক হিসাবে সেটাই সকলের প্রথম দায়িত্ব। সাহায্য করতে না পার অন্ততঃ ক্ষতি কোর না। 'রাজনীতির পথ আমাদের নয়, আমাদের পথ আলাদা'। অথবা 'যাতে নিজের মুক্তিলাভ হয় সেই চেষ্টা কর।' কথাগুলি সেই সময়ের সাথে কতটা খাপ খায় সেটা কিন্তু এখনও সেভাবে মেপে

দেখা হয়নি। আমার যেটুকু জানা আছে তার মধ্যে থেকে খুবই অপ্রচলিত কিছু তথ্য সকলের কাছে তুলে ধরবো। ভেবে দেখার দায়িত্ব পাঠকের।

স্বামী বিবেকানন্দের একটি চিঠি এবং খোদ ইংলণ্ডে বসে ইংরেজ অফিসারের সামনে তাদের নারকীয়তা নিয়ে গর্জে ওঠা দেখে মনে হতে পারে দেশের পরাধীনতার গ্লানি দূর করতে সবার আগে হয়তো তিনিই এগিয়ে আসবেন। বাস্তবে কিন্তু তা হয়নি। তিনি নিজে তো বিপ্লবে জড়ানইনি উপরন্তু তার অনুগামীদেরও ওপথ থেকে দূরে থাকতে আদেশ দিয়ে গেছেন।

অন্নদাঠাকুর, যিনি পরবর্তীকালে এক মহাযোগীর আসন লাভ করেছিলেন, তিনি এক ভীষণ ঝড়বাদলের দুর্যোগপূর্ণ রাতে বেলুড়মঠে আশ্রয়প্রার্থী হয়ে গেছিলেন। মাত্র একটি রাত মঠে থাকার অনুমতি চেয়েও তিনি বঞ্চিত হন। অচেনা লোক, বিপ্লবী হতে পারে, এই আশঙ্কায় তাকে মাত্র একটি রাতও মঠে থাকতে দেওয়া হয় নি। ওই দুর্যোগের মধ্যেই তাকে ফিরে আসতে হয়। (স্বপ্ন জীবন—অন্নদাঠাকুর, প্রথম সংস্করণ, পৃষ্ঠা-১৪৯)।

এমন কি যে নিবেদিতাকে বাদ দিলে স্বামী বিবেকানন্দের অর্দ্ধেকটাই অজানা থেকে যায়, সেই নিবেদিতাই রামকৃষ্ণ মিশনের কেউ নয়! তাকে স্রেফ মিশন থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল এবং আজও নিবেদিতা মিশনের কেউ নন। কিন্তু কেন তাকে বহিষ্কার করা হল? সে প্রসঙ্গে নিশ্চয়ই যাব। তার আগে রামকৃষ্ণদেবকে দিয়ে শুরু করি। ভক্ত কবি অক্ষয় কুমার সেন যেরকম বর্ণনা দিয়েছেন সেই ভাবেই এগোতে থাকব।

শ্রীরামকৃষ্ণের এক ভক্ত যদু মল্লিকের বাগানে রামকৃষ্ণদেবের নেমন্তন্ন হয়েছে। অনেক নিমন্ত্রিতের মধ্যে প্রধান দুইজন, যতীন্দ্রঠাকুর নামে এক ব্রাহ্মণ জমিদার, আর কৃষ্ণদাস পাল, প্রখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী। তবে ঢাল তরোয়াল নিয়ে নয়, কলম হাতে।

যতীন্দ্রঠাকুর রামকৃষ্ণদেবকে খুব একটা আমল দেন নি। ভক্ত কবি তাকে মৃদু গাল মন্দ দিয়ে রেহাই দিয়েছেন। বলেছেন লক্ষ্মীর প্রসাদে এর ভক্তির দরজা বন্ধ। নইলে অমন আমাদের প্রভুদেব তাকে কিনা অবজ্ঞা করে! কৃষ্ণদাস পালকে কিন্তু কবি ছেড়ে কথা বলেন নি—

অন্যজন কৃষ্ণদাস পাল জেতে চাষা।
বড়ই বুঝেন তিনি ইংরাজের ভাষা।।

আমরা কারও প্রতি রেগে গিয়ে বলে বসি না 'বেটা চাষা কোথাকার, আশি বছর বয়স হল এখনও জ্ঞানগম্যি হল না'। পাল মশাই সত্যিই কৃষক সম্প্রদায়ের লোক হতে পারেন। কিন্তু এখানে ভক্ত কবির রাগ অন্য কারণে। তিনি সরাসরি গুরুদেবের জীবন

দর্শনের সমালোচনা করে বসেছেন। কৃষ্ণদাস পাল লোক তো খুব সাধারণ নন। কবি বলছেন—

সূক্ষ্ম বুদ্ধি সুনিপুণ রাজনীতি জ্ঞানে।
বড় বড় সাহেবেরা অতিশয় মানে।।
হিন্দু পেটরিয়ট পত্র করেন প্রকাশ।
চোটে লেখা দেখে লাগে লাটের তরাশ।।
লাটের কাটেন কথা খুঁট ধরি তায়।
প্রশংসা ভাজন তাই যথায় তথায়।।

এহেন কৃষ্ণদাস পালের জীবন দর্শন শ্রীরামকৃষ্ণের থেকে আলাদা কিছু হওয়াই স্বাভাবিক। বিপ্লবী পাল মশাইকে রামকৃষ্ণদেব কিভাবে ভগবান সম্পর্কে বোঝাচ্ছেন তার বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি প্রথমেই তাকে 'চাষা' বানিয়েছেন। পরে বলছেন—

গর্ব খর্ব কারী প্রভু সর্ব শক্তিমান।
শুনো রামকৃষ্ণ কথা অমৃত সমান।।

উপস্থিত নিমন্ত্রিতেরা শ্রীরামকৃষ্ণকে ঈশ্বরীয় কথা কিছু শোনাতে বলেন। তিনিও 'ভগবানই সব, তাকে ছাড়া গতি নেই, কাম কাঞ্চন কতদূর খারাপ, যুক্তি তর্ক আরও খারাপ, নানাবিধ বিবেক বৈরাগ্যের কথা শোনাতে থাকেন। ভক্ত কবি আবার কৃষ্ণদাস পালের ঘাড়ে খারাপ বৈশিষ্ট্যগুলো সব চাপিয়ে দিয়েছেন। কারণ একটু পরেই তিনি প্রতিবাদী হয়ে উঠেছেন।

আগুয়ান হইলেন সাধ্য যতদূর।
প্রতিবাদে বৈরাগ্যের কথা শ্রীপ্রভুর।।
সভায় পালের পোর গরম আসন।
মনে জানে আপনারে অতি বিচক্ষণ।।
দম্ভ সহ প্রতিবাদ উত্থাপন করে।
পাতিয়া কথার জাল সভার ভিতরে।।

পাল মশাই কেমন জাল পেতেছেন আর একটু টেনে দেখা যাক —

বৈরাগ্য ভীষণ বড় উন্নতির পথে।
পথের ভিখারী করে নাহি দেয় খেতে।।
বৈরাগ্য বৈরাগ্য করি ভারতের জাতি।
ধন রাজ্যচ্যুত, খায় ইংরাজের লাথি।।
স্বাধীনতা সংরক্ষণে বিহীন বিক্রম।
এদেশের দুর্দশার ইহাই কারণ।।

জন্মভূমি রক্ষা আর পর উপকার।
নরের কর্তব্য কর্ম এই ধর্ম সার।।
বৈরাগ্যের যত বল সে সকল জানি।
নামান্তরে কহে এরে দুঃখের জননী।।
অতিহীন পরাধীন যে বিরাগে আনে।
যতনে অর্জনে তার উপদেশ কেনে।।

কৃষ্ণদাস পালের মতে আমাদের এই হীন দশার একটা প্রধান কারণ 'বৈরাগ্য'। প্রকাশ্যে কেউ বৈরাগ্য প্রচার করে তা তিনি চান না। তিনিও চান 'গীতা ছেড়ে ফুটবল'। তবে ধ্যান ভজনের তরে নীরোগ শরীরের জন্য নয়। বীর্যবান, বিপ্লবী জাতের স্বার্থে। রামকৃষ্ণদেব সেই বৈরাগ্যের বাণীই প্রচার করছেন। কৃষ্ণদাস পাল তা মেনে নিতে রাজী নন। তিনি বোঝাতে চান পরাধীন দেশের পক্ষে স্বাধীনতা চেষ্টাই অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত। রামকৃষ্ণদেব তা মানছেন না, তার পথ আত্মমুক্তির পথ। শ্রীহরিই সব করাচ্ছেন, তার ইচ্ছা বিনা কিচ্ছুটি হবার নেই, কার উপকার করবে তুমি, হরি যদি অনাবৃষ্টি করে রাখেন, কজনকে খাওয়াবে তুমি, ভগবান কখন হাসেন কখন কাঁদেন, ইত্যাদি ইত্যাদি দৈবতত্ত্ব বোঝাতে থাকেন।

হেন বাক্য সহকারে কৃষ্ণদাসে কন।
হীন বুদ্ধি তাই কহ বৈরাগ্যে এমন।।
বেদান্ত পুরাণ গীতা উচ্চে গায় যারে।
দেবতা দুর্লভ তুচ্ছ তোমার গোচরে।।
যার বলে হরি মিলে তাহে নাহি সার।
তোমার গিয়ান এই কি বুদ্ধি তোমার।।

অতি হীন বুদ্ধি তুমি। বৈরাগ্য বোঝ না, শ্রীহরি বোঝ না, বেদ পুরাণ বোঝ না, বোঝ খালি 'স্বাধীনতা'। কৃষ্ণের দাস নামটাই তোমার বৃথা।

শ্রী প্রভুর উত্তরের পাইয়া আভাস।
পালের বদনে আর নাহি ফুটে ভাষ।।

ভক্ত কবির মনে হয়েছে এতক্ষণে বুঝি পাল মশাইয়ের জ্ঞানোদয় হল। তিনি নিশ্চুপ হয়ে গেছেন। আমার কিন্তু সেরকম মনে হয় না। পাল মশাই স্পষ্টতই বুঝেছেন রামকৃষ্ণদেবের সাথে বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির সম্পর্ক বড় একটা নেই। তাকে এটা বোঝাতে যাওয়াও বৃথা কালক্ষেপ করা। অতএব চুপ করে থাকাই শ্রেয়।

উপরের সমস্ত আলোচনাটাই রামকৃষ্ণ পুঁথি, নবম সংস্করণ, দ্বাদশ প্রকাশ, পৃষ্ঠা-২৯৪, ২৯৫, ২৯৬ থেকে তুলে আনা হয়েছে। একই আলোচনা গদ্য ভাষায় 'শ্রীশ্রী পরমহংস

দেবের জীবনবৃত্তান্ত—রামচন্দ্র দত্ত', পঞ্চম সংস্করণ, পৃষ্ঠা-১০৯, ১১০, ১১১ থেকেও পাওয়া যাবে। সেখানে আবার দেখা যাবে রামকৃষ্ণদেব কৃষ্ণদাস পালকে বলছেন—"তোমার মত রাঁড়িপুত বুদ্ধির লোক আর দেখা যায় না।" রামকৃষ্ণদেব বুঝতেন আত্মমুক্তি। 'দেশের মুক্তি' ব্যাপারটাই তার কাছে অজানা ছিল। অনেকে বলতে পারেন, যে নিজেকে মুক্ত করতে জানে না সে আবার দেশ মুক্ত করবে কি করে! ঠিক কথা, যদিও নিন্দুক উবাচ — রামকৃষ্ণদেবের আত্মমুক্তি মানে জীবন মৃত্যুর পাড়ে গিয়ে ব্রহ্মপদ প্রাপ্তি। এই আত্মমুক্তির সাথে বাস্তব জীবনের পরাধীনতার হাত থেকে মুক্তির কোন সম্পর্ক নেই।

ঠাকুর রামকৃষ্ণের দেশ ভক্তির নমুনা আমরা পেয়েছি, তবে তিনি যে প্রকৃতির মানুষ বিপ্লব ব্যাপারটা একান্তভাবেই তার জন্য নয়। এবার একে একে সারদামণি এবং শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যান্য শিষ্যদের দেশপ্রেম নিয়েও যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করবো। প্রতিটি প্রামাণ্য গ্রন্থের উদাহরণসহ, যে কেউ প্রমাণ করে নিতে পারেন।

'জগদ্ধাত্রী পূজার পর মা কলকাতায় যাইবেন। কোয়ালপাড়া আশ্রমে তখন খুব স্বদেশী চর্চা হয় এবং ধ্যান, জপ, পূজা, পাঠ প্রভৃতি অপেক্ষা তাঁত, চরকা প্রভৃতির উপরই সকলের বেশী ঝোঁক। মা চলিয়া যাইবেন শুনিয়া কেদার বাবু জয়রামবাটীতে তাহাকে দর্শন করিতে গেলেন। মা তাহাকে বলিলেন, "দেখ বাবা, তোমরা যখন ঠাকুরের জন্য ঘর ও আমাদের পথের বিশ্রামের স্থানটুকু করেছ, তখন এবার যাবার সময় ওখানে ঠাকুরকে বসিয়ে দিয়ে যাব। সব আয়োজন করে রেখ। পূজা, অন্নভোগ, আরতি সব নিয়মিত করবে। শুধু স্বদেশী করে কি হবে? আমাদের যা কিছু সবার মূল ঠাকুর। তিনিই আদর্শ। যা কিছু কর না কেন, তাকে ধরে থাকলে কোন বেচাল হবে না"।' (শ্রীশ্রী মায়ের কথা, দ্বিতীয় ভাগ, চতুর্থ সংস্করণ, পৃষ্ঠা-১৮২-৮৩)।

এই বর্ণনা সারদামণির অন্যান্য জীবনী গ্রন্থেও নানা ভাষায় পাওয়া যাবে। কোয়াল পাড়া আশ্রমে তখন খুব স্বদেশী চর্চা চলত। সারদামণি সেটি লক্ষ্য করেছেন এবং শুরুতেই তাদের উৎসাহে জল ঢেলে দিয়েছেন এই বলে যে 'ওসব স্বদেশী করে কোন লাভ নেই, শ্রীরামকৃষ্ণকে ধরে থাক।' ধ্যান, জপ, পূজা, পাঠ, আরতি, অন্নভোগ এইসব নিয়েই থাক, বেচাল হবে না। দেশের কথা, সে ভগবান ভাববে।

কোয়ালপাড়ার ছেলেদের মধ্যে তাঁত, চরকার প্রতি উৎসাহের কথা পাচ্ছি। তাঁত, চরকা নিয়ে সারদাদেবীর একটি মন্তব্য মনে পড়ে যাচ্ছে। স্বামী পরমেশ্বরানন্দের সাক্ষ্য এটি—"একদিন মা নিজে হইতেই বলিলেন, 'দেখ, তোমরা বন্দেমাতরম্ করে হুজুগ করে বেড়িও না, তাঁত কর, কাপড় তৈরি কর। আমার ইচ্ছা হয়, আমি একটা চরকা পেলে সূতা কাটি। তোমরা কাজ কর'।" (শ্রীশ্রী মায়ের কথা, দ্বিতীয় ভাগ, চতুর্থ সংস্করণ, পৃ-৩২৫)।

এখানেও দেখতে পাচ্ছি স্বদেশী আন্দোলন তার কাছে 'হুজুগ' ছাড়া কিছু নয়। আবার তাঁত, চরকা দেখে ভিরমি লাগছে, ওরে বাবা, আবার স্বদেশীয়ানা ঢুকে পড়ল নাকি! না না, ভিরমি লাগার কিছু নেই। আসলে যাদের মাথায় ওই স্বদেশীর ভূত ঢুকেছে তাদের কিছু একটা কাজের মধ্যে ব্যস্ত রাখা। এই আর কি।

সারদাদেবীর তাঁত, চরকা মানে দেশের দ্রব্য গ্রহণ, বিদেশী দ্রব্য বর্জন, এরকম ব্যাপার কিন্তু নয়। ইংরেজদেরও তিনি তার সন্তান বলেছেন। তারকেশ্বরানন্দ লিখেছেন—'কোন কারণে জনৈক স্বদেশ সেবককে মা বলিয়াছিলেন, "তোমরা ভাইয়ে ভাইয়ে যে যা ইচ্ছে কর, কিন্তু তারাও (বিলেতের লোকেরা) তো আমার ছেলে বটে"।' (শ্রীশ্রী সারদাদেবী—ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য, চতুর্থ সংস্করণ, পৃষ্ঠা-১১১)। অথবা স্বামী গম্ভীরানন্দের ভাষায়—'স্বদেশী আন্দোলনের সময় অনেকের হৃদয়ে যখন ইংরেজ বিদ্বেষ ধূমায়িত তখনও তাহার মুখে উচ্চারিত হইত "তারাও তো আমার ছেলে"।' অতএব তাদের জিনিষ ব্যবহারে তার আপত্তি থাকার কথা নয়।

শিষ্যের সাক্ষ্য—'১৯১৭ সালে দুর্গা পূজোর সময় মা মামাদের ছেলেমেয়েদের জন্য কতকগুলি কাপড় কিনিবার ভার আমাকে দেন। আমি সব দেশী মিলের কাপড় কিনিয়া লইয়া যাই। ওই কাপড়গুলির অধিকাংশ নলিনীদি-মাকুদিরা অপছন্দ করিলেন এবং তাহাদের পছন্দ মতো ফরমাশ করিতে লাগিলেন। আমি তাহাদিগকে একটু ধমক দিয়া বলিলাম, "ওসব তো বিলিতি হবে, ও আবার কি আনব?" আমরা ১৯০৬ সাল হইতেই খুব গোঁড়া স্বদেশী ভাবাপন্ন, আমাদের বাড়িতেও কোন বিলিতি দ্রব্য স্থান পাইত না।'

'শ্রী মা পাশে বসিয়া সব দেখিতেছিলেন ও শুনিতেছিলেন। তিনি একটু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "বাবা, তারাও তো আমার ছেলে। আমার সকলকে নিয়ে ঘর করতে হয়। আমার কি আর একরোখা হলে চলে? ওরা যেমন যেমন বলছে তাই সব এনে দাও। এদেরও মনটি বুঝে আমাকে চলতে হয়। আমায় অনেক ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হয়, বাবা।" পরে দেখিতাম কাহারও জন্য কোন বিলিতি দ্রব্য আনিতে হইলে আমাকে না বলিয়া মা অপরকে দিয়া আনাইতেন। (মাতৃ সান্নিধ্যে—স্বামী ঈশানানন্দ, তৃতীয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা-৫২)।

বেশ বোঝা যাচ্ছে সারদাদেবীর তাঁত, চরকা, মানে 'স্বদেশী গ্রহন, বিলিতি বর্জন' মোটেও নয়। এর পরের অংশে দেখতে পাচ্ছি স্বামী ঈশানানন্দ বলছেন—'ক্রমশ তাহাদের মনটি বুঝিয়া বাজার করার ও জিনিস কেনার একটা সুনাম আমার হইয়া গিয়াছিল।' এর থেকে বুঝতে হবে একজন বিপ্লবীর বিপ্লব চেতনার ইতি ঘটে যাওয়া।

প্রচার কিভাবে হয় জানেন, মা বলেছেন 'তাঁত কর, চরকা কাট' কি উপাদেয় পণ্য ভাবুন তো? সঙ্গের আগাছা গুলোর খবর আর কে রাখে। স্বামী গম্ভীরানন্দ তো আবার

এও প্রমাণ করতে চেয়েছেন গান্ধীজীর আগেই সারদাদেবী চরকা আন্দোলন করে রেখেছেন।

ধর্মান্ধ দেশবাসী যদি কারও উপর ধর্মীয় ভাবে প্রগাঢ় আস্থাশীল হয়, আর সেই ধর্মগুরু যদি ভক্তকে এই রকম উপদেশ দেয় 'শুধু স্বদেশী করে কি হবে?' অথবা 'তোমরা বন্দেমাতরম্ হুজুগ কর না', ভক্তটির মধ্যে যদি সামান্য স্বাধীনতা সংগ্রাম স্পৃহা থেকেও থাকে তো তা চিরতরে ধ্বংস হতে বাধ্য।

একবার দুই সিন্ধুবালাকে (দুজনের নামই এক) পুলিশ গ্রেপ্তার করে গ্রামের মধ্য দিয়ে হাঁটিয়ে থানায় নিয়ে যায়। এতে সারদাদেবী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং জানতে চান—"এটা কি কোম্পানীর আদেশ, না পুলিশ সাহেবের কেরামতি? নিরপরাধ স্ত্রী লোকের উপর এত অত্যাচার মহারানী ভিক্টোরিয়ার সময় তো কই শুনিনি? এ যদি কোম্পানীর আদেশ হয়, তো আর বেশি দিন নয়।......"

অথবা, দেশে তখন দারুণ বস্ত্রাভাব দেখা দিয়েছে। বস্ত্রের অভাবে মেয়েরা ঘর থেকে বেরতে পর্যন্ত পারে না। এমনকি বস্ত্রের অভাবে লজ্জা নিবারণে অসমর্থা মহিলার আত্মহত্যার খবর পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে। এ সব শুনে সারদাদেবী অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন এবং কাঁদতে কাঁদতে বলেন "ওরা কবে যাবে গো? ওরা কবে যাবে গো?" এরপর বলতে থাকেন "আগে লোকেরা নিজের বস্ত্র নিজে তৈরি করে নিত। কোম্পানী এসে সে সব নষ্ট করে দিয়েছে। চরকা উঠে গেছে, এখন সব বাবু হয়েছে।"

এই ধরণের উত্তেজক মন্তব্যগুলি জনমানসে বহুল প্রচারিত। কিন্তু একটু অন্যভাবেও ব্যাপারটা দেখা যেতে পারে। আপনি যদি হঠাৎ শোনেন পাশের গ্রামের দুজন মহিলাকে পুলিশ নির্লজ্জের মত টানতে টানতে থানায় নিয়ে গেছে। যাদের একজন সম্ভবত অন্তঃসত্ত্বা। অথবা যদি শোনেন স্রেফ পরণের কাপড়ের অভাবে একজন মহিলা আত্মঘাতী হয়েছেন। আপনি দেশপ্রেমিক হন বা 'রায়বাহাদুর' খেতাব প্রেমী, আপনার মধ্যে একটা তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেবেই। সেই প্রতিক্রিয়া দীর্ঘস্থায়ী নাও হতে পারে। কিন্তু প্রতিক্রিয়া একটা হবেই। আর পূর্বোক্ত ঘটনা গুলির মধ্যে সারদাদেবীর এই তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়াই লক্ষ্য করেছি। স্বদেশীয়ানার সাথে এর কোন সম্পর্ক নাও থাকতে পারে।

মাঝে মাঝে সারদাদেবী পুলিশ কর্তাদের ডেকে এনে 'মাতাজীর আশ্রম' বেশ করে দেখিয়ে দিতেন এবং এও বলে দিতেন এখান থেকে কোন রকম বিপ্লবাত্মক কাজকর্ম হয় না। অতএব ইংরেজ সরকার তাদের যেন কোন রকম সন্দেহের মধ্যে না রাখে।

ইংরেজও দেখে নিয়েছে গোটা দেশ যেখানে ছুরি বোমা নিয়ে তাদের পেছনে দৌড়াচ্ছে, সেখানে মিশন গাদা গাদা ছেলেদের ধরছে আর ছুরি বোমার বদলে কমণ্ডলু ধরিয়ে দিচ্ছে। তারা ভাবতেই পারে 'এমন বন্ধু আর কে আছে, তোমার মত মিশন।'

ইংরেজ সরকার মিশনকে উসকানি দিয়েই চলবে এটাই স্বাভাবিক। কারণ মিশন যত বড় হবে তাদের শত্রু সংখ্যা তত কমবে।

'বিজয়ার দিন গঙ্গা গর্ভে প্রতিমা নিরঞ্জন করিবার পর মঠের সাধুরা বাবুরাম মহারাজের প্রস্তাবে স্বামী নির্মলানন্দকে শিব সাজাইলেন। তিনি শিব সাজিয়া নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলে বাবুরাম মহারাজ স্বহস্তে তাহাকে মাল্য ভূষিত করিলেন, আর প্রাচীন ও নবীন সাধুরা তাহাকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া আনন্দময় শিব নৃত্যে মাতিয়া গেলেন।' (প্রেমানন্দ প্রেমকথা, পৃষ্ঠা-২০৩)।

শৈব যোগীদের মত বিবেকানন্দের মাথায় পরচুলার জটা হাঁটু অবধি নেমে এসেছে। কানে শঙ্খের কুন্ডল, বিভূতি-লিপ্ত বুকে একরাশ ছোট বড় রুদ্রাক্ষের মালা। চোখ বুজে গান গাইছেন, ভাবের আবেশে এই বুঝি ঢলে পড়েন....ব্রহ্মচারীরা তার পায়ের কাছে বসেছেন, গানের সঙ্গে মন্দিরা বাজাচ্ছেন একজন। (নিবেদিতা—লিজেল রেমঁ, অনুবাদিকা নারায়ণী দেবী। প্রথম সং ১৩৬২, পৃ-১৩৭)। অমূল্য মহারাজ—আজ আমি তিন বার পুরীর মন্দিরে গেছি, আপনি কবার? স্বামী তুরীয়ানন্দ—পাঁচ বার। এই রকম বালখিল্য জীবন যাত্রা যাদের, বিদেশী শাসক তো তাদের পাশে পাশে থাকবেই। নিশ্চিত ভাবেই রামকৃষ্ণ মিশনের এত বাড়বাড়ন্তর পিছনে ইংরেজ সরকারের প্রভূত মদত ছিল। যদিও এতদিন পর সেই সূত্রগুলো সব জোগাড় করা সম্ভব নয়।

ধরুন দেখা গেল কোন গ্রামে কিছু যুবক রোজ একত্র হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ কীর্ত্তনে মেতে উঠছে। ইংরেজ সরকার লোক পাঠিয়ে জেনে নিল ব্যাপারখানা কি। এবার তারা দলটির পাশে এসে দাঁড়াল। তাদের মঠ মন্দির তৈরি করার উৎসাহ এবং অন্যান্য সাহায্যেও এগিয়ে এল। তৈরি হয়ে গেল রামকৃষ্ণ মিশনের নতুন একটি সেন্টার। মিশন কর্তারা দেখল বাঃ সেন্টার বাড়ছে। ইংরেজ দেখল বাঃ শত্রু কমছে। দিব্যি শান্তিপূর্ণ সহবস্থান। বিদেশী শাসক কেন মদত দেবে না! আমি হলে তাই করতাম।

ইংরেজরা যে মিশনকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে মদত যোগাতই তার একটা উদাহরণ—'আর একদিন বৈকালে মার কাছে গিয়েছি। মা দেবব্রত মহারাজের ও শচীনের কথা বলিতে লাগিলেন। তাহারা হঠাৎ অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে।' মা—"আহা! মা, দেবব্রতটি আজ চলে গেল। কোম্পানী সেবাশ্রমের পাশের জায়গাটার কি সাহায্য করবে বলেছে; ওরা থাকতে আপত্তি তুলেছে, সেই জন্য রাখাল (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) সরে যেতে বললে। জানিস তো বাপু, তার কোন দোষ নেই, তবু একটা ফেউ লেগে থাকবে। আহা বাছারা খেয়ে গেল না।" (মায়ের কথা, দ্বিতীয় ভাগ, পৃষ্ঠা-২৯০-৯১)।

এখানে দেখা যাচ্ছে কোম্পানী সেবাশ্রমের সাহায্যে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। তবে একটা শর্ত তারা রেখেছে, ঐ যে দুজন প্রাক্তন বিপ্লবী, হয়তো তাদের গা থেকে এখনও বিপ্লবের

গন্ধ পুরোপুরি যায় নি। ওই দুজনকে ভাগাতে হবে। পাছে তাদের উসকানিতে অন্য নিরীহ সাধুদের না আবার মতিভ্রম ঘটে। অতএব তাই করা হল। বিপ্লবী পুষে ইংরেজের সাহায্য কেউ হাতছাড়া করে?

ঐ কথোপকথনটি চলতে থাকে। বিপ্লবী দেবব্রত বসুর বোন সুধীরা দেবী পুলিশকে তার দাদার শ্বশুর বাড়ির লোক বলে উল্লেখ করেন। শুনে সারদামণি বলেন—"শ্বশুর বাড়ির লোকই বটে, মা। কবে স্বদেশীর হাঙ্গামে ধরেছিল, এখনও তার খোঁজ রাখে।......" এখান থেকেও বেশ বোঝা যাচ্ছে আশ্রমে কোনরকম বিপ্লবাত্মক কাজকর্ম হয় কিনা পুলিশ সেদিকে কড়া নজর রাখত। সে ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েই তারা মিশনের পাশে এসে দাঁড়াত। আর মা সারদামণির কাছে স্বদেশী আন্দোলন একটা 'হাঙ্গাম' বা 'হুজুগ' বৈ অন্য কিছু নয়।

শেষ পর্যন্ত শচীন ও দেবব্রত বসু এই দুই বিপ্লবী বিপ্লবের পথ ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে মঠেই থেকে যান। দুজন বিপ্লবীর সংখ্যা কমল, বাড়ল দুজন সন্ন্যাসী। লাভ হল কার?

দেখা গেছে বহু স্বাধীনতা সংগ্রামী শ্রীশ্রী মায়ের সাথে দেখা করেছেন এবং মায়ের আশীর্বাদ লাভ করে ধন্য হয়েছেন। স্বামীজীর বইপত্তরও অনেক বিপ্লবীর কাছে ছিল 'গীতা' তুল্য। এই কথাগুলি জানে না এমন বাঙালী কমই আছে। বাঘাযতীন, মা-র সাথে দেখা করে আশীর্বাদ নিয়ে গেলেন, এ বেশ জানা ঘটনা। এ দেশ ধর্মের দেশ। এ দেশে ধর্মের প্রতি ভক্তি সাধু সন্ন্যাসীর যেমন আছে, হতচ্ছাড়া হতভাগাটারও তেমনই আছে। বাঘাযতীন বা অন্য কেউ শ্রীমায়ের আশীর্বাদ নিতে আসছেন ধর্মের প্রতি সেই টান থেকেই। সারদামণিও তাকে আশীর্বাদ করছেন সকলকে আশীর্বাদ করেন বলেই। ধরা যাক এক বিপ্লবী এসেছেন মাকে প্রণাম করতে। মা কি তাকে বলবেন 'বাবা, আজ তো আর আশীর্বাদ নেই। সকাল থেকে বিলিয়ে শেষ করে ফেলিছি। অন্য দিন এসো'খন।' তা তো হয় না। বিপ্লবী হোক আর যেই হোক, প্রণাম করলে আশীর্বাদ করাই দস্তুর।

এ ভাবেই বহু স্বাধীনতা সংগ্রামী মঠে এসেছেন এবং আশীর্বাদ অথবা শুভেচ্ছা নিয়ে ফিরে গেছেন। একেই আমরা 'বহু বিপ্লবীর জন্মদাতা' বলে গুলিয়ে ফেলি।

শ্রীরামকৃষ্ণের দু-একজন শিষ্যকে বাদ দিলে একমাত্র স্বামী বিবেকানন্দ যার মধ্যে সত্যই স্বাধীনতা স্পৃহা ছিল। যিনি কখনও বা ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছেন। মনে মনে জাতীয় কংগ্রেসের সাফল্য কামনা করতেন। যুব সমাজের প্রতি ধিক্কার জানিয়ে বলতেন—'নিদারুণ আলস্যে আমরা জড় হয়ে গেছি, সে আলস্য ঝেড়ে ফেলতে হবে। আজ আমরা শক্তিহীন গোলামের জাত। আমাদের স্বাধীনতা নাই, প্রাণ নাই, বুঝি সেসব পাওয়ার ইচ্ছাও নাই।....' এ জ্বলন্ত ভাষণ উপেক্ষা করে কার সাধ্য। সমাজ এর ফলে

উপকৃত হবে, কোন সন্দেহ নেই। তবুও এত কিছুর পরেও বলছি স্বামীজী স্বাধীনতা সংগ্রামে সেভাবে সহযোগিতা করেন নি। কেউ বিপ্লবে যোগ দিক তা তিনি মোটেও চাইতেন না। আমার বুঝতে ভুল হোক বা ঠিক, তিনি স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু বিপ্লবে বিশ্বাসী ছিলেন না। মঠবাসীদের উদ্দেশ্যে তিনি ফরমান জারি করেছিলেন "রাজনীতি ইত্যাদিতে কোন যোগ দিবে না অথবা সংস্রব রাখিবে না।" তার ভয় ছিল এতে তার ধর্ম আন্দোলনের ক্ষতি হয়ে যাবে। এক চিঠির উত্তরে লিখছেন, 'আমি সাধারণভাবে সমুদয় খৃষ্টিয়ান পরিচালিত শাসনতন্ত্রকে লক্ষ্য করে সরলভাবে সমালোচনাচ্ছলে কয়েকটি কড়া কথা বলেছি। কিন্তু তার মানে এ নয় যে, আমার রাজনৈতিক বা তজ্জাতীয় বিষয়চর্চ্চার দিকে কিছু ঝোঁক আছে, অথবা রাজনীতি বা তৎসদৃশ কিছুর সঙ্গে আমার কোনরূপ সংস্রব আছে। যারা ভাবেন, ঐ সব বক্তৃতা থেকে স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করে ছাপানো একটা মন্দ হুজুক নয়, আর প্রমাণ করতে চান যে, আমি একজন রাজনৈতিক প্রচারক, তাদের আমি বলি "হে ঈশ্বর, এই সব বন্ধুদের হাত থেকে আমায় রক্ষা কর।" (স্বামী বিবেকানন্দ, জীবন চরিত—প্রমথনাথ বসু, তৃতীয় খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয় ১৩২৬ পৃষ্ঠা-৫০৮)।

আর একবার এক চিঠির উত্তরে বলছেন—'কাপুরুষতা, কি, রাজনৈতিক বাঁদরামোর সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নেই। আমি রাজনীতি মোটেই বিশ্বাস করি না। আমার রাজনীতি—ভগবান ও সত্য। আর সব ছাই আর ভস্ম।' (ঐ—পৃষ্ঠা—৫২৫)। এখানে ভক্ত মণ্ডলী থেকে একটা কথা উঠবেই, এ কথাই যদি মানতে হয় নেতাজীর মতো মহাবিপ্লবী স্বামীজীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হলেন কী ভাবে? জটিল কথাই বটে। আসলে স্বামীজীর মতই নেতাজীও ছিলেন আবাল্য পরম ভক্ত। বাড়ির দুর্গাপূজায় প্রতিবার উপস্থিত থাকার চেষ্টা করতেন। দৈনন্দিন পুজো আর্চার প্রতিটি নিয়ম কানুন ঠিক ঠিক পালন করতেন। সন্ন্যাসী হয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার ইচ্ছাও ছিল প্রবল। এ সময়ই স্বামীজীর কিছু লেখা তার হাতে আসে। সে আহ্বান তিনি উপেক্ষা করতে পারেন নি। স্বামীজী বিদেশি সরকারের বিরোধিতা করে অনেক কিছু তো বলেছেনই। সে সব জানলে মনে বিপ্লবের ছোঁয়া লাগতেই পারে। নেতাজীর যেমন লেগেছিল। তবে বিপ্লবী গড়ে তোলা স্বামীজীর প্রকল্প ছিল না। আধ্যাত্মিক বলে বলীয়ান সমাজ গড়ে তুলতেই তিনি দেশবাসিকে ডাক দিয়েছিলেন।

স্বামীজী দেশের স্বাধীনতা চাইতেন ঠিকই, কিন্তু বিপ্লবের পথে সেই স্বাধীনতা আসতে পারে তা তিনি মানতেন না। তিনি চাইতেন ভারতে নব রামকৃষ্ণ যুগের ভাব ধরাতে। রামকৃষ্ণের ধর্ম পথই একদিন দেশে প্রকৃত মানুষ তৈরি করবে এবং তারাই দেশে স্বাধীনতা আনবে, এই অদ্ভুত কল্পনাই স্বামী বিবেকানন্দ পোষণ করতেন। (স্বামী প্রেমানন্দ—প্রকাশক সম্ভুধানন্দ, পৃষ্ঠা-১৪৯)। এবং সত্য সত্যই 'পরবর্তী কালে অনেক সক্রিয় বিপ্লবী তাদের

আগের জীবন ত্যাগ করে স্বামীজীর আদর্শে শ্রী রামকৃষ্ণকে জীবনের ধ্রুবতারা জ্ঞানে সঙ্ঘে যোগ দিয়েছেন।' (দেবলোকের কথা—স্বামী নির্বানানন্দ, প্রথম প্রকাশ, পৃষ্ঠা-১০৭)। এর ফলে স্বাধীনতা সংগ্রাম কতদূর উপকৃত নতুন করে ভাবার সময় হয়েছে।

স্বামী বিবেকানন্দ নিজে হাতে চিঠি লিখে মঠের প্রথম সভাপতি স্বামী ব্রমানন্দকে বুঝিয়ে দিতেন মঠ মহারানী ভিক্টোরিয়াকে কি কি লিখে মানপত্র পাঠাবে। অথবা অজিত সিং, ভাস্কর সেতুপতির মত ইংরেজের পা চাটা রাজারা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসবে যোগ দিয়ে ইংলণ্ড থেকে দেশে ফিরলে তাদের কিভাবে অভ্যর্থনা জানাতে হবে। স্বামীজী নিজেও সেখানে নিমন্ত্রিত ছিলেন। কিন্তু অসুস্থ শরীরের জন্য যেতে না পারায় ভীষণ মর্মাহত হয়েছিলেন। (বাণী ও রচনা, সপ্তম খণ্ড, পত্র সংখ্যা ৩৩৫, ৩৪৯, ৩৬১, ৩৬২, পৃষ্ঠা-৩৫৩-৩৮১-৩৯৬)। রাজা অজিত সিং এবং রাজা ভাস্কর সেতুপতি ছিলেন স্বামীজীর আমেরিকা গমনের প্রধান দুই উদ্যোক্তা।

আবার অনেক ক্ষেত্রেই মনে হয়েছে স্বাধীনতা বলতে দেশ স্বাধীন নয় ধর্মীয় স্বাধীনতাই স্বামীজীর প্রধান লক্ষ্য। স্বামীজী এবং তার গুরুভাইরা বহুবার ইংরেজকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন কারণ ইংরেজ ধর্মীয় ব্যাপারে নাক গলায় না। অবশ্য নাক গলাতে যাবেই বা কেন তারা। যে শত্রু নিজেই নেশায় ঝিমোচ্ছে, কোন্ আনন্দে তার নেশা ছোটাতে যাবে তারা। 'তিনি (স্বামীজী) আরো ভবিষ্যৎবাণী করেছেন যে, রোমান সাম্রাজ্য যেমন খ্রিষ্টধর্মকে চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিয়েছে। বৃটিশ সাম্রাজ্যও তেমনই ভারতীয় আধ্যাত্মিকতাকে প্রখ্যাপিত করবে। একথা বলে তিনি যোগ করেছেন—"ঈশ্বর ইংল্যান্ডের সহায় হোন"।' (জোসেফাইন ম্যাকলাউড, পৃষ্ঠা - ৪১৮)।

স্বাধীনতা সংগ্রামী সুরেশ চন্দ্র চৌধুরী, সদ্য জেল থেকে ছাড়া পেয়ে সারদামণির সাথে দেখা করতে এসেছেন। 'জেল থেকে ছাড়া পেয়ে বাগবাজারে মায়ের সাথে দেখা করতে গেলাম। কিন্তু মা তখন অন্য কোথাও বেরিয়েছেন। গৌরী মায়ের সাথে দেখা পেলাম। গৌরী মা আমার সাথে অনেকক্ষণ কথা বললেন। আমার সব কথা শুনে গৌরী মা আমাকে বিপ্লবের পথ পরিত্যাগ করতে উপদেশ দিলেন।' (শ্রীশ্রী মায়ের পদপ্রান্তে—স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, তৃতীয় খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, চতুর্থ মুদ্রণ, পৃষ্ঠা-৭০২)।

সারদেশ্বরী আশ্রমের প্রতিষ্ঠাত্রী গৌরী মা। রামকৃষ্ণ দেবের আর একজন প্রধান শিষ্যা। ইনি গঙ্গাস্নান সেরে ফেরার পথে পালিতা কন্যা দুর্গাদেবীকে নিয়ে রোজই একবার অসুস্থ সারদাদেবীকে দেখে যেতেন। একদিন এসে প্রণাম করতে গেলে মা বলেন, "আমাকে স্পর্শ করো না। রোজ রোজ কেন বিরক্ত করতে — কি করতে, কি দেখতে — আসো?" গৌরী মা আমতা আমতা করায় বলেন "আমার কাছে এসে আর কি হবে? আমি আর কারুর ঝামেলা সইতে পারছি না।" দু-চার কথার পর বলেন, "যদি আসো, তবে আমার ঘরে ঢুকো নি। ঐ দরজার বাইরে থেকে দেখে যেও। কোন কথায় বকিও নি।" এরপর

থেকে গৌরী মা সারদামণিকে দেখতে এলেও কোনদিন আর তার ঘরে ঢোকেন নি। (মাতৃ সান্নিধ্যে—স্বামী ঈশানানন্দ, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ - ২০৫)। কারণ জানা নেই।

পাশের বাড়িতে একজন বাঁশীর সুর ধরেছে। স্বদেশী গান গাইছে কেউ বাঁশীর সুরে। 'আমার কুটীর রাণী সে যে আমার হৃদয় রাণী।' নিজের বাড়ির ছাদে ভক্ত পরিবৃত হয়ে বসে আছেন কথামৃতকার মাস্টার মশাই শ্রী মহেন্দ্র নাথ গুপ্ত। মন দিয়ে বাঁশী শুনছেন। সাধুদের উদ্দেশ্য করে বললেন—"স্বদেশী গান গাইছে। মোড় ফিরিয়ে দিলেই হলো।" (শ্রীম দর্শন, চতুর্থ ভাগ, পৃষ্ঠা-২৬৫)। স্বদেশী গানের মোড় ফিরিয়ে 'দে মা আমায় শ্যামা চরণ'।

'শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—"ঠাকুরের স্বরাজ হল আত্মসংযম। এরা বলেন স্বাধীনতা। ঠাকুরের ভাবও আলাদা, ভাষাও আলাদা।" ভক্তদের মধ্যে কেহ কেহ সাহস করিয়া রাজনীতির কথা তুলিয়াছেন। দেশে গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন চলিতেছে। সর্বত্র এই সব আলোচনা, বড় বড় নেতারা জেলে যাইতেছেন। ঘরের কুলবধূও বাহির হইয়া ইহাতে যোগদান করিতেছে। দুই একজন ভক্ত কোমর বাঁধিয়া এইসব কথায় মত্ত।'

'শ্রীম কৌশল করিয়া এই কথার স্রোত ঈশ্বরের দিকে ফিরাইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন—"এই সব কথা যেন কোচরের (কুঁচকির) দাদ। একবার চুলকোতে আরম্ভ করলে আর রক্ষে নেই। শেষে নির্লজ্জ হয়ে দুহাতে বেহুঁশ হয়ে চুলকাতে থাকে"।'

'শ্রীম (মাধবানন্দের প্রতি)—.....স্বামীজী নিবেদিতাকে বলেছিলেন "রাজনীতির সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নাই।" একজন ভক্ত—"আচ্ছা, পলিটিক্সের মধ্যে কত ত্যাগ দেখা যাচ্ছে। কত দুঃখ বরণ করছে এরা।" প্রশ্ন শুনে শ্রীম বলেন, "এই সব বিপ্লবীদের ত্যাগ আমাদের মত নিষ্কাম ত্যাগ নয়। গান্ধীজী রামনাম করতে করতে বিপ্লব করছে ঐ টি নিষ্কাম ত্যাগ, বেশির ভাগই স্বকাম"।' (শ্রীম দর্শন, অষ্টম ভাগ, প্রথম সংস্করণ, পৃষ্ঠা-২৬৪)।

এই আলোচনাটুকু প্রথম থেকে আর একবার লক্ষ্য করে দেখুন, কে দুমাস পায়ে হেঁটে পুরী জগন্নাথধামে যাবে, এদের উৎসাহের অন্ত নেই। কে ভিক্ষা করে নিজে রান্না করে খেয়ে বাকী সময় ভগবানকে ডাকবে, আনন্দে মশগুল। কে গরমের দুপুরে ঘামতে ঘামতে রামকৃষ্ণের থাকা জায়গাগুলি ঘুরে বেড়িয়েছে, শ্রীম আনন্দে আটখানা।

"ধন্য আপনারা! এতগুলি মহাতীর্থ ভ্রমণ করে এলেন। গায়ে শক্তি থাকলে এই করে শক্তির সদ্ব্যবহার করতে হয়।" (শ্রীম দর্শন, ষোড়শ ভাগ, প্রথম সংস্করণ, পৃষ্ঠা-৯২)। শক্তির সদ্ব্যবহার দেখলাম। তার সাথে আর একটা কথা যোগ করে দিতে চাই, লক্ষ্য করেছি এরা প্রত্যেকেই নিজের দলবলকে সবসময় সৈনিক, বীর, শক্তিমান, মহাবীর এইরকম সব বিশেষণে বিভূষিত করতে চান। আর এদের বীরত্বের মাপকাঠি হল কে নির্ভীক মনে আঠারো ঘন্টা ধ্যান করতে পারবে, কে জপের ঠেলায় মেদিনী কাঁপিয়ে

ছাড়বে। কে তীর্থ ভ্রমণে বেরিয়ে তিনদিন না খেয়ে ভগবানের বেদী টলিয়ে দেবে, এই সবই বীর সৈনিক সন্ন্যাসীদের বীরত্বের মাপকাঠি।

একবার বেশী ঘুমানোর জন্য স্বামী অদ্ভুতানন্দ রামকৃষ্ণদেবের কাছে বকুনি খান। ফলাফল কি দাঁড়াল শ্রীমর মুখে শুনুন—"এমনি তার শাসন! যেমন ভালবাসা, অসীম শাসনও তেমনি মর্মভেদী। একদিনের তিরস্কারে লাটু জিতনিদ্র। এরপর সারা জীবন রাত্রিতে ঘুমোতেন না— ভজন করতেন। এরা বীর। (শ্রীম দর্শন, ষোড়শ ভাগ, পৃষ্ঠা-১১৩)। এই হচ্ছে 'বীর সৈনিক'দের বীরত্বের নমুনা। সারারাত জেগে 'ভজনবীর'। অথচ মাতৃভূমির স্বাধীনতা নিয়ে আলোচনা যেন 'কুঁচকির দাদ'।

এই রকম কথাবার্তা বহু পাবেন। আমি দু'তিনটি উদাহরণ হিসাবে ব্যবহার করলাম মাত্র। আরও অনেক অনেক পড়েই রইল। জানতে পারলামনাও অনেক। এরাই বহু বিপ্লবীর জন্ম দাতা।

উপরিউক্ত ঘটনাটির ২৬৪ পাতার উল্লেখ করলাম বটে, দুচার পাতা আগে পরে মিলিয়ে নিয়ে দেখবেন, উক্তির অপব্যাখ্যা করা হল কি না। আমরা সত্যকে জানতে চাই। রামকৃষ্ণদেব এবং তার প্রায় সব শিষ্যই দেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে সম্পূর্ণ উদাসীন, ইহাই সত্য। ইহাকে জানার নামই ঐ বিষয়ক সত্যজ্ঞান।

শুধুমাত্র ভগবানকে জানার নামই সত্যজ্ঞান নয়। যে কোন বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞানই সেই বিষয়ে সত্যজ্ঞান। হাইড্রোজেন, অক্সিজেন মিলিত হয়ে জল তৈরি হয়, ইহাই জল সম্পর্কিত সত্যজ্ঞান। পরিবেশ একই থাকলে সত্য পৃথিবীর সর্বত্র একই ফল প্রসব করে। ট্রেনের তলায় পড়ে একজন মারা গেল তো বললাম কপালের লিখন। কিন্তু যেই প্লেন দুর্ঘটনায় দুশো লোক মারা গেল তখন আর অঙ্ক মিলছে না। একসাথে দুশো লোকের কপাল লিখন একই তা কখনও হয়! কপালের লিখন মিথ্যা। ইহাই সত্যজ্ঞান।

কেউ কেউ আবার এরকম বুঝিয়ে দেন, কোন একজনের কপাল লিখনের দোষে এতগুলো লোকের প্রাণ গেল। তাহলে পনের বছরের যে ছেলেটি মারা গেল তার কপালে হয়ত সত্তর বছর আয়ু ছিল। সে তো মিথ্যে হয়েই গেল। আবার এমনও মানুষ আছে যারা বলেন প্লেনেরও তো একটা ভাগ্য লিপি আছে। যাক আমরা এত দূর যুক্তিহীন হব না। আমরা বরং শ্রীরামকৃষ্ণ শিষ্যদের কাছেই ফিরে যাই।

তবে শ্রীম প্রসঙ্গে কথা হচ্ছে যখন তখন এই কথাটাও জানিয়ে রাখার প্রয়োজন বোধ করছি। ইংরেজরা স্কুল কলেজে ইংরাজী ঢুকিয়ে আমাদের একটা আধা সাহেব বানাবার পরিকল্পনা করেছিল। যাতে এই আধা সাহেবদের দিয়েই তাদের শাসন ব্যবস্থার অর্ধেক কাজ সামলে নিতে পারে। এই বদমায়েসীটা মাস্টার মশাই শ্রীম বিলক্ষণ বুঝেছিলেন। তিনি তার ছাত্রদের এই আধা সাহেব বানাবার তীব্র বিরোধী ছিলেন। এমনকি অন্য কোন

শিক্ষকও যদি তার কাছে পরামর্শ চাইতে আসতেন তো তিনি তাকে সম্পূর্ণ বিষয়টি বুঝিয়ে বাংলা ভাষায় শিক্ষাদানের সুপারিশই করতেন। শ্রীমর এই শিক্ষাটি আমরা কিন্তু মোটেই নিতে পারিনি। আধা সাহেব হবার পিছনেই ছুটে চলেছি।

'শ্রীশ্রী মায়ের পদপ্রান্তে' স্বামী অভয়ানন্দ 'শ্রীশ্রী মায়ের স্মৃতি' কথা রোমন্থন কালে মঠে তার যোগদানের কারণটি বেশ বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছেন। অত বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে যথাসম্ভব সংক্ষেপে আলোচনাটি জানাবার চেষ্টা করছি। মূল গ্রন্থ থেকে মিলিয়ে প্রমাণ করে নিতে পারেন, মন গড়া কথা কিছু ঢুকে গেল কিনা।

স্বামী অভয়ানন্দ প্রথম জীবনে ঢাকায় 'অনুশীলন সমিতি' নামে একটি বিপ্লবী দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু সমিতির কিছু কিছু নীতির সাথে তিনি নিজেকে মানিয়ে নিতে পারছিলেন না। তার মনে হয় এই সময় যদি কেউ সৎ পরামর্শ দিয়ে তার মনের বিভ্রান্তি দূর করে তো কিছুটা মানসিক শান্তি তিনি পান। ঠিক এই সময় এক বন্ধু মাধ্যমে স্বামী ব্রম্নানন্দের সাথে যোগাযোগের একটা সুযোগ পেয়ে যান। তিনি বন্ধুর সাথে বেলুড় মঠে চলে আসেন। মহারাজ তাকে কিছু দিনের জন্য মঠে থাকার ব্যবস্থা করে দেন।

ঘটনাচক্রে বন্ধুটি কিছুদিন পরে অভয়ানন্দকে কিছু না জানিয়েই ঢাকায় ফিরে যায়। আরও কয়েকদিন মঠে থাকা কালে স্বামী ব্রম্নানন্দ মঠের অন্য সকলকে ফেলে নবাগত যুবকটিকে নিয়েই পড়েন। চলতে থাকে এই নতুন যুবকটিকে নিয়ে তার প্রাতঃভ্রমণ, সান্ধ্য ভ্রমণ। এই ভ্রমণ কালে আরও কি চলতে থাকে তার একটা আন্দাজ আমরা করতেই পারি। মগজ ধোলাই।

তিনি ঢাকায় ফিরে যেতে চাইলে ব্রম্নানন্দজী তাকে বলেন "তোমার এক বন্ধু গেছে, তা যাক না, আমরা তো অনেক বন্ধু রয়েছি।" এরপর তাকে বলেন সামনেই স্বামীজীর জন্মতিথি কয়েকদিন থেকে যাও। সেটা মিটলে বলেন আর কয়েকদিন পরে ঠাকুরের জন্মতিথি উৎসব, থেকেই যাও। এইভাবেই চলতে থাকে দিনের পর দিন। যুবক ভুলে যায় তার প্রকৃত পথ। শেষে মঠেরই এক সন্ন্যাসী হয়ে বাকী জীবনের নিশ্চিন্তি। (শ্রীশ্রী মায়ের পদপ্রান্তে—স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, প্রথম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, পৃষ্ঠা-২৮-৩১)। এই ভাবেই মঠ বহু সন্ন্যাসীর জন্ম দিয়েছে। অথচ আমরা বলি 'মঠ বহু বিপ্লবীর জন্ম দাতা'।

'ব্রম্নচর্য ব্রতে দীক্ষিত করিয়া নিবেদিতাকে স্বামীজী শ্রী রামকৃষ্ণ মঠের অন্তর্ভুক্ত করিয়া নিয়াছিলেন। মঠের অঙ্গগণের রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান দূরের কথা, মঠে রাজনীতি চর্চাও তিনি নিষিদ্ধ করিয়া যান।' ব্রম্নচারী অক্ষয়চৈতন্যের উক্তি এটি। যে বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে নিবেদিতার ভারত আগমন, তার আদর্শে অনুপ্রাণিত

হয়ে নিবেদিতার তো ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান সম্ভব নয়। কিন্তু ঘটেছিল ঠিক তাই। নিবেদিতার এই বিপ্লবী সত্ত্বাটিকে ধরতে গেলে অনেক আগে থেকে নিবেদিতাকে দেখতে হবে।

আয়ার্ল্যাণ্ডের মেয়ে নিবেদিতা। তিনি জন্মানোর পর থেকেই দেখে এসেছেন তার জন্ম ভূমির উপর বৃটিশ অত্যাচার। তার দাদু এবং পিতা দুজনেই ছিলেন ধর্মযাজক। আবার দুজনেই বৃটিশ অত্যাচারের বিরুধে আজীবন বিপ্লবও করে গেছেন। ফলতঃ পৈতৃক সূত্র ধরেই নিবেদিতার মধ্যে ধর্ম এবং বিপ্লব সমান ভাবে কার্যকর ছিল।

ইংল্যাণ্ডে যখন তিনি থাকতেন তখন ইংল্যাণ্ড থেকেও আইরিশ স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সাথে যোগাযোগ রাখতেন। স্বামীজীর সাথে ভারতে এসেও সেই ছবির কোন পরিবর্তন হল না। সেই বৃটিশ রাজ, সেই বৃটিশ অত্যাচার। তিনি ইংরেজ শাসনের বিরুধে তো যাবেনই।

যতদিন গুরুদেব সামনে দাঁড়িয়ে আছেন ততদিন তিনি নিজেকে সংযত রেখেছিলেন। যাকে এত মান্য করেন সরাসরি তার বিরোধিতা করতে চাননি। কিন্তু স্বামীজীর মৃত্যুর পর তিনি আর মঠের সাথে আপস করে চলতে পারেননি। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সাথে নিজেকে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে ফেলেন। কেঁপে ওঠে স্বামী বিবেকানন্দের রামকৃষ্ণ মিশন। স্বামী ব্রম্মানন্দ তখন মঠাধ্যক্ষ। তিনি বারে বারে নিবেদিতার সাথে আলোচনায় বসেও কোন সমাধান সূত্র বার করতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় মঠ-মিশন থেকে নিবেদিতাকে বহিষ্কার করা হবে।

এরপর, ১৯০২ সালের ১৯জুলাই অমৃতবাজার পত্রিকায় নিবেদিতাকে দিয়েই বিজ্ঞপ্তি দেওয়ানো হল যে 'এখন থেকে নিবেদিতার কার্যাবলীর সমস্ত দায়িত্ব তার নিজের। তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন। তার কার্যাবলীর সাথে বেলুড় মঠের কোন সংস্রব নেই'।

নিবেদিতা তার স্কুল উন্নয়নের জন্য কিছু চাঁদা তুলেছিলেন। সেই টাকাটাও তার কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হয়। অথচ টাকার অভাবে বাগবাজারে তার স্কুল বন্ধ হতে চলেছে এবং বন্ধ হয়েও গেছিল।

এরপর নিবেদিতা বিপ্লবাত্মক কার্যকলাপ নিয়ে ভারতের নানান জায়গায় ঘুরতে থাকেন। তিনি কলকাতায় ফিরছেন খবর পেলেই স্বামী ব্রম্মানন্দ সংবাদপত্রে নতুন করে বিজ্ঞপ্তি জারি করতেন 'মঠের সাথে নিবেদিতার কোন সম্পর্ক নেই। তার কাজকর্মের দায়ও তার নিজের।'

ভবিষ্যতেও আর নিবেদিতাকে মিশনের অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। আজও রামকৃষ্ণ মিশনের সাথে নিবেদিতার কোন সম্পর্কই নেই। তিনি মিশন থেকে বহিষ্কৃত। কারণ তিনি

স্বাধীনতা সংগ্রামের সাথে যুক্ত। [এই আলোচনার মূল গ্রন্থ সূত্র 'ব্রম্মানন্দ লীলা কথা'— ব্রম্মচারী অক্ষয়চৈতন্য, ১৩৬৯, পৃ - ৩৭-৩৮, (নিবেদিতা—রেমঁ, পৃষ্ঠা ৪০২-৪০৫)। এছাড়াও অন্য কিছু আকর গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া হয়েছে]।

নিবেদিতার ঘটনা উপলক্ষ করে ব্রাহ্মদের 'ভারতী' পত্রিকায় (ভাদ্র ১৩০৯) যে সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হয় তার অংশ বিশেষ—'.....কিন্তু সেই ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত দায়িত্বের পরিবর্তে কোন্ বৃহৎ জাতীয় দায়িত্বভার তাহারা (রামকৃষ্ণ মিশন) স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছেন? দেশের লোকের তাহাদের প্রতি এ প্রশ্ন করিবার অধিকার আছে। সর্বসাধারণের ন্যায় প্রভাতে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান, চা যোগ, স্বেচ্ছামতো কিছু অধ্যয়নাদি বা অনধ্যায়, স্নানাহার, দিবানিদ্রা, সান্ধ্যবিহার, খোস গল্প, আহার ও শয়ন—ইহার বেশী তাহাদের জীবন চরিতের বর্ণিতব্য বিষয় যদি কিছু না থাকে তবে ঐ মঠভানী সৌধ ভাগীরথী জলে লীন হইয়া গেলেও দেশের কোন ক্ষতি নাই।.....তাহাকে (নিবেদিতা) দেশের সকল সদনুষ্ঠানেই সর্বত্রই দেখিতে পাইতেছি, —এবার দেখিতেছি না তাহার পার্শ্বে, পার্শ্বচর রামকৃষ্ণ-সন্ন্যাসীদের। বিবেকানন্দ স্বামীর মৃত্যুর পর হইতে তিনি প্রকাশ্যতঃ সংবাদপত্রে রামকৃষ্ণ মিশনের সহিত তাহার সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ ঘোষণা করিয়াছেন।'

কিছুদিন আগে বাগবাজারে নিবেদিতার বাড়ি সরকার অধিগ্রহণ করে রামকৃষ্ণ মিশনের হাতে তুলে দিল। আসলে সরকার আদৌ জানে না মিশনের সাথে নিবেদিতার কোন সম্পর্কই নেই। মিশন তাকে বহুদিন আগেই বিদায় জানিয়েছে। প্রশ্ন হলো মিশন ঐ বাড়ি-গ্রহন স্বীকার করলো কি ভাবে?

স্বামী বিবেকানন্দের একটি বিখ্যাত শিক্ষা Aggressive Hinduism। শুনে মনে হয় দেশবাসীকে স্বদেশী আন্দোলনে চাগিয়ে তোলার এক মহামন্ত্র বুঝি! না, না, ওসব কিছু নয়, অন্য ধর্ম থেকে হিন্দু ধর্মভুক্ত করাই এর উদ্দেশ্য। খৃষ্টান বা মুসলমানেরা যেমন বিধর্মীদের তাদের নিজেদের ধর্মে নিয়ে আসে, স্বামীজীও চাইতেন হিন্দুরাও তেমন তাদের ধর্মে লোক সংখ্যা বাড়াক। এরই উগ্র রূপ Aggressive Hinduism। হিন্দুধর্মে তো আসা যায় না, তবে বিধর্মী যেন কেউ না হয়। যারা ধর্মান্তরিত তাদের প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে স্বধর্মে ফিরিয়ে আনো, এবং "মুসলমান বা খ্রীষ্টানদিগকেও হিন্দু ধর্মে আনিবার জন্য বিশেষ উদ্যোগ করিতে হইবে।" স্বামী বিবেকানন্দের অভিমত। (স্বামী নির্মলানন্দ—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৪০৬, পৃষ্ঠা - ১৮৫)। অর্থাৎ নতুন কোন ধর্মমত প্রণয়ন করতে হবে যাতে ধর্মের ফাঁক গলে বিধর্মীকেও হিন্দু ধর্মে আনা যায়। এরই নাম Aggressive Hinduism।

স্বামী অভেদানন্দের ভীষণ দুশ্চিন্তা দেখা দিয়েছে। বাপ মায়েরা ছেলেমেয়েদের আট দশ বছর বয়স হলেই বিয়ে দিয়ে দিচ্ছে। দুচার বছর যেতে না যেতেই কুকুর বেড়ালের

মত ছানা পোনায় ঘর ভর্তি। তারা মানুষ না অন্য কিছু কে জানে। দুশ্চিন্তায় স্বামীজীর ঘুম বন্ধ। কি অবৈজ্ঞানিক দেশ! কবে যে এদের মগজটুকু হাঁটু ছেড়ে মাথায় উঠবে! শিষ্যকে এই সব বলছেন স্বামীজী।

কিন্তু একটু লক্ষ করলেই দেখা যাবে স্বামীজীর আসল লক্ষ্য অন্যদিকে। অপরিণত বয়সে বিয়ের কুফল নিয়ে কার কি এসে যায়। আসলে বাপ মায়েরা যদি তাদের ছেলেগুলোকে ঝপাঝপ বিয়ে দিয়ে ফেলে তবে তো দেশে ব্রম্ভচারীর আকাল দেখা দেবে। আর ব্রম্ভচারীর আকাল, দেশের পোড়া কপাল। তাই মহারাজের এত দুশ্চিন্তা।

শিষ্যকে বলছেন—"তোদের মত কতকগুলি লেখাপড়া জানা ছেলেকে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করতে হবে দেশের জন্য এবং গ্রামে গ্রামে গিয়ে ব্রম্ভচর্যের মহান আদর্শ গ্রামবাসীদের সম্মুখে ধরতে হবে। শুধু হুজুগ বা পলিটিক্স নিয়ে মাতলে কি হবে? তাতে দু একজনের পকেট ভারী হবে সত্য।" (যেমন শুনিয়াছি—ব্রম্ভচারী সম্বুদ্ধ চৈতন্য, প্রথম ভাগ, ১৩৩৯ পৃষ্ঠা-১৩-১৪)।

ব্রম্ভচারী হও, গ্রামে গ্রামে ব্রম্ভচর্য শিক্ষা দাও, ভাল খাও দাও সুখে জীবন কাটাও। শুধু পলিটিক্স, মানে, স্বদেশী আন্দোলনের হুজুগে ভীড়ে যেও না। ঈশ্বরকে খোঁজ। তাকে পেলেই সব পাওয়া। তাকে না পেলে স্বাধীনতা পেয়ে হবে কি? পরকাল সামলাবে কে?

দুজন কংগ্রেসের লোক, মানে বিপ্লবী, ছিপ নিয়ে মাছ ধরতে যাচ্ছেন। স্বামী অভেদানন্দজী শিষ্যকে বলছেন তারও এক সময় ছিপ ফেলে মাছ ধরার অভ্যাস ছিল। কিন্তু রামকৃষ্ণদেব তাকে বলেন 'খাবারের মধ্যে বঁড়শি লুকিয়ে এরকম নিষ্ঠুরতা এবং বিশ্বাসঘাতকতা না করাই উচিত।' এরপর অভেদানন্দজী এই অভ্যাস সম্পূর্ণভাবে বর্জন করেন। শিষ্যকে এইসব বলে স্বামীজী সেখান থেকে চলে যান। শিষ্য থেকে যান। পরে আবার শিষ্যের সাথে দেখা হলে স্বামী অভেদানন্দ বলেন—"সকলকে ভালবাস। এখন তোরা ধর্ম কর, রাজনীতির আন্দোলন করে কি হবে?"

দেখা যাচ্ছে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি গুরুজীর বিলক্ষণ অনীহা। ঐ ব্যাপারে কেউ মেতে উঠুক এ তারা কোন ভাবেই চান না। এরপর অভেদানন্দজী শিষ্যকে জিজ্ঞেস করেন—"আমি চলে আসার পর ওরা কি বল্লে?" শিষ্য—"ওরা সবাই বল্লে এত বুড়ো বয়সে এরকম চেহারা দেখতে পাওয়া যায় না। তবে একজন কংগ্রেসের লোক বল্লে, আমাকে আঙুর বেদানা এক বৎসর খাওয়ালে আমিও ঐ রকম চেহারা করতে পারি।" শুনে গুরুজী রেগে টং। বললেন কে তাকে কটা আঙুর বেদানা খাওয়ায়। সুখা রোটি আউর ডাল এই মোর পথ্য। এই রকম অনেক কিছু বললেন। আমরা কিন্তু সে সময়কার কিছু বিপ্লবীর মধ্যে সন্ন্যাসীদের নিয়ে প্রচলিত কথাটি পেয়ে গেলাম। (যেমন শুনিয়াছি, প্রথম ভাগ, পৃষ্ঠা-৪১-৪২)। প্রসঙ্গত, স্বামীজীর গেঞ্জি, বেল্ট, জুতো, মোজা সবই অর্ডার দিয়ে বানাতে

হত। ঐ বিশাল মাপ বাজারে পাওয়া যেত না। (যেমন শুনিয়াছি, তৃতীয় ভাগ, পৃষ্ঠা-১২৫)।

"ইংরেজগণকে ভগবান এ দেশে পাঠিয়েছেন। ইংরেজরা এদেশ শাসন করছে ইহা ভগবানের ইচ্ছা। তোরা তাদের কাছে শেখ্, ওদের অনেক গুণ আছে, ওরা তোদের চেয়ে অনেক বড়, বুঝলি! আজ যদি ইংরেজরা এ দেশ ছেড়ে দেয়, তাহলে দেখবি মারামারির জোরটা কি? সকলেই রাজা হতে চাইবে, সকলেই নিজের মত চালাতে চাইবে এবং স্ব স্ব প্রধান হয়ে কাটাকাটি করবে। যখন উপযুক্ত হবি তখন স্বরাজ আপনিই আসবে।" (যেমন শুনিয়াছি, প্রথম ভাগ, পৃষ্ঠা-৫৩)।

উপরের বক্তব্যে দেখতে পাচ্ছি স্বামীজী ঠিকই বলেছেন ইংরেজরা আমাদের থেকে অনেক এগিয়ে। এককালে যারা বিশ্ব সংসার শাসন করেছে তারা নিশ্চয় আমাদের মত জুতো খাওয়া দেশের লোক নয়। পেছনে পড়ে থাকা যাত্রী সামনের অভিযাত্রীর থেকে অভিজ্ঞতা লাভ করতেই পারে। একদম ঠিক। দেশ স্বাধীন হলেও নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়িটাও স্বামীজীর পূর্বাভাষ মতই হয়েছে বা হচ্ছে। এসব নিয়ে কারো কিছু বলার নেই। শুধু এইটুকু বলতে চাই যাদের মধ্যে এত ইংরেজ প্রীতি তারা কখনও ইংরেজ বিরোধিতায় উৎসাহ দিতে পারে? আর এই যে বলছেন 'যখন উপযুক্ত হবি স্বরাজ আপনিই আসবে,' এই 'উপযুক্ত' হওয়া বলতে দেশ রামকৃষ্ণ ভাবাদর্শে তোলপাড় হয়ে যাওয়াই 'উপযুক্ত' হয়ে ওঠার মাপকাঠি।

শ্রীরামকৃষ্ণের নামে দেশ তোলপাড় তো হচ্ছেই। উন্নতি তো কিছু চোখে পড়ছে না। দেশের সর্বস্তরে উচ্চপদাধিকারীদের মধ্যে দুর্নীতি যে কোন্ পর্যায়ে রয়েছে আমাদের মত তুচ্ছ লোকেরা তার ধারণাই করতে পারি না। ইতালির কোম্পানি থেকে হেলিকপ্টার কেনা হবে। কোম্পানি মোট দামের সাথে ২১৭ কোটি টাকা বাড়তি ধরে রেখেছে। ঘুষ দিতে হবে। তারা জানে এই ধার্মিক জাতটার সাথে ব্যবসা করতে গেলে ঘুষ দিতে হয়। নাহলে ফাইল এক টেবিল থেকে অন্য টেবিলে গিয়ে পৌঁছবে না। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বলেছেন, ইংরেজরা তাদের প্রশাসনের বড় কোন দায়িত্বে ভারতীয়দের রাখতে চাইত না, যথেষ্ট যোগ্যতা থাকলেও না। কারণ তারা বিজিত জাত পরাজিতকে মাথায় চড়তে দেবে কেন! এছাড়াও 'ভারতীয়দের উৎকোচ গ্রহণের স্বভাব।' যে লোকটা ঘুষ না দিলে কাজই করে না সে তো অসৎ লোকই। আপনি বলবেন এর সাথে ধর্মের কী সম্বন্ধ হল? হল। দিনের শেষে নয়নতারা খুঁচিয়ে দুফোঁটা নয়নাশ্রুসহ ধর্মরূপ ইষ্টনাম জপ করলেই সব দোষ কাটান্। চিত্রগুপ্তের খাতায় যার নামের পাশে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ যৎকিঞ্চিৎ, তার মুক্তিও সুনিশ্চিৎ। মুক্ত হয়ে গেলে কি আর জালিয়াতি নিয়ে মুক্ত হবেন। সেগুলো পরের প্রজন্মের জন্য গচ্ছিত থাকবে। তারা আবার 'সারদা' কেলেঙ্কারি করে লোক ঠকিয়ে টাকা কামাবে। তারপর কিছু দরিদ্রনারায়ণ সেবা, কাশীবাস, মুক্তি।

এই যে স্বামীজীরা বলেন 'স্বরাজ,' এই স্বরাজটিও জানার বিষয়। স্বামী অভেদানন্দ খুব অল্প কথায় 'স্বরাজ' খুব সুন্দর ভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন—"শ্রী কৃষ্ণ বলেছেন, 'আমি অনেকবার জন্ম গ্রহণ করেছি'। এই ভাবে চলতে চলতে, জন্মের পর জন্ম, শেষে পরমহংস হয়। পরমহংস হলে বুড়ি ছোঁয়া হয়ে গেল। তার আর খেলা চলবে না। কাজ শেষ হয়ে গেল, এখন দেবতা স্বয়ং। বিড়াল, কুকুর সব জীবকেই একদিন এইরূপ দেবত্ব লাভ করতে হবে। এরই নাম মুক্তি—এরই নাম স্বরাজ লাভ।" (শ্রীম দর্শন, দ্বিতীয় ভাগ, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা-৩০৪)। ঈশ্বর লাভ আর স্বরাজ লাভ একই বস্তুর দুই রূপ।

সমালোচনা করলেও স্বামী অভেদানন্দের দেশপ্রেম নিয়ে সংশয় দেখানো কোনও ভাবে উচিত নয়। এ ব্যাপারে তার একটা বিপরীত সত্তা ছিল। প্রভুত আবেগসহ, তিনি পরাধীনতা নিয়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে এমন বহু কথা বলতেন যা সরকারের কানে গেলে নিশ্চিৎভাবেই তাকে জেলে যেতে হত। সরকার সে সব মন্তব্য জানতে পারলো না কেন সেটাই আশ্চর্য।

'শিবানন্দ বাণী' প্রথম খণ্ড, এগারো পাতা থেকে সতের পাতা পর্যন্ত স্বামী শিবানন্দের সাথে এক ভক্তের একটি দীর্ঘ আলোচনা আছে। ভক্তটিকে 'কা-' নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। পুরো নাম ব্যবহারে কি অসুবিধা বুঝতে পারি না।

কা- অনেকক্ষণ আগে মঠে এসেছেন। এতক্ষণ ঠাকুর ঘরে কাটিয়ে স্বামী শিবানন্দের কাছে উপস্থিত হয়েছেন। তাকে একটু বিষন্ন ও উদ্বিগ্ন দেখে মহারাজ তার কুশল জিজ্ঞাসা করছেন। তিনি বলছেন তার কিছু প্রশ্ন আছে, মহারাজ অনুমতি দিলে নিবেদন করেন—

মহারাজ—"বেশ তো, বল না।" ভক্তটি তখন আবেগ ভরে বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ, এখন সমগ্র দেশ মহাত্মাজীর অসহযোগ আন্দোলনে মাতোয়ারা। শত শত নরনারী জেলে পচে মরছে। কত লোক প্রাণ দিচ্ছে। মহাত্মাজী নিজেও এ বিপদ সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। কিন্তু দেশ ব্যাপী এত বড় ব্যাপারে রামকৃষ্ণ মিশন একেবারে চুপ কেন? আপনাদের কি এতে কিছুই করার নেই? সারা দেশ তো অবাক হয়ে ভাবছে রামকৃষ্ণ মিশন করছে কি! দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাদের কি কিছু কর্তব্য নেই?" শেষটায় অনুযোগের সুরে বলিলেন, "দেশের জন্য আপনাদের প্রাণ কি একটুও কাঁদে না? আপনাদের কি কিছুই করবার শক্তি নেই?"

প্রশ্ন শুনে মহারাজ প্রথমে একটু থমকে যান। তারপর আস্তে আস্তে যা বলতে থাকেন তা এইরকম, 'দেশে রামকৃষ্ণ অবতার জন্মেছিলেন, তার কাজ বোঝার সাধ্য আমাদের নেই। দেশের যদি স্বাধীনতা সংগ্রামীর প্রয়োজন হত তাহলে তিনি তাদের সেই ভাবেই তৈরি করতেন। করেননি যখন বুঝতে হবে তার ইচ্ছা অন্যরকম। স্বামীজীকে দিয়ে তিনি বিশ্বব্যাপী ধর্মের প্লাবন ডেকে এনেছেন। ভারতবর্ষ থেকেই এবার সূচনা। এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ। তিনি ভক্তকে মনে করিয়ে দিয়েছেন "আর স্বামীজীর কথা ছেড়ে দাও,

আমাদের ভেতরেই প্রভুর কৃপায় এমন শক্তি রয়েছে যে আমরাও ইচ্ছা করলে দেশটাকে তোলপাড় করে দিতে পারি। কিন্তু ঠাকুর তো আমাদের তা করতে দেবেন না।"

এইভাবে জগতের দুঃখে তাদের প্রাণ কতটা কাঁদে, তারা শুধু ভারতবর্ষের নয় গোটা জগতের, নারায়ণ বুদ্ধিতে জীব সেবা করে চলেছেন, এই সব বলতে থাকেন। এত শুনেও বেয়াড়া ভক্তটি আবার প্রশ্ন করে বসেন—"তবে কি মহারাজ, আপনার মতে মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতি দেশনায়কগণ ঠিক ঠিক দেশের কাজ করছেন না? তাদের অপূর্ব ত্যাগ, তিতিক্ষা ও দেশ সেবা তো উপেক্ষার কথা নয়। তারা কত নির্যাতন, অত্যাচার না সহ্য করছেন দেশের জন্য।"

এবার মহারাজ থমকে যাচ্ছেন না। তিনি হুঁশিয়ার। গান্ধীজীর মত বিরাট ব্যক্তিত্বকে নিয়ে কোন আলটপকা মন্তব্য তিনি করবেন না। তিনি গান্ধীজীর আন্দোলনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তার একটা সুবিধাও আছে, গান্ধীজীও 'রাম নাম' করতে করতে আন্দোলন করছেন, মহারাজেরাও রামকৃষ্ণ নাম করতে করতে সেবা করে চলেছেন। তবে 'আত্মনো মোক্ষার্থং'। নিজের মুক্তির জন্যে। ঠাকুর-স্বামীজীর আদর্শ ও নির্দেশ অনুযায়ী।

ভক্তটির আবার প্রশ্ন—"কিন্তু মহারাজ, মহাত্মাজী এই অসহযোগ আন্দোলনের দ্বারা সমগ্র দেশে যে জাগরণের সৃষ্টি করেছেন সে সঙ্গে যদি রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের সহযোগিতা থাকত তো দেশের কাজ ঢের এগিয়ে যেত। এ কেবল আমার কথা নয়, দেশের বড় বড় চিন্তাশীল ব্যক্তিদেরও ধারণা তাই। আপনারা মহাত্মাজীর সঙ্গে একযোগে কাজ করেন না কেন?" ভক্তটি সত্যিই বড় নাছোড়বান্দা। শিবানন্দজী এত করে বোঝাচ্ছেন তবু বুঝতে চাইছে না।

'ওরে আমরা আমাদের আদর্শ অনুযায়ী চলি। আর এ আদর্শ রেখে গেছেন সেই দূরদর্শী ঋষি স্বামীজী নিজে।' স্বামীজীর দূরদর্শন কতদূর অবধি কাজ করত, রামকৃষ্ণের মত সত্ত্বগুণের অবতার জগৎ শত শত বছরের মধ্যে আর দ্বিতীয়টি দেখেনি, এই আধ্যাত্ম তরঙ্গ এখন অবাধে সমগ্র জগতে চলতে থাকবে, এই তো সবে শুরু, এর কিরণে জগৎ কেমন উদ্ভাসিত হবে, এই ঐশী শক্তির গতিরোধ করে কার সাধ্য, ভারত জাগবেই জাগবে, ভারতের এই মহাজাগরণ দেখে জগৎ অবাক হয়ে যাবে, তখন সবাই বুঝবে যে ঠাকুর স্বামীজী কেন এসেছিলেন এবং দেশের জন্য তারা কি করে গেছেন। আসলে তারা যে ভারতের জাতীয় কুণ্ডলিনী শক্তি জাগিয়ে দিয়ে গেছেন, ভক্ত কিছুতেই সেটি বুঝতে চাইছে না। তার ঐ এক বায়না 'কেন মিশন স্বাধীনতা সংগ্রামে নেই'।

ভক্ত তার বায়নাক্কা নিয়েই থাকুক, আমরা পাঠককে নিয়ে খুঁজে দেখি স্বদেশী আন্দোলনে মিশন দেশকে আরও কত ভাবে সহায়তা করেছে। উপরের আলোচনার সূত্র, 'শিবানন্দ বাণী'—স্বামী অপূর্বানন্দ, প্রথম ভাগ, তৃতীয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা-১১-১৭।

এক ভক্ত স্বামী সারদানন্দকে চিঠি লিখে কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর জানতে চেয়েছেন। প্রশ্নগুলি আমার জানা নেই, শুধু উত্তরগুলোই দেখতে পাচ্ছি। ৫ম প্রশ্নের উত্তরে সারদানন্দজী লিখছেন—"রাজনীতি চর্চা সম্বন্ধে মিশন ভালো মন্দ কিছুই বলিতে চাহে না। কারণ, ঠাকুর কিছু করিতে ঐ সম্বন্ধে আমাদিগকে কিছু বলিয়া যান নাই এবং স্বামীজী মিশনকে ঐ চেষ্টা হইতে দূরে থাকিতে বলিয়া গিয়েছেন। সেই জন্য মিশন এতকাল পর্যন্ত ধর্ম এবং জনসেবা লইয়া আছে।"

৬ষ্ঠ প্রশ্নের উত্তরে লিখছেন—"সব জিনিসই যখন পরিবর্তনশীল তখন ভারতের এই পরাধীন অবস্থাও একদিন পরিবর্তিত হইয়া রাজনৈতিক স্বাধীনতা উপস্থিত হইবে। উহা কতদিনে হইবে তাহা মিশন জানে না এবং জানিবার চেষ্টাও করে না। মিশনের চেষ্টা—সাধারণে যাহাতে ধর্মবলে ও চরিত্রবলে বলীয়ান হইয়া যথার্থ মানুষ হইয়া ওঠে। চরিত্রবান, ধার্মিক এবং সবল হইবার পরে সেই সকল মানুষ তাহাদের সমাজ ও দেশের শাসনাদি কিভাবে পরিচালিত করিবে, তাহা তাহারা ঐকালে বুঝিয়া লইবে। মিশনের উহা ভাবিবার প্রয়োজন নাই।" (স্বামী সারদানন্দের 'পত্রমালা'—উদ্বোধন, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা-৮০, পত্র সংখ্যা ২০)।

এই পত্রাংশটি থেকে একটা জিনিস খুব পরিষ্কার দেশ স্বাধীন কি পরাধীন, স্বাধীনতা আদৌ আসবে কি আসবে না, এসব নিয়ে মিশন এক মিনিটের জন্যেও ভাবতে বিলকুল নারাজ। তারা সেবা, হোম, যজ্ঞ, অন্নভোগ এসব নিয়েই থাকবে। এসবের মধ্যে দিয়েই পতিত দেশবাসী প্রকৃত মানুষ হয়ে উঠবে। এই কথাটা ইংরেজ সরকারকেও জানিয়ে দেওয়া হত। একবার ঢাকার দরবারে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে ভাষণ দিতে গিয়ে বাংলার তদানীন্তন গভর্ণর লর্ড কারমাইকেল মিশনকে উদ্দেশ্য করে কিছু সন্দেহের কথা উল্লেখ করেছিলেন। সারদামণির আদেশে স্বামী সারদানন্দ তৎক্ষণাৎ স্বামীজীর শিষ্যা মিস ম্যাকলাউডকে সঙ্গে নিয়ে লর্ড কারমাইকেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। মঠের কার্য এবং উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাকে সব জানিয়ে আসেন। লর্ড কারমাইকেল অন্য একটি বক্তৃতায় তার পূর্ব মন্তব্য প্রত্যাহার করে নেন। (পুণ্য স্মৃতি—স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ, পৃষ্ঠা-৫৩)।

একবার নিবেদিতার কারণেও শরৎ মহারাজ বৃটিশ সরকারকে লিখিত প্রতিশ্রুতি দেন, "এখান থেকে কোনরূপ রাজদ্রোহী কাজ হয় না। এটি আধ্যাত্মচিন্তা এবং সেবা প্রতিষ্ঠান।" ইংরেজও জানত রামকৃষ্ণ মিশন একভাবে তাদের ঢাল হিসাবেই কাজ করছে। অতএব তার সাথে আপসের রাস্তায় চলাই ভাল।

'এই সময় একদিন দুপুরে কাটিহারের একজন ব্রহ্মচারী গড়বেতা স্টেশন হইতে শ্রীশ্রী মাকে দর্শন করিতে সাইকেলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি কাটিহারের ডাক্তার অঘোর নাথ ঘোষের বাড়িতে পুলিশের নজরবন্দী হইয়া কিছুদিন ছিলেন। পুলিশ ভুলবশতঃ

তাহাকে অঘোরবাবুর ফেরার ছোট ভাই মনে করে। সুতরাং শরৎ মহারাজ (স্বামী সারদানন্দ) ব্রহ্মচারীটিকে দেখিয়া একটু অসন্তুষ্ট হইয়া আদেশ করিলেন, সে যেন আহারাদির পরই জয়রামবাটী ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, নচেৎ হয়ত মাকে পুলিশের নিকট বিশেষভাবে বিব্রত হইতে হইবে।' (মাতৃ সান্নিধ্যে—স্বামী ঈশানানন্দ, তৃতীয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা-৬০)।

এক ভক্ত লিখছে—আমি ও সহজানন্দ শরৎ মহারাজকে চিঠি লিখলাম, 'আমাদের মঠে যোগদানের ইচ্ছা হয়েছে, কিন্তু আমাদের উপর এখনও স্বদেশী ভাবের জন্য পুলিশের দৃষ্টি রয়েছে।' মহারাজ লিখলেন, 'এ অবস্থায় কি করে আসবি? যদি পুলিশের নজর উঠে যায় তবে আমায় জানাবি।' ১৯১২ সালের প্রথম দিকেই আমাদের উপর থেকে পুলিশের নজর উঠে যায়। তখন পত্র লিখতেই তিনি লিখলেন, 'তোরা দুজনেই চলে আয়'।" (স্বামী প্রেমানন্দ—স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ, পৃষ্ঠা-১২০)। একেই কি বলে 'বহু স্বাধীনতা সংগ্রামীর জনক'?

মহারাজ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ শিষ্যকে বুঝিয়েছেন খুব ঠাকুরের নামকীর্তন করবি মনে শান্তি পাবি। শিষ্য শান্তি পাননি। তার চোখে দেশের দুর্দশার ছবি ফুটে উঠেছে। মহারাজকে তিনি বলছেন—

"আচ্ছা স্বামীজী, আপনি যে বলেছিলেন ভগবানের স্মরণ মনন করার ফলে শাশ্বতী শান্তি ও পরমানন্দ লাভ হয়—কিন্তু সে শান্তি লাভ বর্তমান পরিস্থিতির মধ্যে কি করে সম্ভব? রাজনৈতিক আন্দোলন ও ব্যবসা বাণিজ্যের অভাবে দেশের সর্বত্র দেখছি হাহাকার আর মর্মন্তুদ আর্তনাদ।"

মহারাজ কিন্তু এ সব কথা শুনতে চান না। কি করে মঠ মিশন তৈরি করা যায় তার চিন্তা শুধু সেদিকে। ইঞ্জিনীয়ার তো। উত্তরে তিনি বলছেন—"আপনারা জাগতিক নানা আন্দোলনে ও ঘটনা প্রবাহের উপর এতটা গুরুত্ব আরোপ করেন কেন? এসব তো চিরকাল আছে, থাকবেও। ধরুন দেশময় যে স্বাধীনতা লাভের আন্দোলন চলছে—সে স্বাধীনতা লাভ যদি হয়ে যায়, তাহলে কি সব কিছু শান্তিপূর্ণ হয়ে যাবে? নিশ্চয়ই তা হবে না।" (সৎপ্রসঙ্গে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ—স্বামী অপূর্বানন্দ, তৃতীয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা-৮১)।

এরপর আমরা জাগতিক বিষয়ে বেশি মন দিয়ে কিভাবে সব অনর্থ বাঁধিয়ে বসি, অন্তর্জগতে ডুব দিয়ে 'ডুব দে মন কালী বলে' কেমন শান্তি লাভ হয়, ভক্তকে এসব বোঝাতে থাকেন। ভক্ত কী বোঝে ভক্তই জানে।

বহু লোকের জমায়েত দেখে ইংরেজ সরকার প্রথম দিকে মঠের প্রতি ভীষণ সন্দিহান ছিল। ক্রমে ক্রমে এদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে যখন তারা বিশেষভাবে জানতে পারল তখন বুঝল নাঃ এতো শত্রু শিবির নয়, তবে বহু স্বাধীনতা সংগ্রামী বিপ্লব

ছেড়ে মঠে এসে ভিড়েছে, এদের উপরই যা একটু নজরদারী রাখতে হবে। নতুবা এরাই তো আমাদের প্রকৃত বন্ধু। খোঁজ নিলে হয়ত ইংরেজের উপহার দেওয়া সোনার খোলকর্তালও মঠ থেকে পাওয়া যেতে পারে।

রামকৃষ্ণ মিশনের বার মাসে তের পার্বণের কোন কোন অনুষ্ঠানে বৃটিশ সরকারের বিশিষ্ট প্রশাসনিক কর্তাদের সভাপতিত্ব করতেও দেখা গেছে। (স্বামী প্রেমানন্দ, পৃষ্ঠা-১০০)। কেন এই বন্ধুত্বের হাত বলুন তো?

এই বারো মাসে তেরো পার্বণের এগারোটাই থাকে জন্মতিথি বা জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠান। ৭.১১.১৯৩৩ স্বামী অখণ্ডানন্দ মহুলা থেকে শ্রী বনবিহারী ভট্টাচার্যকে লিখছেন—"আত্ম শ্রাদ্ধের পর বিরজাহোম করিয়া সন্ন্যাসী হইতে হয়। সুতরাং সন্ন্যাসীর জন্মতিথি কেমন, না, যেমন 'সোনার পাথরবাটি'। পার, তোমরা জন্মতিথির কথাটাই একেবারে ভুলিয়া গেলে আমি খুশি হইব।..... আজকাল এ জয়ন্তী সে জয়ন্তীর ব্যাপার দেখিয়া আমি ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত।" (শরণাগতি ও সেবা—স্বামী অখণ্ডানন্দ, উদ্বোধন, পৃষ্ঠা-১৪৩, ১৫৩)। যদিও মহারাজ নিজেই গণ্ডা গণ্ডা জন্মতিথি, জয়ন্তী পালন করতেন। রামকৃষ্ণ মিশনের তো কথাই নেই।

এক ভক্ত স্বামী শিবানন্দকে চিঠি লিখেছেন। তারা খুব হই হই করে বিবেকানন্দের জন্মোৎসব পালন করেছেন। কিন্তু হরিষে বিষাদের মত কোন এক ইংরেজ অফিসার হয়ত তাদের কিছু জিজ্ঞাসাবাদ অথবা অন্য কোন ভাবে কোন সমস্যা তৈরি করেছিল। সেই কথাটিও তিনি মহাপুরুষ শিবানন্দজীকে লিখে জানান। উত্তরে শিবানন্দজী বলেন—'আজকাল কোথাও কোন সরকারী কর্মচারী স্বামীজী বা ঠাকুর সম্বন্ধে বক্তৃতাদি দিতে বাধা দেন না। তোমাদের ওখানে বোধহয় কোন নতুন লোক আসিয়াছেন। যাহা হউক, ভবিষ্যতে বোধহয় কোন বাধা হইবে না।' (মহাপুরুষজীর পত্রবলী—উদ্বোধন, দ্বিতীয় সংস্করণ, পত্র সংখ্যা ১৫৫, পৃষ্ঠা-২৩০)।

না জেনে নতুন কোন লোক কিছু বিপত্তি ঘটিয়ে ফেলেছে। আসলে বহু লোকের সমাবেশ। সঠিক ভাবে উদ্দেশ্যটা জানা না থাকলে সন্দেহ হতেই পারে। তবে মহাপুরুষজী ঠিকই বুঝেছেন আর বাধা আসবে না। কারণ তাকে উপর মহল থেকে নিশ্চয় জানিয়ে দেওয়া হবে, 'ওরে, ওদের উৎসাহ দে রে, উৎসাহ দে। ওরা হরি কীর্ত্তন করে। পারলে ওদের সাথে 'হ্যারি-হ্যারি' করে একটু নেচে নে। বাধা দিসনি।'

মহাপুরুষ মহারাজ স্বামী শিবানন্দ জোসেফিন ম্যাকলাউডকে এক দীর্ঘ চিঠি লিখেছেন। তারই এক জায়গায় লিখেছেনঃ— 'ভারতের হৃদয় আজও বৃটিশ সিংহাসনের প্রতি গভীরভাবে অনুরক্ত। ভারতবাসী তাদের কাছ থেকে অনেক কিছুই পেয়েছে এবং আরো পাবার প্রত্যাশা করে....।' (জোসেফিন ম্যাকলাউড—পৃষ্ঠা-৪৭৪)। জানি না এটা

সাধু-সন্ন্যাসীর মনের কথা, নাকি আপামর ভারতবাসী, তথা ক্ষুদিরাম-সুভাষচন্দ্র বসুর মনের কথা।

মুর্শিদাবাদ জেলায় রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম সেবা প্রতিষ্ঠান স্বামী অখণ্ডানন্দের নেতৃত্বে বেশ প্রসার লাভ করেছে। তবুও গ্রামের কিছু কিছু লোক স্বামীজীর নামে কুৎসা গেয়েই চলেছে। আশ্রমের উন্নতিতে বাধা দিয়ে চলেছে। কিন্তু প্রশাসন যাদের বন্ধু তাদের আবার ভয় কি! 'জেলার শ্বেতাঙ্গ ব্যবসায়ীরা ও উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীগণ ততই আশ্রমের পক্ষে সমর্থন করিয়া প্রতিষ্ঠানটিকে সাহায্য করিতে থাকেন।'

'এই প্রসঙ্গে স্বামী অখণ্ডানন্দ বলিতেন—"সাহেবরাই তো এই আশ্রমের খুঁটি। আমার উপর দিয়ে যখন ভয়ানক ঝড় বইছিল, যখন গ্রামের এক শ্রেণীর লোক আমাকে উচ্ছেদ করবার জন্য কৃত সংকল্প, তখন কেয়ো সাহেব বহরমপুর গ্রান্ট হলে আমার সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। তারা আমায় বলিতেন, 'স্বামীজী, তুমি ভাবছ কেন? আমরা সর্বদা তোমার পক্ষে। ওদের কাছে পরাভব স্বীকার কর না'।" (স্বামী অখণ্ডানন্দ—স্বামী অন্নদানন্দ, প্রথম সংস্করণ, পৃষ্ঠা-১৯০)।

ইংরেজ দেখেছে এবার শহর ছাড়িয়ে গ্রাম গ্রামান্তরেও মিশনের সেন্টার ছড়িয়ে পড়ছে। আর একটি নতুন সেন্টার মানেই সেই এলাকার যুবকদের মধ্যে কিছু হবু স্বাধীনতা সংগ্রামীর সংগ্রাম শেষ। মিশন ফুলে ফলে পল্লবিত হয়ে উঠুক এ তো তারা চাইবেই। এমন কি বেলুড় মঠে সারদামণির জন্মতিথি উৎসবে যোগ দিতে বাংলার গভর্ণর লর্ড লিটনকেও দেখা গেছে।

এই বেলুড় মঠের সূচনা লগ্নের কিছু কথা অনঙ্গ মহারাজ বা স্বামী ওঁকারানন্দের বয়ানে এখানে তুলে ধরব। সেদিন মহারাজ শিষ্যদের কিছু পুরানো দিনের ইতিহাস শোনাচ্ছেন। 'বালির লোকেরা মঠের সঙ্গে গোড়ায় খুব শত্রুতা করেছিল। তারা দরখাস্ত করেছিল যে, এটা মঠ নয়, বাসাবাড়ি। তাই ট্যাক্স মুকুব হতে পারে না। ও ব্যাপারে কোর্টে কেস হয়েছিল, বালির সমস্ত লোক মঠের বিরুদ্ধে।' এখানে একটু থামা যাক। অনেক গোপন খবর এরই মধ্যে বেরিয়ে পড়েছে কিন্তু। যেখানে স্বামী বিবেকানন্দের বিশ্বজয়ের সুবাদে ভারতের গগন ফাটছে, হঠাৎ করে বালির লোকেরা মঠের বিরুদ্ধে চলে গেল কেন? বালিবাসির বাড়া ভাতে বেলুড়মঠ ছাই দিয়েছিল এমন কথা তো শুনি নি। আর বালিবাসির ধর্ম কর্মে মতি নেই ইতিহাসে এমন সাক্ষ্যও নেই। তবে এই বিরোধিতা কেন? কেনই বা তারা সরকারের কাছে দরখাস্ত করতে গেল এটা আদৌ মঠবাড়িই নয়, বসতবাড়ি। এই কাহিনীগুলো সকলের একটু আধটু জেনে রাখা দরকার। এখানে সিস্টার নিবেদিতার সেই চিঠিটির অংশ বিশেষ আর একবার তুলে আনতে হবে। নিবেদিতা বলছেন এখন তিনি বুঝতে পারছেন স্বামীজীর তিন খানা

ইউরোপীয় ধাঁচের ঘর, তার খাওয়া দাওয়া ইত্যাদির মানে কি। (নিবেদিতা - লিজেল রেমঁ, পৃষ্ঠা - ৪২৫)।

বালি পৌরসভার মধ্যেই বেলুড় মঠ অবস্থিত। মঠের জীবনযাত্রা সবচেয়ে কাছ থেকে তারাই দেখেছিল। মঠে চা খাওয়াও নিষিদ্ধ। সেখানে দামী দামী আসবাব পত্র দিয়ে সাজানো ঘর। এমনকি স্বামীজীর বসত বাড়ির মামলার টাকাও মঠ থেকেই যাচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে জমানো ভক্তদের প্রণামীর টাকা, 'টাকাটা তুই তোর বাড়িতে পাঠিয়ে দে,' মায়ের নামে প্রতিমাসে একশ টাকা চাঁদার ব্যবস্থা হয়ে যাচ্ছে। এমনকি হাজার ডলার প্রণামীও হতদরিদ্র মায়ের জুটে যাচ্ছে। আরও কত কি ছিল আমরাও জানতে পারলাম না, বালির বাসিন্দারাও জানত না। তবে এর মধ্যে দিয়েই যেটুকু প্রকট হয়েছে তাতেই স্থানীয় বাসিন্দারা মঠের বিপক্ষে চলে যায়। পৃথিবীতে এত জায়গা থাকতে শুধুমাত্র বালির বাসিন্দারাই মঠের বিপক্ষে গেল কেন ভেবে দেখার বিষয় বটে। স্টার্ডি, ফ্রাঙ্ক, হেনরিয়েটা মুল্যার প্রভৃতি বিদেশ থেকে আসা ভক্তরাও আস্তে আস্তে মঠের সাথে সম্পর্ক চুকিয়ে দেশে ফিরে যায়। এদের সাথে স্বামীজীর সম্পর্কের বিভিন্ন ঘটনা নানা জায়গায় পাওয়া যাবে। কিন্তু এরা মঠ ত্যাগ করে চলে গেল কেন এবং তার পরবর্তীকালের মন্তব্য কোথাও খুঁজে পাবেন না। সেগুলি খুব সন্তর্পনে ধামাচাপা পড়ে গেছে।

বালির বাসিন্দারা বেলুড় মঠকে নরেন দত্তের বাগানবাড়ি বলেই জানত। মঠ থেকে সরকারের কাছে আবেদন জানান হয় মঠকে যেন করমুক্ত করে দেওয়া হয়। এতেই স্থানীয় বাসিন্দারা প্রতিবাদী হয়ে ওঠেন। যে বাগান বাড়িতে আবাসিকেরা এমন স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করে, সেই বাগান বাড়ি হঠাৎ 'মঠ' অজুহাতে করমুক্ত হতে যাবে কেন। মামলা একটা হয়েছিল বটে। ইংরেজ সরকারও জানত যে ভাবেই হোক এই কচি মঠকে পাকা মঠে পরিণত করতে হবে। শুধু কর মুকুব কেন, পারলে সরকার বাহাদুরই মঠকে কর দেবে। সেই মতো কোর্ট থেকে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটকে মঠ পরিদর্শন করে রিপোর্ট জমা দেবার আদেশ দেওয়া হয়। আবার আমরা অনঙ্গ মহারাজের বর্ণনায় চলে যাই। 'একদিন সকালে ডি-এম হঠাৎ মুখে পাইপ দিয়ে ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে মঠের মূল দরজার কাছে হাজির। তখন চারিদিকে বেড়া ছিল। স্বামীজী বেঁচে আছেন। ডি-এম মঠে ঢোকার রাস্তা খুঁজছেন। এ দিকে মঠের কুকুর বাঘা তাকে দেখেই রাস্তা দেখিয়ে দেখিয়ে এখন যেখানে চা খাওয়া হয়, সেখানে নিয়ে গেল। তারপর স্বামীজী নেমে তার সঙ্গে কথা বললেন। তিনি রিপোর্টে লিখলেন— The dog has showed me the way. So it must be a monastary. ট্যাক্স মুকুব হয়ে গেল।' (শ্রীরামকৃষ্ণ স্বামী বিবেকানন্দ ও ধর্মপ্রসঙ্গ,—স্বামী ওঁকারানন্দ, পৃষ্ঠা-১২৫-২৬)। কুকুর আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছে। সুতরাং নিশ্চিৎ ভাবেই এটি একটি মঠ। কুকুরের বদলে ডি-এম যদি রিপোর্ট

করতেন, এখানে এসে আমি ডাঁস মশার কামড় খেয়েছি, সুতরাং নিশ্চিৎ ভাবেই এটি একটি মঠ, এতেও অবাক হবার কিছু ছিল না। আসলে ইংরেজ সরকার চাইছিল মঠের সামনে যে বাঁধাই আসুক তাকে দূর করতে হবে। মঠ যত প্রসারিত হবে ইংরেজের শত্রু সংখ্যার ঘটবে তত সঙ্কোচন। সরকারের দিক থেকে বিনা রক্তপাতে ব্যাপারটা মন্দ নয় মোটে।

তদানীন্তন মেডিকেল কলেজের সেক্রেটারী এবং তর্কস্পৃহার জন্য ভক্তমণ্ডলীতে 'হেগেল' নামে পরিচিত শ্রী সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী হঠাৎ করেই বাবুরাম মহারাজ, মানে স্বামী প্রেমানন্দকে প্রশ্ন করে বসেছেন—"মহারাজ এই দেখুন আজ দেশের যুবকগণ কি লইয়া মাতিয়া আছে। ইহারা দেশের জন্য তাহাদের কাঁচা মাথা বলি দিতে প্রস্তুত হইয়াছে। আর আপনারা এখানে বসিয়া কি করিতেছেন? কেবল খিচুড়ি খাওয়াইতেছেন আর ঠাকুরের নাম প্রচার করিতেছেন। ইহাই কি বর্তমান ধর্ম?" (পুণ্যস্মৃতি—স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ, পৃষ্ঠা-৬)।

সামনেই বিবেকানন্দের চিকাগো ধর্ম সভায় বক্তৃতার একটি ছবি ছিল। সেটিকে দেখিয়ে প্রেমানন্দজী বলেন—"তোমাদের দেশে যদি রাজনৈতিক নেতার প্রয়োজন হত তাহলে ঠাকুর একে এইভাবে তৈরি করতেন না। কপর্দকহীন, কৌপীনধারী সন্ন্যাসী। এরপরেও তোমরা বুঝতে পারছ না দেশের কি প্রয়োজন?" প্রয়োজন ছিল অস্ত্রধারী সৈনিকের। কৌপিনধারী সন্ন্যাসী সময়ের বিচারে ভুল নির্বাচন।

'কিন্তু তখন আমি উগ্র রাজনীতি লইয়া খুবই ব্যস্ত। তাই বন্ধুগণকে সানুনয়ে বলিয়া ছিলাম, "ভাই আমাকে ছেড়ে দাও। আমি দু নৌকোয় একসঙ্গে পা দিতে পারব না। এখন আমাকে রাজনীতিতেই থাকতে দাও। পরে সময় হলে তোমাদের প্রদর্শিত ধর্ম জীবন যাপন করার চেষ্টা করব।" (পুণ্যস্মৃতি, পৃষ্ঠা-৭-৮)। এরপর উগ্র রাজনীতির সাথে যুক্ত থাকার জন্য যুবকটিকে প্রায় একবছর জেলে কাটাতে হয়।

জেল থেকে ছাড়া পেয়ে হরি মহারাজ, মানে, স্বামী তুরীয়ানন্দের অশেষ 'কৃপায়' তিনি আর রাজনীতিতে ফিরে যেতে পারেননি। মঠেই যোগদান করেন এবং সেখানেই থেকে যান। পরাধীন দেশ আর এক যোদ্ধাকে হারালো, মিশন পেল আরও এক নন্দ, কি আনন্দ।

'বিপ্লবী দলের অন্যতম নায়ক সতীশ (সত্যানন্দ) বাবুরাম মহারাজের প্রেরণায় মঠে যোগদান করেন এবং ত্যাগ, আদর্শনিষ্ঠা ও কর্মশক্তির গুণে তাহার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন।' 'মঠে যোগদানের পরেও অনেকদিন পর্যন্ত পুলিশের কড়া নজরে ছিলেন। প্রথম প্রথম থানায় গিয়া হাজিরা দিতে হইত, তারপরে পুলিশের লোক মঠে আসিয়া রোজ তাহাকে দেখিয়া যাইত।' (প্রেমানন্দ প্রেমকথা—ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য, চতুর্থ সংস্করণ, পৃষ্ঠা-২০৫ টীকা, ৩১ টীকা)। বিপ্লবী দলের আর এক নায়কের অপমৃত্যু দেখলাম। সঙ্গে

দেখছি বৃটিশ নজরদারী। তারা লক্ষ্য রাখছে মৃত বিপ্লবী আবার না সন্ন্যাস ভুলে বিপ্লবে যোগ দেয়।

স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ এক ভক্তকে (বিধুরঞ্জন দাস) কোমর থেকে ঘাড় পর্যন্ত পদচালনা করেছেন। ভক্ত অভিভূত। ''মহারাজের এই অহেতুক কৃপা প্রাপ্ত হইয়া, আমার মনে হয়, ভক্তি না বাড়ুক চৈতন্য না জাগুক, অন্ততঃ ঠাকুরের দরজায় খানদানী চাষার মত পড়িয়া আছি। এই কৃপা না পেলে হয়ত বিপ্লবীদের দলে ভিড়িয়া যাইতাম, কারণ তখন ঐরূপ মনোভাব ছিল, আর তদনুকূল পরিবেশেও বাস করিতাম।'' (প্রেমানন্দ প্রেমকথা, পৃষ্ঠা-১৮৯)। এর পরেও তিনি বলেছেন, 'ঢাকায় থাকা কালীন বাবুরাম মহারাজ অনেক বিপ্লবমুখী যুবককেই শক্তি সঞ্চার করে বিপ্লব ছাড়িয়ে সন্ন্যাসের পথে নিয়ে আসেন।'

বাবুরাম মহারাজকে সরকার থেকে পুরস্কার দেওয়া উচিত ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানের বিরুদ্ধে ইংরেজের জয়ের জন্য তিনি ঠাকুর রামকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনাও করতেন। (স্বামী প্রেমানন্দ—স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ, পৃষ্ঠা-১১৭)।

কিছুদিন আগে শ্রীমা সারদামণি সম্পর্কে একটি বই পড়ছিলাম। ইদানিং কালে লেখা একটি বিখ্যাত বই। নামটা উহ্যই থাক। কি সুনিপুন ভাবেই না বাক্যের দু-একটি শব্দ চেপে দিয়ে অথবা কোন বর্ণনাকে সম্পূর্ণ নিজের মতো করে গুছিয়ে নিয়ে একদম চকলেটের মতো করে পাঠকের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। পড়তে পড়তে মনে হচ্ছিল মিশনের রান্না ঘরের ইঁদুরটাও বুঝি স্বাধীনতা সংগ্রামী। এমন কি সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে নিবেদিতা বিতাড়ন, তাকেও এমন ভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে যে হতবাক হতে হয়।

রামকৃষ্ণ মিশনের এক কৃতি সন্ন্যাসী স্বামী শর্বানন্দ। মিশনের একদম প্রথম যুগে প্রচার এবং নতুন নতুন কেন্দ্র স্থাপনে এনার বিরাট অবদান। তারই একটি স্মৃতিকথা দিয়ে এই অধ্যায় শেষ করব—

'অল্প কিছু দিনের মধ্যেই ঘটল একটি ছোট ঘটনা যা আমার মানসিক ভারসাম্য নষ্ট করে দিল গভীর ভাবে। তখন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন চলছে এবং আমরা সব বাঙালী যুবক ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই সেপ্টেম্বর অনশন সত্যাগ্রহ করার শপথ গ্রহণ করিয়াছিলাম। ঐ একই দিনে বঙ্গভূমির প্রতি অবিচারমূলক এই কালা-কানুন প্রত্যাহার করার দাবীতে বিক্ষোভ প্রদর্শনেরও সংকল্প আমাদের ছিল। সঙ্ঘে যোগদানের পূর্বেই এই ব্যাপারে আমি অঙ্গীকারবদ্ধ ছিলাম। সুতরাং নির্দিষ্ট দিনে উপবাসী থেকে আমি প্রতিজ্ঞা পালন করতে চাইলাম। বিষয়টি শশী মহারাজের (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) গোচরে আসতেই তিনি ক্ষুব্ধে উঠলেন এবং আমাকে প্রচণ্ড তিরস্কার করলেন ধর্ম সঙ্ঘে যোগদানের পরেও রাজনৈতিক প্রবণতার জন্য।'

'শশী মহারাজ তার অভিমত ব্যক্ত করলেন যে, শুধুমাত্র রাজনীতির পথে চলে ভারতবর্ষের প্রকৃত স্বাধীনতা কখনই করায়ত্ত হতে পারে না।' আসবে ধর্মান্দোলনের মধ্যে দিয়ে। এরপর বলেন রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ নির্দেশিত পথ ধরে তিনি এর চেয়েও বেশি দেশ সেবা করতে পারেন। 'রাজনৈতিক বিক্ষোভ সমাবেশ পাশ্চাত্য প্রভাব পুষ্ট এবং ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক ভাবধারার সঙ্গে তা সঙ্গতিহীন, ইত্যাদি আরও অনেক কথা সেদিন তিনি বলেছিলেন।' 'ভারতবাসীর রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের প্রতি তার তীব্র অনীহা ছিল লক্ষ্য করার মত।'

'অবশ্য, তার সেদিনকার যুক্তিজাল আমার মনে তখন রেখাপাত করতে পারেনি এবং আমি উপবাসী থেকে ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য জেদ করতে লাগলাম। তবে আজ আমি বুঝতে পারছি, তার ঐ ধরনের মনোভাব ছিল কত যুক্তিপূর্ণ।'

যাক শর্বানন্দজীও আজ বুঝে ফেলেছেন গুরুদেব কত যুক্তিপূর্ণ ছিলেন, আর তিনি কি ভুলটাই না করেছেন। এরপর প্রকৃত শিষ্য কাকে বলে এসব নিয়ে কিছু ভাষণ, শশী মহারাজ শিষ্যর ব্যাপারে কেমন কড়া, বিপ্লবী মনোভাব তার হৃদয়কে কেমন আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, এইরকম কিছু আলোচনা।

'তাই যখন আমি তাকে বলতে শুনলাম, "তুমি যদি আমার নির্দেশ না মেনে চল তবে তোমাকে এ স্থান ত্যাগ করে চলে যেতে হবে, কোন অবাধ্যতার প্রশ্রয় আমি দিতে পারি না।" আমি তৎক্ষণাৎ আমার অল্প জিনিসপত্র যা কিছু ছিল সব গুছিয়ে নিয়ে চলে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলাম।' কিন্তু যেতে তিনি পারেননি। শশী মহারাজের আর এক শিষ্য স্বামী বিমলানন্দ সারাদিন ধরে তাকে বোঝান। তাকে চিনিয়ে দেন তার পালকের প্রকৃত রং কী এবং তিনি বুঝতে পারেন ঈশ্বর লাভই শ্রেষ্ঠ 'এবং তুচ্ছ রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে জড়িয়ে পড়ে শক্তিক্ষয় না করা'। শেষে আবার মঠে ফিরে এসে শশী মহারাজের পায়ে লুটিয়ে পড়া।

'শশী মহারাজ আমার এই মানসিক পরিবর্তনের কথা শুনে গভীর তৃপ্তি বোধ করলেন এবং রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ বিষয়ক প্রচলিত ধ্যান ধারণা সম্বন্ধে শ্রী রামকৃষ্ণের বিভিন্ন উক্তি উদ্ধৃত করে বিষয়টির উপর আলোকপাত করলেন। জীবনের আদর্শ সম্বন্ধে আমার অন্তর্দৃষ্টি খুলে যাক—তিনি এই আশীর্বাদ করলেন।'

'এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, শশী মহারাজ আমাদের কখনই মঠের ভেতরে রাজনীতি বিষয়ক আলোচনা করতে দিতেন না।' 'এমন কি মঠের ভিতর খবরের কাগজের অনুপ্রবেশও বরদাস্ত করতেন না। একদিন কেউ একটি খবরের কাগজ নিয়ে এসে মঠের বারান্দায় বেঞ্চের উপর ফেলে রেখে চলে যায়। শশী মহারাজ তা দেখতে পেয়ে আমাকে তৎক্ষণাৎ কাগজটি আবর্জনা পাত্রে ছুঁড়ে ফেলতে বলেন। শুধু তাই নয়, খবরের কাগজের স্পর্শে অশুচি সেই স্থানে 'গঙ্গা-গঙ্গা' উচ্চারণ করে কিছু গঙ্গাজলও ছিটিয়ে দিতে তিনি

আমাকে আদেশ করেন। একথা তিনি প্রায়ই বলতেন যে, রামকৃষ্ণ খবরের কাগজে দৃষ্টিপাত পর্যন্ত করতে পারতেন না।'

উপরের সম্পূর্ণ আলোচনা সূত্র—সেবাদর্শে রামকৃষ্ণানন্দ—স্বামী প্রমেয়ানন্দ, প্রথম প্রকাশ, পৃষ্ঠা-১৮৩-১৮৪। আলোচনাটির রায় দানের দায়িত্ব পাঠকের। আমি শুধু অনুরোধ জানাচ্ছি কোনো তত্ত্বের অপপ্রয়োগ হল কিনা মূল গ্রন্থ থেকে একটু মিলিয়ে নিন। শুধু মাত্র এখানেই নয়, যেখানেই সন্দেহ হবে সেখানেই। আসলে রামকৃষ্ণ মিশন সম্পর্কে একগুচ্ছ ভুল ধারণা আমরা মনের মধ্যে গেঁথে রেখে দিয়েছি। সেই ভুলের সাথে সত্যের সংঘাত আজ নয় কাল, একদিন হবেই। কুসংস্কারমুক্ত যুক্তিবাদী মন নিয়ে সেই সত্যের মুখোমুখি হতে হবে আপনাকেই। একান্তভাবে আপনাকেই।

শ্রীরামকৃষ্ণের এক শিষ্য সাধু নাগ মহাশয়। ঢাকায় দেওভোগ গ্রামে এনার আশ্রমে ইংরেজ সরকারের রাজকর্মচারীদের বেশ আনাগনা ছিল। শ্রী শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর 'সাধু নাগ মহাশয়' গ্রন্থের কিছু অংশ—'রাজকর্মচারীগণ আসিলে নাগ মহাশয় তাহাদিগকে সসম্রমে অভিবাদন করিতেন, বলিতেন—"মহাশক্তির ইচ্ছায় ইংরাজ দেশের রাজা হইয়াছেন, ইহাদিগকে অমান্য করিলে ভগবতী অসন্তোষ হন।" তিনি ইংরেজ রাজত্বের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। বলিতেন—"মা মহারাণী শক্তির অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহার পুণ্যেই ইংরাজের অভ্যুদয় হইয়াছে। ইহাদের শাসনে প্রজা সুখে থাকিবে।" (পৃষ্ঠা-১০৯)। এই মানসিকতা নিয়ে কেউ দিয়েছে স্বাধীনতা সংগ্রামে উৎসাহ, এ কখনও হতে পারে?

'অ্যাগ্নেস ভিলাতে একদিন সকালে মহারাজদের সঙ্গে আমাদের নিয়মিত সাক্ষাতের পর, প্রেমানন্দজী যখন নিচের তলায় নামছিলেন তখন আমি (পরবর্তীকালে স্বামী নিখিলানন্দ) তাঁর অনুসরণ করলাম। তাঁকে একা পেয়ে বললাম, "মহারাজ, আমি আপনার সঙ্গে একটু গোপনে কথা বলতে চাই।" ফিরে চাইলেন তিনি আমার দিকে। বললেন দৃপ্তভাবে ঃ "তুমি একজন বিপ্লবী?" বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেলাম আমি। জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনি কি করে জানলেন?" তিনি বললেন, "আমরা সব বুঝতে পারি। দেশকে সেবা করার পথ এ নয়। ভুল পথ ধরেছ তোমরা।" উত্তেজনা তাঁর বেড়ে চলল। তিনি বললেন, "ওসব করে কিছুই হবে না। তোমার আর সব বিপ্লবী বন্ধুদের নিয়ে কাল সকালে এস। তোমাদের মহারাজের (স্বামী ব্রমানন্দ) কাছে নিয়ে যাব।"

পরদিন সকালে দু-জন বিপ্লবী বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে ভিলাতে হাজির হলাম। স্বামী প্রেমানন্দ আমাদের একটা ছোট ঘরে নিয়ে গেলেন। সে ঘরে দুটি তক্তপোশ ছিল। স্বামী ব্রমানন্দ একটিতে বসেছিলেন; স্বামী প্রেমানন্দ অপরটিতে বসলেন। স্বামী ব্রমানন্দের সেবককে ঘরের বাইরে যেতে বলা হলো; ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হলো। স্বামী ব্রমানন্দকে প্রণাম করে আমরা মেঝেতে বসলাম।

স্বামী প্রেমানন্দ ব্রহ্মানন্দজীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, "মহারাজ, এই যুবকদের প্রতি একটু তাকান। এরা ভাল ছেলে, কিন্তু ভ্রান্তপথে চালিত। ভারতকে সেবা করবার জন্য এরা হয়েছে বিপ্লবী। আপনি দয়া করে এদের একটু সদুপদেশ দিন।" স্বভাবসুলভ গুরুগম্ভীর স্বামী ব্রহ্মানন্দ অতি দরদের সঙ্গে আমাদের বিদ্বেষের পথ, জিঘাংসার পথ ছেড়ে দিয়ে স্বামী বিবেকানন্দের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করতে বললেন। তিনি প্রথমেই বললেন আমাদের চরিত্র গঠন করতে, তারপর যেন আমরা দেশসেবায় ব্রতী হই। তিনি আমাদের সাবধান করে বললেন যে, বিপ্লবীদের মধ্যে কিছু দুষ্ট স্বার্থপর লোক আছে—সেজন্য কোন ফল হচ্ছে না। চরিত্রের অভাবই এই নিষ্ফলতার কারণ। উদাহরণস্বরূপ তিনি বললেন, "ভিজে বারুদে বিস্ফোরণ হয় না। যতই জ্বালাবার চেষ্টা কর না কেন, তাতে কেবল দেশলাই-এর কাঠি নষ্ট হবে। আর বারুদ যদি শুকনো হয় তবে একটি কাঠি মুহূর্তে ঘটাতে পারে বিরাট বিস্ফোরণ।" তিনি খুব জোর দিয়ে বললেন ঃ "স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন প্রকৃত দেশপ্রেমিক এবং আমাদের উচিত তাঁর নির্দেশ মেনে চলা।"

আমি বললাম ঃ "কিন্তু মহাশয়, আপনারা তো স্বামী বিবেকানন্দকে বুঝতে পারেননি। আমরা তাঁর বই-এ পড়েছি—তিনি চাইতেন আমরা যেন ভারতের স্বাধীনতার জন্য রক্তমোক্ষণ করি। আর বিপ্লবীরা তো তাই করছে। আপনারা স্বামী বিবেকানন্দের উপদেশ ধরতে পারেননি।"

এ ধরনের উক্তি স্বামী প্রেমানন্দের পক্ষে সীমাহীন অসহ্যের ব্যাপার। তিনি ফেটে পড়লেন ঃ "নির্বোধের দল! তোরা জানিস না কার সঙ্গে কথা বলছিস। বিশ বছরেরও অধিক আমরা স্বামীজীকে জানি। আমরা একসঙ্গে খেয়েছি, খেলেছি, কথা বলেছি, আমাদের কর্মপন্থা নিয়ে আলোচনা করেছি—আর আমরা তাঁকে বুঝিনি! আহাম্মকের দল, তাঁর বই-এর দুপাতা পড়ে ভাবছিস তোরা তাঁকে সম্পূর্ণ বুঝে ফেলেছিস?"

তারপর তিনি ব্রহ্মানন্দজীর দিকে তাকিয়ে বললেন, "মহারাজ, শুনলেন আহাম্মকের কথা? এ বলছে কিনা আপনি স্বামীজীকে বোঝেননি! আপনি কি মনে করেন যে, একটা ঘোড়ার চেয়ে এর অধিক বুদ্ধি আছে? দেখি, পিঠে করে এ আমাকে বইতে পারে কি না।"

ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তিনি বিছানা ছেড়ে উঠলেন এবং আমাকে নিচু হয়ে চার-হাত-পায় হামাগুড়ি দিতে বললেন। তারপর আমার পিঠের উপর বসে দু-পাশে দু-পা ঝুলিয়ে দিয়ে ঘরের চারপাশে তাঁকে নিয়ে ঘুরিয়ে বেড়াতে আদেশ করলেন। তখন আমি যেন একটা সত্যিকার ঘোড়া। আমি তাঁর আজ্ঞা পালন করলাম। দু-এক মিনিট পর তিনি আমার পিঠের উপর থেকে নেমে বললেন, "সব ঠিক হয়ে যাবে।"

স্বামী ব্রহ্মানন্দ সপ্রেমে আপনভাবে সমস্ত ব্যাপারটা দেখলেন। তারপর আবার আমাদের চরিত্রগঠনের উপদেশ দিলেন। ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম আমরা। আর সেই থেকে ছিন্ন হয়ে গেল বিপ্লবী সমিতির সঙ্গে আমার যোগসূত্র। (স্বামী প্রেমানন্দের জীবন ও স্মৃতিকথা— সম্পাদক স্বামী চেতনানন্দ, উদ্বোধন, পৃষ্ঠা-১৪৮-১৫০)।

স্বামী নিখিলানন্দের যে ভুল, আমাদেরও সেই একই ভুল। সম্ভবতঃ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুরও ঐ ভুলই হয়েছিল। ওঠো, জাগো, মায়ের নামে বলি প্রদত্ত, শুনে নিখিলানন্দজী যেমন ভেবে নিয়েছিলেন এ বুঝি দেশ উদ্ধারের ডাক, আমরাও ঠিক তেমনই ভেবে নিয়েছি। আসলে এ ডাক আলস্য ছেড়ে জেগে ওঠার ডাক। সাধন, ভজন, কীর্ত্তনে মেতে ওঠার ডাক। 'শিব' লাভ কি এমনি হয়, নাকি মোক্ষ এসে হাতে ধরা দেয়। খাটতে হয়, মায়ের নামে বলি প্রদত্ত হতে হয়, আর মনের মধ্যে স্বাধীনতা সংগ্রামের স্পৃহা থেকে থাকলে সেটিকে ত্যাগ করতে হয়। তিনিও বিপ্লবের পথের যাত্রী নন, তার গুরুভাইরাও ওপথের যাত্রী নন। স্বামীজী সম্পর্কে আকর গ্রন্থগুলি নানাভাবে আমার মতো যারা পড়েছে তারা জানে, আর জানে তার গুরুভাইরা। যারা তার সাথে দিনের পর দিন ওঠা বসা করেছে তারা জানে স্বামীজী ছিলেন শুধুই ধর্ম মার্গের সন্যাসী। মোক্ষ লাভই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। তুচ্ছ স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা থেকে সংঘকে তিনি সবসময় দূরে রাখতেই চেয়েছেন। স্বামীজী আর দেশের স্বাধীনতা নিয়ে আমরা অনেক কথাই বলি বটে কিন্তু আসল সত্যটি হল এই, তিনি কোন দিনই স্বাধীনতা সংগ্রামে বিশ্বাসী নন।

আলগোছে কয়েকটি বিপ্লবাত্মক কথা তিনি বলেছেন ঠিকই, কিন্তু সেটাই স্বামীজীর আসল পরিচয় নয়। আর এই যে হঠাৎ বলে ফেলা কয়েকটি মন্তব্য এবং একটি চিঠি একেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে লক্ষ বার আমদের শোনানো হয়। যাতে কথাগুলি একেবারে 'মরমে পশিল রে' হয়ে থেকে যায়। "আগে দেশকে ধর্মভাব দিয়ে প্লাবিত করে দাও। আত্মার কথাই শোনাও, ভগবানের কথাই শোনাও।" (ঐ পৃষ্ঠা-১৯০)। এই তার সার কথা। এভাবেই চরিত্র গঠন হবে। তারাই দেশকে স্বাধীন করবে। 'ধর্মভাবের বন্যা' মানে চন্ডীপাঠ, গীতাপাঠ, হোম, যজ্ঞ, পূজো, ভজন, কীর্ত্তণ, দন্ডীকাটা আরও অনেক কিছু। মানুষ তৈরির নকশা এটা। কিন্তু এই ছাঁচে যে মানুষ তৈরি হবে সে স্বাধীনতা সংগ্রামে যুক্ত হবে না। হলেও দেশ স্বাধীন করতে পারবে না।

স্বামী প্রজ্ঞানন্দ, চিন্ময়ানন্দ, সহজানন্দ, আত্মপ্রকাশানন্দ, সুন্দরানন্দ, সত্যানন্দ, সম্বুদ্ধানন্দ, অভয়ানন্দ আরও অনেক অনেক নন্দ, যারা পূর্ব জীবনে স্বাধীনতা সংগ্রামের সাথেই যুক্ত ছিলেন, পরে সাধু হলেন। '১৯১৩-তে শ্রীশ্রী মায়ের কাছে মন্ত্রদীক্ষা লাভের পর থেকে নিজের জীবনে স্থিতাবস্থা লাভ হয় তার (স্বামী প্রেমেশানন্দের)। পূর্বের দেশহিতৈষনা ও সমাজসেবার ব্রতের উপর স্বামীজীর আদর্শের প্রলেপ পড়ে। সেই 'বিপ্লবী সুহৃদ সমিতি' পরিণত হয় 'রামকৃষ্ণ সেবা সমিতি' নামে। সভাপতি ইংরেজ জেলা জজ। (স্বামী

প্রেমেশানন্দজীর পত্রসংকলন, পৃষ্ঠা-১০)। এর ফলে দেশ কী পেল ভেবে দেখার বিষয়। তবুও আমাদের বিশ্বাস 'মিশন বহু স্বাধীনতা সংগ্রামীর জনক।'

সবশেষে বলি এটি একটি তথ্যবহুল গ্রন্থ। যার তথ্যগুলি খেয়াল রাখার জন্য বইটি একাধিকবার পড়া যেতে পারে। নিজে পড়ে অন্যকে পড়ালে তথ্য বিনিময়ের সুবিধাও হতে পারে।

অপ্রাসঙ্গিক

আইনস্টাইনের চিঠি— আনন্দবাজার ৬.১০.২০১২

'এ যেন 'ঈশ্বরের' অবিশ্বাস, তা-ও আবার অন্য কোনও বিষয়ে নয়। স্বয়ং ঈশ্বরের অস্তিত্বেই। এবং সেই অবিশ্বাসের খতিয়ান নিজের হাতেই একটি চিঠিতে লিখে ফেলেছিলেন তিনি। তিনি অ্যালবার্ট আইনস্টাইন।....লিখছেন "আমার কাছে ঈশ্বর আসলে মানুষের দুর্বলতার প্রকাশ ছাড়া আর কিছু নয়।".....বাইবেল সম্বন্ধে বলছেন 'আদিম শিশুসুলভ গল্পের সম্ভার"..."কোনও ব্যাখ্যা, কোনও যুক্তিই আমার এই ধারণা বদলাতে পারবে না।"...."বাকি সব ধর্মের মতো ইহুদি ধর্মও আমার কাছে শিশুসুলভ কুসংস্কারেরই প্রতিফলন।" এসমস্ত বক্তব্যই নির্দ্বিধায় তিনি পেস করেছিলেন ইহুদি দার্শনিক এরিক গুটকিন্ডের কাছে।' (১৯৫৪)।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় — যা দেখি, যা শুনি...।

আনন্দবাজার, ২৪.১২.২০১১।

আমার মুশকিল হচ্ছে, আমি তো পরলোকে বিশ্বাস করি না, পরজন্ম বলে কিছু নেই। স্বর্গ-টর্গ সবই সুমধুর কল্পনা মাত্র। এই পৃথিবীতে শেষ নিশ্বাস ফেলা মানেই চরম শেষ, সে আর কোথাও নেই। আত্মার অস্তিত্বেও আমি বিশ্বাস হারিয়েছি অনেক কাল আগে। আত্মাও মুনি-ঋষি, দার্শনিকদের মনগড়া একটা ব্যাপার, মৃত্যুর পর মানুষের শরীর থেকে কিছুই বেরিয়ে যায় না। ঈশ্বরের অস্তিত্বও স্বীকার করার কোনও কারণ নেই, বিগ ব্যাং ঘটেছে প্রাকৃতিক কারণে, তার আগে সময়েরও অস্তিত্ব ছিল না। ....অনেকের হৃদয়ে ভক্তি ও বিশ্বাসে একজন ঈশ্বর আছেন। যিনি শুধুমাত্র এই ছোটোখাটো পৃথিবীটা চালান। যিনি পেটের অসুখ সারিয়ে দেন, পরীক্ষায় পাশ করান। যার নামে কান্নাকাটি করে বহু মানুষ বিপদে বা দুঃখের দিনে সান্ত্বনা পায়। এই ঈশ্বরের অধীনে একটা চমৎকার স্বর্গ আছে, নরকও একটা আছে। ......সত্যি কথা বলতে কি, প্রত্যেকটা ধর্মই বেশ কিছু ভণ্ডামির ওপর দাড়িয়ে আছে। ...অনেক কাল আগে ব্রেখ্‌টের একটা ছোট কবিতা পড়েছিলাম। এটা একবার পড়লেই মুখস্থ হয়ে যায়—জানুয়ারি টেন/সিক্সটিন টেন/ গ্যালিলিও গ্যালিলি/অ্যাবলিশেষ হেভেন।

যে সকল গ্রন্থ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে

(১) রাণী রাসমণি—প্রবোধ চন্দ্র সাঁতরা।(২) রাণী রাসমণির জীবন বৃত্তান্ত—নির্মল কুমার রায়। (৩) রাণী রাসমণি—গোপাল চন্দ্র রায়। (৪) শ্রী শ্রী কথামৃত—প্রথম ভাগ, প্রকাশক অনিল কুমার গুপ্ত, কথামৃত ভবন, সপ্তদশ সংস্করণ, ১৩৬৮, দ্বিতীয় ভাগ, একাদশ সংস্করণ, ১৩৮৮, তৃতীয় ভাগ, নবম সংস্করণ—১৩৬৭, চতুর্থ ভাগ, নবম সংস্করণ, ১৩৮৬, পঞ্চম ভাগ, ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৩৬৮। (৫) শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ (অখণ্ড সংস্করণ, রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন)—স্বামী সারদানন্দ।(৬) শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পুঁথি—অক্ষয় কুমার সেন।(৭) শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ লীলামৃত—শ্রী বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল।(৮) শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত—রামচন্দ্র দত্ত।(৯) শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণচরিত—গুরুদাস বর্মণ, প্রথম ভাগ, ১৩১৬।(১০) ঠাকুর রামকৃষ্ণ—ব্রহ্মচারী অক্ষয় চৈতন্য।(১১) রামকৃষ্ণদেব-জীবন ও বাণী—ফ্রেডারিখ ম্যাক্সমূলার, অনুবাদ সলিল কুমার গঙ্গোপাধ্যায়।(১২) রামকৃষ্ণের জীবন—রমাঁ রলাঁ, অনুবাদ ঋষি দাস।(১৩) শ্রী রামকৃষ্ণ অন্ত্যলীলা—স্বামী প্রভানন্দ, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড।(১৪) শ্রী রামকৃষ্ণকে যেরূপ দেখিয়াছি—স্বামী চেতনানন্দ। (১৫) শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণের অনুধ্যান—মহেন্দ্রনাথ দত্ত। (১৬) রামকৃষ্ণদেবের লীলাতত্ত্ব—শ্রী শশীভূষণ সামন্ত, প্রথম ভাগ।(১৭) শিবানন্দ বাণী—স্বামী অপূর্বানন্দ, প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ। (১৮) রামকৃষ্ণ সারদামৃত—স্বামী নির্লেপানন্দ।(১৯) শ্রীশ্রী মায়ের পদপ্রান্তে—স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড।(২০) শ্রীম-দর্শন—স্বামী নিত্যাত্মানন্দ, ১-১৬ খণ্ড।(২১) গৌরী মা—শ্রীদুর্গাপুরী দেবী।(২২) স্বপ্ন জীবন—অন্নদাঠাকুর।(২৩) শ্রীম সমীপে—স্বামী চেতনানন্দ। (২৪) দেবলোকে—স্বামী অপূর্বানন্দ।(২৫) অতীতের স্মৃতি—স্বামী শ্রদ্ধানন্দ।(২৬) মা আনন্দময়ীর কথা—অভয়।(২৭) সৎকথা—স্বামী সিদ্ধানন্দ, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড।(২৮) স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র ১ম ও ২য় ভাগ। (২৯) ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ—গিরিশ ঘোষ। (৩০) রবীন্দ্রনাথ চাইলেও বিবেকানন্দ মেশেননি—তুহিনশুভ্র ভট্টাচার্য।(৩১) ভক্ত মনমোহন—উদ্বোধন।(৩২) সারদানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী—মহেন্দ্রনাথ দত্ত।(৩৩) স্বামী প্রেমানন্দ—স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ (১৩৭২)।(৩৪) স্বামী অভেদানন্দ—স্বামী আদ্যানন্দ। (৩৫) দক্ষিণেশ্বরে শ্রী রামকৃষ্ণ—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ। (৩৬) শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী—মহেন্দ্রনাথ দত্ত ১ম ও ২য় খণ্ড।(৩৭) সাধু নাগ মহাশয়—শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী।(৩৮) শ্রীশ্রী নিত্যগোপাল চরিতামৃত—ওঙ্করানন্দ অবধূত।(৩৯) স্বামীজীর বাণী ও রচনা—উদ্বোধন, ১-১০ খণ্ড।(৪০) স্মৃতিকথা—স্বামী অখণ্ডানন্দ।(৪১) মহাপুরুষজীর পত্রাবলী—উদ্বোধন।(৪২) শ্রীশ্রী মা ও জয়রাম বাটী—স্বামী পরমেশ্বরানন্দ।(৪৩) পুনর্জন্মবাদ—স্বামী অভেদানন্দ। (৪৪) ভগিনী নিবেদিতা—প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা।(৪৫) স্বামী অখণ্ডানন্দ—স্বামী অন্নদানন্দ।(৪৬) পাশ্চাত্যে বিবেকানন্দ—মেরি লুই বার্ক।(৪৭) স্বামী সারদানন্দের পত্রমালা—উদ্বোধন।(৪৮) ব্রহ্মানন্দ লীলাকথা—ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য।(৪৯) সৎ প্রসঙ্গে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ—স্বামী অপূর্বানন্দ।(৫০) মাতৃ সান্নিধ্যে—স্বামী ঈশানানন্দ।(৫১) পরমার্থ প্রসঙ্গ—স্বামী বিরজানন্দ।(৫২) নবযুগের মহাপুরুষ—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ, প্রথম প্রকাশ (১৩৫৬)।(৫৩) পত্র সংকলন—স্বামী অভেদানন্দ।(৫৪) ভক্তমালিকা—স্বামী গম্ভীরানন্দ। (৫৫) প্রেমানন্দ প্রেমকথা—ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য। (৫৬) দেবলোকের কথা—স্বামী নির্বানানন্দ।

(৫৭) স্মৃতির আলোয় স্বামীজী—স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ।(৫৮) সেবাদর্শে রামকৃষ্ণানন্দ—স্বামী প্রমেয়ানন্দ। (৫৯) স্বামী বিবেকানন্দ—ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত।(৬০) আমার জীবন কথা—স্বামী অভেদানন্দ, ১ম ও ২য় ভাগ।(৬১) পুণ্য স্মৃতি—স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ।(৬২) নিবেদিতা—সরলাবালা দাসী।(৬৩) শ্রীশ্রী লক্ষ্মীমণি দেবী—শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র সেনগুপ্ত।(৬৪) শ্রীমা সারদাদেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ।(৬৫) ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ—উদ্বোধন।(৬৬) শ্রীশ্রী মায়ের কথা—উদ্বোধন।(৬৭) শ্রীশ্রী লাটু মহারাজের স্মৃতিকথা—শ্রী চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়। (৬৮) মরনের পারে—স্বামী অভেদানন্দ। (৬৯) ভারতে বিবেকানন্দ—স্বামী শুধানন্দ। (৭০) স্বামী শিষ্য সংবাদ—শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী। (৭১) শ্রীশ্রী সারদাদেবী—ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য। (৭২) যেমন শুনিয়াছি—সম্বুদ্ধ চৈতন্য ১ম, ২য়, ৩য় ভাগ।(৭৩) সারদা-রামকৃষ্ণ, শ্রী দুর্গাপুরী দেবী, প্রথম প্রকাশ, দ্বিতীয় মুদ্রণ (১৩৬১)।(৭৪) প্রত্যক্ষদর্শীর স্মৃতিপটে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ, উদ্বোধন।(৭৫) শ্রী শ্রী মায়ের স্মৃতিকথা—স্বামী সারদেশানন্দ, উদ্বোধন, ১৯৮৯।(৭৬) শ্রী শ্রী মায়ের জীবনকথা—স্বামী ভূমানন্দ।(৭৭) স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের স্মৃতিমালা, তার পত্র ও রচনা সংগ্রহ—সংকলক স্বামী চেতনানন্দ। (৭৮) রামকৃষ্ণ পার্ষদ পরশে—স্বামী নির্লেপানন্দ, ১৯৭১।(৭৯) স্বামী অখণ্ডানন্দের স্মৃতিসঞ্চয়—স্বামী নিরাময়ানন্দ, ১৯৯৬।(৮০) প্রেমানন্দ—শ্রী ওঁকারেশ্বরানন্দ, প্রথম ভাগ ১৩৪২, দ্বিতীয় ভাগ ১৩৫৩। (৮১) ব্রহ্মানন্দ চরিত—স্বামী প্রভানন্দ।(৮২) স্বামী অভেদানন্দ রচনাবলী।(৮৩) স্বামী অভেদানন্দের পত্রাবলী।(৮৪) স্বামী নির্মলানন্দ—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ, ১৪০৬।(৮৫) কথাপ্রসঙ্গে স্বামী অভেদানন্দ—স্বামী সোমেশ্বরানন্দ।(৮৬) ব্রহ্মানন্দের অনুধ্যান—মহেন্দ্রনাথ দত্ত, ১৩৪৬।(৮৭) স্বামী সারদানন্দ—ব্রহ্মচারী প্রকাশচন্দ্র, ১৩৪২।(৮৮) শ্রী রামকৃষ্ণ স্বামী বিবেকানন্দ ও ধর্মপ্রসঙ্গ—অনঙ্গ মহারাজী, স্বামী ওঁকারানন্দ। (৮৯) শ্রী মা—আশুতোষ মিত্র। (৯০) স্বামী তুরীয়ানন্দ—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ। (৯১) জোসেফাইন ম্যাকলাউড—প্রব্রাজিকা প্রবুদ্ধপ্রাণা।(৯২) নিজের কথা—শ্রী অরবিন্দ।(৯৩) জীবন্মুক্তি সুখপ্রাপ্তি—প্রকাশক স্বামী সত্যব্রতানন্দ, ১৯৪৯।(৯৪) বিবেকানন্দ জীবন ও জিজ্ঞাসা—মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, ১৯৬৩।(৯৫) স্বামী বিবেকানন্দ (জীবনচরিত)—প্রমথনাথ বসু, ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ খন্ড। (৯৬) শ্রী শ্রী নাগমহাশয়—বিনোদিনী মিত্র।(৯৭) রানী রাসমনি—বঙ্কিমচন্দ্র সেন।(৯৮) শ্রী শ্রী মা সারদামনি দেবী—মানদাশঙ্কর দাশগুপ্ত, ১৩৯০।(৯৯) লাটু মহারাজের অনুধ্যান—মহেন্দ্রনাথ দত্ত। (১০০) সুবোধানন্দের স্মৃতিকথা—স্বামী চেতনানন্দ, ১৪১২।(১০১)।নিবেদিতা—লিজেল রেমঁ, অনুবাদ-নারায়নী দেবী।(১০২) শ্রী ম কথা—স্বামী জগন্নাথানন্দ, ১৩৪৮।(১০৩) স্বামী সারদানন্দের স্মৃতিকথা—স্বামী চেতনানন্দ।(১০৪) স্বামীজীর পদপ্রান্তে—স্বামী অজজানন্দ।(১০৫) দিব্যপ্রসঙ্গে—স্বামী দিব্যাত্মানন্দ, ১৩৭৯। (১০৬) শরনাগতি ও সেবা—স্বামী অখণ্ডানন্দ। (১০৭) স্বামী সারদানন্দের জীবনী—ব্র. অক্ষয়চৈতন্য।(১০৮) শিবানন্দ স্মৃতি সংগ্রহ—স্বামী অপূর্বানন্দ।(১০৯) স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের কথা—স্বামী চিৎসরূপানন্দ, ১ম ও ২য় ভাগ। (১১০) শ্রী রামকৃষ্ণ প্রসঙ্গ—মাসিক বসুমতী। (১১১) শতরূপে সারদা—স্বামী লোকেশ্বরানন্দ। (১১২) স্বামী প্রেমানন্দের জীবন ও স্মৃতিকথা।—সম্পাদক স্বামী চেতনানন্দ। (১১৩) স্বামীজীর কৃষ্টিন—প্র. ব্রজপ্রানা, উদ্বোধন।(১১৪) স্বামী প্রেমানন্দের পত্রাবলী—উদ্বোধন।(১১৫) আজ পর্যন্ত প্রকাশিত উদ্বোধন পত্রিকার প্রায় প্রতিটি সংখ্যা।

অমৃতবাজার পত্রিকা

১৯ জুলাই ১৯০২

বিজ্ঞপ্তি

'আজ থেকে মিশনের সহিত আমার সকল সম্পর্ক ছিন্ন হইল। আমার সকল কর্মের দায়িত্ব এখন থেকে একান্ত ভাবেই আমার নিজের।'

(সিস্টার নিবেদিতা)